বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও ইসলামী বিধান : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

আনজুমান আরা
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং- ১৯৭/২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. শেখ মো: ইউসুফ
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আগস্ট - ২০১৬

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা এবং মমতাময়ী মা ও আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকবৃন্দের প্রতি, যাদের স্নেহশীল দৃষ্টি, অক্লান্ত পরিশ্রম, সীমাহীন উৎসাহ-উদ্দীপনা আর অফুরন্ত দু'আয় মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে গবেষণার এ স্তরে পৌঁছার তৌফিক দান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ঘোষণা পত্র

আমি দৃঢ় প্রত্যয় দিয়ে ঘোষণা করছি যে, **'বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও ইসলামী বিধান : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা'** শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে প্রণীত এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শেখ মো: ইউসুফ স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লিামা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এ গবেষণাকর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য এ শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

তারিখ, ঢাকা
১২ আগস্ট, ২০১৬

(আনজুমান আরা)
এম.ফিল গবেষক
রেজিঃ নং- ১৯৭
শিক্ষাবর্ষ : ২০১০-২০১১
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূত্র : **তারিখ : ১২ আগস্ট, ২০১৬**

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক আনজুমান আরা কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত **'বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও ইসলামী বিধান : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে লিখিত ও সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এটা সম্পূর্ণরূপে গবেষকের একক গবেষণাকর্ম; কোন যুগ্মকর্ম নয়। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ কিংবা অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমার জানামতে, ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমোদন করছি।

(ড. শেখ মোঃ ইউসুফ)
তত্ত্বাবধায়ক ও
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

নানামুখী প্রতিকূলতা ও বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এম.ফিল ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত **'বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ও ইসলামী বিধান : একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা'** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে পেরে সর্বপ্রথম পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

গবেষণা কর্মে যারা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বপ্রথম সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শেখ মো: ইউসুফ স্যারের প্রতি। তিনি অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্ধারণ করা থেকে শুরু করে গবেষণা কর্মের শেষ পর্যন্ত অভিরাম উৎসাহ-উদ্দীপনা, অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় ও উপ-অধ্যায় বিন্যাস, গবেষণাপদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে আমাকে সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও মূল্যবান দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। বহু ব্যস্ততার মাঝেও তিনি তার অতি মূল্যবান সময় দিয়ে অভিসন্দর্ভটিকে এর অবয়ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিসহ দৃষ্টিনন্দন ও প্রাণবন্ত স্তরে উন্নীত হতে সর্বাত্মক সহায়তা করেছেন। তার ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা, দায়িত্বশীলতা ও দক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলেই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সহজ ও সম্ভব হয়েছে এবং এটি মানসম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করি। স্যারের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন কামনা করছি।

ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাসহ স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সকল সম্মানিত শিক্ষককে, যাদের মমতামাখা সংস্পর্শ ও উদার পরামর্শ পেয়ে আমার চিন্তাশক্তি বেশ গতিশীল হয়েছে। তাদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ ও পরামর্শ এ গবেষণা কাজে যথেষ্ট সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে।

অতি আবেগের সাথে স্মরণ করছি শৈশব জীবনের স্মৃতি বিজড়িত পিতৃতুল্য শিক্ষকমণ্ডলী ও বিদ্যাপীঠগুলোকে, যাদের স্নেহের পরশে জীবনে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে গবেষণার এ দিগন্তে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছি। তন্মধ্যে দক্ষিণ পাইকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘোড়াশাল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পলাশ শিল্পাঞ্চল কলেজ ও শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দ আমার জীবনে আজীবন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করি তিনি যেন এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিয়ামত পর্যন্ত কাঙ্খিত মানে টিকিয়ে রাখেন এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষকবৃন্দকে উভয় জগতে উত্তম বিনিময় দান করেন।

এছাড়াও যারা বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রেরণা, উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা মো. নুরুজ্জামান আজাদ, মমতাময়ী মা হোসনেয়ারা বেগম, সম্মানিত বড় ভাই ডা. সোহেল আবদুল্লাহ, স্নেহের ছোট ভাই নাঈম আবদুল্লাহ, প্রাণপ্রিয় স্বামী মোহাম্মদ ইমাম হোসাইন, আদরের দুটি সন্তান মোহাম্মদ ফাইয়াজ ইমাম সালমান ও তাসনুভা মুমতারিন তানিশা, শশুর আব্বু মো. ইসমাইল হোসেন, শাশুড়ি আম্মা ছকিনা খাতুন, ভাসুর মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন ও ননদ শামীমা আক্তার। বিশেষভাবে হৃদয়ের গভীরে থেকে তাদের নাম স্মরণ করছি এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি। দীর্ঘদিন গবেষণা করার কারণে পরিবারের সদস্যদের সঠিকভাবে সময় দেয়া কিংবা পরিবারের অনেক প্রয়োজনীয় কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা থেকে বিরত থাকতে হয়েছে।

সবার আন্তরিক সাহায্য-সহযোগিতা, কল্যাণ কামনা ও দু'আর ফলে মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে গবেষণাকর্মটি চূড়ান্ত পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আমি মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জন্য সর্বোত্তম প্রতিদান কামনা করছি। তিনি যেন তাদেরকে তার প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করে নেন এবং জান্নাতুল ফেরদাউসের সর্বোচ্চ মাকাম দান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত অভিসন্দর্ভের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেসব লাইব্রেরি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতায় আমি মুগ্ধ। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি এবং আল-আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক লাইব্রেরি প্রভৃতি।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে আল কুরআন, তাফসীর, আল হাদীসে নারীর অধিকার বিষয়ক বর্ণিত আয়াত, হাদীস এবং নানাবিদ বিষয় সম্পর্কিত দেশি-বিদেশি খ্যাতনামা লেখকদের রচনা, দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকা ও জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ, নারী বিষয়ক প্রচলিত বাংলাদেশের বিভিন্ন আইন, নারী নির্যাতন বিষয়ক দেশি-বিদেশি পত্রিকা ও জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদন, প্রবন্ধ-নিবন্ধের সহযোগিতা নিয়েছি। এবং যথাস্থানে পাদটীকা ও উদ্বৃতিতে সে সব গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম, প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিকের নাম সসম্মানে উল্লেখ করছি। তাদের কাছেও বিশেষভাবে ঋণী। মহান আল্লাহ তাদেরকে উভয় জাহানের উত্তম প্রতিফল প্রদান করুন।

পরিশেষে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে হৃদয়ের গভীর থেকে দু'আ করছি, তিনি যেনো তার এ বান্দাকে তার প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করে নেন এবং উক্ত গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি ও মর্যাদা দান করেন। আমিন।

(আনজুমান আরা)
এম.ফিল গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংক্ষেপ

অনু	:	অনুবাদ
ই. ফা বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
১ম	:	প্রথম
২য়	:	দ্বিতীয়
৩য়	:	তৃতীয়
৪র্থ	:	চতুর্থ
৫ম	:	পঞ্চম
৬ষ্ঠ	:	ষষ্ঠ
৭ম	:	সপ্তম
৮ম	:	অষ্টম
৯ম	:	নবম
১০ম	:	দশম
প্রাগুক্ত	:	পুর্বোক্ত/ পূর্বের উক্তি
বি.	:	বিশেষ
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
পৃ	:	পৃষ্ঠা
খ.	:	খণ্ড
তাং	:	তারিখ
তা.বি	:	তারিখ বিহীন
পরি.	:	পরিশিষ্ট
সা.	:	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
রা.	:	রাদিয়াল্লাহু আনহু/আনহা
র./রহ.	:	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
আ.	:	আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম
হি.	:	হিজরি সাল
খ্রি.	:	খ্রিষ্টাব্দ/খৃষ্টাব্দ
খৃ.	:	খৃষ্টাব্দ /খ্রিষ্টাব্দ
খৃ. পূ.	:	খৃষ্টপূর্ব
সং.	:	সংস্করণ
BIIT	:	Bangladesh Institute of Islamic thought.
ed.	:	edition
eds	:	edited
Ibid	:	ibidem, which means ‘in the same place’
p.	:	page
pp .	:	pages
Vol	:	volume
AD	:	after death of Christ

Dhaka University Institutional Repository

M.phil	:	Masters of philosophy
Ph. D	:	Doctor of philosophy
http	:	Hyper text transfer protocol
N.B	:	Note Bane
IFB	:	Islamic Foundation Bangladesh.
OECD	:	Organization for Economic Co-operation and Development
UN	:	United Nations
WHO	:	World Health Organization
IHEID	:	The Graduate Institute of International and Development Studies
UK	:	United Kingdom
USA	:	United State of America

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
ভূমিকা			১

প্রথম অধ্যায়

নারী ও বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ ৫-৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	নারীর পরিচয়	৬
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	নারীর বৈশিষ্ট্য	৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	পরিচ্ছদ, ফ্যাশন, পোশাক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী	১১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	পেশায় নারীর অংশগ্রহণ	১৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	নারী নির্যাতনের ঐতিহাসিক রূপ	১৫
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে নারী নির্যাতন	২১
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	ইসলামের দৃষ্টিতে নারী	২৪
অষ্টম পরিচ্ছেদ	:	নারী নির্যাতনের বৈশ্বিক চিত্র	৩৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারী নির্যাতনের ইতিবৃত্ত ৩৯-৮০

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	নারী নির্যাতন কী?	৩৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	ইতিহাস	৪৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	নারী নির্যাতনের ধরনসমূহ	৪৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন	৫৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	বিভিন্ন রূপে যৌন নির্যাতন	৫৭
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	নারীর প্রতি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস	৬৯
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	নারী নির্যাতনের কারণসমূহ	৭৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নারী নির্যাতনে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ৮২-১৩২

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র	৮২
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ	৮৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	ধর্ষণ	৮৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	যৌতুক	৯৪
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	এসিড সন্ত্রাস	১০০
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	ইভটিজিং	১০৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	নারী ও শিশু পাচার	১১৫
অষ্টম পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে পরিস্থিতি	১২৫
নবম পরিচ্ছেদ	:	নারীদের আত্মহত্যার ভয়াবহ চিত্র	১২৬
দশম পরিচ্ছেদ	:	পতিতাবৃত্তি- বাংলাদেশ পরিস্থিতি	১২৮
একাদশ পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশে নারীর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি মূল্যায়ণ	১৩১

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচলিত আইন ১৩৪-১৬৬

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)	১৩৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২	১৪৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০	১৫৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১	১৫৭
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	নারী নির্যাতন রোধে বিবিধ	১৫৮
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	নারী নির্যাতন রোধে প্রচলিত আইনের প্রায়োগিক দিক মূল্যায়ণ	১৫৯
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	প্রচলিত আইন বাস্তবায়নের বাস্তবতা এবং কিছু কেস স্টাডি	১৬১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা ৮-২৭৩

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	ইসলামের দৃষ্টিতে নারী	১৬৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	নারী সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা	১৭৯
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	নারী নির্যাতন রোধে ইসলামী আইনের প্রায়োগিক দিক	১৮৬
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	অনৈতিকতা রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ	২০০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য	২০৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	সমাজ সংস্কার	২১৪
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন	২৩২

সুপারিশ ২৭৪

উপসংহার ২৭৯

গ্রন্থপঞ্জি ২৮০

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

নারী মানবতার অর্ধেক। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মোটামুটি অর্ধেকই নারী। নারী ও পুরুষ অখণ্ড মানব সমাজের দু'টি অপরিহার্য অঙ্গ। পুরুষ যেমন মানবজাতির একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনি আরেকটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে নারী। একটি দেশও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতি তাই নারী সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নারীকে উপেক্ষা করে মানবতার জন্য যে কর্মপদ্ধতি তৈরী হবে তা হবে অসম্পূর্ণ। আমরা এমন কোনো সমাজের কথা কল্পনাই করতে পারি না যা কেবল পুরুষ নিয়ে গঠিত, যেখানে নারীর প্রয়োজন অনুভূত হয় না। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি সমাজেই নারী ও পুরুষ সমানভাবে পরস্পরের মুখাপেক্ষী। তাই এর কোনোটাকে বাদ দিয়ে মানব সমাজ কোনক্রমেই পূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। এ কারণেই নারী-পুরুষের সুষম উন্নয়ন সমাজে প্রগতির একটি অনিবার্য পূর্বশর্ত।

নারী সমাজের পশ্চাদপদতা একটি জাতির সার্বিক অগ্রগতিকে বিঘ্নিত করে। প্রাচীন আরবে শিশুকন্যাকে জীবন্ত কবর দেওয়া, ইউরোপে বুদ্ধিমতি নারীদের ডাইনি অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা, ভারতে সতীদাহ প্রথা– ইত্যাদি নারী নির্যাতনের অতীত ইতিহাস। বর্তমানে নারী নির্যাতনে ধরণ ও রূপে নতুনত্ব ও ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। নারী সুদীর্ঘকাল ধরে নানাভাবে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হয়েছে এবং আজকের সভ্য সমাজেও হচ্ছে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যারও প্রায় অর্ধেক নারী। শুধু তাই নয়, এ দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধী দলীয় নেত্রী নারী, স্পিকারও নারী। সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন, চাকরি ক্ষেত্রে নারী কোটা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, ভিন্ন ভিন্নভাবে নারীকে নির্যাতন, সহিংসতা ও বৈষম্যের শিকার হতে হয়।

ধর্ষণ, ইভটিজিং, দাম্পত্য কলহ, যৌতুকের কারণে নির্যাতন, স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে, পরকীয়া, কিস্তি বা ঋণের টাকা পরিশোধে চাপ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, গলা টিপে কিংবা পিটিয়ে হত্যা, ছুরিকাহত করা, এসিড নিক্ষেপে ঝলসে দেওয়া, কেরোসিন ঢেলে আগুন দেওয়া, বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে বাকরুদ্ধ করাসহ শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এক কথায় ধর্ষণ যৌন হয়রানি থেকে শুরু করে রাস্তঘাটে চলাফেরার ক্ষেত্রে ও নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। যৌন হয়রানি ও স্কুল-কলেজে যাওয়ার সময় উত্ত্যক্ত হওয়া নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব কারণে অনেক নারী নীরব প্রতিবাদ স্বরূপ আত্মহননের পথও বেছে নিয়েছে।

বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির যে বিপ্লব ঘটেছে, তাতেও নারীকে হতে হচ্ছে নানামুখি নির্যাতনের শিকার। নানান ধরনের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস এখন নারী নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে যুক্ত হয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নারী নির্যাতনের ধরন ও প্রকৃতিতেও নানামুখি পরিবর্তন চলে এসেছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে নারীরা দুর্বিসহ সহিংসতার শিকার হচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মোবাইল ফোন একদিকে যেমন মানুষের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনছে, তেমনি কিছু বিকৃত রুচির মানুষের (সাইবার সন্ত্রাসী) কারণে সেটি নারীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণও হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পুরস্কার

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় নারী নির্যাতন সংঘটনের পেছনে অতি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও পরিবার কাঠামো, বিরাজমান পিতৃতান্ত্রিক মন-মনন ও সংস্কৃতি, বিরাজমান বৈষম্যমূলক আইন, দুর্বল বিচারব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক প্রথা ও মূল্যবোধের প্রভাব, দারিদ্র্য, সম্পদ ও সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকারের অভাব, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারী পুরুষের মাঝে অসম সম্পর্ক, বিরোধপূর্ণ রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা, সাধারণভাবে নারী–পুরুষ সমঅধিকার ধারণা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও চেতনার অভাব অন্যতম কারণ বলে বিবেচিত হয়।

নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যান যেমন দিন দিন বড় হচ্ছে, তেমনি বিভিন্ন মহল থেকে এর প্রতিরোধ ও প্রতিকারের চেষ্টাও চলছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায়, বাংলাদেশেও নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে বেশ কিছু আইন রয়েছে। 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩), এসিড নিয়ন্ত্রন আইন ২০০২, এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২, যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইন ১৯৭৪, নীতিগর্হিত কার্যকলাপ আইন ১৯২৯ ইত্যাদি নারী নির্যাতন প্রতিরোধে রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনি ব্যবস্থা। বাংলাদেশ জাতিসংঘের

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষিত নারীর জন্য সব বৈষম্য দুরীকরনের সনদে স্বাক্ষর ও অনুমোদন করেছে; কিন্তু এত আলোচনা-সমালোচনা, চেষ্টা-প্রচেষ্টার পরও এ সমস্যার কোন সমাধান করা যাচ্ছে না। এ ব্যর্থতার মূল কারণ সমস্যার গভীরে পৌঁছাতে না পারা।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামই দিয়েছে সবচেয়ে যুগপোযোগি দিক-নির্দেশনা। নারী-পুরুষের সমতা বিধান করেছে একমাত্র ইসলামই। নারীদের অন্ধকার জগত থেকে তুলে এনে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলামই। পরিবার, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রে নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করেছে একমাত্র ইসলামই। এমন এক সময়ে ইসলাম নারীদের অধিকার নিয়ে সোচ্চার হয়েছে, যখন তাদের মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না। কন্যা সন্তান হলে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। অথচ, তাদের অধিকারের ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে ব্যক্তি ভাল কাজ করবে, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী এবং সে ঈমানদার হবে, এরূপ লোক জান্নাতে দাখিল হবে, আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।'[১]

আলোচ্য আয়াতে ভাল কাজের পুরষ্কারের জন্য নারী-পুরুষ পৃথক করা হয়নি। বলা হয়েছে ভাল কাজ করলেই মিলবে পুরস্কার। সে নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক। নারী-পুরুষের সমতার কথা জানিয়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ঘোষণা করেছেন, 'হে মানব–জাতি! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এক আত্মা থেকে এবং যিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার জোড়া, আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে অনেক নর ও নারী।'[২] মহান আল্লাহ তায়ালার এই ঘোষণাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে, পুরুষ আর নারী সবাই মানুষ। সবারই সমান অধিকার। কারণ, কাউকে আলাদা আলাদা বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়নি। একই আত্মা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। একই আত্মা থেকে সৃষ্টি, সুতরাং কার সঙ্গে কারও কোন পার্থক্য থাকার কথা নয়। ইসলামই এ বিষয়টা প্রথম প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে।

সমতার বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন আল্লাহ তায়ালা কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন আয়াতে। যেমন, 'আমি বিনষ্ট করি না তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর কর্ম, তা সে হোক পুরুষ কিংবা নারী। তোমরা একে অন্যের সমান।'[৩] 'বিশ্বাসী পরুষ ও বিশ্বাসী নারী একে অপরের বন্ধু। তারা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আনুগত্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। এদেরই উপর আল্লাহ রহমত বর্ষণ করবেন।'[৪] 'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক।'[৫]

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মর্যাদাবান সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মোত্তাকী।'[৬] 'যে ভাল কাজ করে এবং বিশ্বাসী, হোক সে পুরুষ কিংবা নারী, আমি তাকে অবশ্যই দান করব এক পবিত্র শান্তিময় জীবন এবং তারা যা করত তার জন্য তাদেরকে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।'[৭]

'যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করে সে কেবল তদনুরূপ প্রতিফল পাবে। আর যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে সে পরুষই হোক কিংবা নারীই হোক, সে যদি বিশ্বাসী হয় তবে এরূপ লোকেরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেথায় তাদেরকে দেয়া হবে বেহিসাব রিযিক।'[৮]

---

১ **আল কুরআন, ৪:১২৪**
২ আল কুরআন, ৪:১
৩ আল কুরআন, ৩:১৯৫
৪ আল কুরআন, ৯:৭১
৫ আল কুরআন, ২:১৮৭
৬ আল কুরআন, ৪৯:১৩
৭ আল কুরআন, ১৬:৯৭
৮ আল কুরআন, ৪০:৪০

Dhaka University Institutional Repository

রাসুলও (স.) নারীকে বসিয়েছেন সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে। বিভিন্ন হাদীসের মাধ্যমেই সেটা প্রতীয়মান হয়। রাসুল (স.) বলেছেন, 'কন্যারাই হচ্ছে তোমাদের উত্তম সন্তান।' আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তির কন্যাসন্তান আছে, আর সে তাকে জ্যান্ত কবরস্থ করেনি কিংবা তার সাথে লাঞ্ছনাকর আচরণ করেনি এবং পুত্র সন্তানকে তার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়নি আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[৯]

সুতরাং, প্রমাণিত হয়েছে যে, একমাত্র ইসলামই নারীর সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত করেছে। আর কোন সমাজে যদি সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত থাকে, তাহলে সেখানে নারী নির্যাতন কল্পনাও করা যায় না। প্রাচীন আরবীয় জাহেলী সমাজে নারীর প্রতি যে বর্বর, পৈশাচিক, নির্দয় ও সহিংস আচরণ করা হতো ইসলাম তা সমূলে উৎপাটন করতে পেরেছিল। নারীকে বসিয়েছিল সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে।

নারী অধিকার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও পবিত্র কুরআনের বর্ণনা বহু মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। অপমানিত ও বন্দিনী নারী সমাজের জন্য ইসলাম আবির্ভূত হয়েছে মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা হিসেবে। ইসলামের ছায়াতলে নারী এটা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে তারা এক সম্মানিত সত্তা, যার রয়েছে জীবনের অধিকার, মালিকানার বা নিজস্ব সম্পদের অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা। ইসলাম একেবারে শুরু থেকেই সর্বতোভাবে নারী–নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার। তারপরও মুসলিম অধ্যুষিত আমাদের এ জনপদে নারীরা নিপীড়িত, নির্যাতিত ও অবহেলিত কেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। সম্ভবত নারী নির্যাতন রোধে ইসলাম যে কর্মসূচী ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছে তা ভালোভাবে অনুধাবন এবং অনুসরণ না করাই এর সবচেয়ে বড় কারণ।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের পাশাপাশি ইসলামী শরী'আর দিক-নির্দেশনা প্রয়োগ ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। বরং বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের আধুনিকায়নে ইসলামী ভাবধারা সন্নিবেশিত হলে আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সহজতর হবে। সর্বোপরি ইসলামী মূল্যবোধ তৈরী করা গেলে, নারী নির্যাতনই অনেকাংশে কমে যাবে। কার্যকরভাবে শরী'আ আইন প্রয়োগ করা গেলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেমে আসতে পারে তা শূন্যের কোঠায়।

[৯] ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (র.), অনু: ড. আ, ফ, ম আবু বকর সিদ্দিকী, সম্পাদনা: অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, *সুনান আবি দাউদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬), খ. ৫, পৃ. ৬১২, হাদীস নং- ৫০৫৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

নারী ও বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ

- প্রথম পরিচ্ছেদ : নারীর পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নারীর বৈশিষ্ট্য
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ : পরিচ্ছদ, ফ্যাশন, পোশাক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পেশায় নারীর অংশগ্রহণ
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নারী নির্যাতনের ঐতিহাসিক রূপ
- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে নারী নির্যাতন
- সপ্তম পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে নারী
- অষ্টম পরিচ্ছেদ : নারী নির্যাতনের বৈশ্বিক চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
নারী ও বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ

মানব সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতায়। নারী ও পুরুষের সম্পর্ক এমন একটি প্রকৃতিগত আকর্ষণের প্রকাশ যা তাদেরকে পরস্পর একত্র থাকতে বাধ্য করে। অথচ তাদের কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। নারী নিজের জীবন বিপন্ন করে মানব বংশধারাকে লালন-পালন করতে পারে; কিন্তু নিজের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ, শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা এবং সংগ্রামময় পৃথিবীতে টিকে থাকার লড়াই তার একার পক্ষে অসম্ভব। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই নারী কষ্ট সহিষ্ণু ও শক্তিশালী নয়। বরং পুরুষের চেয়ে দুর্বল ও কোমল।

নারীর এই দুর্বলতাকে পুঁজি করেই পৃথিবীর আদিকাল থেকে তাদের ওপর কর্তৃত্বপরায়ন হয়েছে পুরুষ। নানা ক্ষেত্রে এই কর্তৃত্বপরায়নতা বিস্তৃত হতে থাকলে নারীর প্রতি নির্যাতনের মাত্রা নানান রূপে বাড়তে থাকে। একসময় বলা হতো আইয়ামে জাহেলিয়া যুগে নারীর অবস্থা ছিল সবচেয়ে শোচনীয়। নারীকে মানুষ হিসেবেও গণ্য করা হতো না। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়, শুধু আইয়ামে জাহেলিয়াই নয়, পৃথিবীর সকল যুগে, সকল কালে এমনকি সকল সভ্যতায় সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। কোথাও নারী নিরাপদে থাকতে পারেনি।

আধুনিকযুগে নারী নির্যাতন পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা। হত্যা, ধর্ষণ, লাঞ্ছণা, গঞ্জনা কিংবা যৌতুক তো নারী নির্যাতনের পুরনো রূপ। আধুনিক যুগে ইভটিজিং, এসিড সন্ত্রাস, ব্ল্যাকমেইলিং, ইন্টারনেটে ভিডিও কিংবা ছবি প্রকাশ এমনকি সাইবার ক্রাইমেরমত নানা উপায়ে নতুন রূপে নারীর ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে।

আলোচ্য আলোচনায় নারী নির্যাতনের ঐতিহাসিক রূপ, বিভিন্ন সভ্যতা এবং ধর্মে নারী নির্যাতন, নারীর অবস্থানের সঙ্গে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের পরিসংখ্যানভিত্তিক পরিস্থিতি তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদঃ নারীর পরিচয়

নারী নির্যাতনের প্রকৃতি

জ্ঞানবিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে বিশ্ব অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করলেও এখনো কিছু কিছু নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা মানব সমাজকে পীড়া দিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। এর একটি হচ্ছে নারী নির্যাতন। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী এবং সমাজের উন্নয়নে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু তারপরও সাধারণভাবে তারা শান্তি, নিরাপত্তা ও অধিকারের দিক দিয়ে এখনো পুরুষের সমকক্ষ নয়। জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের সাম্প্রতিক রিপোর্টে (৪ এপ্রিল, ২০১১) বলা হয়েছে, বিশ্বের দরিদ্র জনগণের ৭০ শতাংশই নারী এবং মাত্র এক শতাংশ নারীর নিজস্ব মালিকানায় সম্পত্তি আছে। এ প্রতিবেদনটিই প্রমাণ করে যে, নারীরা কোনভাবেই পুরুষের সমানাধিকার পাচ্ছে না। এছাড়া দুঃখজনকভাবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। নারী নির্যাতনের ব্যপকতা, বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে নারীর পরিচিতি এবং নারী নির্যাতনের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনার প্রয়াস চালাচ্ছি।

নারী পরিচিতি

'নারী' শব্দটি মানুষের মধ্যে স্ত্রী বাচকতা বুঝায়। ইংরেজিতে (নারী) woman শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় বয়স্কদের ক্ষেত্রে। যদিও নারী শিশু, বালিকা কিংবা কিশোরীদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে ব্যবহার করা হয় 'girl' শব্দটি। তবুও সাধারণ অর্থে (শিশু, বালিকা, কিশোরী কিংবা বয়স্ক যাই হোক না কেন) মানবজাতির মধ্যে স্ত্রী বাচকতা বোঝাতেই নারী (woman) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। যেমন বলা হয়, নারী অধিকার (women's rights)।

A **woman** is a female human. The term *woman* is usually reserved for an adult, with the term girl being the usual term for a female child or adolescent. However, the term *woman* is also sometimes used to identify a female human, regardless of age, as in phrases such as "women's rights". "Woman" may also refer to a person's gender instead of their sex. Women are typically capable of giving birth from puberty until menopause, although some sterile, intersex and/or transgender women cannot. Throughout history women have assumed or been assigned various social roles.[১০]

শুধু তাই নয়, 'নারী' (Woman) শব্দটি দিয়ে মানুষের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট শ্রেনীর লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যও বোঝায়; যারা স্বাধারণত বাচ্চা জন্মদানে সক্ষম। বয়ঃসন্ধি কাল থেকে বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত সাধারণত সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম থাকেন তারা। যদিও এদের মধ্যে কারও কারও সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা থাকে না (বন্ধ্যা)। এছাড়া হিজড়াদের মধ্যে যাদের মধ্যে মহিলাভাব বেশি এবং লিঙ্গ পরিবর্তন করে যারা মহিলা হয়েছে তাদেরও সন্তান জন্ম দানের সক্ষমতা নেই। নারী বলতে পৃথিবীর অন্যতম প্রাণী মানুষের স্ত্রী-বাচকতা নির্দেশক রূপটিকে বোঝানো হয়। এর বিপরীত পুরুষ, নর প্রভৃতি। সংস্কৃত 'নৃ' শব্দটি থেকে নারী শব্দটির উৎপত্তি (নৃ+ঈ = নারী)। বিভিন্ন আসমানী কিতাব যেমন- বাইবেল, কুরআন ইত্যাদি অনুসারে হাওয়া পৃথিবীর প্রথম নারী বা মানবী। 'নারী' শব্দটি সাধারণত প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেখানে 'মেয়ে' (Girl) শব্দটি ব্যবহৃত হয় স্ত্রী-শিশু বা কিশোরীর ক্ষেত্রে। তাছাড়া বয়সের বাধা ডিঙিয়েও 'নারী' শব্দটি সমগ্র স্ত্রী-জাতিকে নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হতে পারে, যেমনঃ 'নারী অধিকার' দ্বারা সমগ্র স্ত্রী জাতির প্রাপ্য অধিকারকে বোঝানো হয়।

---

[১০] Deana F. Morrow and Lori Messinger, *Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice* (New York City : Columbia University Press, 2006), p: 8

Dhaka University Institutional Repository

নারী শব্দটির ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ

আরবীতে নারীর প্রতিশব্দ- নিসা। বাংলা একাডেমী অভিধানে যার অর্থ করা হয়েছে: স্ত্রী লোকগণ।[১১] অন্য একটি অভিধানে এসেছে এভাবে- নিসা, নাসওয়াতু অর্থ স্ত্রী লোক। এর সমার্থক শব্দ ইমরা'আতুন।[১২] আল মানার অভিধানে নারী শব্দের শাব্দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এভাবে- নারীর আরবী ইমরা'আতু, আল মারওয়াতু, নারী জার্তি অর্থে- আন নিসাউ।[১৩] নারী শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ woman। অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে woman শব্দের ব্যাখ্যায় এসেছে- An adult female human being; men, women and children.[14] আবার অক্সফোর্ড অভিধানে women শব্দটির প্রতিশব্দ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে female শব্দটি। যার অর্থ করা হয়েছে এভাবে (adj.) 1. Being a women or a girl, 2. Of the sex that can lay eggs or give birth to babies; a female act.[15] female শব্দটির উৎপত্তি মূলতঃ ল্যাটিন 'femina' থেকে। femina মানে হলো 'woman'।[১৬] যদিও পুরনো ইংরেজিতে woman শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে- An adult human female, origin from the old English for 'WIFE' and 'MAN'।[১৭]

woman শব্দটির উচ্চারণ কিংবা বানানরীতিতে গত এক শতাব্দীকাল ধরে নানান রূপে পরিবর্তণ এসেছে। যেমন- প্রথমে বলা হতো, wīfmann।[১৮] এরপর *wīmmann*। তৃতীয় পর্যায়ে এসে এর বানানরীতি পরিবর্তিত হয়ে এসে দাঁড়ায় *wumman*।[১৯] সর্বশেষ চূড়ান্তভাবে নারী শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ দাঁড়ায় *woman*। প্রাচীন ইংরেজিতে *wīfmann* শব্দটি দিয়ে বোঝানো হতো 'মহিলা মানুষ'(female human)কেই। এর বিপরীতার্থক শব্দ ছিল *wēr*। যার অর্থ পুরুষ মানুষ (male human)। প্রাচীন ইংরেজিতে লৈঙ্গিক নিরপেক্ষতা (সাধারণভাবে মানুষ) বোঝাতে ব্যবহার করা হতো *Mann* or *monn* শব্দটি। আধুনিক ইংরেজিতে এখন যেমন ব্যবহার করা হয় 'person' কিংবা 'someone' শব্দ দুটি। নরম্যান রাজত্বকালের পর মূলতঃ *man* শব্দটি ব্যবহার শুরু হয় পুরুষ মানুষ (male human) বোঝাতে। ১২শ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে পুরনো *wēr* শব্দের পরিবর্তে *man* শব্দটির ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। wīfmann শব্দটির মধ্য থেকে 'এফ' (f) এবং 'এম' (m) খন্ডিত অংশদুটিকে নিয়েই ইংরেজিতে নারীদের আধুনিক রূপ দেওয়া হয়েছে "woman" নামে। তবে বিবাহিত নারীদের (wife) বোঝাতে খুব ছোট করেই কিংবা প্রাথমিক উপাদান হিসেবে মহিলা শব্দটি 'female' ব্যবহার করা হয়। আবার ইংরেজিতে দীর্ঘদিন ধরে "woman" শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে একটা ভূল ধারনা প্রচলিত। অনেকেই মনে করেন "woman" শব্দটি "womb" থেকে এসেছে। এটা মূলতঃ অন্য একটি শব্দের রূপ। একটি পুরনো ইংরেজি শব্দ। যেটা এসেছে '*wambe*' থেকে। যার অর্থ হচ্ছে "stomach" বা পেট (নারী কিংবা পুরুষের)।[২০]

---

১১ *আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩), খ. ৩, পৃ: ২৪০২

১২ মাওলানা মুহিউদ্দিন খান (সঙ্কলক), *আল কাওসার : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ১৯৮৬, ৭ম সংস্করণ- মার্চ ১৯৯৭), পৃ. ৫৭০

১৩ আবু তাহের মেসবাহ (সঙ্কলক ও সম্পাদক), *আল মানার: আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান* (ঢাকা: মোহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রকাশ- ১৯৯০), পৃ. ৮০২

১৪ Oxford advanced learning Dictionary, International student edition (London: Oxford university press, 6th edition, 2003-2004), p. 1549

১৫ Oxford advanced learning Dictionary, Ibid, p. 489.

১৬ Catherine Soanes, *Compact oxford reference Dictionary* (London: Oxford University Press, 2001), p. 300.

১৭ Catherine Soanes, *Compact oxford reference Dictionary,* Ibid, p. 975

১৮ Bosworth & Toller, Anglo-Saxon Dictionary (Oxford, Oxford university press, 1898-1921) p. 1219 and C. T. Onions, Oxford Dictionary of English Etymology (Oxford, Oxford university press, 1966) p. 1011

১৯ Noah Webster, *Webster's New World Dictionary* (Boston : Houghton Mifflin Harcourt, Second College Edition, 2014)

২০ Elizabeth Cady Stanton and the Revising Committee, *The Woman's Bible* (England : the Church of England , 1898) , p. 20-21

Dhaka University Institutional Repository

পারিভাষিক অর্থে নারী

নারীত্ব (Womanhood) শব্দটি দিয়ে মূলত নারীদের জীবনের নির্দিষ্ট একটা অংশকেই বোঝানো হয়। মূলতঃ কিশোরীকাল পেরিয়ে (১৮ বছর বয়সের) পরের অংশেরই নাম Womanhood।

'Woman' শব্দটি ব্যাবহার হয় সাধারণ মানব জাতির 'স্ত্রী' অংশকে বোঝাতেই। তবে, বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের ক্ষেত্রে ইংরেজিতে এই শব্দটির ব্যবহার। অক্সফোর্ড অভিধানে নারীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'An adult female human being. (in compaounds) a woman who come from the place mentiond or whose job or interest is connected with thing mentioned! etc. an English woman, a bussinss woman।'[২১] বালিকাদের ক্ষেত্রে ব্যাবহার করা হয় '*girl*' শব্দটি। ইংরেজিতে '*girl*' শব্দটি মূলতঃ 'মানুষের একটি লৈঙ্গিক শ্রেনীর তরুন' অংশকেই বোঝায়।[৫] ষোড়ষ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকেই '*girl*' শব্দটি মেয়ে শিশু বোঝাতে ব্যবহার হয়ে আসছিল।[৬] আবার কখনও কখনও কথ্যভাষায় বালিকা, তরুনী কিংবা অবিবাহিত মেয়ে বোঝাতেও '*girl*' ব্যবহৃত হয়। তবে ১৯৭০ এর দশকের নারীবাদীরা এই শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল। তাদের মতে, এমন শব্দের ব্যবহার অপরাধ প্রবণতা বাড়াতে পারে। বিশেষ করে এ কারণেই পুর্বে খুব ব্যবহার হতো এমন শব্দ, যেমন '*office girl*' এখন আর ব্যবহার করা হয় না।

অথচ কোন কোন সংস্কৃতিতে দেখা যায়, যেখানে কুমারীত্বের সাথে পারিবারিক সম্মান জড়িত, সেখানে '*girl*' (মেয়ে) শব্দটি কখনো বিয়ে হয়নি এমন নারীকে প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। সেখানে যদি বিবাহের পূর্বেই নারী যৌনসম্পর্ক করেছে বলে প্রমাণিত হয়, তবে তা পরিবারের জন্য অসম্মানকর হিসেবে বিবেচিত। ইংরেজি ভাষায় 'মেইডেন' শব্দটি অবিবাহিত নারীদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর যোগ্যতা কিংবা অবস্থা বোঝাতে নানা ধরনের শব্দ ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে 'womanhood' (নারীত্ব) শব্দটি সাধারণভাবেই একজন নারীর অবস্থা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়; বিশেষতঃ নারীদের শারীরিকভাবে, অর্থাৎ ঋতুস্রাব শুরুর পর থেকে।

'femininity' (মেয়েলিপনা) শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হয় নারীর আচরণের বিশেষধরনের একটি ভূমিকা বোঝানোর জন্য। 'womanliness' শব্দটি প্রায় 'femininity'- এর মত। তবে, 'womanliness' ব্যবহার হয় নারীদের নারীবাচক অন্যকোন আচরণ বোঝাতে।

'femaleness' হলো একটি প্রচলিত পরিভাষা। তবে এটা সাধারণত ব্যবহার হয় 'human femaleness' এর সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে। নারীদের ক্ষেত্রে আরও একটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হতো। এই শব্দটি অবশ্য এখন প্রায় অপ্রচলিত। যে মহিলা সূতা কাটেন, তাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'distaff '। অথ্যাৎ, সূতা যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহিলারা কেটে থাকেন, সে কারণেই এই শব্দটি ব্যবহার করা হতো। তবে আধুনিকযুগে এই শব্দের পরিবর্তে ল্যাটিন থেকে আমদানিকৃত একটি শব্দ ব্যবহার করা। শব্দটি হচ্ছে 'muliebrity'- অথ্যাৎ তাঁতি। এ শব্দটি দ্বারা মহিলাকে পুরুষের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে, এই শব্দটির ব্যবহার এখন খুবই কম।

পারিভাষিকভাবে নারী বোঝাতে ইংরেজিতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় যে শব্দগুলো সেগুলো হচ্ছে, 'womanhood', কখনও 'femininity'।

[২১] Oxford advanced learning Dictionary, Ibid, p. 1549

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ নারীর বৈশিষ্ট্য

সাংস্কৃতিক এবং লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্য

প্রাগৈতিহাসিক যুগে নারীদের নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকা অবশ্যই ছিল। বিশেষত শিকারী সমাজে খাবারের জন্য মহিলাদের দায়িত্ব ছিল গাছ থেকে ফল-মূল, ছোট ছোট জীব-জন্তু এবং মাছ সংগ্রহ করা। পুরুষদের দায়িত্ব ছিল বড় বড় জীব-জন্তু শিকার করে মাংস সংগ্রহ করা।

পরবর্তীকালে নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক ভূমিকায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষতঃ তরুণ বয়স থেকে, পেশাগত বিভিন্নতার কারণে নারীদের ভূমিকাও বিভিন্নভাবে পরিবর্তন হয়েছে। সাধারণত মধ্যবিত্ত ঘরের নারীরা বেশি যুক্ত থাকেন গৃহস্থালির কাজে এবং সন্তান লালন-পালনে। নিম্নআয়ের নারীরা, বিশেষ করে কর্মজীবী নারীদের ক্ষেত্রে গৃহে থাকা হয়ে ওঠেনা। অর্থের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে তারা ঘরের বাইরে কাজ করতে বের হন। নারীদের অধিকাংশ কাজই সাধারণত হয়ে থাকে পুরুষদের তুলনায় অনেক কম পারিশ্রমিকের।

নারীদের শ্রমের বাজারে যখন পরিবর্তন আসলো, তখন তাদের জন্য শুধুমাত্র 'নোংরা' ধরনের কাজই সবচেয়ে বেশি সহজলভ্য হিসেবে দেখা দিল। এছাড়া বিভিন্ন কারখানায় দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিচ্ছন্নকর্মী হিসেবে কাজ তাদের জন্য সহজলভ্য হয়ে দাঁড়ায়।

বিভিন্ন অফিসে সম্মানজনক পেশা, যেগুলোতে উচ্চশিক্ষা যোগ্যতার মাপকাঠি, সেখানে যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের অংশগ্রহণ ১৯০০ সালে ৬ ভাগ থেকে ১৯২৩ সালে ২৩ ভাগে উন্নীত হয়। শতকরা হিসেবে এই যে বড় ধরনের পরিবর্তন, সেটা কর্মক্ষেত্রে নারীদের সঙ্গে আচরণগত দিকেও পরিবর্তন এনেছে। একই সঙ্গে নারীদের ক্যারিয়ার এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনেরও সূচনা করে এই পরিসংখ্যান।

এরফলে ১৯৭০ এর দশকে শিক্ষিত অনেক নারী, এদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞানীও ছিলেন, তারা সন্তান ধারনে অনীহা দেখাতে শুরু করেন। তবে ১৯৮০ এর দশকে এসে প্রতিষ্ঠানগুলো চেষ্টা শুরু করে কাজের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা বিধানের। এমনকি নিজের বাড়িতে সমতা না থাকলেও কর্মক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নিজের যোগ্যতাবলে অনেক নারীই পুরুষের তুলনায় অধিক সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছেন।

পেশাদার নারীরা এখনও ঘরোয়া কাজ এবং সন্তান লালন-পালনে অনেক বেশি যত্নশীল। কোন কোন মানুষ আবার বলে থাকেন, তাদের সামনে দু'ধরনের বাধা (সংসার এবং ক্যারিয়ার)। যে কারণে সময় এবং শক্তি কোনটাই তাদেরকে জীবনে সাফল্য এনে দিতে সক্ষম হয় না।

যদিও পরবর্তীকালে ঘরোয়া পরিবেশে নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্রে অনেকটাই সমতা এসে গেছে। সাম্প্রতিক এক গবেষনায় দেখা গেছে, এই সময়ে এসে নারীরা নৈতিকতা, সততা এবং মঙ্গলের বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। অপরদিকে পুরুষরা দৃষ্টি দিচ্ছে সামাজিক নিয়মাবলী রক্ষার দিকে।[২২]

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেও নারী সহকর্মীদের জন নারী ফ্যাকাল্টি মেম্বার প্রয়োজন হতো, তাদেরকে আলাদা রাখার জন্য। এটা এ কারণে করা হতো যে, নারীরা একই সময়ে দুটি কাজ করতে কখনোই সক্ষম হতো না। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হিস্টোরি অ্যান্ড সায়েন্সের অধ্যাপক লোন্ডা শিয়েবিঙ্গারের মতে, "Being a scientist and a wife and a mother is a burden in society that expects women more often than men to put family ahead of career.'[23]

তবুও নারীদের একটি বিরাট অংশ এখনও উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত নয় বিধায় কর্মক্ষেত্রে তাদের পারিশ্রমিক অনেক পুরুষের চেয়ে বেশ কম হয়ে থাকে। আমেরিকার সিবিএস নিউজ দাবি করেছে, ২০০৫ সালে আমেরিকায় ৩০ থেকে ৪৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে ৬২ ভাগই বিশ্ববিদালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত এবং কর্মক্ষেত্রে তারা পুরুষের সমান

---

[২২] J. Gere & C. C. Helwig, Young adults' attitudes and reasoning about gender oles in the family context. *"Psychology of Women Quarterly, 36"* (California: Sage Publications, 2012), p. 301-313

[২৩] Londa Schiebinger, *Has Feminism Changed Science? : Science and Private Life* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), p. 92-103

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে। তবে এ পরিসংখ্যান উন্নত **১৯**টি দেশের মধ্যে সর্বনিম্নতম। কয়েকটি পশ্চিমা রাষ্ট্রে, যেমন জার্মানি, সুইজারল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ড– নারীদের পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে অনেক বড় অবিচার করে থাকে।[২৪]

[২৪] CHRISTINE LAGORIO, *U.S. Education Slips In Rankings (CBS News*. 13 September 2005), http://www.cbsnews.com/news/us-education-slips-in-rankings/ visited on 15 April, 2015

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ পরিচ্ছদ, ফ্যাশন, পোশাক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে নারী

পৃথিবীটা অনেক বড়। নানান দেশ এবং সংস্কৃতির কারণে বিশ্বে বিভিন্নভাবে নানা পোশাকে নারীরা নিজেদের সজ্জিত করে নেয়। এর মধ্যে তাদের পছন্দ এবং রুচির মিশ্রন অবশ্যই থাকে। আবার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রভাবও থাকে। এছাড়া ধর্মীয় ঐতিহ্য, সামাজিক আচার এবং ফ্যাশন ট্রেন্ডসহ বিভিন্ন বিষয়াধিও নারীদের পোশাক-পরিচ্ছদে প্রভাব বিস্তার করে। নানান সমাজ এবং নানা সংস্কৃতিতে নানাভাবে শালীনতা বজায় রাখা হয়।

যদিও অনেক দেশের বিচারব্যবস্থায় পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে নারীদের পছন্দ-অপছন্দ সব সময় স্বাধীন নয়। বিভিন্ন আইনী ব্যবস্থা দ্বারা তারা কী কী পরিধান করতে পারবে আর কী কী পরিধান করতে পারবে না, তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। এই বিষয়টা সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য ইসলামীক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে। যেখানে তাদের বিচারব্যবস্থা কিংবা আইন নির্দিষ্টই করে দেয় যে তারা কী পরবে (যেমন হিজাব পরিধান করা)।

অথচ কোন কোন রাষ্ট্রে দেখা গেছে হিজাবের পোশাক (যেমন বোরকা, কিংবা মুখ ঢেকে রাখা) পুরোপুরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে (যেমন ফ্রান্স। এই দেশটিতে আইন করে হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়েছে)। অথচ এই আইনটি অনেক বড় বিতর্কিত একটি আইন।

ধর্ম

কিছু ধর্মের মতবাদে লিঙ্গভিত্তিক কিছু বিশেষ শর্ত আছে। নারী পুরুষ ভেদে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত মিথস্ক্রিয়া, নারীর জন্য নির্দিষ্ট পোশাক এবং আরো অনেক উপাদান আছে যা সমাজে নারীর অবস্থানকে প্রভাবিত করে। অনেক দেশেই ধর্মীয় শিক্ষা অপরাধ আইন অথবা পারিবারিক আইনকে প্রভাবিত করে(উদাহরনস্বরূপ শরিয়াহ আইনের কথা বলা যেতে পারে)। ধর্ম, আইন এবং লিঙ্গের মধ্যকার সমতার কথা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বলে থাকে।

সাক্ষরতা

বিশ্বে পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার কম। সিআইএন ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্টবুক ২০১০ সালে দেখায় যে, ৮০ শতাংশ নারীই সাক্ষরজ্ঞানহীন, যেখানে ৮৮.৬ শতাংশ পুরুষই সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন। দক্ষিণ এবং পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকার সাহারা অঞ্চলে অনেকাংশে নারীদের সাক্ষরতার হার সবচয়ে কম।

ওইসিডি দেশগুলোতে শিক্ষা

অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন দেশগুলোর (Organization for Economic Co-operation and Development) (ওইসিডি) মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য গত ৩০ বছরে অনেকটাই হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান সময়ে এসে দেখা যাচ্ছে পূর্বের তুলনায় কিশোরী মেয়েদের অনেকেই তৃতীয় পর্যায়ের (বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষা নিয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে উঠছে। ওইসিডি ৩০টি দেশের মধ্যে অন্তত ১৯টিতে দেখা যাচ্ছে ৫৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী নারীদের তুলনায় ২৫ থেকে ৩৪ বছর নারীরা অন্ততঃ দ্বিগুন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষিত। আবার ওইসিডি ২৭টি দেশের মধ্যে অন্তত ২১টির তথ্য-উপাত্ত নিয়ে দেখা গেছে- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা অর্জণের ক্ষেত্রে নারীরা হয়তো পুরুষদের সমান কিংবা কোথাও কোথাও পুরুষদের চেয়েও এগিয়ে। এসব দেশে দেখা যাচ্ছে ১৫ বছর বয়সী মেয়েরা ক্যারিয়ার নিয়ে সমান বয়সী ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশি আশাবাদী।[২৫]

[২৫] http://www.oecd.org/general/educationlevelsrisinginoecdcountriesbutlowattainmentstillhamperssome.htm, visited on 15 August, 2015

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে অনেক ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টভুক্ত দেশে মাত্র ত্রিশ শতাংশ নারী বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল খাতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করছে। আর বেশিরভাগ ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টভুক্ত দেশের ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশ নারীরা গবেষণা কাজে নিয়োজিত।[২৬]

একটা চলতি ভুল ধারণা আছে যে নারীরা এখনো আনুষ্ঠানিক ডিগ্রি অর্জনের জন্য অতটা উপযোগি হয়নি। বিজ্ঞান বিষয়ক ঐতিহাসিক মার্গারেট রোসলারের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের সব ব্যাচেলর ডিগ্রির মধ্যে নারীরাই অর্জন করছে ৫৪ শতাংশ। যদিও, শিক্ষাব্যবস্তার উন্নয়নের সাথে সাথে পুরুষের তুলনায় নারীরাই বেশি ডিগ্রি অর্জন করছে। আজ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালযে নারীরা পড়ালেখা করলেও, সকল বিভাগে তাদের সমানভাবে সুযোগ দেয়া হচ্ছে না।[২৭]

সমাজবিদ্যাবিশারদ হ্যারিয়েট জুকারম্যান পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যত মর্যাদাজনক হয়, সেখানে ঠিক ততটাই কঠিন হয়ে যায় সকল বিভাগে নারীদের অংশগ্রহন। ১৯৮৯ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবারের মতো রসায়ন বিভাগে সিনথিয়া ফ্রেন্ড নামের একজন নারীকে নিয়োগ দিয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে পদার্থবিদ্যা বিভাগে নেয়া হয় মেলিসা ফ্রাঙ্কলিন নামের আরেক নারীকে। তিনি আরও পর্যবেক্ষন করেছেন যে, কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের পদোন্নতি বা অবস্থার পরিবর্তন হলেও নারীদের বেলায় তা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীটি যে অবস্থায় কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে, সেই অবস্থানেই তাকে দীর্ঘমেয়াদে থাকতে হয়। স্মিথ অ্যান্ড ট্যাং অনুসারে, ১৯৮৯ সালের দিকে ৬৫ শতাংশ পুরুষ এবং ৪০ শতাংশ নারীর অবস্থান পরিবর্তন হয়েছিল বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলী হিসেবে। মাত্র চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীরা সহকারী অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিতে পেরেছিলেন।[২৮]

---

[২৬] http://www.oecd.org/science/sci-tech/womeninscientificcareersunleashingthepotential.htm , visited on 15Aaugust, 2015

[২৭] Eisenhart, A. Margaret, Finkel, Elizabeth, *Women (Still) Need Not Apply: The Gender and Science Reader* (New York: Routledge, 2001), p. 13–23

[২৮] Brainard, G. Susanne, Carlin, Linda. *A six-year Longitudinal Study of Undergraduate Women in Engineering and Science: The Gender and Science Reader* (New York: Routledge, 2001), p. 24–37

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ পেশায় নারীর অংশগ্রহণ

১৯৯২ সালে পিএইচডি থেকে নয় শতাংশ নারী উপার্জন করতে সক্ষম হলেও মাত্র এক শতাংশ নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে পেরেছেন। ১৯৯৫ সালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে মাত্র এগার শতাংশ নারী কাজ করতো। আর প্রকৌশল স্কুলগুলোর মধ্যে নারী ডিনের সংখ্যা মাত্র ৩১১জন, যা কিনা মোট সংখ্যার মাত্র এক শতাংশ। এমনকি সাইকোলজি বিভাগে পিএইচডির ক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে থাকলেও খুব কম সংখ্যক নারীই কাজ পান, ১৯৯৪ সালেও এর অনুপাত ছিল মাত্র ১৯ শতাংশ।[২৯]

রাজনীতিতে নারী

বেশিরভাগ দেশের রাজনীতিতেই নারীদের অনুপস্থিত দেখা যায়। ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে গোটা বিশ্বের জাতীয় অধিবেশনগুলোতে নারীদের উপস্থিতি ছিল মাত্র ২২ শতাংশ।[৩০] নাগরিক অধিকার ভোটে অবশ্য নারীদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে আনুপাতিক হারে তাদের সংখ্যা বাড়ছে। উনিশ শতক এবং বিংশ শতকে প্রথমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, এরপর স্থানীয় পর্যায়ে অবস্থান নিতে শুরু করে এবং ১৯২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নারীরা দেশটির সংবিধানের ১৯তম অ্যামেন্টমেন্টের হাত ধরে ভোটাধিকার পায়। কিছু পশ্চিমা দেশ তখনো নারীদের ভোটাধিকার দিচ্ছিল না। বিশেষ করে সুইজারল্যান্ডের নারীরা ১৯৭১ সালে ভোটাধিকার লাভ করে এবং ১৯৯১ সালে তারা স্থানীয় বিভিন্ন ইস্যুতে ভোট দেয়ার সক্ষমতা পায়।[৩১] [৩২]

বিজ্ঞান, কলা ও সহিত্যে

নারীদের সায়েন্স, সাহিত্য এবং আর্টে অবদান রাখার ইতিহাস আছে। ঐতিহাসিকভাবেই নারীদের একটি ক্ষেত্রে কাজ করার অধিকার দেয়া হয়েছে, আর তা হলো গাইনি বিদ্যা। শুধু যে নিম্নবিত্ত নারীদের মধ্যেই এটা ছিল তা নয়, উচ্চশ্রেনীর নারীদের মধ্যেও এর প্রচলন ছিল। পুরুষ শাসিত সাহিত্যের জগতে একজন নারীর পক্ষে অবস্থান নেয়া খুব কঠিন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, নারী লেখকেরা পুরুষের নাম নিয়ে সাহিত্যচর্চা করছেন।[৩৩] [৩৪]

ঐতিহাসিকভাবেই নারীকে গৃহ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ রাখা হয়েছে। পরিবার থেকেই তাদেরকে বিজ্ঞান চর্চায় অংশগ্রহণ কিংবা উদ্বুদ্ধ করা হয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৩ সালে সমান অধিকার আইন আকারে গৃহীত হবার পর নারীদেরকে উল্লেখযোগ্য হারে বিজ্ঞান বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। কিন্ত বিজ্ঞানে অংশগ্রহণের হার প্রকৌশল বিদ্যার তুলনায় নিম্নমুখী। বিজ্ঞান ও প্রকৌশলে ডক্টরেট গ্রহণের সংখ্যা ১৯৭০ সালে ৭% থেকে ১৯৮৫ সালে ৩৪%-এ দাঁড়ায়। তন্মধ্যে প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রীর সংখ্যা যেখানে ১৯৭৫ সালে ছিল মাত্র ৩৮৫ জন, সেখানে ১৯৮৫ সালে ১১,০০০ ছাড়িয়ে যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে আইনের মাধ্যমে নারীকে বিশেষায়িত করলেও এখনো এ পেশায় বেশ অসমতা বিরাজ করছে।

---

[২৯] Londa Schiebinger, *Has feminism changed science? Meters of Equity* (Cambridge: Harvard University Press, 1999), p. 33

[৩০] 'Women in Parliaments: World and Regional Averages'. http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm, visited on 25 July, 2015

[৩১] http://history-switzerland.geschichte-schweiz.ch/chronology-womens-right-vote-switzerland.html, visited on 25 July, 2015

[৩২] United Nations, Press Release, *"Experts In Women'S Anti-Discrimination Committee Raise Questions Concerning Reports Of Switzerland On Compliance With Convention"*. (New York: 14 January, 2003) http://www.un.org/press/en/2003/WOM1373.doc.htm, visited on 25 July, 2015

[৩৩] Jacues Gelis, *History of Childbirth,* (Boston: Northern University Press, 1991), p. 96-98

[৩৪] W.F Bynum & Roy Porter, *Companion Encyclopedia of the History of Medicine* (London and New York: Routledge, 1993), p. 1051-1052

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ১৯৮৯ সালে বিজ্ঞানী হিসেবে পুরুষের অংশগ্রহণ ছিল ৬৫% এবং মাত্র ৪০% নারী উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। যেখানে পূর্ণাঙ্গকালীন একজন বিজ্ঞানীর বার্ষিক আয় ৪৮,০০০ টাকা; সেখানে নারীর আয় ছিল ৪২,০০০ টাকা।[৩৫]

[৩৫] Eisenhart and Finkel, Ch : 1 in *The Gender and Science Reader ed. Muriel Lederman and Ingrid Bartsch* (New York, Routledge, 2001), p. 16-17

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ নারী নির্যাতনের ঐতিহাসিক রূপ

নারী ও পুরুষের শক্তি ও যোগ্যতার এ পার্থক্যের কারণে ইতিহাসে অধিকাংশ যুগে নারী লাঞ্ছিত ও নির্যাতিত হয়েছে। শক্তিমত্তার কারণে পুরুষ নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছে। আর নারীকে মনে করেছে নিম্নমানের। ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই বিভিন্ন সমাজে বিভিন্নভাবে নারীর ওপর নির্যাতন চলে আসছে। মানব জাতির মধ্যে নারীই সর্বপ্রথম দাসত্বের শৃঙ্খল পরেছে। নারীর দাসত্ব শুরু হয়েছে ইতিহাসের দাস প্রথা প্রচলন হওয়ারও পূর্বে।

ইসলামের অভ্যুদয়ের যুগে প্রাচীন মানব সমাজগুলোতে এবং ইসলামের অভ্যুদয়ের পরে মধ্যযুগীয় ইউরোপে ও আধুনিক ইউরোপে নারীর আইনগত ও সামাজিক মর্যাদা কিরূপ ছিল ও আছে, তা ন্যায়নিষ্ঠভাবে পর্যালোচনা করলে এ কথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নারীর প্রতি সদয় অথবা নিষ্ঠুর আচরণে এক জাতির সাথে আরেক জাতির এবং এক আইনের সাথে আরেক আইনের যতই পার্থক্য ও বৈপরিত্য থাকুক না কেন, ইসলামের অভ্যুদয়ের পুর্বে নারী কখনও কোন সমাজে তার যথাযোগ্য সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা লাভ করেনি।

যে সব দেশ ও সভ্যতা ন্যায় ও ইনসাফের জন্য খ্যাত সেখানেও নারীকে অবজ্ঞা ও অবমাননার দৃষ্টিতে দেখা হতো। তাকে পশুর মত বেচাকেনা করা হত। এমনকি কখনও কখনও তাকে সে সব অধিকার থেকেও বঞ্চিত রাখা হত, যে সব অধিকার জীব-জন্তুও ভোগ করতে।

গ্রিক সভ্যতায় নারী

প্রাচীন গ্রীক সমাজের নারীকেই প্রথম সভ্য নারী বলা চলে। তারা সতীসাধ্বী ছিল এবং গৃহের বাইরে বেরতো না। যাবতীয় কাজ তারা বাড়ির ভেতরেই সমাধা করতো। কিন্তু শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত ছিল। ফলে সাধারণ সমাজ জীবনে তারা কোন অবদান রাখতে পারতো না। সমাজে তারা এত ঘৃণিত ছিল যে, তাদেরকে শয়তানের নোংরা চেলাচামুণ্ডা মনে করা হতো। শুধুমাত্র অভিজাত পরিবারগুলোতে পর্দার প্রচলন ছিল। তবে আইনগতভাবে নারী ছিল সংসারের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির মত। বাজারে তার বেচাকেনা চলত। যে সব ব্যাপারে নারীর নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন উঠত, সেখানে তার কোন স্বাধীনতা ও মর্যাদা ছিল না।

প্রাচীন দার্শনিক সক্রেটিস গ্রিক সমাজে নারীর অবস্থান মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, 'Woman is the greatest source of choose and disruption in the world, she in like the Dafali Tree, which outwardly looks very difficult, but if sparrows eat it, they die without fail. (নারী হচ্ছে জগতে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যাহা বাহ্যত খুব সুন্দও দেখায়; কিন্তু চড়ুই পাখি উহা ভক্ষণ করলে উহাদের মৃত্যু অনিবার্য)।[৩৬]

গ্রীকরা নারীকে উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত করেছিল। সারা জীবন তারা দাসীবাঁদীর ন্যায় জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। তাদের বিয়ের ব্যাপারটা পুরোপুরিভাবে পুরুষদের এখতিয়ারাধীন ছিল। পুরুষরা নারীদের জন্য যে স্বামী পছন্দ করতো, সেই স্বামীই তাদের বরণ করে নিতে হতো। পুরুষই নারীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করতো। পুরুষের অনুমতি ছাড়া নারী নিজের সম্পত্তি ভোগদখল ও হস্তান্তর করতে পারত না। সেই সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করার অধিকার ছিল পুরুষের একচেটিয়া। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি ছাড়া স্বামীর কাছ থেকে তালাক চাওয়ার অধিকার ও নারীকে দেওয়া হত না। বরং এই অধিকার অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হতো।

গ্রীক সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় উন্নতি করা সত্ত্বেও তাদের সমাজে নারীর স্থান ছিল অনেক নীচে। তারা নারীকে মানবতার জন্য দুর্বহ বোঝা মনে করত। গ্রীক সভ্যতা যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও গ্রীকরা নারী সম্পর্কে বলতো, অগ্নিদগ্ধ হওয়ার এবং সর্পদংশনের প্রতিকার সম্ভব; কিন্তু নারীর কু-প্রভাব ও অকল্যানের প্রতিকার সম্ভব নয়।

[৩৬] আবদুল খালেক, *নারী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ১৯৯৫), পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

পেন্ডোরা নামক এক নারীর সম্পর্কে তাদের ধারনা ছিল যে, সে সবরকম পার্থিব বিপদ-আপদের উৎস। একজন গ্রীক সাহিত্যিক বলেন, দুটি ক্ষেত্রে নারী পুরুষের জন্য আনন্দের কারণ। এক, বিয়ের দিন এবং দুই, তার মৃত্যুর দিন।[৩৭]

সুসভ্য গ্রিসের নারীদের কথা 'ইফিজেনিয়া ইন টরিস'–এ (Iphigenia in tauris) ভালোভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইফিজেনিয়া আফসোস করে বলেছে, "মানবজাতির মধ্যে নারীদের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। পুরুষের ভাগ্য প্রসন্ন হলে সে শাসকের পদে উন্নীত হয় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যশ লাভ করে, আর তার ভাগ্য বিমুখ হলে সে তার নিজের লোকের মধ্যেই স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে সুখের সীমা খুবই সংকীর্ণ। তাকে অজাচিতভাবে, অনেক সময় অচেনা-অজানা লোকের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয়। আর তার ঘর যদি ধ্বংস হয়ে যায়, বিজিত ব্যক্তি তাকে ধ্বংসস্তুপের ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে, তার প্রিয়জনদের মৃতদেহের মধ্য দিয়ে তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায়।[৩৮]

অবশ্য স্পারটাবাসী কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করে নারীকে কিছু কিছু নাগরিক অধিকার দিয়েছিল। তাকে উত্তরাধিকার, তালাক ও আর্থিক লেনদেনের এখতিয়ার দিয়েছিল। তবে এটা তাদের পক্ষ থেকে নারীর যোগ্যতার স্বীকৃতি বা তার প্রতি উদারতা প্রদর্শনের নিদর্শন ছিল না। এর কারন ছিল স্পারটার দীর্ঘ যুদ্ধাবস্থা। যেহেতু পুরুষরা সর্বক্ষণ যুদ্ধে ব্যাস্ত থাকতো, তাই তাদের অনুপস্থিতিকালে গৃহস্থালির কাজকর্ম নারীদের ওপর ন্যস্ত রাখত। এ কারনে স্পারটার মহিলারা এথেন্স ও অন্যান্য গ্রীক নগরীর মহিলাদের চেয়ে বেশী রাস্তায় বেরুত এবং অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতো।[৩৯] তথাপি এরিস্টটল নারীকে এই অধিকার প্রদানের জন্য স্পারটাবাসির নিন্দা করতেন এবং এই অধিকার প্রদানকেই স্পারটার পতনের জন্য দায়ী করতেন।

স্মার্টার আইনে একথা স্পষ্ট লিপিবদ্ধ ছিল যে, অল্প বয়স্ক এবং দুর্বল স্বামীর উচিৎ তার অল্পবয়স্কা স্ত্রীকে কোন যুবকের সাথে বিয়ে দেওয়া যাতে সেনাবাহিনীতে শক্তিশালী সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।[৪০]

অতঃপর গ্রীক সভ্যতা যখন উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরহন করল, তখন নারীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলো এবং পুরুষদের সাথে প্রকাশ্যে সভা সমিতিতে অবাধে মেলামেশা করতে লাগলো। ফলে নির্লজ্জতা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ল যে, ব্যাভিচার আর দূষণীয় মনে হত না। এমনকি এক পর্যায়ে বেশ্যালয়গুলো হয়ে উঠলো সাহিত্য ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল।

তারপর সাহিত্য ও শিল্পের নামে উলঙ্গ মূর্তি স্থাপন করা হতে লাগলো। এরপর তাদের ধর্ম ও নারী ও পুরুষের অবৈধ সম্পর্ককে স্বীকৃতি দিয়ে বসলো। তাদের দেবী 'আফ্রদাইতি' এক দেবতার স্ত্রী হয়েও তিনজন দেবতার সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। এমনকি একজন সাধারন মানুষকেও সে নিজের উপপতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার ঔরস থেকে সে 'কিওপিড' নামে যে সন্তান প্রসব করে, তা হয়ে দাঁড়ায় গ্রীক জাতির প্রেমের দেবতা। এতেও তাদের তৃপ্তি আসেনি। অবশেষে তারা পুরুষে পুরুষেও অস্বাভাবিক যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এর নিদর্শনস্বরূপ 'হারমোডিস' ও 'আরাস্তজেন' নামক অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারী দুই পুরুষের মূর্তি স্থাপন করে। এই পর্যায়ে এসেই প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার পতন ও বিলুপ্তি ঘটে।[৪১]

রোমান সভ্যতায় নারী

---

৩৭ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, অনু: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, *ইসলামি সমাজে নারী* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৮), পৃ. ১৭

৩৮ অগাস্ট বেবেল, অনু: কনক মুখোপাধ্যয়, *নারী অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতে* (কলকাতা : ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ৩য় প্রকাশ, জুন ২০০৩), পৃ: ১১

৩৯ ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী, অনু:আকরাম ফারুক, ***ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*** (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৫ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০), পৃ. ১০

৪০ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন রোমান সমাজে এ রূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক- তাকে পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করতে পিতা বাধ্য থাকতো না। শিশু ভুমিষ্ট হওয়ার পর তাকে পিতার পায়ের কাছে রাখা হত। পিতা যখন তাকে ধরে উপরে তুলতো, তখন প্রমাণিত হত যে, সে তাকে আপন পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছে। অন্যথায় ধরে নেওয়া হতো যে, পিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সে ক্ষেত্রে শিশুকে কোন খোলা ময়দানে অথবা উপাসনালয়ের বেদিতে রাখা হতো। ছেলে হলে পরবর্তী সময়ে কেউ ইচ্ছা করলে তাকে গ্রহণ করতো। নচেৎ শিশু ক্ষুদায়-পিপাসায়, গরমে কিংবা শীতে ধুকে ধুকে মরতো।

পরিবার প্রধান ইচ্ছা করলে যে কোন বহিরাগতকে পরিবারের অন্তর্ভূক্ত করতে পারতো এবং নিজের সন্তানদের মধ্য থেকে যাকে চাইতো দাস-দাসীর মত বিক্রি করে পরিবার থেকে বের করে দিতো পারতো। অতঃপর একসময় বিক্রির অধিকার তিনবার নাগাদ সীমিত করে দেওয়া হয় নয়া আইন জারির মাধ্যমে। পিতা কর্তৃক নিজ পূত্রকে বিক্রি করা দুইবারের বেশি হলে ওই পূত্রের ওপর আর পিতার আনুগত্য বাধ্যবাধকতা থাকতো না। তবে সন্তান যদি মেয়ে হতো, তাহলে তাকে আজীবন পিতার অনুগত থাকতে হতো। ছেলে-মেয়ের বয়স যতই হোক, তাদের ওপর পিতার কর্তৃত্ব, পিতার মৃত্যু পর্যন্তই বহাল থাকতো। সন্তানের ন্যায় নিজের স্ত্রীর ওপর, নিজের পুত্রদের স্ত্রীদের ওপর এবং পৌত্রদের স্ত্রীদের ওপরও পরিবার প্রধানের কর্তৃত্ব বজায় থাকতো।

এই কর্তৃত্ব বলতে বুঝাত বিক্রি করার অধিকার, বহিস্কার করার অধিকার, শাস্তি দেয়ার অধিকার, এমনকি হত্যা করার অধিকারও। অন্য কথায় বলা যায়, পরিবারের ওপর পরিবারপ্রধানের কর্তৃত্বও ছিল মালিকানামূলক, সংরক্ষণমূলক নয়। পরিবারপ্রধানের এই কর্তৃত্ব ৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট জাস্তিনানের সময় খর্ব করা হয় এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য কিছু মারপিট করার চেয়ে বেশি কোন অধিকার তাকে দেয়া হয়নি।

পরিবারের প্রধান পরিবারের সকল সহায় সম্পদের একচ্ছত্র মালিক হতো। পরিবারের কোন সদস্য কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। পরিবারের সদস্যরা নিছক পরিবার প্রধানের সম্পত্তি বৃদ্ধির হাতিয়ার গণ্য হতো। পরিবার প্রধানই এককভাবে ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিত এবং এ ব্যাপারে তাদের মতামতের তোয়াক্কা করতো না। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কন্যা শিশুর আদৌ কোন মালিকানা থাকতো না। সে কোন অর্থ উপার্জন করলেই সেটা পরিনত হতো পরিবার প্রধানের একটা বাড়তি সম্পত্তিতে। এমনকি মেয়ের বয়ঃপ্রাপ্তি কিংবা বিয়ে হয়ে গেলেও তার কোন মালিকানা থাকতো না।

পরবর্তীকালে সম্রাট কনস্ট্যান্টাইনের শাসনামলে স্থির হয়, মেয়ে যে সম্পত্তি তার মায়ের উত্তরাধিকার হিসেবে পাবে, তা তার পিতার সম্পত্তি হবে না, বরং মেয়ের সম্পত্তি হবে। তবে পিতা সে সম্পত্তি ব্যাবহার করতে পারবে। মেয়ে যখন পিতার আনুগত্য থেকে মুক্ত হবে, তখন পিতা তার সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ নিজের মালিকানাধীন করে নিতে পারবে এবং বাকি দুই তৃতীয়াংশ মেয়ের থাকবে।

সম্রাট জাস্তিনিয়ানের আমলে স্থির করা হয় যে, মেয়ে যে সম্পদ নিজের শ্রম দারা উপার্জন করবে, অথবা তার পরিবারের প্রধান ছাড়া অন্য কারো মাধ্যমে অর্জন করবে, সে সম্পত্তি ওই মেয়েরই মালিকানাধীন বিবেচিত হবে। তবে পরিবার প্রধান যে সম্পত্তি তাকে দেবে, সে সম্পত্তির মালিকানা পরিবার প্রধানেরই থাকবে এবং তার অনুমতি ছাড়া মেয়ে তা ভোগ ও ব্যাবহার করতে পারবে না।

পরিবার প্রধান মারা গেলে বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রসন্তান স্বাধীন হয়ে যেত। কিন্তু যুবতী কন্যা স্বাধীন হত না। কন্যা যতদিন বেঁচে থাকতো, ততদিন অন্য একজন অভিভাবক তার মনিব হতো। পরবর্তীকালে এই বিধি সংশোধিত হয়। আইনগত অভিভাবকের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে এরুপ কৌশল প্রবর্তন করা হয় যে, নারী নিজেকে নিজের মনপুত কোন অভিভাবকের কাছে বিক্রি করে দেবে এবং উভয়ের মধ্যে এই মর্মে চুক্তি হবে যে, এই আত্ম বিক্রির উদ্দেশ্য হল পূর্ববর্তী মনিবের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করা। এই চুক্তির কারনে নতুন মনিব তাকে তার পছন্দমত যে কোন কাজে বাধা দিত না। আর যুবতী কন্যা বিয়ে করে, তবে তাকে তার স্বামীর সাথে সার্বভৌম চুক্তি নামে একটা চুক্তি সম্পাদন করতে হতো।

অর্থাৎ স্বামীকে স্ত্রীর উপর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব দিতে হত। এই চুক্তি সম্পাদিত হতো তিনটি উপায়ে-

Dhaka University Institutional Repository

১। পুরোহিতের পরিচালনাধীন একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে
২। প্রতিকী ক্রয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে
৩। বিয়ের পর পুরো এক বছর স্বামীর সাথে বসবাসের মাধ্যমে।
এভাবে পরিবার প্রধান নিজের কন্যার ওপর থেকে পিতৃত্বের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলত এবং এ কর্তৃত্ব হস্তান্তরিত হতো স্বামীর নিকট। মোটকথা পরবর্তীকালে রোমান সমাজের জ্ঞানগত অগ্রগতি সাধিত হলে নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব কিছুটা শিথিল হয়। কিন্তু, এিতদসত্ত্বেও নারীর অধিকার পুরোপুরি বহাল হয়নি।
নাগরিক অধিকারের পথে তিনটি জিনিস রোমান আইনে পরবর্তীকালেও অন্তরায় বিবেচিত হতে থাকে। এই তিনটি জিনিস হল অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, বুদ্ধির অপরিপক্কতা এবং নারী হওয়া। প্রাচীন রোমান আইনবিদগন নারীদেরকে নাগরিক অধিকার না দেয়ার প্রধান কারণ হিসেবে দায়ী করতেন তাদের বুদ্ধির স্বল্পতাকে। জাস্তিনিয়ানের জারিকৃত আইনে এই বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্ট ও স্বচ্ছ করার চেষ্টা করা হয়। এ আইনে বলা হয় যে, চুক্তি সম্পাদনের জন্য দু'রকম যোগ্যতা প্রয়োজন: আইনগত যোগ্যতা ও বাস্তব যোগ্যতা।
আইনগত যোগ্যতার অভাব হেতু তিন শ্রেণীর নাগরিক চুক্তি সম্পাদনের জন্য নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে গণ্য হয়। এরা হচ্ছে: ১। দাসদাসী ২। বিদেশি ৩। পরিবার প্রধানের একচ্ছত্র কর্তৃত্বাধীন স্ত্রী ও মেয়েরা।
আর বাস্তব যোগ্যতার অভাব হেতু যে চার শ্রেণীর নাগরিক চুক্তি সম্পাদনের অযোগ্য বিবেচিত হয়: ১। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু বা বালক-বালিকা ২। বুদ্ধিতে অপরিপক্ক ও ঋণগ্রস্থ ৩। ঋণগ্রস্থ প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা ও স্ত্রীগণ ৪। অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে ঋণগ্রস্থ ও অভিভাবকের আশ্রিত স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্কা নারীগণ। অবশ্য রোমান সাম্রাজ্যের শেষের দিকে নারীদের জন্য অভিভাবক থাকার প্রথা বিলুপ্ত হওয়ায় উপরোক্ত চতুর্থ অবস্থাটা আর টিকে থাকেনি। তথাপি এসব প্রাপ্তবয়স্কা স্বাধীন নারীগণ ঋণগ্রস্থ থাকলে পুরোপুরিভাবে নাগরিক অধিকার ভোগ করার যোগ্য বিবেচিত হত না। রোমান আইনে নারীকে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদের উপযুক্ত মনে করা হত না। এমনকি কোন ব্যাপারে তার স্বাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য ছিল না।[৪২]

আরব সভ্যতায় নারী

আরবের অধিবাসীরা নারীর অস্তিত্বকে লজ্জাজনক ও লাঞ্ছনাকর মনে করত। কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়া ছিল তাদের জন্য গভীল দুঃখ ও মনোকষ্টের কারণ। তাই তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিত। এ প্রসঙ্গে এমন কিছু দুঃখজনক ও ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে যা শোনা মাত্রই হৃদয় কেঁপে ওঠে।
এক ব্যক্তি নবী (স.) কে তার জাহেলী যুগের কাহিনী শুনিয়ে বলল, 'আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট ছিল। আমি যখনই তাকে আহ্বান করতাম সে বড় আনন্দ চিত্তে আমার কাছে দৌড়ে আসত। এভাবে একদিন আমি তাকে ডাকলে সে আমার পেছনে পেছনে দৌড়ে এল। আমি তাকে সাথে করে নিকটবর্তী একটি কুপের পাশে গেলাম এবং ধাক্কা দিয়ে কুপের মধ্যে ফেলে দিলাম। তখনও সে আব্বা আব্বা বলে চিৎকার করছিল।' ঘটনাটি শুনে নবী (স.)এর দুটি চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। এমনকি তার পবিত্র দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গেল।[৪৩]
কায়েস ইবনে আসেম জাহেলি যুগে আট-দশটি কন্যা সন্তানকে জ্যান্ত দাফন করেছিল।[৪৪] বিয়ের কোন সীমা-সংখ্যা ছিল না। যত সংখ্যক নারীকে ইচ্ছা বিয়ে করত। ইসলাম কবুল করার সময়ে ওয়াহাব আসাদী (রা:) এর আটজন

৪২ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৪৪ হাফেজ আল্লামা ইমামুদ্দিন ইবনু কাসীর (রহ.), অনু: ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *তাফসিরে ইবনে কাসীর* (ঢাকা : তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণ, মে ২০০৮), খ. ৪, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রী ছিল।[৪৫] গায়লান ইবনে সালমা ছাকাফী যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তার অধিকারে জাহেলী আমলের ১০জন স্ত্রী ছিল। অবশ্য তারাও তার সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে।[৪৬]
একইভাবে তালাকের ব্যাপারেও কোন প্রতিবন্ধকতা ছিল না। পুরুষরা যখনই চাইত এবং যতবার চাইত স্ত্রীকে তালাক দিত এবং ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রত্যাহার করত।[৪৭]

ইউরোপীয় সভ্যতায় নারী

বর্তমান ইউরোপ নারী ও পুরুষের সাম্যের দাবিদার। কিন্তু এই ইউরোপে এক শতাব্দীকাল পূর্বেও নারী পুরুষের জুলুম অত্যচারের শিকার ছিল। ইংল্যান্ডের আইনে এ বিষয়টি স্বীকৃত ছিল যে, বিয়ের পরে পুরুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে কোন পরিবর্তণ আসে না। কিন্তু বিয়ের পরে নারীর ব্যক্তিত্ব পুরুষের ব্যক্তিত্বের একটা অংশে পরিণত হয়। সুতরাং এর উপর ভিত্তি করে নীতি গড়ে উঠেছিল যে, নারীর জিম্মায় বিয়ের পূর্বের কোন ঋণ থাকলে পুরুষ তা পরিশোধ করবে। কিন্তু তার কোন ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তি থাকলে তা পুরুষের মালিকানায় চলে যাবে।
কোন কাজ করার ব্যাপারে নারীর কোন স্বাধীনতা ছিল না। সে তার নিজের ইচ্ছামত কোন চুক্তি করতে পারত না। এমনকি অর্থ উপার্জণ করে নিজের জন্য খরচ করা কিংবা পছন্দমত বিয়ে করার অধিকারও তার ছিল না। মেয়েদেরকে পিতা-মাতার মালিকানা মনে করা হত। পিতা-মাতা যার সাথে ইচ্ছা তাদের বিয়ে দিত। বিয়ে ছিল একটি ব্যাবসা, যার মাধ্যমে পিতা-মাতা মেয়েদের ছেলেদের কাছে বিক্রি করে দিত। নারী স্বাধীনতার বিখ্যাত প্রবক্তা মিল (Mill) তার পরাধীন নারী গ্রন্থে লিখেছেন, "ইউরোপের ইতিহাসের দিকে তাকান, দেখতে পাবেন খুব বেশি দিন অতিবাহিত হয়নি যখন বাপ তার মেয়েকে যেখানে ইচ্ছা বিক্রি করে দিত। এ ব্যাপারে তার ইচ্ছার কোন তোয়াক্কাই করা হতো না।"[৪৮]

হামুরাবীয় সভ্যতায় নারী

হামুরাবির আইনে নারীকে গৃহপালিত জীবজন্তুর পর্যায়ে ফেলা হতো। এ কারনে কেউ কারো মেয়েকে হত্যা করলে তার ক্ষতিপূরণ হিসেবে ওই মেয়ের বাবার কাছে হত্যাকারীর নিজের মেয়েকে চিরতরে হস্তান্তর করতে হতো। সে ওই মেয়েকে হত্যা করুক বা দাসি হিসেবে রেখে দিক, সেটা তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার। (হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর সমসাময়িক রাজা নম্রুদ ধ্বংসের পর ইরাকের সবচেয়ে নামজাদা রাজা ছিলেন হামুরাবি)।

অন্যান্য সভ্যতায় নারী

ব্যাবিলনিয়ান সাম্রাজ্যের শক্তিশালি রাজধানী ব্যাবিলনের এই রকম আইন ছিল যে, প্রত্যেক কুমারি মেয়েকে অন্তত একবার মিলিটা দেবির মন্দিরে (Goddess Mylitta) তীর্থ যাত্রা করতে হবে এবং দেবির সম্মানার্থে সেখানে আগন্তুক পুরুষদের পছন্দ অনুযায়ী তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।
আর্মেনিয়াতে দেবি এ্যনাইটিসকেও (Anaitis) ঠিক একইভাবে পূজা করা হত। ইজিপটস, সিরিয়া, ফোনিসিয়া, সাইপ্রাস, কার্থেজ এমনকি গ্রীস এবং রোমেও এই ধর্মের যৌন পদ্ধতির সংগঠন ছিল।[৪৯]

---

৪৫ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৯৪, হাদীস নং- ২২৩৫

৪৬ ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী, সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, *জামে আত-তিরমিযী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন, ১৯৯৫), খ. ৩, পৃ. ৪১২, হাদীস নং- ১১২৯

৪৭ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৭৪, হাদীস- ২১৮৪

৪৮ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৪৯ অগাস্ট বেবেল, *নারী অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

চীনা ও ভারতীয়রা নারীদের ক্ষেত্রে সমানভাবে মনুষ্যত্বের কথা অস্বীকার করেছে এবং খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ম্যাকন-এর কাউন্সিলে (Council of Macon) নারীদের মনুষ্যত্ব ও আত্মার বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হলে সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতাই তার স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।[৫০]

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে নারী নির্যাতন

বিভিন্ন দেশ-জাতি, সভ্যতায়ই শুধু নয়, ধর্মের দৃষ্টিতেও নারী ছিল অপরাধী। ক্রমান্বয়ে এ ধারনা বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে নারীর প্রতি ঘৃণা ও অসন্তোষ। তাকে শয়তানের দালাল এবং পাপের দরজা বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার সাথে সম্পর্ক রাখা তাকওয়ার পরিপন্থি এবং দুরে অবস্থানকে আল্লাভীতির প্রমান মনে করা হয়েছে।

ইহুদি ধর্মে নারী

এ ধর্ম আমাদের সামনে এমন ধারনা পেশ করে যে, পুরুষ সৎ স্বভাব বিশিষ্ট ও সৎকর্মশীল এবং নারী বদস্বভাব বিশিষ্ট ও ভণ্ড। মানবজাতির প্রথম সদস্য আদম (আঃ) জান্নাতে মহাসুখে জীবন কাটাচ্ছিলেন। কারণ তিনি ছিলেন আল্লাহর অনুগত বান্দা। কিন্তু তার স্ত্রী হাওয়া (আঃ) তাকে সর্বপ্রথম আল্লাহর অবাধ্য হতে প্ররোচিত করল এবং তাকে এমন একটি ফল খাওয়াল, যা খেতে আল্লাহ তাকে নিষেধ করেছিলেন। ফলস্বরূপ তিনি আল্লাহর সব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলেন এবং তার ভাগ্যলিপিতে কায়-ক্লেশের জীবন লিপিবদ্ধ হল।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ আছে যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, 'যে বৃক্ষের ফল ভোজন করতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ? তাহাতে আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গীনি করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ওই বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, তাই খাইয়াছি'- আদি পুস্তক তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক-**১১**।

এরপরে আল্লাহ তায়ালা হাওয়াকে বললেন, 'আমি তোমার গর্ভ বেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব। তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে ও সে তোমার ওপরে কর্তৃত্ব করিবে'- আদি পুস্তক, অধ্যায়: ৩, শ্লোক: ১৬।[৫১]

ইহুদিদের মধ্যেও ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে নারীর পতিতাবৃত্তির চল ছিল। তার প্রমান ওল্ড টেস্টামেন্টে পাওয়া যায়। আব্রাহাম (Abraham) বিনা দ্বিধায় তার স্ত্রী সারাকে অন্যের কাছে ধার দিয়েছিলেন। অথ্যাৎ ফারাওর কাছে দিয়েছিলেন। যার জন্য ফারাও তাকে মূল্যবান পুরস্কার দিয়েছিলেন। ইহুদিদের পূর্বপুরুষ এবং যিশু খৃষ্টের পিতৃপুরুষ এই দর কষাকষির মধ্যে দোষের কিছুই দেখতে পাননি- আজকালকার ধারনায় যা কি না আমাদের অত্যন্ত নোংরা আর বিশ্রি মনে হয়।[৫২]

এছাড়া ইহুদীরা সচারচর নারীকে অভিশাপ মনে করে থাকে। কারন নারীই আদমকে বিপথগামী করেছিল। তাওরাতে বলা হয়েছে স্ত্রীলোক মৃত্যুর চেয়েও মারাত্মক। আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সৎ, সে স্ত্রীলোকের কবল থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে। এক হাজার জনের মধ্যে এ রকম পুরুষ মাত্র একজন পাওয়া যাবে। কিন্তু হাজার জনের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ও সৎ পাওয়া যাবে না।

খৃস্টধর্মে নারী

খৃস্টধর্ম নারীকে যতদূর নীচে নিক্ষেপ করা সম্ভব তা করেছে। নারী সম্পর্কে খৃস্টধর্মের অনুভুতি তারতুলীনের নিম্ন বর্ণিত বক্তব্য দ্বারা অনুমান করা যায়, 'হে নারীকুল, তোমরা জান না যে, তোমাদের প্রত্যেকেই একেকজন হাওয়া। তোমাদের জন্য আল্লাহর যে ফতোয়া ছিল তা যদি এখনও বর্তমান থাকে, তাহলে উক্ত অপরাধ প্রবণতাও তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছে। তোমরা তো শয়তানের দরজা। তোমরাই অতি সহজে আল্লাহর প্রতিচ্ছবি, অর্থাৎ পুরুষের ধ্বংস করছো।'[৫৩]

---

[৫১] সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[৫২] অগাস্ট বেবেল, *নারী অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৫৩] সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

সেন্ট পল তার একটি পত্রে লিখেছেন, 'নারী সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক শিক্ষা করুক। আমি উপদেশ দিবার কিংবা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি নারীকে দিই না। কিন্তু মৌনভাবে থাকিতে বলি। কারণ, প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে নির্ম্মান করা হইয়াছিল। আর আদম প্রবঞ্চিত হইলেন না, কিন্তু নারী প্রবঞ্চিতা হইয়া অপরাধে পতিতা হইলেন।'- তীমথিয়ের প্রতি প্রেরিত পলের প্রথম পত্র, অধ্যায়-২ঃ ১১-১৪।[৫৪]

প্রথম জুগের খ্রিস্টধর্মের যাজকগণ রোমান সমাজে অশ্লীলতা ও ব্যাবিচারের ব্যাপক ছড়াছড়ি ও চরম নৈতিক অধঃপতন দেখে আতংকিত হয়ে পড়েন এবং এসব কিছুর জন্য নারীকেই এককভাবে দায়ী করেন। কেননা নারীরা সমাজে অবাধ চলাফেরা, খেলাধুলা ও পুরুষদের সাথে অবাধ মেলামেশা করতো। তাই খ্রিষ্টীয় ধর্মজাজকগন স্থির করলেন যে, বিয়ে একটা নোংরা কাজ এবং অবিবাহিত ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বিবাহিত অপেক্ষা বেশি সম্মানার্হ্য। তারা ঘোষণা দিলেন যে, নারী হল শয়তানের প্রবেশদ্বার এবং নিজের সৌন্দর্য নিয়ে তার লজ্জিত থাকা উচিত। কেননা নারীর সৌন্দর্য হল বিপথগামি ও প্রলুব্ধ করার কাজে শয়তানের অস্ত্র।[৫৫]

মস্তাম নামক আরেক জাজক বলেন: নারী এক অনিবার্য আপদ। এক লোভনীয় আপদ। পরিবার ও সংসারের জন্য হুমকি। মোহনীয় মোড়কে আবৃত বিভীষিকা।

পঞ্চম শতাব্দীতে মাকন একাডেমী এ বিষয়ে গবেষণা চালায় যে, নারী কি আত্মাহীন দেহ, না কি তার আত্মাও আছে। গবেষণা শেষে একাডেমী সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, একমাত্র মসিহের মাতা মরিয়ম ব্যতিত আর কোন নারীই দোজখ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত আত্মার অধিকারিণী নয়।[৫৬]

পাশ্চাত্য জগত খ্রিস্টধর্মে দিক্ষিত হওয়ার পর উপরোক্ত জাজকদের মতামত দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই ৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল নারীকে কি মানুষ বলে বিবেচনা করা হবে? না কি অমানুষ বলা হবে? অবশেষে স্থির করা যে সে মানুষ বটে, তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষের সেবা করা।

মজার ব্যাপার এই যে, ১৮০৫ সাল পর্যন্তও ব্রিটিশ আইনে স্ত্রীকে বিক্রি করে দেয়ার অধিকার স্বামীর জন্য সংরক্ষিত ছিল। এ সময়ে স্ত্রীর মূল্য বেঁধে দেয়া হয়েছিল ছয় পেনস। ঘটনাক্রমে ১৯৩১ সালে জনৈক ইংরেজ তার স্ত্রীকে পাঁচশো পাউন্ডে বেচে দেয়। তার উকিল তার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে বলল যে, বৃটিশ আইনে একশ বছর আগে স্বামীকে নিজের স্ত্রী বিক্রি করার অনুমতি দিত। আর ১৮০১ সালের বৃটিশ আইনে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে বিক্রি করা হলে সে জন্য ছয় পেনস মূল্য নির্ধারিত ছিল। আদালত জবাবে বলেন যে, এ আইন ১৮০৫ সালে বাতিল হয়ে গেছে এবং স্ত্রীকে বিক্রি করা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আদালত উক্ত স্বামীকে দশ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।[৫৭]

আগের বছর ইতালিতে স্ত্রী বিক্রির আরেকটি ঘটনা ঘটে। জনৈক ইতালীয় নিজের স্ত্রীকে কিস্তিতে বিক্রি করে। শেষের দিকের কয়েক কিস্তি বাকি থাকতে ক্রেতা দাম পরিশোধ করা বন্ধ করলে বিক্রেতা তাকে হত্যা করে। (মাজাস্সাতু হাযারাতিল ইসলাম, ২য় বর্ষ, পৃ: ১০৭৮)।[৫৮]

হিন্দু ধর্মে নারী

ধর্মের নামে নারীর প্রতি সবচেয়ে বেশি দ্বাসত্ব ও নির্যাতন চালানো হয়েছে হিন্দুধর্মে। ভারতবর্ষের বিখ্যাত আইন রচয়িতা মনুরাজ নারী সম্পর্কে বলেছেন, 'শৈশবে নারী তার পিতার অধীনে থাকবে, যৌবনে স্বামীর অধীনে থাকবে

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
[৫৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
[৫৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
[৫৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

এবং বিধবা হওয়ার পরে থাকবে পুত্রের অধীনে, কোন সময়েই সে স্বাধীন থাকবে না।'- মনুস্মৃতি ১৪৫:৫। 'নারী অপ্রাপ্ত বয়স্কা, প্রাপ্ত বয়স্কা বা বৃদ্ধা যাই হোক না কেন... স্বাধীন যেন না হয়।'- মনুস্মৃতি ১৪৫:৫।[৫৯]

মনু সংহিতায় পিতা, স্বামী অথবা নিজ পুত্রের কর্তৃত্ব থেকে নারীর স্বাধীন হবার কোন অধিকার নেই। এই তিনজন মারা গেলে তাকে তার স্বামীর কোন এক পুরুষ নিকটাত্মীয়ের তত্বাবধানে থাকতে হবে। সারা জীবন তাকে অধিকারহীনা অবস্থায় কাটাতে হয়। এমনকি এক সময়ে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর বেঁচে থাকার অধিকারও ছিল না। তাকে স্বামীর সাথে একই চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো। ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত এই সতিদাহ প্রথা চালু থাকে। এরপর এই প্রথা বিলোপ করা হলেও হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের তা মনপুত ছিল না। কোথাও কোথাও নারীকে দেবতার তুষ্টি সাধন অথবা কৃষি ও ভালো ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে বলি দেয়া হতো।[৬০]

হিন্দুধর্মে সতীদাহ প্রথার নামে অজস্র নারীকে অকালে স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। মর্মন্তুদ এ মৃত্যুর সময় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে শোরগোল করা হত। যাতে জীবন্ত নারীর মরন চিৎকার কারও কানে না যায়। সতীদাহ প্রথা রহিত হলেও, হিন্দু বিধবাদেরকে আজও অমানবিক জীবন-যাপন করতে হয়। এমনকি সংযমের নামে তাদেরকে রঙিন পোষাক এবং পুষ্টিকর খাবার থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়।

মনুরাজ বলেন, 'উৎসর্গ এবং ব্রত পালন করা নারীর জন্য পাপ। তার উচিৎ শুধু স্বামীর সেবা করা। স্বামীর মৃত্যুর পর পূনরায় স্বামী গ্রহনের বিষয়ে মুখে আনাও নারীর উচিৎ নয়। বরং, স্বল্পাহারি হয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো কাটিয়ে দেওয়া উচিৎ।'- অধ্যায়-৫, ১৫৫-১৫৭।[৬১]

এ ধর্মে নারীরা উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে কোন অংশ পায় না। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এখনও একটি বিশেষ গাছের গোড়ায় প্রতি বছর একটি করে যুবতী মেয়েকে বলি দেয়ার রেওয়াজ চালু আছে। কোন কোন হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বলা আছে: বিষ, সাপ, আগুন, মৃত্যু, নরক ও ঝড় বন্যা- এসব কোন কিছুই নারীর চেয়ে খারাপ নয়।[৬২]

প্রাচীন জাতি সমূহের প্রবাদ প্রবচনে নারী

একটি চীনা প্রবাদে আছে: তোমরা স্ত্রীর কথা শোন, তবে বিশ্বাস করো না।

একটি রুশ প্রবাদে আছে: দশটি নারীর মধ্যেও একটির বেশি আত্মা থাকে না।

একটি স্পেনীয় প্রবাদে বলা হয়েছে: দুষ্টা নারীকে এড়িয়ে চলো। তবে বিদুষী নারীর প্রতি ঝুঁকে পড়ো না।

একটি ইতালীয় প্রবাদে বলা হয়েছে: ঘোড়া চটপটে বা অলস যাই হোক, তাকে চালাতে চাবুক ব্যবহার কর। আর নারী সতীই হোক আর অসতীই হোক- তাকে ডান্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা কর।[৬৩]

---

৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ, ২৬

৬০ ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৬১ সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৬২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

আরবীতে নারী নির্যাতনের প্রতিশব্দ- তাগযীবুল মারআতে।[৬৪] নারীদের প্রতি জুলুম ও অপমান ইসলাম বরদাস্ত করতে পারেনি। তাই নারী জাতিকে লাঞ্চনা ও অমর্যাদাকর অবস্থান থেকে উঠিয়ে এনে অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে। ইসলাম মেয়েদেরকে বিভিন্ন ভাবে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছে। যেমন-

১. কন্যা হিসাবে মর্যাদা।
২. বোন হিসাবে মর্যাদা ।
৩. মা হিসাবে মর্যাদা ।
৪. স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা ।

ইসলামে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদা

সমাজকে সুন্দর, শান্তিময়, গতিশীল ও পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব কার কতখনি এবং কে কিভাবে পালন করবে তা বুঝে নেওয়া দরকার। আর এই সমাজের কাছে কার কতখানি অধিকার তাও সঠিকভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। নারী-পুরুষের শ্রষ্টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা জানিয়েছেন, 'মুমিন নারী ও মুমিন পুরুষ, পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। তারা মানুষকে যাবতীয় ভালো কাজের আদেশ করে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। এরা এমন লোক যাদের প্রতি অবশ্যই আল্লাহর রহমত নাযিল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজয়ী, সুবিজ্ঞ ও জ্ঞানী।'[৬৫]

'আল্লাহ ঈমানদার পুরুষও ঈমানদার নারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কানন-কুঞ্জের, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় প্রস্রবণ। তারা সেগুলোরই মাঝে থাকবে। আর এসব কানন-কুঞ্জে থাকবে পরিচ্ছন্ন থাকার ঘর। বস্তুত এ সমুদয়ের মাঝে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। এটিই হলো মহান কৃতকার্যতা।'[৬৬]

অথ্যাৎ মুমিন নারী ও পুরুষ পরস্পর একটা আদর্শ ও শান্তিময় সমাজ গড়ার সহযোগী। তারা-

১. তারা নিজেরা ভালো কাজ করবে।
২. খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে এবং পুরুষরা পুরুষদের ও নারীরা নারীদের ভালো কাজ করার নির্দেশ দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। এর প্রতিদানে তারা পাবে- আল্লাহর সন্তোষ। যাকে বলা হয়েছে সবচেয়ে বড় সাফল্য। আর আল্লাহর সন্তোষ মানেই তো- দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের কল্যাণ।

নারী ও পুরুষ মানব জাতির দুইটি অংশ। সমাজ গঠনে, সভ্যতার ভিত্তি স্থাপনে, মানবতার সেবায়- উভয়ে সমান অংশীদার। মনমস্তিষ্ক ব্যথা-কষ্ট, সুখ, আনন্দ, বিবেক-বুদ্ধি, অনুভূতি মানবিক প্রয়োজন উভয়েরই আছে।

নারী পুরুষের সমান মর্যাদার বিষয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, সকল মানুষই চিরুনির শলাকার ন্যায় সমান। আরবের অনারবের উপর, সাদার কালোর উপর, পুরুষের নারীর উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। কেবল মুত্তাকী লোকদের জন্য তাঁর নিকট অধিক মর্যাদা রয়েছে।'[৬৭]

ইসলামী আইনের ভারসাম্য নীতি

ভারসাম্যহীন চরম বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের এই পৃথিবীতে একটি মাত্র জীবন ব্যবস্থা আছে যা পুরাপুরি ন্যায়নীতি ও ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যার মধ্যে শুধু মানুষেরই না, সমস্ত মাখলুকের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। মানুষের তৈরী জীবন-বিধানে কোনো অবস্থাতেই যা সম্ভব না।

---

৬৪ আবু তাহের মেসবাহ (সঙ্কলক ও সম্পাদক), *আল-মানার, আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০৩

৬৫ আল কুরআন, ৯ : ৭১

৬৬ আল কুরআন, ৯ : ৭২

৬৭ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ* (কায়রো: ১৯৩০), খ. ৬, পৃ. ৪১১

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে শান্তি পাওয়ার একমাত্র কারণ হলো, ইসলাম হলো ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এই জীবন বিধানের মধ্যে মানব জীবনের যত সমস্যা আছে প্রতিটি সমস্যা সমাধানের এমন নিখুঁত দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যা অনুধাবন করলে প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে বলে উঠতে বাধ্য যে, এই আইন-কানুনের রচয়িতা তিনি যিনি আসমান, জমিন এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র বিশ্ব জগতের তিনিই শাসক পরিচালক ও মালিক। তিনি সিরাতুল মুস্তাকিমের প্রবর্তক। সেই মহান আল্লাহর তৈরী এ জীবন ব্যবস্থার নামই ইসলাম।

আর এই ইসলামই নারীর সঠিক মূল্যায়ণ করেছেন। নারী-পুরুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়মানুযায়ী। তার নারীদের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আল আল্লাহ হচ্ছেন, পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।'[৬৮]

ইসলাম নারীকে সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য করাই নয় শুধু স্বীকৃতিও দিয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে, 'পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে। অল্প কিংবা বেশী। এ অংশ নির্ধারিত।'[৬৯]

আল কুরআন নিম্নের আয়াতে উভয়ের সমমর্যাদার ওপর কত জোর দিয়েছে সেটাই এখন দেখা যাক,

'নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী– তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'[৭০]

যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে। আর যে পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বে-হিসাব রিযিক দেয়া হবে।'[৭১]

এমনিভাবে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন সূরায় ইসলামী সমাজে নারীর স্থান ও মর্যাদা, নারীর সামাজিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, নারীর ভালো কাজের প্রতিদান পুরুষের সমান, এসব কথা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

এছাড়াও স্ত্রীর কাছে স্বামীর আনুগত্য দাবী, নারীর নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, নারীর প্রসংশনীয় গুণাবলী, হিজরত করে আসা নারীদের ব্যাপারে বিধান এবং নারীদের বায়আত গ্রহণের পদ্ধতি ও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইসলাম অন্যান্য ধর্মের ন্যায় নারী ও পুরুষের মধ্যে নৈতিক, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক পার্থক্য তৈরি করেনি। পুরুষের মত নারী যদি সৎ কর্মশীলা হয় তবে সে জান্নাতে যেতে পারবে এবং তার ধর্মপালন ও ইবাদাত করার পূর্ণ যোগ্যতা ও অধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে সে অসৎ কর্মশীলা হলে জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।'[৭২]

আল্লাহ বলেন: 'অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক।'[৭৩]

---

৬৮ আল কুরআন, ২ : ২২৮

৬৯ আল কুরআন, ৪ : ৭

৭০ আল কুরআন, ৩৩ : ৩৫

৭১ আল কুরআন, ৪০ : ৪০

৭২ আল কুরআন, ১৬ : ৯৭

৭৩ আল কুরআন, ৩ : ১৯৫

Dhaka University Institutional Repository

কন্যা হিসেবে মর্যাদা

কুরআন নাযিলের পূর্বে এ নির্যাতিত শ্রেনীটির বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। পবিত্র কুরআন বললো, না তারাও জীবিত থকবে এবং যে ব্যক্তিই তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তাকে জবাবদিহী করতে হবে। 'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।'[৭৪]

নবী (স.) নির্যাতিত শ্রেনীকে সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশনামা ও শিক্ষা দিয়েছেন আজ পর্যন্ত নারী অধিকারের কোনো দাবীদার তার চেয়ে ন্যায়ানুগ ও বাস্তব শিক্ষা পেশ করতে সক্ষম হয়নি। তিনি বলেছেন: 'হযরত মুগীরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, হকদারকে হক কথা না দেয়া, সবরকম পন্থায় সম্পদ সংগ্রহ করা এবং মেয়ে সন্তানদের জ্যান্ত কবর দেয়া।'[৭৫]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'যে ব্যক্তির কন্যাসন্তান আছে, আর সে তাকে জ্যান্ত কবরস্থ করেনি কিংবা তার সাথে লাঞ্ছনাকর আচরণ করেনি এবং পুত্র সন্তানকে তার চেয়ে অগ্রাধিকার দেয়নি আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[৭৬]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যার তিনটি কন্যা সন্তান কিংবা তিনটি বোন থাকে, সে যদি তাদের সাথে সবসময় সদয় ব্যবহার করে, অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৭৭]

এরূপ আরেকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে তিরমিযী শরীফে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, 'যার দুটি মেয়ে কিংবা দুটি বোন থাকে, সে যদি বোন থাকে, সে যদি তাদের সাথে সব সময় সদয় ব্যবহার করে এবং তাদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করে তবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত।'[৭৮]

হযরত আয়েশা (রা.) রাসুলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 'আল্লাহ যদি কাউকে কন্যা সন্তানের মাধ্যমে কোন রকম পরীক্ষায় ফেলে থাকেন, আর সে যদি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করে তাহলে ওইসব কন্যাসন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার কারণ হবে।'[৭৯]

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কোন ব্যক্তির দুটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করলে- যতদিন তারা একত্রে বসবাস করবে, তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।'[৮০]

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাথে উত্তম আচরণ করো এবং তাদেরকে সদাচার শিক্ষা দাও।'[৮১]

---

৭৪ আল কুরআন, ৮১ : ৮-৯

৭৫ ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাইল বুখারী, *সহীস বুখারী* (ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা: আধুনিক প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৬), খ. ৫, পৃ. ৪৩৫, হাদীস নং- ৫৫৪২

৭৬ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ, ৬১২, হাদীস নং- ৫০৫৬

৭৭ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিয়ী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ, ৩৬৬, হাদীস নং- ১৯১৮

৭৮ *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৩৬৮, হাদীস নং- ১৯২২

৭৯ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৪১-৪৪২, হাদীস নং- ৫৫৬০। ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি (র.), অনু. ও সম্পাদনা : সম্পাদনা পরিষদ, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০৩), খ. ৭, পৃ. ১৪৩, হাদীস নং- ৬৪৫৪

৮০ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ, অনু: মুহাম্মদ মুসা, *সুনানু ইবনে মাজা* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০০২), খ. ৪, পৃ. ১৭৯, হাদীস নং- ৩৬৭০

৮১ ইমাম ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৮০, হাদীস নং- ৩৬৭১

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (স.) খুব আবেগপূর্ণ ভাষায় বলেন, 'আমি কি তোমাকে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সাদকার কথা বলবো না? তোমার যে কন্যাকে (বিধবা হওয়ার কিংবা তালাক দেয়ার কারণে) তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তুমি ছাড়া তার দায়িত্ব গ্রহণকারী বা উপার্জণকারী আর কেউ নাই।[৮২]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন: যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে প্রতিপালন করে বড় করলো সে এবং আমি এভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবো। নবী (স.) তাঁর মধ্যমা ও শাহাদত আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে একথা বললেন। তিনি আরো বললেনঃ দুটি পথ এমন আছে যা দিয়ে দুনিয়াতেই অতি দ্রুত আযাব আসে। তাহলো, যুলুম ও সীমালংঘণ এবং অবাধ্যতা।[৮৩]

হাদীসের শেষ বাক্যাটিতে নবী (স.) একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অথ্যাৎ যুলুম-নির্যাতনের সময় সীমা এমনিতেই খুব স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ করে যুলুমের যে তীর নিজের কলিজার টুকরাকে লক্ষ করে নিক্ষিপ্ত হয় তা মযলুমের বক্ষ ভেদ করার পূর্বেই যালেমের জীবন কাল নিঃশেষ করে দেয়।

মুসলিম শরীফে এই হাদীসটি এভাবে এসেছে, 'হযরত আনাস ইনবে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে বালিগ হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করে, কিয়ামতের দিবসে সে ও আমি এমন অবস্থায় আসব, এই বলে তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো একত্র করলেন।'[৮৪]

রাসুল (স.) এর কাছে তাঁর নিজের কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) সম্মান ও মর্যাদা এত উঁচুতে ছিল যে, তার বিন্দু পরিমাণ কষ্টও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে এসেছে একটি হাদীসে. 'হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমার মেয়ে আমারই রক্ত মাংস। যা তার সন্দেহ-সংশয় ও অশান্তির কারণ হয় তা আমারও সন্দেহ-সংশয় ও অশান্তির কারণ হয়। আর যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকের কষ্ট দেয়।'[৮৫]

হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসও প্রায় অনুরূপ। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ফাতিমা আমারই অঙ্গ। তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়।'[৮৬]

হযরত আয়েশা (রা.)কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে নবী (স.) কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন: ফাতেমাকে।[৮৭] একবার নবী করিম (স.)কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনার প্রিয়তম মানুষটি কে? তিনি বললেন, 'আয়েশা।'[৮৮]

হযরত আয়েশা (রা.) মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (স.) আরও স্পষ্ট করে বলেছেন বুখারি শরীফে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসটিতে। 'হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (স.)কে বলতে শুনেছি, যাবতীয় খাদ্যের ওপর সারীদের মর্যাদা যেমন, সমস্ত স্ত্রী লোকের ওপর আয়েশার মর্যাদাও তেমন।'[৮৯]

বোন হিসেবে মর্যাদা

ইসলামের এসব শিক্ষা মানুষের চিন্তা ও কর্মে এমন একটি বিপ্লব আনলো যে, যারা এক সময় একটি নিষ্পাপ শিশুকে জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধা করতো না এবং এ নিষ্ঠুর আচরণ করতে গিয়ে যাদের ললাটে এক বিন্দু ঘাম পর্যন্ত দেখা দিতো না, তারাই ঐসব শিশুর প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণকে নিজেদের পুঁজি মনে করতে লাগলো। আপন

---

৮২ *প্রাগুক্ত*, খ. ৪র্থ, পৃ. ১৭৯, হাদীস নং- ৩৬৬৭

৮৩ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪র্থ, পৃ. ৩৬৭, হাদীস নং- ১৯২০

৮৪ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ১৪৪, হাদীস নং- ৬৪৫৬

৮৫ ইমাম বুখারি, *সহীহ বুখারি*, প্রাগুক্ত (৫ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ. ৫৬৮, হাদীস নং- ৩৪৮৪। ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৩১, হাদীস নং- ৬০৮৬

৮৬ ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৩১, হাদীস নং- ৬০৮৬

৮৭ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, (প্রকাশকাল: জুন, ১৯৯৭), খ. ৬, পৃ. ৩৭৫, হাদীস নং- ৩৮৭৪

৮৮ প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৮০, হাদীস নং- ৩৮৮৫

৮৯ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ৩৪৮৮

Dhaka University Institutional Repository

শিশু-সন্তান যাদের কোলে নিরাপত্তা পেতো না তারাই অন্যের সন্তানের রক্ষক ও তত্বাবধায়ক হয়ে গেল। আর যারা নারীর সাথে স্নেহ-ভালোবাসার আচরণ করতে জানতো না তারাই নিজেদের জীবন সন্ধ্যায় এ নির্যাতিত মানব শ্রেনীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতো।

ওহুদের যুদ্ধের সময় হযরত জাবের (রা:)-এর পিতা তাকে বললেন: বেটা, হয়তো এ যুদ্ধে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। জীবনের এ শেষ মুহূর্তে আমি তোমাকে আমার কন্যাদের ব্যাপারে কল্যাণকামিতার অছিয়ত করছি।[৯০]

সুতরাং হযরত জাবের (রা.) একজন যুবক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর বোনদের দেখাশোনার জন্য একজন বিধবাকে নিজের জন্য পছন্দ করলেন। এ ঘটনাটিই হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে এসেছে।

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা সাত অথবা (রাবীর সন্দেহ) ৯টি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। অতঃপর আমি এক প্রাপ্ত বয়সা মহিলাকে বিবাহ করি। রাসুলুল্লাহ (স.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জাবের তুমি কী বিয়ে করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন কুমারী না প্রাপ্তবয়স্কা? আমি বললাম, প্রাপ্ত বয়স্কা। তিনি বললেন, তুমি কেন কুমারী মেয়ে বিয়ে করলে না? যাতে তুমি তার সাথে খেলাধুলা করতে পারতে, আর সেও তোমার সাথে (খেলাধুলা করতে পারতো)। জাবের বলেন, আমি তাকে জানালাম আবদুল্লাহ কয়েকটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। আমি ওদেরই মতো কুমারী মেয়ে বিয়ে করা পছন্দ করি নাই। তাই আমি বয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করেছি। যেন সে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সংশোধনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। তনি বললেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিক অথবা বলেন (রাবীর সন্দেহ) কল্যাণ দান করুন।'[৯১]

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের বর্ণনানুসারে হযরত হামজা (রা.)-এর শাহাদাতের পর তিনজন তার মেয়ের অভিভাবকত্বের দাবিদার হলেন। একদিকে হযরত আলী (রা.) দাবী করলেন যে, সে আমার চাচাতো বোন। তাই তাকে প্রতিপালনের জন্য আমার দাবী অগ্রগণ্য। অন্যদিকে হযরত জাফর (রা.) দাবী করলেন, 'আমি আলী (রা.) এর চেয়ে তার লালন পালনের অধিক হকদার। কেননা, সে যে আমার চাচাতো বোন শুধু তাই নয়, অধিকন্তু আমার স্ত্রী তার খালা। এ জন্য দুটি কারণে, তার লালন-পালনের দায়িত্ব ও সুযোগ আমার হওয়া উচিৎ।' তৃতীয়ত, হযরত জায়েদ (রা.) দাবী করে বসলেন যে, সে আমার ভাইয়ের (হযরত জায়েদ ছিলেন আনসার এবং হযরত হামজা রা. ছিলেন মুহাজের। নবী স. তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন কায়েম করে দিয়েছিলেন) মেয়ে। তাই ভ্রাতৃকন্যা প্রতিপালনের অধিকার চাচার চেয়ে আর কার বেশি থাকতে পারে?[৯২]

এসব শিক্ষার মধ্যে এত শক্তি আছে যে, তা জুলুম ও নির্যাতনের দৃঢ় বাহুকে চুরমার করে দিতে পারে। যে ব্যক্তি দৃঢ়ভাবে তার প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার পক্ষে ন্যায় ও ইনসাফের সীমার বাইরে পা রাখা আদৌ সম্ভব নয়। তাই, অসহায় ও দুর্বল নারীর প্রতি সে জুলুমও করতে পারে না।

মা হিসেবে মর্যাদা

নারীকে মা হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা মায়ের বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করে আয়াত নাযিল করেছেন, 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যাবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার স্তন্য ছাড়াতে সময় লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি ও সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি পছন্দনীয়

---

৯০ ইমাম হাকেম নিশাপুরী, *মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন*, খ. ৪র্থ, পৃ. ২০৩

৯১ ইমাম বুখারি, *বুখারি শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫ম, পৃ. ১৭০, হাদীস নং- ৪৯৬৭। ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪র্থ, পৃ. ৩৪৬, হাদীস নং- ৩৫০৩। ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, (ঢাকা : ই ফা বা, প্রকাশকাল: জুন ১৯৯৫), খ. ৩য়, পৃ. ৩৭৯, হাদীস নং- ১১০০

৯২ কাজী শাওকানী, *নাইলুল আওতার*, খ. ৭, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

সৎকাজ করি। আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ন কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম।[৯৩]

ইসলামে প্রত্যেকটি জায়গায় মায়ের সাথে সম্মান সূচক ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, ' তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। তাদের সামনে ভালোবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল : হে পালনকর্তা তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।[৯৪]

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যাবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু' বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।[৯৫]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ তায়াল স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, 'আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি।'[৯৬] সূরা আন নিসায় মায়ের প্রতি সদচারনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয়, ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায়, মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।[৯৭]

হাদিসে এসেছে, 'হযরত আবু উমামা (রা:) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হুজুর (স.)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, সন্তানের কাছে পিতামাতার কি হক আছে? হুজুর স. উত্তরে বললেন, মা–বাবা তোমার বেহেশত ও দোযখ। (তুমি মা বাবাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলে বেহেশতে যেতে পারবে, আর যদি তাদের কষ্ট দাও তবে দোযখ নির্ধারিত আছে।)'[৯৮]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল (স.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসুল (স.) বলেছেন, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি জন্মদাতার সন্তুষ্টিতে নিহিত এবং আল্লাহর ক্রোধ ও রোষ জন্মদাতার রোষ–অসন্তুষ্টিতে নিহিত (তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, হাকেম)।[৯৯]

পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদের পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ। এমনকি আল্লাহ তায়ালা সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিন্তু মাতা-পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদকারীর গুনাহ তিনি নিজে কখনও ক্ষমা করতে পারবেন না। এ ব্যাপারে রাসুল (স.) বলেন, 'সমস্ত গুনাহই এমন যে, তা হতে আল্লাহ যা এবং যতটা ইচ্ছা মাফ করে দেবেন। কিন্তু পিতা-মাতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করণ, দুর্ব্যবহার করা, অধিকার আদায় না করার গুনাহ তিনি মাফ করবেন না। বরং, যে লোক গুনাহ করে, তার জীবদ্ধশায় মৃত্যুর পূর্বেই শাস্তি ত্বরান্বিত করেন (মিশকাত)।[১০০]

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসুল (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ-আমার সদ্ব্যবহারের সব চেয়ে বড় হকদার কে? রাসুল (স.) বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি

---

[৯৩] আল কুরআন, ৪৬ : ১৫

[৯৪] আল কুরআন, ১৭ : ২৩-২৬

[৯৫] আল কুরআন, ৩১ : ১৪

[৯৬] আল কুরআন, ২৯ : ৮

[৯৭] আল কুরআন, ৪ : ৩৬

[৯৮] ইমাম ইবনে মাজা, *সুনান ইবনু মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৭, হাদীস নং- ৩৬৬২

[৯৯] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী* (ঢাকা: ই ফা বা, প্রকাশকাল, জুন ১৯৯২), খ. ৪, পৃ. ৩৫৮, হাদীস নং- ১৯০৫

[১০০] মাওঃ মোহাম্মদ আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-এপ্রিল, ১৯৭৫), খ. ৩, পৃ. ২৫৭

Dhaka University Institutional Repository

বললেন, তোমার মা। সে আবার বলল তারপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। সে বলল তারপর কে? চতুর্থবার বললেন, তোমার পিতা। তারপর তোমার নিকটে অতঃপর যে তোমার নিকটে।'[১০১]

এখানে বাবা থেকে মায়ের স্থান তিনগুণ উর্ধ্বে বলে প্রমাণ করেছেন তিনটি কারনে **১.** মা সন্তান গর্ভে ধারণ করার কষ্ট করেন **২.** সন্তান প্রসবের সময় কষ্ট করে **৩.** সন্তানকে দুই বছর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ায় এবং লালন পালন করার কষ্ট করে। আবু দারদা রা. বলেন, আমি নবীজীকে (স.) বলতে শুনেছি, পিতা-মাতা জান্নাতের মাঝের দরজা। যদি চাও, দরজাটি নষ্ট করে ফেলতে পারো, নতুবা তা সংরক্ষণও করতে পারো (ইবনে মাযাহ)।[১০২]

পিতা-মাতা জীবিত এবং অসুস্থ। তাদের দেখা-শোনার আর কেউ নেই। এ অবস্থায় পিতা-মাতাকে রেখে জিহাদে যেতেও নিষেধ করেছেন রাসুল (স.)। 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হুজুর (স.) এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ (স.)- আমি জিহাদে যাওয়ার আশা করছি সে বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই। এতে হুজুর (স.) বললেন, তোমার কি মা আছেন? লোকটি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আছেন। তখন হুজুর (স.) বললেন, যাও এখন তুমি মায়ের খেদমত করবে।[১০৩]

একজন অমুসলিম মায়ের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করেছেন রাসুলুল্লাহ (স.)। হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রা. বর্ণনা করেন, নবী (স.) এর যামানায় আমার অমুসলমান মা আমার নিকট আসলেন। আমি রাসূলুললাহ (স.)কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মা অমুসলিম। কিন্তু তিনি আমার কাছে কিছু পেতে আশা করছেন। আমি কি তাকে সন্তুষ্ট করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।[১০৪]

ইসলাম মা হিসাবে নারীর মর্যাদা এত বেশী দিয়েছে যে, পুরুষ কোনভাবেই সে মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।

স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা

নারীকে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেমন, আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যেন তাদের কাছে তোমরা বসবাস করতে পার। রাসুল (স.) বলেছেন, 'দুনিয়ার সব কিছুই ভোগ-ব্যবহারে সামগ্রী। আর দুনিয়ার এসব ভোগ ব্যবহার সামগ্রীর মদ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সদাচারী, সৎ স্বভাব ও সুরুচি সম্পন্না স্ত্রী।'[১০৫]

কেননা এইরূপ স্ত্রীই স্বামীর পরকালীন সাফল্য লাভে সাহায্যকারী হতে পারে। আর যা বা যে পরকালীন সাফল্য লাভে সাহায্যকারী, তা এবং সে সর্বোত্তম। এটা নিঃসন্দেহ। প্রায় অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে নাসায়ী শরীফে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সমগ্র পৃথিবী মানুষের ভোগ্য বস্তু। আর পৃথিবীস্থ ভোগ্য বস্তু সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হলো পূণ্যবতী স্ত্রী।'[১০৬]

একজন উত্তম স্ত্রী কেমন হবে, কী তার গুণ, কেমন হবে তার আচরণ– এসবের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাসুল (স.) সুস্পষ্টভাবেই তার সব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন অন্য একটি হাদীসে, 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলে করিম (স.) এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন মেয়ে উত্তম? জবাবে রাসুল (স.) বলেন, যে মেয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে দেবে। যখন সে তার দিকে তাকাবে, অনুসরণ ও আদেশ পালন করবে, যখন সে তাকে

---

[১০১] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩১, হাদীস নং ৫৫৩৯। ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ* (ঢাকা: ই ফা বা, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে- ২০০৩), খ. ৭, পৃ. ৮৫, হাদীস নং- ৬২৬৯, (মুসলিম শরীফের পরবর্তী ৬২৭০ নম্বর হাদীসটিও প্রায় অনুরূপভাবে বর্ণিত)।

[১০২] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৫৯, হাদীস নং- ১৯০৬

[১০৩] ইমাম বুখারি, *বুখারি শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩২, হাদীস নং- ৫৫৩৯। ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৭, পৃ.: ৮৬, হাদীস নং- ৬২৭৩

[১০৪] ইমাম বুখারি, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩৬, হাদীস নং- ৫৫৪৫

[১০৫] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৪৯, হাদীস নং- ৩৫০৭

[১০৬] ইমাম আবু আবদির রহমান ইবনে শোয়াইব আন নাসায়ী (রঃ), অনু: মাওলানা রিজাউল করিম ইসলামাবাদী, *সুনানু নাসায়ী শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল জুন, ২০০৩), খ. ৩, পৃ. ৪৭৬, হাদীস নং- ৩২৩৫। ইমাম ইবনে মাজা, *সুনান ইবনে মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ, ৩৬০, হাদীস নং- ১৮৫৭

Dhaka University Institutional Repository

কোন কাজের হুকুম করবে এবং তার স্ত্রীকে নিজের ব্যবহারে এবং তার নিজের ধন-মালের ব্যাপারে, সে যা অপছন্দ করে তাতে সে স্বামীর বিরুদ্ধতা করবে না।'[১০৭]

অন্য আরেকটি হাদীসে রাসুল (স.) উত্তম চরিত্রের নারীর গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনকরেছেন খুব সুন্দর ভাষায়। হযরত আবু আমামাতা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেন, 'মুমিনের তাকওয়ার পক্ষে অধিক কল্যাণকর ও কল্যাণলাভের উৎস হচ্ছে সচ্চরিত্রবতী এমন একজন স্ত্রী যাকে সে কোন কাজের আদেশ করলে সে তা মানবে, তার দিকে সে তাকাইলে, সে তাকে সন্তুষ্ট করে দেবে, সে যদি তার উপর কোন কীড়া-কছম দেয়, তবে সে তাকে কছমমুক্ত বানাবে। সে যদি স্ত্রী হতে দুরে চলে যায়, তবে সে নিজ সত্তার ও স্বামীর অর্থসম্পদের ব্যাপারে স্বামীর কল্যাণামী হয়।'[১০৮]

ইসলাম স্বামীর কাছে স্ত্রীর স্বতন্ত্র মর্যাদার কথা জোর দিয়ে বলেছে। দুই দেহ এক মন প্রাণ হয়ে স্বামী স্ত্রী বসবাস ও সংসার করবে বটে কিন্তু প্রত্যেকের মর্যাদার প্রতি প্রত্যেকের খেয়াল অবশ্যই থাকতে হবে। স্ত্রীকে ভালবাসা তার মান মর্যাদা হানিকর কোন কাজ বা বাক্য প্রয়োগ করবে না, তার খোর-পোষের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

একজন মুসলিম স্বামীর প্রতি অনবহেলিত কর্তব্য ইসলামের বিচারে স্ত্রীর প্রতি স্বামী কেমন ব্যবহার করে তা দিয়ে স্বামীর ভালো মন্দের বিচার প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'নারীদের অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর তেমনি যেমন রয়েছে পুরুষদের অধিকার নারীদের উপর ন্যায় সঙ্গত ভাবে।'[১০৯] অন্যত্র আছে, 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদভাবে জীবন যাপন কর।'[১১০] অন্য একটি হাদিসে রাসুল (স.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীর কাছে ভালো, তারা ইসলামের কাছে ভালো, আমি আমার স্ত্রীদের কাছে ভালো ব্যক্তি।'[১১১]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারা, যারা স্ত্রীদের কাছে উত্তম।'[১১২]

হুজুর স. আরো বলেছেন, 'হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যাক্তিই ঈমানের পরিপূর্ণ মুসলমান। তোমাদের মধ্যে তারাই উত্তম, যারা নিজেদের স্ত্রীর কাছে উত্তম।'[১১৩]

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, 'হাকিম ইবনে মুয়াবিয়া আল কুশাইরী (র.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ (স.), আমাদের কাছে আমাদের স্ত্রীদের কি কি প্রাপ্য আছে? হুজুর (স.) উত্তরে বললেন, তুমি যখন খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, তুমি যখন কাপড় পরবে তখন তাকেও কাপড় পরাবে। তার মুখ মন্ডলে আঘাত বা প্রহার করবে না। তার সাথে বিরক্তিকর ব্যবহার করবেনা বা তার দোষ খুঁজে বেড়াবে না। যদি আদব কায়দা শিক্ষা দেবার জন্য সাময়িকভাবে তার সঙ্গ ত্যাগ করতে হয় তবে তাকে ঘরে রেখেই তা করবে।'[১১৪] পবিত্র কুরআন শরীফে ইরশাদ হচ্ছে, 'নারীরা তোমাদের পোশাক পরিচ্ছেদ আর তোমরা নারীদের পোষাক পরিচ্ছেদ।'[১১৫]

---

১০৭ ইমাম নাসায়ী, *সুনানু নাসায়ী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৬, হাদীস নং- ৩২৩৪

১০৮ ইমাম ইবনে মাজা, *সুনান ইবনে মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬১, হাদীস নং- ১৮৫৭

১০৯ আল কুরআন, ২ : ২২৮

১১০ আল কুরআন, ৪ : ১৯

১১১ ইমাম ইবনে মাজা, *সুনান ইবনে মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১২, হাদীস নং- ১৯৭৭। ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪৪, হাদীস নং- ১১৬৩

১১২ ইমাম ইবনে মাজা, *সুনান ইবনে মাজা*, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৪১২, হাদীস নং- ১৯৭৮

১১৩ ইমাম তিরমিযী, অনুবাদ ও সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুসা, *জামে আত-তিরমিযী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর: ১৯৯৬), খ. ২, পৃ. ৩২৭, হাদীস নং- ১১০০

১১৪ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবু দাউদ* (ঢাকা: ই, ফা, বা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯২, দ্বিতীয় সংস্করণ: ২০০৬), খ. ৩, পৃ. ১৫৬, হাদীস নং- ২১৩৯

১১৫ আল কুরআন, ২ : ১৮৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল (স.) বলেছেন, দুনিয়া উপভোগের উপকরণ (ভোগ্যপণ্য) এবং দুনিয়ার উত্তম উপভোগ্য উপকরণ, পূণ্যবতী নারী (স্ত্রী)।'[১১৬] স্ত্রীদের বিষয়ে আরও একটি হাদীসে রাসুল (স.), 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, কোন মুমিন পুরুষ, কোন মু'মিন নারীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে পারবে না; (কেননা) তার কোন চরিত্রকে (অভ্যাস) অপছন্দ করলে, তার অন্য কোন চরিত্র (অভ্যাসটি) সে পছন্দ করবে...। কিংবা এ ধরনের অন্য কিছু বলেছেন।'[১১৭]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুল (স.) বলেন, মুমিনদের মাঝে ঈমানে সেই পরিপূর্ণ তাদের মাঝে যার চরিত্র সুন্দরতম, তোমাদের মাঝে উত্তম হলো তারা, যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে উত্তম।'[১১৮]

এখানে প্রেম ভালোবাসা ও পবিত্রতা রক্ষায় নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদা দান করা হয়েছে। রাসুল (স.) বিদায় হজ্জের ভাষনে বিশেষ গুরুত্বসহকারে নারীদের অধিকার সম্পর্কে পুরুষদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা স্ত্রী লোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করে চলবে। তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ আল্লাহর নামে এবং এভাবেই তাদের হালাল মনে করে তোমরা তাদের উপভোগ করেছ।'[১১৯]

হুজুর (স.) আরো বলেছেন, 'একবার হযরত উমর (রা.) রাসুল (স.) কে প্রশ্ন করেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ আমরা কোন সম্পদ সঞ্চয় করবো? রাসুল (স.) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন অর্জন করে, কৃতজ্ঞ আত্মা, জিকরকারী জিহ্বা এবং আখিরাতের কাজে সহায়তাকারী ঈমানদার স্ত্রী।'[১২০] অন্য এক যায়গায় হুজুর (স.) ইরশাদ করেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেন, গোটা দুনিয়াই হলো সম্পদ। আর দুনিয়ার মধ্যে পূণ্যবতী স্ত্রী লোকের চাইতে অধিক উত্তম কোন সম্পদ নাই।'[১২১]

রাসুল (স.) এর কাছে তিনটি জিনিস প্রিয়। এর মধ্যে রয়েছে নারীও। 'হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, পার্থিব বস্তুর মধ্যে স্ত্রী ও সুগন্ধি আমার নিকট পছন্দনীয় এবং নামাজ হচ্ছে আমার নয়নের প্রশান্তি।'[১২২] স্ত্রীদের অধিকার নিয়ে আরেকটি হাদীসে রাসুল (স.) বলেন, 'সাবধান, তোমাদের স্ত্রীদের ওপর, তোমাদের হক রয়েছে। আর তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের ওপর হক রয়েছে। স্ত্রীদের ওপর তোমাদের হক হলো, যাদের তোমরা অপছন্দ করো, তাদের তোমাদের ঘরে স্থান দেবে না। অথবা, যাদের তোমরা অপছন্দ কর, তাদের গৃহে অনুমতি দেবে না। শোন, তোমাদের ওপর স্ত্রীদের হক হলো, তাদের খোর-পোষের ক্ষেত্রে তাদের প্রতি উত্তম আচরণ করবে।'[১২৩]

আবার অন্যত্র বলেছেন, 'পুরুষ যখন স্ত্রী গ্রহণ করে তখন তার অর্ধেক ঈমান পূর্ণ হয়, অতঃপর বাকী অর্ধেক ঈমান রক্ষার জন্য আল্লাহকে ভয় করা দরকার।' এছাড়াও উচ্চ মর্যাদাশালী নারীকে কোন কোন জায়গায় পুরুষের উপরেও স্থান দেয়া হয়েছে।

যেমন কুরআন পাকে মারিয়াম আঃ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলতে গিয়ে বলেন, 'এবং পুরুষ নারীর সমান নয়।' অর্থাৎ সব পুরুষ সব নারীর সমান নয়, বরং কোন কোন নারীর চেয়ে পুরুষ আরো নিম্নমানের আছে।

মুসলিম ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে নারী

মুসলিম ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে মুসলিম নারীর অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক-

---

১১৬ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা: ই ফা বা, জুন, ২০০৩), খ. ৪, পৃ. ৩৪৯, হাদীস নং- ৩৫০৭

১১৭ প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৫১, হাদীস নং- ৩৫১২

১১৮ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪৪, হাদীস নং- ১১৬৩

১১৯ ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৮৯, হাদীস নং- ২৮১৭

১২০ ইমাম ইবনে মাজা, *সুনান ইবনে মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬০, হাদীস নং- ১৮৫৬

১২১ প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ.৩৬০, হাদীস নং- ১৮৫৫

১২২ ইমাম নাসায়ী, *সুনানু নাসায়ী শরীফ* (ঢাকা: ই ফা বা, প্রকাশকাল: জুন ২০০৪), খ. ৪, প. ১৭৯, হাদীস নং- ৩৯৪৩ (নাসায়ী শরীফের পরের হাদীসটিও অনুরূপ)।

১২৩ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪৩, হাদীস নং- ১১৬১

Dhaka University Institutional Repository

(ক) উত্থান যুগে

ইসলাম প্রদত্ত এই সর্বাত্মক ও মৌলিক সংস্কারকামী নীতিমালার আলোকে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যেখানে নারী পূর্ণ যোগ্যতা ও অধিকার সম্পন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে সম্মানিত ও সমাদৃত হয়, যেখানে নারী স্ত্রী হিসেবে এবং সর্বজন মান্য মানুষ প্রস্তুতকারী মহীয়সী জননী হিসেবে সমাজের কাছ থেকে যথার্থ মর্যাদা ও সমাদর লাভ করে এবং যেখানে পর পুরুষের সাথে অবাধ ও সন্দেহজনক মেলামেশার সুযোগ না থাকায় নারীকে অপবাদ, অপমান ও কলংকের বোঝা বইতে হয় না।

সে সমাজে একমাত্র ইবাদতের স্থানসমূহে, জ্ঞান চর্চার মজলিস ও অনুষ্ঠান সমুহে এবং যুদ্ধের ময়দানসমূহে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী সময়ের জন্য নারী ও পুরুষের একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু এসব স্থানেও নারীদের জন্য পৃথক বৈঠক, গাম্ভীর্যপূর্ণ পোশাক ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীর পরিবেশ বিরাজমান থাকায় কোন লোলুপ চাহনি তাদেরকে বিব্রত করে না, কিংবা কারো অসংযত আচরন তাদেরকে পীড়া দেয় না। সেখানে কোন নারী যখন পুরুষদের সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করে,তখন পুরুষরা লজ্জার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয়। কোন নারী যখন কোথাও আসন গ্রহন করে, তখন পুরুষরা তার কাছ থেকে সরে দাড়ায় এবং কোন নারী যখন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে, তখন তার প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হয়।

ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রের নারী সংক্রান্ত নীতিমালায় মাযহাবি মতভেদ যতই পরিলক্ষিত হোক, তার মূল রুপ সর্বযুগে একই রকম থেকেছে। কেননা আল্লাহর কিতাবে, রাসুলের (স.) হাদীসে এবং রাসুল (স.), সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের পরবর্তী অনুসারীদের বাস্তব অনুশীলনে ও কর্মধারায় এই নীতিমালা সর্বদাই সচ্ছ ও স্পষ্টভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

(খ) পতন যুগে

এরপর ক্রমাগত মুসলিম সভ্যতার বিকাশ ও সম্প্রসারণ এবং মুসলিম দেশসমুহের রীতিনীতি ও আচার আচরনে বিবর্তন ঘটতে থাকায় নারীকে পরিবর্তিত যুগ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কখনো তার অধিকার ও মর্যাদা রক্ষিত হয়, আবার কখনো তা হয় অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার। সর্বশেষে নারী এমন এক পতনের যুগে পদার্পন করে,[১২৪] যখন তার অধিকার ও মর্যাদা অনেকাংশে ভূলুণ্ঠিত হয় এবং সে চরম অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হয়। ফলে ইসলাম নারীর উপর যে সামাজিক দায়িত্ব অর্পন করেছিল, তা পালনে সে একেবারেই অক্ষম হয়ে পড়ে।

এতদসত্তেও আমরা ইতিহাসকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, এই তমসাচ্ছন্ন যুগেও দুটি জিনিস অবিক্রিতভাবে বহাল ছিল-

প্রথমত: ইসলাম নারীর যে অধিকারসমূহ নির্ধারিত করে দিয়েছিল, তা মুসলিম ফকিহদের প্রণীত গ্রন্থসমূহে অবিক্রিতভাবে বহাল ছিল। যদিও সমকালীন সমাজ তার বেশির ভাগকেই কার্যকরী রাখতে সক্ষম হয়নি। এর কারণ এই যে, মুসলিম নারী ইসলামী সমাজে যে অধিকারগুলো পেয়েছে ও ভোগ করেছে, তা ছিল স্বয়ং আল্লাহর শাশ্বত আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকার, যাকে বিকৃত বা পরিবর্তিত করার অধিকার ও ক্ষমতা কারো ছিল না, সে যত ক্ষমতাশালী ব্যক্তিই হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত: মুসলিম নারীর সচ্চরিত্রতার সুনাম এবং তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনের অভ্যাস। এই পতনের যুগেও অটুট ও অক্ষত্ব ছিল। পতন যুগে মুসলিম সমাজ যত বিকৃতি, অধঃপতন ও নৈরাজ্যেরই শিকার হোক না কেন, তার নারী সমাজের এ উজ্জল বৈশিষ্টটি কখনও কালিমালিপ্ত হয়নি। আর এই বৈশিষ্ট মুসলিম নারীকে পাশ্চাত্যের

[১২৪] ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং- ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

লেখকদের কাছে ঈর্ষার পাত্রে পরিণত করেছে। এ কারণে তারা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের উত্থানের সূচনাকাল থেকেই মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ রাখা ও তাদের অবস্থা অনুসন্ধান করা শুরু করেছে।[১২৫]

বস্তুত এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মুসলিম দেশগুলোতে কর্মরত অমুসলিম সংযোগ মাধ্যমগুলো মুসলিম সমাজের ঐতিহ্য ও রীতিনীতিতে নারীর সতীত্ব সুরক্ষা ও তার প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন থেকে বিরত থাকাকে মুসলিম নারীর কৃতিত্ব ও সুখ্যাতির কারণ বলে মেনে নিয়েছে, যা থেকে পাশ্চাত্যের নারী বঞ্চিত। অথচ এই উভয় নারী (মুসলিম নারী ও পাশ্চাত্যের খৃষ্টান নারী) একই ধর্মের (অর্থাৎ ওহীযোগে প্রাপ্ত ধর্মের) অনুসারী। এ কারণেই আমরা আজও সম্ভ্রান্ত খৃষ্টান পরিবার সমূহের নারীর সতীত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মানসিকতা দেখতে পাই- যদিও তাদের ও আমাদের ঐতিহ্য, নৈতিকতা ও রীতিনীতিতে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

ইসলামে নারীর মর্যাদার বিষয়ে পাশ্চাত্যের আগ্রহ

সভ্যতার নানান উত্থান-পতনেও যখন দেখা যাচ্ছে যে ইসলামে নির্ধারিত নারীর মর্যাদা এবং তাদের অধিকারসমূহ এখনও অটুট এবং নিরঙ্কুশ, তখন পাশ্চাত্যে এ নিয়ে তৈরী হয়েছে প্রবল আগ্রহ। পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষিরা যখন ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রমান করার চেষ্টা করছে যে, ইসলামই নারীকে পশ্চাদপদ করে দিয়েছে, ইসলামই নারীর অগ্রযাত্রা এবং উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়, তখন দেখা যাচ্ছে পাশ্চাত্যের মানুষের মধ্যে ইসলাম নিয়ে প্রচণ্ড আগ্রহ। ব্যাপক নেতিবাচক প্রচারণা সত্ত্বেও তারা ইসলাম এবং আল কুরআন অধ্যয়ন করা শুরু করে দিয়েছে এবং ইসলামের ছায়াতলে এসে সামিল হচ্ছেন। তেমনই একজন ইউরোপীয় জাঁদরেল মহিলা সাংবাদিক আইভান রাইডলি। কাজ করতেন বৃটিশ বিখ্যাত পত্রিকা ডেইলি মিরর-এ। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ২০০১ সালে যখন আফগানিস্তানে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে, তখন আইভান আফগানিস্তান সফরে যান সেখানকার যুদ্ধের ভয়াবহতা বিশ্বের কাছে তুলে ধরার জন্য। কিন্তু তালেবানরা তাকে মার্কিনীদের পক্ষে গুপ্তচরের অভিযোগে গ্রেফতার করে। এরপর মার্কিন সেনারা আফগানিস্তান দখল করার পর রাইডলিকে মুক্ত করে। মুক্ত রাইডলি ফিরে যান ব্রিটেনে।

অন্যদের চেয়ে বেশি গির্জায় যেতেন বলে রাইডলিকে অনেকেই গোঁড়া খৃষ্টান মনে করতেন। সেই গোঁড়া খৃষ্টান থাকা অবস্থাতেই ইসলাম এবং আল কুরআন নিয়ে অধ্যয়ন শুরু করেন তিনি। রাইডলি জানান, 'এই পথে গবেষণা করতে গিয়ে খুব শিগগিরই আধ্যাত্মিক সফরে যাওয়ার সুযোগ পাই। এ প্রক্রিয়ায় ত্রিশ মাসেরও বেশি সময় লেগেছে।' এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামকে ধর্ম হিসেবে বেছে নেন তিনি। অনেকেই এ খবরটি হজম করতে পারেননি। ইসলাম নিয়ে গবেষণা শেষ করার পর রাইডলি নিজের মধ্যে অবিশ্বাস্য মাত্রায় আধ্যাত্মিক ও মানসিক শক্তি অনুভব করতেন। কারণ, গবেষণার মাধ্যমে তিনি যে সব সত্য উদঘাটন করেন তা তার ওপর বিস্ময়কর প্রভাব ফেলেছিল। ইসলামের যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করেছিল রাইডলিকে, সেটা হলো- নারী অধিকার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। নারীর মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অন্য অনেক মানুষেরমত রাইডলিকেও ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে। তিনি এটা উপলব্ধি করেন যে, অপমানিত ও বন্দিনী নারী সমাজের জন্য ইসলাম আবির্ভূত হয়েছে মুক্তিদাতা বা ত্রাণকর্তা হিসেবে। ইসলামের ছায়াতলে নারী এটা অনুভব করতে সক্ষম হয় যে, নারী এক সম্মানিত সত্তা যার রয়েছে জীবনের অধিকার, মালিকানার বা নিজস্ব সম্পদের অধিকার, সম্মান ও মর্যাদা।

মিশরীয় চিন্তাবিদ এবং মুজতাহিদ সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ এ প্রসঙ্গে বলেন, ইসলামের পক্ষ থেকে নারী যদি মর্যাদা না পেত তাহলে নারী তার প্রকৃত পরিচিতি অর্জন করতে সক্ষম হত না। ইসলাম যথাযোগ্য পন্থায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষকেই মর্যাদা দিয়েছে।' ইসলামে নারীর মর্যাদা রাইডলিকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। তার মতে, কুরআন নারীর নিন্দা জানায়নি এবং তাকে মজলুম বা অসহায়ও করেনি। বরং আল্লাহ কুরআনে তাদের স্বাধীনতার কথা ও সমান অধিকার বা সমতার কথা উল্লেখ করেছেন। জ্ঞান অর্জনসহ মানুষ হিসেবে সব অধিকার

[১২৫] ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী, *ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

পুরুষের মত নারীরও প্রাপ্য। তিনি বলেছেন, 'আমি ইসলামে তালাক ও সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সম্পর্কে গবেষণা করে দেখলাম, এসব বিধান এতটা উন্নত যে মনে হয় এইমাত্র কোনো পারিবারিক আদালতে এসব আইন অনুমোদিত হয়েছে।'

অবিশ্বাস্য ব্যাপার হল ইসলাম ঘরে থাকা মহিলাদেরকে ব্যাপক অধিকার দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে ঘরে কাজ করতে পারেন বা নাও করতে পারেন। ইসলাম এভাবে ঘরের নারীকে ও ঘরের শিশুদের লালন ও শিক্ষাদানকারী মহিলাদের প্রভূত সম্মান দিয়েছে। অথচ আমি যখন পাশ্চাত্যের কোনো কোনো মহিলাকে প্রশ্ন করি যে তারা কি করেন? তখন তারা লজ্জায় মাথা নিচু করে বলেন: আমি গৃহিণী বা গৃহবধু। অথচ ইসলাম ঘরের কাজে নারীর উপস্থিতিকে উচ্চ মর্যাদা দেয়। ইসলাম সম্পর্কে যতই তথ্য পাচ্ছিলাম ততই এর সত্যতা ও যৌক্তিকতা আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল।'

অন্য যে কোনো নও-মুসলিম মহিলার মত ব্রিটিশ নও-মুসলিমা আইভান রাইডলিও হিজাবের বলিষ্ঠ সমর্থক। তিনি বলেছেন, 'পাশ্চাত্য হিজাবকে জুলুম ও দমন-পীড়নের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরছে। অথচ আমি এখন অন্যদের চেয়েও এটা বেশি জানি যে হিজাব নারীকে বরং স্বাধীনতা ও শক্তি যোগায়। আমি যখন হিজাব পরে পথে-ঘাটে চলাফেরা করি তখন নিজেকে শক্তিমান মনে করি। হিজাবকে নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেন। কেউ কেউ বলেন, হিজাবধারী মহিলারা আসলে নিজেকে প্রকাশ করতে ভয় পান, তাদের আত্মবিশ্বাস নেই ইত্যাদি। আমার মত এর ঠিক উল্টো। হিজাবধারী মহিলারাই অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এটা বোঝাতে চান যে, তারা মুসলিম নারী। হিজাব আমার জীবনে ও বিশেষ করে আমার নিরাপত্তা রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। হিজাবের অশ্রয়ে আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করি।'[১২৬]

ইসলামে নারীর মর্যাদা রাইডলিকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছে। তার মতে কুরআন নারীর নিন্দা জানায়নি এবং তাকে মজলুম বা অসহায় করেনি। বরং আল্লাহ কুরআনে তাদের স্বাধীনতার কথা ও সমান অধিকার বা সমতার কথা উল্লেখ করেছেন। জ্ঞান অর্জনসহ মানুষ হিসেবে সব অধিকার পুরুষের মত নারীরও প্রাপ্য। রাইডলি বলেছেন, 'আমি ইসলামে তালাক ও সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার সম্পর্কে গবেষণা করে দেখলাম, এসব বিধান এতটা উন্নত যে মনে হয়, এইমাত্র কোনো পারিবারিক আদালতে এসব আইন অনুমোদিত হয়েছে। বহু আইনজীবী তাদের অধিকার বা দাবি প্রমাণের জন্য ইসলামের সামাজিক আইন থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে থাকেন। আরো অবিশ্বাস্য ব্যাপার হল ইসলাম ঘরে থাকা মহিলাদেরকে ব্যাপক অধিকার দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে ঘরে কাজ করতে পারেন বা নাও করতে পারেন। ইসলাম এভাবে ঘরের নারীকে ও ঘরের শিশুদের লালন ও শিক্ষাদানকারী মহিলাদের প্রভূত সম্মান দিয়েছে। অথচ আমি যখন পাশ্চাত্যের কোনো কোনো মহিলাকে প্রশ্ন করি যে, তারা কি করেন তখন তারা লজ্জায় মাথা নিচু করে বলেন: আমি গৃহিণী বা গৃহবধূ। অথচ ইসলাম ঘরের কাজে নারীর উপস্থিতিকে উচ্চ মর্যাদা দেয়। ইসলাম সম্পর্কে যতই তথ্য পাচ্ছিলাম ততই এর সত্যতা ও যৌক্তিকতা আমার কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল।'[১২৭]

রেডিও তেহরানের বাংলা সাইটে প্রকাশিত একই নিবন্ধে মিশরীয় চিন্তাবিদ সাইয়্যেদ কুতুব-এর একটি মন্তব্য দেয়া হয়েছে। ইসলামে নারীর মর্যাদা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ইসলামের পক্ষ থেকে নারী যদি মর্যাদা না পেত তাহলে নারী তার প্রকৃত পরিচিতি অর্জন করতে সক্ষম হত না। ইসলাম যথাযোগ্য পন্থায় নারী–পুরুষ নির্বিশেষে সব মানুষকেই শ্রদ্ধা করেছে এবং আল্লাহর ফুঁকে দেয়া রুহ বহনকারী মানুষকে উচ্চ মর্যাদায় আসীন করেছে। আর এভাবেই নারী তার প্রকৃত সম্মান ফিরে পেয়েছে।'[১২৮]

---

[১২৬] http://parstoday.com/bn/news/world-i14239, Visited on 11 July, 2016

[১২৭] প্রাগুক্ত

[১২৮] প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ নারী নির্যাতনের বৈশ্বিক চিত্র

জাতিসংঘের মহিলা বিষয়ক কার্যক্রম 'ইউএন ওমেন অ্যাফেয়ার্স' কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ (২০১৪) প্রতিবেদনে নারী নির্যাতনের বৈশ্বিক চিত্র ফুটে উঠেছে। জাতিসংঘের মহিলা বিষয়ক ইউএন ওমেন অ্যাফেয়ার্সের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে[১২৯] 'Facts and Figures: Ending Violence against Women' শিরোনামে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে পয়েন্ট আকারে বিশ্বব্যাপি নারী নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রকাশিত বৈশ্বিক নারী নির্যাতনের চিত্রগুলো তুলে ধরা হলো...

১. ২০১৩ সালের বিশ্বব্যাপি পরিচালিত নানা জরিপ ও সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যে জানা যায়, বিশ্বব্যাপি ৩৫ ভাগ নারী নিজ সঙ্গী কিংবা অন্যের দ্বারা শারিরীক কিংবা যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এমনকি বেশ কিছু রাষ্ট্রের নির্যাতনের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, ৭০ ভাগ পর্যন্ত নারী তাদের জীবনের কোন না কোন সময়ে নিজের সঙ্গী কিংবা অন্য কারও দ্বারা শারিরীক কিংবা যৌন নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন। (According to a 2013 global review of available data, 35 per cent of women worldwide have experienced either physical and/or sexual intimate partner violence or non-partner sexual violence. However, some national violence studies show that up to 70 per cent of women have experienced physical and/or sexual violence in their lifetime from an intimate partner).

২. অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইজরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশগুলোতে প্রায় ৪০ থেকে ৭০ ভাগ নারী হত্যার শিকার হন তাদের একান্ত পুরুষসঙ্গীর দ্বারা। (In Australia, Canada, Israel, South Africa and the United States, intimate partner violence accounts for between 40 and 70 per cent of female murder victims)

৩. বিশ্বব্যাপি প্রায় ৬৪ মিলিয়ন (প্রায় ৬ কোটি ৪০ লাখ) কন্যাশিশু বাল্যবিবাহের শিকার। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় ২০-২৪ বছর বয়সী বিবাহিত নারীর পরিমান ৪৬ ভাগ, পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকায় ৪১ ভাগ নারীর বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই। বাল্য বিবাহের কারণে অপরিনত বয়সেই অনাকাংখিত গর্ভধারণ করতে বাধ্য হন নারীরা। যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জীবন নাশের আশংকা দেখা দেয়। বিশ্বব্যাপি ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী নারীদের মৃত্যুর প্রধান কারণ হিসেবে দেখা যায় গর্ভধারন সম্পর্কিত জটিলতাকে। (More than 64 million girls worldwide are child brides, with 46 per cent of women aged 20–24 in South Asia and 41 per cent in West and Central Africa reporting that they married before the age of 18. Child marriage resulting in early and unwanted pregnancies poses life-threatening risks for adolescent girls; worldwide, pregnancy-related complications are the leading cause of death for 15-to-19-year-old girls).

৪. বিশ্বব্যাপি প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ মেয়ে কিংবা নারীকেই দেখা যায় তাদের যৌনাঙ্গের সমস্যায় ভুগতে। হয় সেখানে কোন আঘাত করা হয়েছে কিংবা কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। (Approximately 140 million girls and women in the world have suffered female genital mutilation/cutting).

৫. বিভিন্ন জরিপে উঠে এসেছে, এই আধুনিক যুগেও বিশ্বব্যাপি লক্ষ লক্ষ নারী এবং মেয়ে শিশু দাস-দাসির ন্যায় জীবন-যাপন করছে। বিশ্বব্যাপি জোরপূর্বক প্রায় ২ কোটি ৯ লাখ মানুষকে বিভিন্ন অমানবিক কাজে বাধ্য করা হয়। এর মধ্যে ৫৫ শতাংশই হলো নারী কিংবা মেয়ে শিশু। এছাড়া প্রতি বছর বিশ্বব্যাপি প্রায় ৪৫ লাখ মানুষ যৌন হেনস্তার শিকার হয়। যাদের ৯৮ ভাগই হচ্ছে নারী ও নারি শিশু। (Trafficking ensnare millions of women and girls in modern-day slavery. Women and girls represent

[১২৯] http://www.unwomen.org/en ,Visited on 10 November, 2015

Dhaka University Institutional Repository

55 per cent of the estimated 20.9 million victims of forced labour worldwide, and 98 per cent of the estimated 4.5 million forced into sexual exploitation).

৬. যুদ্ধ-বিগ্রহে নারী ধর্ষন তো নিয়মিত ঘটনা। কোনভাবেই এটাকে রোদ করা সম্ভব নয়। একটি পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বসনিয়া-হার্জেগোভিনা যুদ্ধে অন্তত ২০ থেকে ৫০ হাজার নারী ধর্ষনের শিকার হয়েছেন। একই সময় (১৯৯৪ সালে) আফ্রিকার রুয়ান্ডায় গণহত্যা চলাকালে প্রায় আড়াই থেকে পাঁচ লাখ নারী এবং মেয়ে শিশু লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। (Rape has been a rampant tactic in modern wars. Conservative estimates suggest that 20,000 to 50,000 women were raped during the 1992–1995 war in Bosnia and Herzegovina, while approximately 250,000 to 500,000 women and girls were targeted in the 1994 Rwandan genocide).

৭. ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতেও কর্মক্ষেত্রে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ নারী অনাকাংখিত যৌন হয়রানি, শারীরিক নির্যাতন কিংবা অন্য যে কোন উপায়ে যৌন নির্যাতনের মুখোমুখি হন। (Between 40 and 50 per cent of women in European Union countries experience unwanted sexual advances, physical contact or other forms of sexual harassment at work).

৮. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য দেশে স্কুলেই ১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী মেয়েরা যৌন হয়রানি কিংবা এ ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখিন হন। (In the United States, 83 per cent of girls aged 12 to 16 have experienced some form of sexual harassment in public schools.)

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নারী নির্যাতনের ইতিবৃত্ত

- প্রথম পরিচ্ছেদ : নারী নির্যাতন কী?
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইতিহাস
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নারী নির্যাতনের ধরনসমূহ
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ : পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন রূপে যৌন নির্যাতন
- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : নারীর প্রতি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস
- সপ্তম পরিচ্ছেদ : নারী নির্যাতনের কারণসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
নারী নির্যাতনের ইতিবৃত্ত

নারী নির্যাতন, অথ্যাৎ নারীর প্রতি সহিংসতা এমন একটি পরিভাষা যা সামষ্টিকভাবে নারীর প্রতি সহিংসতাকে যে কোনো স্তরে নির্দেশ করে। কিছু সময় একে ঘৃণ্য অপরাধ হিসেবেও দেখা হয়।[১] এ ধরণের সহিংসতা একটি বিশেষ দলের দ্বারা সংঘঠিত হয়। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা মানে এমন কাজ যা নারীর উপর সহিংসতাকে প্রকাশ করে কারণ তারা নারী, আর এটা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর কারণেই।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ নারী নির্যাতন কী?

ইংরেজিতে oppression এবং violence দুটি শব্দ আছে। শব্দ দুটি বুঝাতে বাংলায় নির্যাতন শব্দটি ব্যবহৃত হয়। নির্যাতন দৈহিক হতে পারে বা মানসিক হতে পারে। কাউকে দৈহিক কষ্ট দেওয়া, কাউকে প্রহার করা কিংবা কাউকে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া, কাউকে পদে পদে খোঁটা দেওয়া সবই নির্যাতন।[২]

তবে সাধারণ অর্থ অনেকের পছন্দ নয়। তারা আরও একটু গভীর দিক থেকে এর সজ্ঞা চাইতে পারেন। এমনি একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন বিখ্যাত সাইকিয়াস্ট্রিক এবং সাইকোএনালিস্ট ড. এফ জে হ্যাকার। তার মতে নির্যাতন বলতে বুঝায়, 'ভীতি প্রদর্শন ও ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা।' (To frighten, and by frightening, o dominate and control- Ferederick F Hacker Cruseders Criminals and Crazis: Terrorism in our time)।[৩]

উপরোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে, নির্যাতন কেবলমাত্র মারধোর বা খোঁটাদানে সীমাবদ্ধ নয়; নির্যাতনের পরিধি বহু ব্যাপক। নির্যাতনের নানা রূপ। কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বা শ্রেনীর উপর নির্যাতন সংঘটিত হয়; যখন–

১. ওই ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা শ্রেণী অপরের স্বার্থে, অন্যের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য কাজ করতে বাধ্য হয় এবং তাকে নিজের শ্রমের ফসল নিজে ভোগ করতে বা ব্যবহার ও বিতরণ করতে দেওয়া হয় না।
২. নিজ দেহের ওপর নিয়ন্ত্রণ, জীবন ও জীবিকার ওপর নিয়ন্ত্রণ, নীতি নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, পছন্দ-অপছন্দের স্বাধীনতা, এসব কিছুই ওই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেনীর থাকে না।
৩. ওই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেনীকে অন্য ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেনীর চেয়ে সামাজিক তথা সাংস্কৃতিকভাবে নীচ ও নিকৃষ্ট মনে করা হয়।
৪. ওই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেনীকে সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না।
৫. ওই ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেনী শারীরিক, দৈহিক ও মানসিক আক্রমণের শিকার হয়।

নির্যাতনের উপরোক্ত ৫টি রূপ পাঁচটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা হয়–

ক) মতাদর্শ (Ideology): নির্যাতনের সমর্থনে আদর্শের যুক্তি খাড়া করা হয়। ছাত্রের ভবিষ্যৎ কল্যাণ হবে এই আদর্শের যুক্তিতে আমাদের দেশে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র পেটানোর ঐতিহ্য চলে আসছে।
খ) প্রচারণা (Propaganda): প্রচারণা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা কথন। নির্যাতনের সপক্ষে যে আদর্শ দাঁড় করানো হয়, প্রচারণার মাধ্যমে তা জনগনের গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির গোয়েবলস প্রচারণার দ্বারা মিথ্যাকে সত্যরূপে উপস্থাপন করেছিলেন।

---

১ Marguerite Angelari, *Hate Crime Statutes: A Promising Tool for Fighting Violence Against Women*, in Gender and American Law, Sereies Editor: Karen J. Maschke (New York and London, Garland Publishing, Inc, 1997), p. 405.

২ মাহমুদা ইসলাম, *নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন* (ঢাকা: জে কে প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০২, দ্বিতীয় সংস্করণ: মে ২০০৫), পৃ. ২৩

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

গ) বাছবিচারহীনতা (indiscriminate) এবং অ-নৈতিকতা (amoral): নির্যাতন সাধারণত নির্বিচারে চালানো হয়। ন্যায়-অন্যায় ভেদাভেদ করা হয় না। বস্তুত কোন ন্যায়বোধ থাকে না। বরং মনে করা হয় যে, নির্যাতন কোন খারাপ কাজ নয়।

ঘ) স্বেচ্ছাপ্রনোদিত মান্যতা (voluntary compliance) : নির্যাতনের মূল লক্ষ্য, নির্যাতিতকে আদেশ মানতে এবং নির্যাতনকারীর নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করতে বাধ্য করা। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, নির্যাতনের ভয়ে নির্যাতিত স্বেচ্ছায় নিজে থেকেই কথা শুনতে ও বশ্যতা স্বীকার করতে উদ্যেগী হবে। তখন আর মারপিটের অথ্যাৎ নির্যাতনের দরকার হবে না। কারণ নির্যাতন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে পারে না। নির্যাতন সত্বেও নির্যাতিত যদি পথে না আসে, তাহলে নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে এবং বশে আনা সম্ভব নাও হতে পারে।

ঙ) নির্যাতনকারী ও নির্যাতিতের প্রতি সমাজের মনোভাব: শুরুতে বলা হয়েছে, নির্যাতনের দুটি পক্ষ থাকে নির্যাতনকারী ও নির্যাতিত। পক্ষ দুটিকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। নির্যাতিত নির্যাতন সয়ে চুপ করে থাকবে– নির্যাতনকে আত্মস্থ করে নেবে, প্রতিবাদ করবে না। কিন্তু নির্যাতিত যদি নির্যাতন মেনে না নিয়ে প্রতিহত করে এবং প্রতি আক্রমণ করে, তবে নির্যাতনের মতাদর্শ ও যুক্তি বিধ্বস্ত হয়ে পড়বে এবং নির্যাতনকারী ও নির্যাতিতকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা যাবে না।[৪]

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে জাতিসংঘের দেয়া বিবৃতিতে বলা হয়, 'ঐতিহাসিকভাবে নারী এবং পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার অসামঞ্জস্যতার কারণেই নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা ঘটে। আর এটা সমাজের অনেকগুলো কঠিন বাস্তবতার ভেতর একটি যেখানে নারীদের পুরুষের তুলনায় নিচু করে দেখা হয়।' ("violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between men and women" and that "violence against women is one of the crucial social mechanisms by which women are forced into a subordinate position compared with men.")[৫]

১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপসংক্রান্ত একটি বিলে উল্লেখ করা হয়েছিল, 'যে কোনো ধরনের কাজ, যা নারীর দৈহিক বা মানসিক ক্ষতির কারণ হয়, অথবা সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনে নারীর স্বাধীনতাকে হরণ করে, তা-ই নারীর প্রতি সহিংসতা।'[৬]

জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান ২০০৬ সালে এক বিবৃতিতে জানিয়েছিলেন যে, 'নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা আনুপাতিক হারে গোটা বিশ্বের সমস্যা। অন্ততঃ পৃথিবীর প্রতি তিনজন নারীর মধ্যে একজন শারীরিক নির্যাতন, যৌন নিগ্রহ অথবা ওই নিগৃহকারীর সঙ্গেই তাকে সারাজীবন থাকতে হয়।'[৭]

নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বিভিন্ন বিস্তারিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একেবারে ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত এই সহিংসতার ঘটনা ঘটে। কিছু অপরাধী নারীকে ধর্ষণ, পরিবারে সহিংসতা, যৌন হয়রানি, গর্ভনিরোধক ব্যবহার না করা, জন্মপূর্ব যৌন নির্বাচন, সংঘবদ্ধ সহিংসতাসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর রীতি এবং ঐতিহাসিক কুৎসিত চর্চার ভেতর দিয়ে যায়। পাশাপাশি সম্মানের কারণে হত্যা, যৌতুকের কারণে অত্যাচার, নারী যৌনাঙ্গ ছেদ, জোরপূর্বক বিবাহ ইত্যাদিও ক্রমাগত ঘটছে। কিছু ধরনের সহিংসতার জন্য দায়ী রাষ্ট্র। যেমন; যুদ্ধকালীন ধর্ষণ, যৌন দাস, জোরপূর্বক নির্বীজ, গর্ভপাত, পুলিশ বা সেনাবাহিনী কর্তৃক সহিংসতা ইত্যাদি। এর

---

৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩ ও ২৪

৫ United Nations General Assembly: UN Documents, 1993, "*A/RES/48/104 - Declaration on the Elimination of Violence against Women"*, http://www.un-documents.net/a48r104.htm , Visited 25 July, 2015

৬ http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards, Visited on 25 July, 2015

৭ Azad Moradian, *"Domestic Violence against Single and Married Women in Iranian Society",* (Retrieved from http://iranian.com/main/blog/azad/domestic-violence-against-single-and-married-women-iranian-society.html, 2009), Visited on 25 July

Dhaka University Institutional Repository

বাইরে এক শ্রেনী সংঘবদ্ধভাবেও নারী নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত, যেমন মানবপাচারকারী নেটওয়ার্ক।[৮] ১৯৯৭ সালে দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডব্লিউএইচও) নারীর প্রতি সহিংসতা প্রশ্নে এক গবেষণায় নারীর জীবন চক্রকে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে প্রকাশ করে। এর মধ্যে আছে, ১. প্রাক জন্ম, ২. শৈশব, ৩. বালিকাবস্থা, ৪. কৈশোর এবং ৫. সাবালকত্ব ও বৃদ্ধ।[৯]

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে জাতিসংঘের দেয়া বিবৃতিতে (UN Declaration on the Elimination of Violence against Women) 'নারীর প্রতি সহিংসতা'র সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা যা শারিরীক, যৌন অথবা মানসিক ক্ষতিসাধন কিংবা দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। এরমধ্যে হুমকি দান, বলপ্রয়োগ অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, সেটা ব্যক্তিগত জীবনেই হোক অথবা জনসাধারণের মধ্যেই হোক। এবং সহিংসতার তিনটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। যেমন: পরিবারের মধ্যে ঘটে যাওয়া সহিংসতা, সাধারণ সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতা এবং রাষ্ট্রকর্তৃক সংঘটিত বা উপেক্ষিত। এটা আরো বলে যে, ঐতিহাসিকভাবে নারী এবং পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের অসামঞ্জস্যতার জন্যই নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছে। এবং পারিবারিক নির্যাতনের মধ্যে তিন ধরনের সহিংসতা চিহ্নিত করা গেছে, এমনকি সধারণ সমাজেও যে সহিংসতা হচ্ছে সেখানে ওই তিন ধরনের সহিংসতা সবচেয়ে বেশি হয় এবং একইভাবে রাষ্ট্রীয় সহিংসতার শিকারও হয়ে থাকে নারীরা। এটাকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, "*violence against women is a manifestation of historically unequal power relations between men and women*".[10]

জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলির (ইউএসজিএ) নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক নীতিমালায় নারীর প্রতি সহিংসতাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, 'নারী নির্যাতন হচ্ছে, লৈঙ্গিক সহিংসতার কারণে নারী জনসমক্ষে বা ব্যক্তিগত জীবনে শারীরিক, যৌন বা মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার হলে কিংবা নারীর প্রতি হুমকি প্রদর্শন করাকেও সহিংসতা বলা হবে। ("violence against women" as "*any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or mental harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life*.")[11]

এছাড়াও ১৯৯৩ সালে বর্ণিত নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক সনদে বলা হয়, নারীর প্রতি কোনো বিশেষ ব্যক্তি, সম্প্রদায় থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সহিংসতা হতে পারে। (Also, the 1993 Declaration on the Elimination of Violence Against Women noted that this violence could be perpetrated by assailants of either gender from individual, communal to state levels.)[12]

'লৈঙ্গিক সহিংসতা' বলতে প্রায়শই 'নারীর প্রতি সার্বিক সহিংসতার' কথা বলা হয়। এবং বিএডব্লিউর নিবন্ধে এ বিষয়ে পুনরাবৃত্তি করে বলা হয় যে, নারীর প্রতি সহিংসতার জন্য মূলতই দায়ী পুরুষ। অবশ্য, ১৯৯৩ সালের 'নারীর প্রতি সহিংসতা রহিতকরণ' শীর্ষক বিবৃতিতে বলা হয়, যখন লৈঙ্গিক সহিংসতার কথা বলা হয়, তখন সেটা নারী এবং পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এবং এই বৈষম্যের শেকড় প্রোথিত আছে নারী-পুরুষের অসমতার মধ্যে।[১৩]

---

[৮] E. Prügl, (Director), *Violence against Women*, (Geneva, Switzerland: Gender and International Affairs Class 2013, 25 November), Lecture conducted from The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID).

[৯] http://www.who.int/gender/violence/v4.pdf, visited on 25 July, 2015

[১০] United Nations General Assembly : UN Documents, 1993, প্রাগুক্ত

[১১] প্রাগুক্ত।

[১২] G. Krantz and C. Garcia-Moreno, *Violence against Women*. Journal of Epidemiology and Community Health (London, 59(10), 2005 Oct), p. 818-821

[১৩] http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards, Visited on 13 June, 2015

Dhaka University Institutional Repository

২০০৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে সময়ের প্রাসঙ্গিকতা বিচারে নারী ও কন্যা শিশুর ওপর নির্যাতনের আরও একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়। যেখানে বলা হয়েছে, 'নারী এবং কন্যা (Girl) সন্তানের প্রতি সহিংসতার সংজ্ঞা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নারী ও কন্যাশিশুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা সবচেয়ে বেশি নিয়মানুগ এবং বিস্তৃত। এর মূল হলো সতন্ত্র এবং ক্রমাগত ঘটনার বদলে লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক কাঠামো। এটা বয়স, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ও ভৌগলিক সীমানা জুড়ে বিদ্যমান। সকল সমাজেই এর প্রভাব রয়েছে। আর এগুলোই হলো বৈশ্বিকভাবে এই অসমতা এবং বৈষম্যাবস্থা দূরীকরণের অন্তরায়।'[১৪]

জাতিসংঘ নারীর প্রতি সহিংসতাকে আরেকটু ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে জাতিসংঘ যে, 'লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা যা শারীরীক, যৌন অথবা মানসিক ক্ষতিসাধন কিংবা দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। এরমধ্যে হুমকি দান, বলপ্রয়োগ অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, সেটা ব্যক্তিগত জীবনেই হোক অতবা জনসাধারণের মধ্যেই হোক।'[১৫]

'লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা' এবং 'নারীর প্রতি সহিংসতা' সচরাচর অপরিবর্তিতভাবে সাহিত্যে এবং আইনজীবীরা ব্যবহার করে থাকেন। যাহোক, জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স শব্দগুলো সরাসরি একজন ব্যক্তির প্রতি সহিংসতাকে নির্দেশ করে। কারণ একটি সমাজে অথবা সংস্কৃতিতে পুরুষ বা নারী হোক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স জেন্ডারের সবগুলো দিককেই নির্দেশ করে। অন্যভাষায় বলতে গেলে, নারীর সঙ্গে সম্পর্ক সামাজিকভাবে কিছুটা নিচু করে দেখা হয় এবং এতে করে দুর্বলতা সহিংসতায় রুপ নেয়।

'ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট ওম্যান'-এর মানে হলো, 'লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা যা শারীরীক, যৌন অথবা মানসিক ক্ষতিসাধন কিংবা দুর্ভোগ সৃষ্টি করে। এরমধ্যে হুমকি প্রদান, বলপ্রয়োগ অথবা ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, সেটা ব্যক্তিগত জীবনেই হোক অথবা জনসাধারণের মধ্যেই হোক।' কাউন্সিল অব ইউরোপের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য ২০০২ সালে প্রনয়ণ করা প্রকেক্টিং ওম্যান অ্যাগেইনস্ট ভায়োলেন্স (Protecting women aginst Violence) নামে একটি ঘোষণাপত্র। সেখানেই নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়গুলো বর্ণনা করা হয়েছে। এই ঘোষণাপত্র অনুসারে নারীর প্রতি সহিংসতা নিম্নোক্তগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না–[১৬]

১. পরিবারে শারীরিক, যৌন এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, গৃহপালিত কাজে নিয়োজিত কন্যা শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার, যৌতুকজনিত সহিংসতা, বৈবাহিক ধর্ষণ, নারী যৌনাঙ্গ ছেদ এবং অন্যান্য নারীর জন্য ক্ষতিকর ঐতিহ্যগত চর্চা ইত্যাদি।
২. সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘঠিত শারীরিক, যৌন এবং মানসিক নির্যাতনের মধ্যে ধর্ষণ, যৌন হয়রানি এবং কর্মক্ষেত্রসহ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে হুমকি প্রদান, নারী পাচার এবং জোরপূর্বক যৌনবৃত্তি।
৩. রাষ্ট্র কতৃর্ক সংগঠিত অথবা উপেক্ষিত শারীরিক, যৌন এবং মানসিক নির্যাতন। সেটা যেস্থানেই ঘটুক।
৪. আরো কিছু বিষয় আছে যা বিএডব্লিউ (VAW) নারীর মানবাধিকার ইস্যুতে যুক্ত হয়েছে। সশস্ত্র সংঘর্ষ, বিশেষায়িত হত্যাকাণ্ড, নিয়মতান্ত্রিক ধর্ষণ, যৌনদাসত্ব এবং জোরপূর্বক সন্তানধারণ করা এর অংশ। এছাড়া জোরপূর্বক গর্ভপাত, হুমকি ইত্যাদিও সংযুক্ত।

এই সংজ্ঞাগুলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসন্তোষজনক এবং সমস্যাযুক্ত মনে হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, নারী এবং পুরুষের মধ্যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে 'নারীর প্রতি সহিংসতা' প্রশ্নে সংজ্ঞাগুলো দেয়া হয়েছে। এই সংজ্ঞাগুলোকে সমালোচনা করে অনেকেই বলেন যে, যখন এই সহিংতা বোঝাতে 'জেন্ডার' (Gender) শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন সেটা পুরুষের প্রতিই নির্দেশ করে, একই ক্ষেত্রে যখন 'জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স' বলা হচ্ছে তখন তা নারীকেই নির্দেশ করে। অন্য আরেকটি সমালোচনায় বলা হয়, 'জেন্ডার' হলো সেই

[১৪] http://www.endvawnow.org/en/articles/295-defining-violence-against-women-and-girls.html. Visited on 13 June, 2015

[১৫] United Nations General Assembly : UN Documents, 1993, প্রাগুক্ত

[১৬] https://www.coe.int/t/dg2/equality/domesticviolencecampaign/Source/EN_CDEG_2007_3_complete.pdf, Visited on 13 June, 2015

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষায়িত পন্থা যা সমাজকে হীনমন্যতা এবং অধীনতার দিকে ঠেলে দিতে পারে।[১৭] সুতরাং, এই বিষয়টির এমন কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই যা 'জেন্ডার বেজড ভায়োলেন্স'কে প্রকাশ করে বরঞ্চ এটা নারীদের মধ্যে নারীত্ব বনাম পুরুষত্ব প্রশ্নে অন্তরায় সৃষ্টি করে।[১৮]

স্কটল্যান্ডের সরকার যেভাবে নারীর প্রতি সহিংসতাকে সংজ্ঞায়িত করে: 'আমরা নারীর প্রতি সহিংসতাকে এই মর্মে সংজ্ঞায়ন করি যে, নারী এবং শিশুর প্রতি এমন কোনো কাজ যা সম্মানহানি বা ক্ষতি করে। আর এই ধরনের কাজ মূলতঃ পুরুষেরাই করে থাকে এবং সেখানে নারী এবং শিশুরা হলো প্রধানতম শিকার। নারীর প্রতি ভিন্নধর্মী সহিংসতা যেমন আবেগজনিত, মানসিক, যৌন এবং শারীরীক নির্যাতন এবং বলপ্রয়োগও একই সঙ্গে যুক্ত। লৈঙ্গিক বৈষম্যই এসবের শেকড় তাই একে লৈঙ্গিক সহিংসতা বলা হয়।'[১৯]

এই সংজ্ঞা অনুযায়ী নারীর প্রতি সহিসংতা আরও যুক্ত করে:-

১. পরিবার, সম্প্রদায় অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে শারীরিক, যৌন এবং মানসিক নির্যাতন: গৃহাভ্যন্তরে অপব্যবহার, ধর্ষণ, অজাচার এবং শিশুধর্ষণ;
২. কর্মস্থলে অথবা পাবলিক প্লেসে যৌন হয়রানি এবং হুমকি; বাণিজ্যিক যৌন শোষণসহ যৌনপেশা, পর্নোগ্রাফি এবং মানবপাচার;
৩. যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা
৪. নারী যৌনাঙ্গে অঙ্গহানি
৫. জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ
৬. সম্মানের নামে অপরাধ
৭. বাণিজ্যিক যৌন শোষণের মধ্যে পর্নোগ্রাফি, বেশ্যাবৃত্তি, নগ্ননৃত্য, ল্যাপ ড্যান্সিং, পোল ড্যান্সিং এবং টেবিল ড্যান্সিং।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে স্কটল্যান্ড 'Safer Lives: Changed Lives, a shared approach to tackling violence against women in Scotland' শিরোনামে যে সংজ্ঞা দিয়েছে তা পুরোটা পড়ে দেখা যেতে পারে। এই কাঠামোটি ২০০৯ সালে স্কটল্যান্ডে সকল নারীদের প্রতি সহিংসতা রোধে এবং বোঝাপড়া নিশ্চিত করতে তৈরি করা হয়েছিল।

নারীর প্রতি সহিংসতা এখন একটি বৈশ্বিক সমস্যা, বিশেষ করে পশ্চিমের বাইরে যেখানে সামাজিক মূল্যবোধ, পর্যাপ্ত আইন এবং বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ খুব কম। অনেক সমাজেই নারীকে সহিংসতার হাত থেকে রক্ষা করার কোনো রীতি নেই। উদাহরনস্বরূপ ইউনিসেফের জরিপ অনুযায়ী, ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সী অনেক নারী আছেন যারা ভাবেন যে, স্বামীরা তাদের স্ত্রীকে শারীরিকভাবে আঘাত করার অধিকার রাখে। আফগানিস্তান এবং জর্ডানে এর হার ৯০ শতাংশ, মালিতে ৮৭%, গিনি এবং তিমোর-লেস্তে ৮৬%, লাওসে ৮১%, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে ৮০%। ২০১০ সালে ওয়াশিংটনে পিও রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপ অনুযায়ী, মিসর এবং পাকিস্তানে ব্যাভিচারের জন্য শাস্তিকে ৮২% মানুষ সমর্থন দেয়। জর্ডানে ৭০ শতাংশ, নাইজেরিয়ায় ৫৬% এবং ইন্দোনেশিয়ায় ৪২% মানুষ এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী।[২০]

নারী যৌনাঙ্গ ছেদ, নারীপাচার, জোরপূর্বক বেশ্যাবৃত্তি, জোরপূর্ববক বিয়ে, ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, সম্মানের নামে হত্যাকাণ্ড, এসিড সন্ত্রাস এবং যৌতুকজনিত সহিংসতা বিভিন্নভাবে নারীদের উপর প্রভাব ফেলে। সরকার চাইলে

---

[১৭] L. Visaria, *Violence against Women: A Field Study* (Mumbai: Economic and Political Weekly, 35(20), 2000), p. 1742-1751

[১৮] E. Prügl, (Director), *Violence against Women*, প্রাগুক্ত

[১৯] Safer Lives: *Changed Lives, a shared approach to tackling violence against women in Scotland* (Edinburgh: Safer Scotland, Scottish Government, 2009), p. 11

[২০] http://www.pewglobal.org/2010/12/02/muslims-around-the-world-divided-on-hamas-and-hezbollah/ , Visited on 13 June, 2015

Dhaka University Institutional Repository

নারীদের প্রতি এই সহিংসতা দূর করতে পারে। এছাড়াও নারীর প্রতি সহিংসতার আরও কিছু ধরন আছে যা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃতি। উল্লেখযোগ্যভাবে, ডাইনি হিসেবে পুড়িয়ে দেয়া, বিধবাদের আত্মাহুতি দেয়া এবং পা মাড়িয়ে দেয়ার মতো ঘটনাও ঘটতো। ডাইনি হিসেবে নারীদের হত্যা করার বিষয়টি অনেক প্রাচীন। উদাহরনস্বরূপ প্রাক আধুনিক যুগে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার ইউরোপের কলোনিগুলোতে এই চর্চা হতো। আজ সাহারার অনেক অঞ্চলে, উত্তর ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং পাপুয়া নিউগিনিতে আজও ধারনা করা হয় ডাকিনীবিদ্যার জন্য মানুষই দায়ী। আবার অনেক দেশ আছে যেখানে ডাকিনীবিদ্যাকে বিশেষ অপরাধ হিসেবে ধরা হয়। সৌদি আরবে ডাকিনীবিদ্যার জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়ারও বিধান রয়েছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল তাদের এক রিপোর্টে জানিয়েছে, ২০১১ সালে দেশটিতে একজন নারীকে ডাকিনীবিদ্যার জন্য শিরচ্ছেদ করা হয়।[২১]

যুদ্ধ এবং সশস্ত্র সংগ্রাম, সেনাশাসন অথবা জাতিগত সংঘাতের সময় নারীদের প্রতি যৌন নির্যাতনের ঘটনা অনেক বেড়ে গেছে, যাদের বলা হচ্ছে যুদ্ধের সময় ধর্ষিত এবং যৌনদাস। এর একটি জ্বলজ্বলে উদাহরণ হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, বসনিয়ার যুদ্ধ, রুয়ান্ডার গণহত্যা এবং কঙ্গো যুদ্ধের সময়কালীন ধর্ষণ। নারীর উপর নির্যাতনের প্রশ্নে আইন এবং পলিসি ভিন্নতা আছে।[২২] ইউরোপীয় ইউনিয়নে যৌন হয়রানি এবং মানবপাচার সরাসরি অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।[২৩]

---

[২১] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2011/12/saudi-arabia-beheading-sorcery-shocking/. Visited on 13 June, 2015

[২২] https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/10/colombian-authorities-fail-stop-or-punish-sexual-violence-against-women/, Visited on 13 June, 2015

[২৩] European Parliament Council Official Journal, C*OUNCIL DIRECTIVE* (Directive 2002/73/EC - equal treatment of 23 September 2002), p. 15

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ইতিহাস

নারীর প্রতি সহিংসতার ইতিহাস বৈজ্ঞানিকভাবে নির্নয় করা সহজ নয়। নারীর প্রতি সহিংসতার অনেক ঘটনাই প্রকাশ্যে আসে না, কিংবা প্রকাশ করা হয় না। সামাজিক বিভিন্ন নিয়ম, রীতি, ট্যাবু ও সংস্কারের কারণে এরকম হয়।[২৪] এটা স্বীকার করতেই হবে যে এই সময়ে এসেও এখন পর্যন্ত নারীর প্রতি সহিংসতার কোনো বাস্তবিক এবং সঠিক চিত্র পাওয়া যায় না।[২৫] যে কারণে ঐতিহাসিক দলিলগুলোই খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্র বুঝতে। যদিও ইতিহাস ঘেটে এই সহিংসতার দৃশ্য বের করা খুব একটা সহজ নয়। অনেকেই দাবি করেন যে, ইতিহাসের বিভিন্ন বাঁকে নারীর প্রতি সহিংসতাকে ইতিবাচকভাবে দেখা হয়েছে।[২৬] উদারহরণস্বরূপ রোমান আইনে স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের কঠোর শাস্তি দিতে পারতেন। আর সেই আইনটি চার্চ এবং রাষ্ট্র উভয়পক্ষ হতেই স্বীকৃত ছিল।[২৭] ১৮শতকের সে সময় ব্রিটিশ আইনেও স্ত্রীকে স্বামীরা লাঠি দিয়ে পেটানোর বিধান রাখা হয়েছিল। ১৯ শতকের শেষের দিকে ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই আইন বাতিল করা হয়। কিছু ঐতিহাসিক বিশ্বাস করেন, নারীকে সম্পত্তি হিসেবে দেখার প্রবনতা থেকেই মূলত নারীর প্রতি সহিংসতার সৃষ্টি।[২৮] বিশ্বে এখনও চিরস্থায়ীভাবেই পিতৃতন্ত্র বিরাজ করছে এবং এটা একটা স্থিতাবস্থা অতিক্রম করছে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে জাতিসংঘের বিবৃতি অনুসারে, নারী এবং পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার অসামঞ্জস্যতার কারণে ঐতিহাসিকভাবেই নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছে। আর এ কারণেই পুরুষের হাতে নারী নির্যাতন এবং বৈষম্যের শিকার হচ্ছে, যা নারীদেরকেও বাধ্য করছে পুরুষের তুলনায় নিচু হয়ে থাকতে।

আধুনিক সময়ে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্রই নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে এবং বিশ্বে এমন কোনো দেশ, অঞ্চল নেই যেখানে সংস্কৃতিগতভাবে নারীর স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য নারী নির্যাতনের বিষয়টি নজরে আসে যখন বিশেষ কোনো দেশে বা অঞ্চলে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যৌতুকের কারণে কনেকে পুড়িয়ে হত্যা করারও রেকর্ড আছে। এরকম ঘটনাপ্রবন দেশগুলোর মধ্যে আছে, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং নেপাল। এই দেশগুলোতে এসিড সন্ত্রাসের ঘটনাও সচরাচরই ঘটে। তবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার চিত্রও ব্যাতিক্রম নয়। মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে জোরপূর্বক নারী যৌনাঙ্গ ছেদ, জোরপূর্বক বিবাহসহ ইত্যাদি নির্যাতনের শিকার হতে হয় নারীদের। আফ্রিকার অনেক দেশেও এরকম সহিংসতার ঘটনা শোনা যায়। বিশেষত ইথিওপিয়া, মধ্য এশিয়ার ককেসাস অঞ্চলে বিবাহের জন্য নারীদের বিপুল পরিমান পণ দিতে হয়। আর এই পণ দিতে না পারলে নারীর উপর নেমে আসে অত্যাচার। যে সুযোগে মানবপাচারকারী চক্র এই রাষ্ট্রগুলো থেকে অনেক নারী পাচার করে নিয়ে যায়।[২৯]

---

[২৪] Dr Etienne G Krug, James A Mercy PhD, Linda L Dahlberg PhD, Prof Anthony B Zwi PhD, *The world report on violence and health*" (Amsterdam, Netherlands: Volume 360, No. 9339, 5 October 2002), p. 1083–1088

[২৫] United Nations General Assembly 2006, Report of the Secretary General, "*In-depth study on all forms of violence against women"*, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/61/122/Add.1, Visited 20 June, 2015

[২৬] Mary Dickson, *No Safe Place: Violence Against Women*. (Ireland, Patricia, A PBS Documentary Film Script, 1996), PBS, http://www.pbs.org/kued/nosafeplace/script/script.html , Visited 20 June, 2015

[২৭] Berne Stedman, *'Right of Husband to Chastise Wife'* (Virginia Law Register **3** (4), August 1917), p. 241

[২৮] Penelope Harvey & Peter Gow, *Sex and violence: issues in representation and experience* (Routledge, Psychology Press, 1994), p. 36

[২৯] http://www.violenceisnotourculture.org/News-and-Views/papua-new-guinea-police-cite-bride-price-major-factor-marital-violence, Visited 20 June, 2015

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান ইতালিতে ১৯৮১ সালের আগেও একজন পুরুষ ইচ্ছে করলেই তার যৌনসঙ্গীকে সম্মানের নামে হত্যা করতে পারতো।[৩০] যদিও এধরনের কাজে আইনের চেয়েও বেশি ভূমিকা রেখেছিল স্থানীয় সংস্কৃতি যা নারীদের নিতান্তই অবৈধ হিসেবে দেখতো। আরও একটা বিষয় নিয়ে বিতর্ক আছে যে, সত্যিই কি সংস্কৃতি, প্রথা, স্থানীয় আচার, বিধিনিষেধ নারীর প্রতি সহিংসতাকে উস্কে কিংবা তারিত করে। বিশেষত, একটি দেশ অথবা অঞ্চলের কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠিই সমাজের এই আরোপিত সংস্কৃতিগুলো চালু করে, যা পরবর্তীতে ঐতিহ্য আকার দারণ করে। কিন্তু এই সংস্কৃতিগত আত্মপক্ষ সমর্থন সবসময়ই প্রশ্নের মুখোমুখি হয় কারণ এই সিদ্ধান্তগুলোও আসে কিন্তু সমাজের ওই রাজনৈতিক নেতা অথবা ঐতিহ্যবাহী কর্তৃপক্ষের হাত ধরেই। আসলেই যারা আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের পক্ষ থেকে কোনো কণ্ঠস্বরকে কিন্তু রাখা হচ্ছে না। যদিও সংঘর্ষের ক্ষতিকর দিকগুলো ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে এবং সহিংসতার নেতিবাচক দিককে বিভিন্নভাবে বিন্যাসও করা হয়েছে। ১৮৭০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আদালত 'স্ত্রীকে তার স্বামী শারীরীকভাবে আঘাত করতে পারবে' এই আইনটি রদ করে। বাস্তবে ১৮৭১ সালে রাজ্যহিসেবে আলাবামা এই আইনটি মানতে শুরু করে।[৩১]

স্বামীর প্রতি যাতে স্ত্রীরা দায়িত্ব পালনে কোনো কার্পণ্য না করে এবিষয়ে যুক্তরাজ্য যে আইনটি ছিল তা রদ করা হয় ১৮৯১ সালে। আর বৃহৎ আকারে বিংশ এবং একবিংশ শতাব্দীতে অনেক দেশেই এ ধরণের আইনগুলো বাতিল হয়ে যায়। ২০০২ সালে করা সর্বশেষ পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, বিশ্বের প্রতি পাঁচজন নারীর মধ্যে একজন পুরুষের হাতে শারীরিক এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। এই নির্যাতনের শিকার হয়ে ১৫-৪৪ বছর বয়সী অনেক নারী ক্যান্সার, ম্যালেরিয়াসহ বিভিন্ন কারণে মারা যাচ্ছে।[৩২]

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে উদ্যোগগুলো নেয়া হয়েছে তা নিম্নে বর্ণিত হলো:[৩৩]

১. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য প্রতিরোধে ১৯৭৯ সালে একটি কনভেনশন আয়োজন করা হয়েছিল যেখানে নারীর প্রতি সহিংসতাকে বৈষম্যের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

২. ১৯৯৩ সালের মানবাধিকার কনভেনশন থেকে নারীর প্রতি সহিংসতাকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের পর্যায়ে ফেলা হয় এবং সেটা জাতিসংঘের বিবৃতি অনুসারেই করা হয়।

৩. নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণে ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতার সংজ্ঞা নির্ধারন করে। একই বছর ওয়ার্ল্ড কনভেনশন থেকে নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য পয়েন্টে আসা হয়।

৪. জনসংখ্যা এবং উন্নয়নের উপর ১৯৯৪ সালে আন্তর্জাতিক কনফারেন্স হয় যেখানে নারীর স্বাস্থ্য অধিকার, নারীর প্রতি সরকারের আচরণ এবং নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কি কি করনীয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

৫. ১৯৯৬ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য অ্যাসেম্বলি (ডব্লিউএইচএ) সহিংসতাকে একটি জরুরী জনস্বাস্থ্য ইস্যু হিসেবে ঘোষণা দেয় এবং অংশীদার কর্তৃক সহিংসতা এবং হয়রানির শিকার হওয়াকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। যা পরবর্তীতে ২০০২ সালের ডব্লিউএইচও'র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৪]

---

৩০ Donatella Barazzetti, Franca Garreffa, Rosaria Marsic : National Report: Italia*, "DAPHNE PROJECT "PROPOSING NEW INDICATOORS: MEASURING VIOLENCE'S EFFECTS. GVEI"* (ITALIA: Centre Women's Studies "Milly Villa", University of Calabria, Rende, July 2007)

৩১ Office of Violence against Women (OVM). *"The History of the Violence Against Women Act"* (U.S. Department of Justic), Visited on 20 June, 2015

৩২ Sarah Venis, Richard Horton, *"Violence against women: a global burden"* (Netherlands: Elsevier, Volume 359, No. 9313, 6 April 2002), p.1172

৩৩ http://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards. Visited on 13 June, 2015

৩৪ Dr Etienne G Krug, James A Mercy PhD, Linda L Dahlberg PhD, Prof Anthony B Zwi PhD, "*The world report on violence and health*", প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৬. ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘ ২৫ নভেম্বরকে নারীর প্রতি সহিংসতা দুরীকরণ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।[৩৫]

৭. ২০০২ সালে, ১৯৯৬ সালে ডব্লিউএইচএ'র ঘোষণার আলোকে সহিংসতাকে জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে গণ্য করা হয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) সহিংসতা এবং স্বাস্থ্যের ওপর প্রথম একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে যেখানে বেশ কয়েকপ্রকারের সহিংসতার কথা স্থান পেয়েছে, যেগুলোর কারণে জনস্বাস্থ্যের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে নারী স্বাস্থ্যের ওপর এর প্রভাব পড়ে অনেক বেশি। ওই রিপোর্টে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় যে, সিভিল সোসাইটির সংস্থাগুলোতে এমন কিছু কর্মকাণ্ড ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে যা নারীর বিরুদ্ধে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই রিপোর্টে সময়কাল ধরা হয়েছে ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়কে।[৩৬]

৮. ২০০৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) নারীদের স্বাস্থ্য এবং ঘরোয়া নির্যাতনের ওপর একটি 'মাল্টি কান্ট্রি স্টাডি' রিপোর্ট প্রকাশ করে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের ১০টি দেশের ২৪ হাজার নারীর ওপর জরিপ চালিয়ে এই রিপোর্ট তৈরী করা হয়। যেখানে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন ও কারণ নিয়ে কাজ করা হয়। বিশেষ করে, সঙ্গী কর্তৃক যেসব নির্যাতনের শিকার হয় নারীরা সেটাই ছিল জরিপের মূল বিষয়। একই সঙ্গে এটা নারী স্বাস্থ্যের ওপর কেমন প্রভাব ফেলে সেটাও তুলে আনা হয় ওই জরিপে।[৩৭]

৯. ২০০৬ সালেই সর্বপ্রথম জাতিসংঘ থেকে নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়ে গভীর থেকে গবেষণা করে এর ডকুমেন্ট তৈরী করা হয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এটাই নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক তৈরীকৃত সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ কোন ডকুমেন্ট।[৩৮]

১০. জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন উপায়ে (আইনগত, রাজনৈতিক এবং সামাজিক) নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, কমানো কিংবা নির্যাতন সৃষ্টিকারী সহায়ক বিষয়গুলো কমানোর জন্য জোর কাজ করে যাচ্ছে। বিশেষ করে, ১৯৬০ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক গবেষণা করে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধকল্পে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যার সুফল পাচ্ছে নারীরা।[৩৯]

সমাজে এর প্রভাব

স্বাস্থ্য এবং মানবাধিকার বিষয়ক জার্নালের নিবন্ধ[৪০] অনুসারে, অনেক বছর ধরেই অনেক সংগঠনের ক্রমাগত আন্দোলনের ফলে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়টি বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘনের সমপর্যায় ভুক্ত হয়।[৪১] নারীর প্রতি সহিংসতা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সামষ্টিক জনতার মাঝেও হতে পারে, এমনকি গোটা জীবন ধরেও নির্যাতনের শিকার হতে পারে নারীরা। অনেক নারীই আছেন যারা ভয়াবহ বিভীষিকার ভেতর দিয়ে জীবন কাটিয়ে দেন এবং এটা অবশ্যই তাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং মানবাধিকারের লঙ্ঘন হয়। বাস্তবে এই ভয়ের সূত্র সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিকভাবে কাজ করে। আর এর বাইরে নারীর প্রতি সহিংসতা অথবা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বয়স, শ্রেনি, সংস্কৃতি, ধর্ম, যৌন সচেতনতা এবং ভৌগোলিক বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর

---

৩৫ Sarah Venis, Richard Horton, *"Violence against women: a global burden"*, প্রাগুক্ত।

৩৬ Dr Etienne G Krug, James A Mercy PhD, Linda L Dahlberg PhD, Prof Anthony B Zwi PhD, প্রাগুক্ত।

৩৭ Claudia Garcia-Moreno, (2005), *WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women (PDF).* Switzerland: WHO.

৩৮ United Nations General Assembly 2006, Report of the Secretary General, "*In-depth study on all forms of violence against women"*, প্রাগুক্ত।

৩৯ U.S. Department of Justice, Office of Violence against Women (OVM), *The History of the Violence Against Women Act,* U.S. Department of Justice. Visited on 20 June, 2015

৪০ Susana T. Fried, *Violence against Women, Health and Human Rights*, (Harvard University: Harvard School of Public Health/François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, 2003), Vol. 6, No. 2, Violence, p. 88-111

৪১ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

করে। অন্যদিকে এটা সমাজের বিভিক্তিকরণেরও একটি ইস্যু। সহিংসতা বিভিন্ন পথ হয়ে নয়, সোজাসুজিই জনস্বাস্থ্য খাতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।[৪২] এইচআইভি এইডসও এরকমই আরেকটি কারণ যা সহিংসতার জন্ম দেয়। যে সকল নারীর এইডস আছে তারা এই সহিংসতার শিকার হন।[৪৩] দ্য ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউএইচও) রিপোর্টে বলা হয়, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রত্যক্ষভাবেই স্বাস্থ্যসেবাকে প্রভাবিত করে।[৪৪] যেসমস্ত নারীরা এই সহিংসতার শিকার তাদের জন্য জরুরী ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা দরকার এবং যারা সহিংসতার শিকার হয়নি তাদের জীবনের তুলনায় ওই আক্রান্ত নারীদের জীবন যে কতটা ভয়াবহ তা তুলনামূলক দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখা দরকার।

জাতিসংঙ্ঘ কর্তৃক নির্ধারিত নারী নির্যাতনের সারনি (নারীর পুরো জীবন ঘিরে)[৪৫]

সময়	নির্যাতনের ধরন
জন্মের আগে	ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে লিঙ্গ নির্ধারণ করে গর্ভপাত। কন্যা সন্তান গর্ভে থাকতেই গর্ভপাতের মাধ্যমে শিকার হচ্ছে নির্মম সহিংসতার। এ ক্ষেত্রে মায়ের স্বাস্থ্য ঝুঁকিও দেখা দেয়।
শিশুকাল	নারীর শিশুকালে নির্যাতনের শিকার হয় বিভিন্ন উপায়ে। যেমন: মানসিক, শারীরিক এবং যৌন নির্যাতন।
বালিকাবয়স	বাল্য বিবাহ, যৌনাঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি, শারিরীক, যৌন, মানসিক নির্যাতন। একই সঙ্গে অজাচার, শিশু পর্নোগ্রাফি এবং পতিতাবৃত্তি।
কৈশোর এবং প্রাপ্ত বয়স্ককাল	নানা ধরনের ফৌজদারী অপরাধ যেমন, এসিড নিক্ষেপ, প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণ। অর্থনৈতিক বিনিময়ে ধর্ষণ (যেমন, স্কুলের অনেক নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষনের শিকার হতে হয়, স্কুল ফি'র পরিবর্তে। যাতে করে ওই শিক্ষার্থীকে আর স্কুলের ফি দিতে হয় না।) অজাচার; কর্মক্ষেত্রে যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন উত্যক্তকরণ, জোর করে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা এবং পর্নোগ্রফি, নারী পাচার, সঙ্গীর দ্বারা নির্যাতন, বৈবাহিক ধর্ষণ, যৌতুকের জন্য নির্যাতন এবং হত্যা, সঙ্গী কর্তৃক হত্যা, মানসিক নির্যাতন, অক্ষম নারীদের ক্ষেত্রে মানসিক নির্যাতন এবং জোর করে গর্ভধারণ করানো।
বৃদ্ধকাল	জোর করে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা, নরহত্যা কিংবা অর্থনৈতিক কারণে বিধবা করে ফেলা, যৌন, শারিরীক এবং মানসিক নির্যাতন।

৪২ Lisa Colarossi, Journal of Social Work Education, *A RESPONSE TO DANIS & LOCKHART: WHAT GUIDES SOCIAL WORK KNOWLEDGE ABOUT VIOLENCE AGAINST WOMEN?* (Oxfordshire: Taylor & Francis Ltd. Council on Social Work Education, WINTER 2005), Vol. 41, No. 1, p. 147-159

৪৩ Susana T. Fried, *Violence against Women,* প্রাগুক্ত।

৪৪ WHO Factsheet, *"Violence against women"* (WHO, 1 September 2011). http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/, Visited on 20 June, 2015

৪৫ *Violence against women: Definition and scope of the problem* (World Health Organization, 1, 1-3, 1997), http://www.who.int/gender/violence/v4.pdf, p.2. Visited on 20 June, 2015

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ নারী নির্যাতনের ধরণসমূহ

নানা উপায়ে নারী নির্যাতন হয়ে থাকে। নারী নির্যাতনের কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নারী নির্যাতনের নানা উপায় এবং ধরণ নিয়ে ছোট হলেও সুন্দর একটা বর্ণনা দিয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক পরিচালতি তথ্য আপা প্রকল্পে। সেগুলোই নিম্নে আলোচনা করা হলো।[৪৬]

১. শারীরিক নির্যাতনঃ নানা কারণে অনেক পুরুষ তার স্ত্রী মারধর করে থাকে। পারিবারিক ছোট–খাটো কারণ সহ প্রধানত যৌতুকের কারণে স্বামী তার স্ত্রী স্বামী তার স্ত্রীকে শারীরিক নির্যাতন করে থাকে। এতে মারাত্মকভাবে নারীরা আহত হওয়া ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুও ঘটে থাকে।

২. ধর্ষণ বা বলৎকারঃ নারী ধর্ষণ ও ব্যাভিচার প্রায়শই বাংলাদেশে ঘটে থাকে। এ থেকে বিবাহিত মহিলা ও কন্যা শিশুরাও বাদ পড়ে না। কেউ প্রতিশোধের নেশায় কেউ বা যৌনাকাঙ্খা মিটানোর বিকৃত বাসনা পূরণের জন্য এরকম ধর্ষণ করে থাকে।

৩. যৌন হয়রানিঃ অফিস আদালত, স্কুল কলেজ বা কল-কারখানার নারী শ্রমিকরা যৌন হয়রানির শিকার হয়। এ কারণে নারী মৃত্যুও মাঝে মাঝে ঘটে থাকে।

৪. এসিড নিক্ষেপঃ স্কুল কলেজের মেয়েরা এবং গার্মেন্টসে কর্মরত নারী শ্রমিকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ছেলেদের প্রস্তাবে রাজী না হওয়ার অপরাধে এসিডে পুড়তে হয়।

৫. তালাকঃ তুচ্ছ কারণে অথবা সামান্য মনো-মালিন্যের প্রেক্ষিতে নারীকে তালাক প্রদান এদেশে অহরহ ঘটে থাকে। তালাক প্রদানের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে।

৬. যৌতুকের বলীঃ যৌতুক প্রথা বাংলাদেশের একটি ভয়াবহ প্রথা। সাধারণত নিম্নবিত্ত বা মাধ্যবিত্তের মেয়েরাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌতুকের বলী হয়ে থাকে। যৌতুকের দাবী পরিশোধ না হওয়ায় নববধুর কপালে নেমে আসে নির্যাতনের ভয়াবহ ছোবল। এতে করুন মৃত্যুও ঘটে থাকে।

৭. মানসিক নির্যাতনঃ নারীদের প্রতি যথাযথ সন্মানসূচক ব্যবহার না করার কারণে মেয়েরা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়।

৮. আর্থিকভাবে নির্যাতনঃ সম্পত্তি অর্জন নারীর মৌলিক অধিকার। উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিতকরণ, তার নিজস্ব উদ্যোগে অর্জিত সম্পত্তি আত্মসাৎ ইত্যাদি ঘটনা এদেশে অহরহ ঘটতে দেখা যায়।

৯. নারী পাচারঃ যৌনদাসী হিসাবে বিদেশে নারী পাচার বাংলাদেশে এক প্রকট সমস্যা। পার্শ্ববর্তী দেশ সহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে বাংলাদেশী নারীদের পাচারের খবর প্রায়ই প্রচার মাধ্যমে দেখা যায়।

১০. গনিকা বৃত্তিঃ নারীকে জোর করে তুলে এনে পতিতালয়ে সর্দারানীর কাছে বিক্রি করে দেবার ঘটনাও অনেক ঘটে থাকে। অনেক প্রভাবশালী সমাজপতিদের বিকৃত বাসনার শিকার হয়েও অনেক মেয়ে শেষে পতিতালয়ে দেহ ব্যবসায় বাধ্য হয়ে থাকে।

১১. অশ্লীল সাহিত্যঃ মেয়েদের নগ্ন শরীর প্রদর্শনকে ব্যবসার উপজীব্য করে অনেক মেয়ের জীবন নষ্ট করা হয়।

১২. বিজ্ঞাপনে ও সুন্দরী প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নারীকে পণ্যে পরিণতকরণঃ আজকাল পন্যের বিজ্ঞাপনে নারীর দেহ প্রদর্শন করা হয় আর সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামেও নারীর দেহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

১৩. পরিবারে নারী নিগ্রহঃ থেকেই পরিবারে নারীরা নানা রকম অত্যাচারের শিকার হয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হচ্ছে।

১৪. অপহরণঃ অনেক সুন্দরী মেয়ে অপহরণের শিকার হয়ে শ্লীলতাহানির শিকার হন।

১৫. উত্যক্ত করাঃ রাস্তা ঘাটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসা যাওয়ার পথে মেয়েদের উত্যক্ত করা হয়।

---

[৪৬] http://info.totthoapa.gov.bd/gender/নারীর-প্রতি-□□□□□□-□□-□□□-নির্যাতন-কি. Visited on 18 July, 2015

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতনের প্রসঙ্গে জাতিসংঘের সংগঠন প্রণীত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হলো:[৪৭]

নির্যাতনের রুপ	পরিবার	সম্প্রদায়	রাষ্ট্র
নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রুপ	**দৈহিক আগ্রাসনঃ-** ▪ হত্যা যৌতুক ও অন্যান্য ▪ দৈহিক আঘাত ও প্রহার ▪ যৌন অঙ্গহানি ▪ ভ্রুন হত্যা ▪ শিশু হত্যা ▪ খাদ্য বঞ্চনা ▪ চিকিৎসা সেবায় বঞ্চনা ▪ প্রজনন ঘটিত বল প্রয়োগ/ নিয়ন্ত্রণ ▪ যৌন অত্যাচার ▪ ধর্ষণ ▪ মানসিক অত্যাচার ▪ আটকে রাখা ▪ বলপূর্বক বিবাহ দান ▪ প্রতিশোধের ভীতি প্রদর্শন	(সামাজিকগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি) এর ভিতরে বা বাইরে নারীর উপর নির্যাতন:- **দৈহিক অত্যাচারঃ-** ▪ দৈহিক আঘাত ও প্রহার ▪ দৈহিক শাস্তি প্রদান ▪ প্রজনন ঘটিত বলপ্রয়োগ/ নিয়ন্ত্রণ ▪ ডাইনী দাহ ▪ সতীদাহ ▪ যৌন হামলা ▪ ধর্ষণ **কর্মস্থলে নির্যাতনঃ-** ▪ যৌন আগ্রাসন ▪ হয়রানি ▪ ত্রাস/ভীতি প্রদর্শন ▪ নারী পাচার ▪ জবরদস্তি পতিতাবৃত্তি **তথ্য মাধ্যমঃ-** ▪ অশ্লীল সাহিত্য ▪ নারীদেহকে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করণ।	রাজনৈতিক নির্যাতন (নীতি, আইন ইত্যাদি) ▪ জবরদস্তি সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা বিনষ্টকরণ ▪ জবরদস্তি গর্ভধারণ ▪ অরাষ্ট্রীয় এজেন্টদের নির্যাতন বরদাস্ত করণ। **হেফাজতে নির্যাতন** (সশস্ত্র বাহিনী,পুলিশ ইত্যাদি) ▪ ধর্ষণ ▪ নিপীড়ন

মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম কর্তৃক নির্ধারিত ধরণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের, 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম' কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ' নামক সংকলন গ্রন্থে নারী নির্যাতনের নিম্নোক্ত ধরণগুলো উল্লিখিত হয়েছে।[৪৮]

১. শারীরিক নির্যাতন

আঘাত, ক্ষতি, অঙ্গহানি এবং মৃত্যুর জন্য দায়ি শারীরিক আঘাতকেই আন্তর্জাতিকভাবে শারীরিক নির্যাতন বলা হচ্ছে। যেমন, ঘুষি দেয়া, লোহার রড দিয়ে আঘাত, লাথি অথবা অন্য কোনো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা। এটা দুই দিক দিয়েই তীব্র এবং ভয়াবহ। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সহিংতার শিকার নারী মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। তারা শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে আঘাত করে। এই বিভিন্ন কায়দার বর্বরতার মুখোমুখি হয় নারীরা তাদের বাসায়, বিশেষ করে মাতৃত্বকালীন সময়ে।

(Physical abuse is the international use of physical force with the potential for causing injury, harm, disability or death, for example hitting, shoving, biting, restrain, kiking or use of weapon.

[৪৭] http://info.totthoapa.gov.bd/gender/□□□□-প্রতি-□□□□□□-□□-□□□-নির্যাতন-বি, Visited on 18 July, 2015

[৪৮] ড. আবুল হোসেন, সংগ্রহ ও সম্পাদনা এবং প্রকল্প পরিচালক, '*বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ*' (ঢাকা: 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম' কর্তৃক প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থ, জানুয়ারি- ২০১০), পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

It is usually recrurrent and ascaletes in both frequency and severity. Although most assults on women do not result in death, they do result in physical injury and severe emptional distress. The various forms of brutality that women may experience in the home have serious repercussion on their health, particularly during pregnancy.)

২. মানসিক নির্যাতন

নারীর প্রতি মানসিক নির্যাতনের চিত্র সহজে বোঝা যায় না এবং এর সংজ্ঞায়ন করাও কঠিন। শারীরিক আঘাত নারীর পক্ষে দেখানো সহজ হলেও মানসিক আঘাত দেখানো যায় না। অনেক ক্ষেত্রে নিজের মানসম্মানের কথা ভেবেও তারা কিছু বলেন না। প্রায়ই এটাও হয় যে, নিজেই নিজের শরীরে নির্যাতন করছে অন্যের দেয়া মানসিক যন্ত্রনার কারণে।

(Psychological abuse of women is understimated, trivialized and at times difficult to define. Psychological abuse has been reported by abused women to be as damaging as physical battering because of its impact on the self-image of the victi(m.) it often precedes or accompanies physical abuse, but it may occur by itself.)

৩. যৌন নির্যাতন

যৌন নির্যাতনকে আসলে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে যে, নির্যাতনের শিকার নারী বা পুরুষ যখন নিজের অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করতে বাধ্য হয় হুমকি অথবা অত্যাচারের কারণে। আবারো এটাও দেখা যায়, যেভাবে স্বাভাবিক শারীরিক সম্পর্কে অভ্যস্ত মানুষ তা যদি কেউ না করে বিকৃত কায়দায় জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক করে। কিছু ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের মাত্রা এমনই থাকে যে, সেটা নিয়ে আলোচনা করাও কঠিন।

(Sexual assult consists of a range of behaviours that may include pressured sex when the victim does not desire sex, coerced sex by manipulation or threat, physically forced sex, or sexual assult accompanied by violance. Victims many be forced or coerced to prform a type of sex they do not desire, or at a time they do not want it. For some battered victims this sexual violation is profound and difficult to discuss.)

৪. আবেগজনিত নির্যাতন

বিশেষত পিতা-মাতা, পারিবারিক সদস্য, সহকর্মী, বন্ধু অথবা সম্প্রদায়ের কোনো সদস্য দ্বারা এই নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে পারে। মৌখিক এ ধরণের আক্রমনের শিকার প্রায়শই নারীরা হয়ে থাকে।

(Emotional Abuse represents a method of control that may consist of varbal attacks and humiliation, including repeated varbal attacks against the victim's worth as an individual or role as a parent, family member, co-worker, friend or community member. The verbal attacks often emphasize the victims vulnarabities.)

৫. বিচ্ছেদ/বিচ্ছিন্নতা

অপরাধী যখন শিকারের সময়, কার্যক্রম এবং অন্যের সঙ্গে সম্পর্ককেও নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করে তখনই বিচ্ছেদ সূচিত হয়। অপরাধীরা এক্ষেত্রে সহমর্মী সম্পর্ক, সাধারণ কার্যক্রমসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা চালায়। অনেকসময় গৃহে আটকে রাখা, বাস্তবতার তুলনায় মিথ্যায় আশ্রয়ে বাড়িয়ে বলে মানসিক চাপও সৃষ্টি করে তারা।

(Isolation occurs when perpetrators try to control victims' time, activities, and contract with others. Perpetrators may accomplish this through interfering with supportive relationships,

Dhaka University Institutional Repository

creating barriers to nromal activities, such as locking the victim in the home, and lying or distorting what is real to gain psychological control.)

৬. অর্থনৈতিক অপব্যবহার

অর্থনৈতিক অপব্যবহার ঘটে তখনই যখন অপরাধী শিকারের সকল উৎস, সময়, যাতায়াত, খাবার, বস্ত্র, আশ্রয়, বীমা এবং অর্থের উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করতে যায়। সে হয়তো সেই নারীর স্বয়ংসম্পূর্ণতার সক্ষমতাকে চ্যালেঞ্চ করে এবং সকল অর্থনৈতিক উৎস নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করে। যখন সেই শিকার নারী সকল ভয়ংকর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে চলে যায়, তখন অপরাধী শিকারকে ফিরিয়ে আনার জন্য অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রনকে কাজে লাগাতে চায়।

(Economic abuse is when perpetrators control access to the all of the victims' resources, such as time, transportation, food, clothing, shelter, insurance and money. He may interfare with her ability to become self-sufficient, and insist that he control all of the finances. When the victim leaves the violent relationship, the perpetrator may use economics as a way to maintain control or force her to return.)

৭. মানবপাচার

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং অন্যান্য অনেক দেশে মানবপাচারের ঘটনা বেশি। আর এই পাচারকৃতদের জোরপূর্বক বেশ্যাবৃত্তি এবং অনেকক্ষেত্রে বশ্যতা শিকার করতে হয়। অনেক শিশুকেই মধ্যপ্রাচ্যে উটের জকি হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পাচার করা হয়। পাচারকৃত অনেকেই দারিদ্র অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য, ভালো চাকরি অথবা বিয়ের শর্তে অথবা নিজের পরিবারকে সহায়তার জন্য পাচার হয়ে যায়।

(Trafficking is extensive from Bangladesh, primarily to India, Pakistan and destinations within the country, largly for purposes of forced prostituion, although in some cases for labour servitude. Some children have reportedly been trafficked to Middle East to work as camel jockeys. Most trafficked persons, eager to escape the cycle of poverty, are lured by promises of a good job or marriage. Orphans, run-aways and others outside the normal family support system are also susceptible.)

৮. এসিড সন্ত্রাস/আক্রমন

এসিড সন্ত্রাস অসহ্য। চামড়ার টিস্যু গলে যায় এবং অনেকসময় হাড়ও গলে যায়। অনেকেই আছেন যারা এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়ে চোখ হারিয়েছেন। এই শিকারদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রামের গরীব নারী, যাদের চিকিৎসা করানোর মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই। বিবাহে সম্মত না হওয়া, যৌতুক সমস্যা, গৃহাভ্যন্তরীন লড়াই এবং সম্পত্তিজনিত সমস্যার কারণে এই এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে।

(Acid Attack is hideous. Skin tissue melts, and even bones can be dissolved. Many victims have lost their sight in one or both eyes. Since the victims are mostly poor women living in the countryside, they do not have money for medical treatment. The immediate causes of these appalling and som.imes deadly Acid throwing attacks range from refusals of a marriage proposal, dowry diputes, domestic fights, and disputes over property.)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ পারিবারিক ও সামাজিক নির্যাতন

আমাদের সমাজে নারীরা পারিবারিক ও সামাজিকভাবেই নির্যাতিত হয়ে থাকে বেশি। পারিবারিকভাবে নির্যাতনের মাত্রাটাই বেশি। যৌতুক, সঙ্গীর দ্বারা নির্যাতন, পরিবারে কারো হিংসার শিকার হয়ে রোষানলে পড়া, সম্মানের জন্য (অনার কিলিং) হত্যা, উত্তরাধিকার, কন্যা সন্তান জন্মদান, বন্ধ্যাত্ম্য– ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণ ও রূপে নারীরা সামাজিক ও পারিবারিকভাবে নির্যাতনের শিকার হয়।

পারিবারিক সহিংসতা

নারীরা সচরাচর ঘনিষ্ঠ জনদের কাছ থেকেই নির্যাতনের শিকায় হয়। যাকে সাধারণত 'intimate partner violence' বলা হয়। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, এই সমস্যার মূল সন্ধান করা অনেক কষ্টসাধ্য।[৪৯] নারীরা সবচেয়ে বেশি পুরুষ সঙ্গীর হাতেই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসে প্রায় ১০০ মিলিয়ন নারী তাদের বর্তমান অথবা সাবেক সঙ্গীর হাতে খুন হয়েছেন, যেখানে ২০১০ সালে পুরুষ খুন হয়েছেন মাত্র ২১জন।[৫০] ২০০৮ সালে ফ্রান্সে ১৫৬জন নারী এবং ২৭জন পুরুষ তাদের সঙ্গীর হাতে খুন হয়েছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বে ৩৮ শতাংশ নারী খুন হয় তাদের সঙ্গীর হাতে।[৫১] জাতিসংঘের একটি রিপোর্ট আরেকটি সূত্র থেকে জানায়, অন্তত ৭১টি দেশ পাওয়া যায় যেখানে নারীরা পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়, ইথিওপিয়াতে এর হার সর্বাধিক।[৫২] পশ্চিম ইউরোপের দেশ ফিনল্যান্ড নারীর প্রতি সহিংসতাকে বিভিন্ন প্রকরণে বিভক্ত করে বৈধ দেখানোয় বিপুল সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছিল। দেশটির সমাজ ব্যবস্থায় নারী এবং পুরুষের মধ্যে বৈষম্যের মাত্রা ছিল লক্ষ্যনীয়।[৫৩] প্যান আমেরিকান হেলথ অর্গানাইজেশনের এক স্টাডিতে জানা যায়, লাতিন আমেরিকার ১২টি দেশের মধ্যে বলিভিয়ার তুলনায় অন্যান্য দেশে পরিবার পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতার হার সবচেয়ে বেশি।[৫৪] যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এধরনের সহিংসতাকে বিষমকামের চেহারায় চিত্রিত করা হয়। এমনকি সমকামী সম্পর্ক, মেয়ে-মা সম্পর্ক, রুমমেটদের মধ্যে সম্পর্ক এবং অন্যান্য সম্পর্ক যেখানে দুইজন সঙ্গীই নারী সেগুলোকেও নির্যাতনের আওতায় আনা হয়।[৫৫]

সম্মানের জন্য হত্যা

পৃথিবীর কিছু অংশে সম্মানের নামে হত্যা (Honor killing) খুবই সাধারণ বিষয়। সম্মানের জন্য হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহন করে সচরাচর পরিবারের সদস্যরা (স্বামী, বাবা, চাচা অথবা ভাই)। কারণ তাদের ধারণা অনুযায়ী ধর্ষণের শিকার হওয়া ওই নারী তাদের পরিবারের জন্য অসম্মান বয়ে এনেছে। এ ধরনের হত্যকাণ্ড ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত, বিশেষ করে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে এই প্রবনতা দেখা যায়।[৫৬] অনেক সময়

---

৪৯ *Intimate Partner Violence: overview* (Centers for Disease Control and Prevention. US, 2006) https://web.archive.org/web/20070211183916/http://www.cdc.gov/ncipc/factsheets/ipvfacts.htm, Visited on 10 August, 2015

৫০ *All domestic abuse deaths to have multi-agency review*, (BBC, 13 April 2011), http://www.bbc.com/news/uk-13058300, Visited on 10 August, 2015

৫১ WHO Factsheet, *"Violence against women"*, প্রাগুক্ত।

৫২ *"Ethiopian women are most abused"*, (BBC News. 11 October 2006), http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6040180.stm, Visited on 10 August, 2015

৫৩ KRIS CLARKE, International Perspectives in Victimology, *Academic Journal, The Paradoxical Approach to Intimate Partner Violence in Finland* (Tokiwa International Victimology Institute (TIVI) and The Press at California State University, August 2011), Vol. 6, Issue 1, p.9

৫৪ http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/violence-against-women-lac.pdf, Visited on 10 August, 2015

৫৫ Lori B. Girshick, *"No Sugar, No Spice: Reflections on Research on Woman-to-Woman Sexual Violence."* Violence Against Women, (New York, Warren Wilson College: December 2002), Vol. 8 No. 12, p. 1500-1520

৫৬ BBC Ethics guide, *Honour crimes*, http://www.bbc.co.uk/ethics/honourcrimes/crimesofhonour_1.shtml, Visited on 10 August, 2015

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারের পছন্দের প্রার্থীকে বিয়ে করতে না চাইলেও হত্যা করা হয় অথবা পরিবারের অমতে অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে, বিবাহবর্হিভূত শারীরিক সম্পর্ক করলে, ধর্ষিতা হলে, পারিবারিক মূল্যবোধ বহির্ভূত পোশাক পরলেও পরিবারের সদস্যদের হাতে ওই নারীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।[৫৭]
সম্মানের জন্য হত্যাকাণ্ডের ঘটনা মূলতঃ আফগানিস্তান, মিসর, ইরাক,জর্ডান, লেবানন, লিবিয়া, মরক্কো, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সিরিয়া, তুরস্ক এবং ইয়েমেনে বেশি ঘটে থাকে।[৫৮] এছাড়াও ইউরোপে, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার অভিবাসী কমিউনিটির মধ্যে সম্মানের জন্য হত্যার রীতি প্রচলিত আছে। তবে এ ধরণের হত্যাকাণ্ড সবচেয়ে বেশি হয় মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়ায়।[৫৯] ভারতের উত্তরাঞ্চলের অঞ্চলগুলোতে; বিশেষ করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, ঝাড়খন্ড, হিমাচল প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশেও সম্মানের নামে নারীদের হত্যা করা হয়।[৬০] তুরস্কের আনাতোলিয়ায় সম্মানের জন্য হত্যাকাণ্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।[৬১]

যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা

যৌতুক বাংলা শব্দ। এর প্রতিশব্দ পণ। দু'টোই সংস্কৃত থেকে এসেছে। হিন্দীতে বলে দহীজ (ইংরেজিতে Dowry (ডওরি)। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে- 'Dowry' : The Property that a wife or a wifes family give to her husband upon marriage (যৌতুক হল বিবাহ উপলক্ষে কন্যা বা কন্যার পরিবারের পক্ষ থেকে বরকে প্রদেয় সম্পদ)।[৬২] বাংলা পিডিয়ায় বলা হয়েছে- বিবাহের চুক্তি অনুসারে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে যে সম্পত্তি বা অর্থ দেয় তাকে যৌতুক বা পণ বলে।[৬৩]
সাধারণ অর্থে যৌতুক বলতে বিয়ের সময় কিংবা বিয়ের আগে-পরে পাত্র বা বরপক্ষ কর্তৃক কনে পক্ষের কাছে কৃত দাবি-দাওয়াকে বুঝায়। অর্থাৎ পাত্রপক্ষ কনে পক্ষের কাছে দাবি জানিয়ে যে সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আদায় করে তাই যৌতুক। ২০০০সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমনআইনে স্বামীপক্ষের দ্বারা বিয়ের পণ হিসাবে বিয়ে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় বিয়ে স্থির থাকার শর্তে অর্থ, বিলাস সামগ্রী বা অন্যবিধ দাবিকে যৌতুক বলা হয়েছে।
যৌতুক বিষয়টি দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশে (বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা) খুবই সাধারণ বিষয়। আর এই প্রথাটিই অনেক সহিংস ঘটনার সূত্র হিসেবে কাজ করে। কনে পুড়িয়ে হত্যার মতো ঘটনাও এই সহিংসতা থেকেই আসে।
অনেকক্ষেত্রেই যৌতুকের কারণে নারীরা তাদের স্বামী কিংবা স্বামীর পরিবারের হাতে নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা যায়; কারণ কনের বাড়ি থেকে বিয়ের সময় পন দেয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, যৌতুক প্রথার কারণে হত্যার পাশাপাশি আত্মহত্যার ঘটনাও প্রচুর। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং নেপালে এই আত্মহত্যা প্রবণতা অধিক। ২০১১ সালেই শুধুমাত্র যৌতুকের কারণে ৮৬১৮জন নারীকে হত্যা করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যানটি সরকারি হলেও, বাস্তবিক পরিসংখ্যান প্রায় তিনগুন বেশি।[৬৪]

---

৫৭ Pascale Harter, '*Libya rape victims 'face honour killings*' (BBC News, Tunisian-Libyan border, 14 June 2011), http://www.bbc.com/news/world-africa-13760895, Visited on 10 August, 2015

৫৮ প্রাগুক্ত।

৫৯ *International Domestic Violence Issues*, https://goo.gl/PJRGM7, Visited on 10 August, 2015.

৬০ http://www.bbc.co.uk/worldservice/specials/1817_wawryw/page4.shtml, Visited on 10 August, 2015

৬১ Sarah Rainsford, *'Honour' crime defiance in Turkey* (BBC News, Istanbul, 19 October 2005), http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4357158.stm, Visited on 10 August, 2015

৬২ Hugh Chisholm, General Editor, *The new Encyclopedia Britanica* (UK, USA: Encyclopedia Britanica, 1911), V. 4, P. 205

৬৩ সিরাজুল ইসলাম, প্রধান সম্পাদক, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজাহান মিয়া, *বাংলাপিডিয়া*, *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ* (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম সংস্করণ: মার্চ ২০০৩, পূন: মূদ্রণ, মার্চ- ২০০৪), খ. ৮, পৃ. ৪৫৫

৬৪ http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/12/confronting-dowry-related-violence-in-india-women-at-the-center-of-justice/, Visited on 10 August, 2015

Dhaka University Institutional Repository

যৌতুকের বিস্তার

যৌতুকের উৎপত্তি সম্বন্ধে সুনির্ধারিত কোনো ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। অধুনা এ বিষয়ে গবেষকগণ এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে যা লিখেছেন এর সারমর্ম হল, প্রাচীন হিন্দুসমাজে এর উৎপত্তি হয়েছে, এটি প্রায় স্বীকৃত।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রাচীন হিন্দুসমাজে এটি ছিল কন্যাপণ। অর্থাৎ বরপক্ষ কনে পক্ষকে দিত। কনেপক্ষ বিয়ের মাধ্যমে তাদের একজন সদস্যকে হারাচ্ছে– এর ক্ষতিপূরণের জন্য কনের পরিবারকে বরপক্ষকর্তৃক বিভিন্ন সম্পদ দিত। কালক্রমে এটি বরপণে রূপ ধারণ করে।[৬৫]

উল্লেখ্য, হিন্দুদের এই কন্যাপণের সাথে ইসলামের মোহরের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা, কন্যাপণ দেওয়া হত ক্ষতিপূরণের জন্য কন্যার পরিবারকে, কন্যাকে নয়। আর মোহর দেওয়া হয় কন্যার সম্মানি হিসাবে স্বয়ং কন্যাকে, কন্যার পরিবারকে নয়। হিন্দুসমাজের কন্যাপণ কালক্রমে বরপণে রূপান্তরিত হওয়ার পিছনে যেসব কারণ রয়েছে তা হল–

১. কুলিনত্ব

প্রাচীনকালে অনার্যরা সমাজে মর্যাদা পাওয়ার আশায় আর্যদের নিকট তাদের কন্যা সম্পাদন করত। বিনিময়ে মোটা অংকের সম্পদ দিত। তখন থেকেই যৌতুক প্রথা কালক্রমে একটি সামাজিক রূপ নেয়।[৬৬] এই শ্রেণীবৈষম্য বা কুলিনত্বের কারণে হিন্দুসমাজে আজও যৌতুক প্রথা সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। বিশেষ করে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মাঝে এর প্রচলন অনেক। উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা যায়, উচ্চবর্ণের বাহ্মণরা প্রচুর যৌতুক পাওয়ার আশায় শতাধিক বিবাহ করত। এসব স্ত্রী তাদের পিতৃগৃহেই থাকত। স্বামীরা বছরে একবার দেখা করতে আসত এবং প্রচুর আতিথেয়তা ভোগ করে যাওয়ার সময় অনেক যৌতুক নিয়ে যেত।[৬৭]

২. কুলিনত্বে নতুন মাত্রার সংযোজন

উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও কুলিনত্বের মর্যাদা লাভ করে। তখন হিন্দুসমাজে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হয়। তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে ডিগ্রী অর্জন করে। এতে চাকরির বাজারে তাদের দাম বেড়ে যায় এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। তখন কন্যাপক্ষ বিভিন্ন উপহার-উপঢৌকন দিয়ে বরপক্ষকে আকর্ষণের চেষ্টা করত। তাদের উপহারের মান ও পরিমাণের উপর নির্ভর করত পাত্রের পিতা-মাতার সন্তুষ্টি। এককথায় এটি দাবি করে নেওয়ার পর্যায়ে চলে যায়। আশা ছিল শিক্ষার ফলে কুলিনত্বের ক্ষতিকর দিকগুলো দূরিভূত হবে। কিন্তু তা না হয়ে বরং কুলিনত্ব আরো শক্তিশালী হয়েছে।[৬৮]

৩. হিন্দুসমাজের উত্তরাধিকার আইন

একে যৌতুক প্রথার উৎপত্তির একটি মৌলিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। হিন্দু-আইনের মিতাক্ষারা ও দায়ভাগ– উভয় মতবাদের আলোকেই সাধারণত কন্যা পিতার সম্পত্তি পায় না। বিশেষ করে দায়ভাগ মতবাদ অনুযায়ী সম্পত্তিতে বিবাহিতা কন্যার অংশিদারিত্ব অনেকটাই অনিশ্চিত।

---

৬৫ বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৫৫ সিরাজুল হক, *ইসলাম ও যৌতুক* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ), পৃ. ১৫

৬৬ বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৫৫

৬৭ বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃ. ৪৫৫

৬৮ বাংলাপিডিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ৮, পৃষ্ঠা: ৪৫৫ এবং সিরাজুল হক, *ইসলাম ও যৌতুক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ: ১৫

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু আইনে স্পষ্ট উল্লেখ আছে- পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র বা বিধবা থাকতে কন্যা পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ লাভ করতে পারে না এবং অবিবাহিতা কন্যা বিবাহিতা কন্যার উপর প্রাধান্য পায়। কন্যা কখনো এই সম্পত্তি পেলে তা শুধু ভোগের অধিকার থাকে। তাতে স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না।[৬৯]

হিন্দু আইনে এ সম্পত্তিকে নারীর মূল সম্পত্তি বা স্ত্রীধন বলা হয় না। নারীর স্ত্রীধন বলতে বুঝায়, যাতে তার স্বত্বও প্রতিষ্ঠিত হয় তা হল, পিতামাতা, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য আত্মীয়ের দান এবং বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যহল যৌতুক।[৭০]

হিন্দুসমাজে নারীরা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন দিক থেকে নির্যাতিত। উত্তরাধিকারের বিষয়েও তারা চরমভাবে বঞ্চিত হয়েছে। বৌদ্ধায়নের শাস্ত্রে লেখা আছে, স্ত্রী লোকেরা বুদ্ধিহীন, তাহাদের কোন বিচারশক্তি নাই, তাহারা উত্তরাধিকার লাভের অযোগ্য।[৭১]

হিন্দু আইনে উত্তরাধিকার সূত্রে নারীরা কোন স্ত্রী-ধন (যে সম্পদে নারীর স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়) পায় না। তাই বিয়ের সময় যৌতুক দেওয়ার নামে তাদের স্ত্রী-ধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৭২] এটিই পরবর্তীতে বর্তমান সর্বগ্রাসী যৌতুকের রূপ লাভ করেছে।

আরো লক্ষণীয় হল, হিন্দু আইনে স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার অংশগ্রহণ প্রায় অনিশ্চিত। কারণ পুত্র, পৌত্র অথবা প্রপৌত্রের মধ্যে কেউ জীবিত থাকলে বিধবা তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির কিছুই পায় না। ওরা না থাকলে যদি কখনো পায় তবে তা শুধু ভোগস্বত্ব। এজন্য বিধবার মৃত্যুর পর স্বামী থেকে প্রাপ্ত সম্পদে তার পরবর্তী ওয়ারিসরা উত্তরাধিকার না হয়ে তার মৃত স্বামীর ওয়ারিশরা উত্তরাধিকার হয়।[৭৩]

বিধবার একমাত্র স্ত্রীধন হচ্ছে বিভিন্ন দান ও বিয়ের সময় প্রাপ্ত যৌতুক। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে, 'Another function of a dowry in some societies has been to provide the wife which a means of support in case of her husband's death. In this latter case the dowry is a substitute for a share compulsory in the succession or the inheritance of the husband's landed property.'[74]

মোটকথা, হিন্দু সমাজের বিভিন্ন রীতিই বর্তমান ভয়াবহ যৌতুক প্রথার উৎপত্তির মূল কারণ। ১৯ শতক থেকে ২০ শতকের মধ্যে ইউরোপেও এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়; কিন্তু প্রাচীন মুসলিম সামজে যৌতুকের কোনো অস্তিত্ব ছিল বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায় এর ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশের নাম উল্লেখ করা হয়নি। বিংশ শতকের শুরুতে হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজকে যখন যৌতুক প্রথা অস্থির করে তুলেছিল তখন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজ নিশ্চিন্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত ছিল। শুধু তাই নয়, মুসলিম সমাজের মেয়েদের কদরও ছিল অনেক বেশি। দীর্ঘদিন যাবৎ হিন্দু সমাজ ও মুসলিম সমাজ একত্রে বসবাসের কারণে সাম্প্রতিককালে আরো বিভিন্ন কুপ্রথার মতো এই যৌতুক কুপ্রথাটিও মুসলিম সমাজে সংক্রমিত হয়।

---

৬৯ নির্মলেন্দু ধর, *হিন্দু আইন* (ঢাকা, রেমিসি পাবলিশার্স প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, পঞ্চম সংস্করণ- ১ নভেম্বর ২০১৩), পৃ. ৩৬-৩৭

৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১৮

৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭

৭৪ Hugh Chisholm, General Editor, *The new Encyclopedia Britanica*, Ibd. V. 4, P. 204

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ বিভিন্নরূপে যৌন নির্যাতন

নারী নির্যাতনের সবচেয়ে বড় মাধ্যম যৌন নিগ্রহ। বেশ কয়েক প্রকারের যৌন নির্গহ হতে পারে। ধর্ষ, ধর্ষিতার প্রতি সহিংসতা, ইভ টিজিং, এসিড সন্ত্রাস, নারী শিশু পাচার, যৌন হয়রানি, অপবাদ আরোপ কিংবা বিধবাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। উল্লিখিত বিষয়গুলো নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতনের যে কোন মাত্রাকে হার মানিয়ে দেয়। এ বিষয়গুলোই তুলে ধরা হলো এ আলোচনায়।

ধর্ষণ

ধর্ষণ একপ্রকার যৌন অত্যাচার। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা অনুমতি ব্যতিরেকে যৌনাঙ্গের মিলন ঘটিয়ে বা না ঘটিয়ে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত হওয়াকে ধর্ষণ বলা হয়। সাধারনভাবে ধর্ষণ বলতে বুঝায়, নারী বা পুরুষ যে কোন একজনের অমতে জোরপূর্বক যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাকে। তবে আমরা যে সমাজে বাস করি তার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ষণের শিকার শুধুমাত্র নারীরা। কিন্তু আমাদের এই ধারণা পুরোপুরিভাবে 'ধর্ষণ'কে সংজ্ঞায়িত করে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ধর্ষণের সংজ্ঞা হলো:

Rape is a type of sexual assault usually involving sexual intercourse, which is initiated by one or more persons against another person without that person's consent.[75]

অন্য আরেকটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, 'The term rape is sometimes used interchangeably with the term sexual assault.'[76]

দন্ডবিধি ১৮৬০ – The Penal Code ১৮৬০: ৩৭৫-৩৭৬ ধারায় 'ধর্ষণ'কে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তা হলো, 'যদি কোন পুরুষ নিম্নবর্ণিত পাঁচ প্রকারের যে কোন অবস্থায় কোন নারীর সাথে যৌন সহবাস করে তবে সে ব্যক্তি নারী ধর্ষণ করেছে বলে গণ্য হবে-

প্রথমতঃ কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌন সহবাস করলে।

দ্বিতীয়তঃ কোন নারীর সম্মতি ছাড়া যৌন সহবাস করলে।

তৃতীয়তঃ মত্যু বা আঘাতের ভয় দেখিয়ে সম্মতি আদায় করে কোন নারীর সাথে যৌন সহবাস করলে।

চতুর্থতঃ কোন নারীকে মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা আইনসঙ্গতভাবে বিবাহিত স্বামী বলে বিশ্বাস করিয়ে সম্মতি আদায় করে সঙ্গম করলে, যদিও ঐ পুরুষটি ভাল করেই জানে যে সে উক্ত নারীর স্বামী নয়।

পঞ্চমতঃ যদি কোন নারীর বয়স চৌদ্দ বছরের কম হয় তাহলে তার সম্মতি নিয়ে যৌন সহবাস করলেও ধর্ষণ হবে এবং সম্মতি ছাড়া যৌন সহবাস করলেও ধর্ষণের অপরাধ করেছে বলে বিবেচিত হবে।

এই ধারায় একটি ব্যতিক্রম অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যতিক্রমটি হলো কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে যৌন সহবাস করলে ধর্ষণের অপরাধ হয় না, তবে স্ত্রীর বয়স তের বছরের কম হলে ধর্ষণের অপরাধ সংঘটিত হয়।[৭৭]

বাংলাদেশের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এ রয়েছে–

৯। (১) যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা: যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত ষোল বছরের অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা ষোল বৎসরের কম বয়সের

---

৭৫ Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi and Rafael Lozano, *World report on violence and healt* (Geneva : World Health Organization, 2002), p. 149

৭৬ Hedge Barbara, edited by Jenny Petrak, *The Trauma of Sexual Assault Treatment, Prevention and Practice.* (Chichester: John Wiley & Sons, 2003), p. 2

৭৭ দন্ডবিধি ১৮৬০– (The Penal Code: 1860, 6th October, 1860), ৩৭৫-৩৭৬ ধারা, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা উক্ত ধর্ষণ পরবর্তী তাহার অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ধর্ষিতা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুন্য এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন এবং ধর্ষণের ফলে উক্ত নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে বা তিনি আহত হন, তাহা হইলে ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুন্য এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে-

(ক) ধর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(খ) ধর্ষণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অনুন্য পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৫) যদি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিতা হন, তাহা হইলে যাহাদের হেফাজতে থাকাকালীন উক্তরূপ ধর্ষণ সংঘটিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ধর্ষিতা নারীর হেফাজতের জন্য সরাসরিভাবে দায়ী ছিলেন, তিনি বা তাহারা প্রত্যেকে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য, অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অনুন্য পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুন্য দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

টিকা দুটিতে আছে: 'ষোল বৎসরের' শব্দগুলি 'চৌদ্দ বৎসরের' শব্দগুলির পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

উল্লেখিত আইনে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং অতিরিক্ত কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ধর্ষণের অপরাধ সংঘটিত না হলেও শুধুমাত্র ধর্ষণের চেষ্টার জন্য সর্বোচ্চ দশ বছর কিন্তু কমপক্ষে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, অনুপ্রবেশই নারী ধর্ষণের অপরাধ রূপে 'গণ্য হবার যোগ্য যৌনসহবাস' অনুষ্ঠানের জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

ধর্ষণ শুধু বাংলাদেশেই নয়, এটা একটা বড় ধরনের বৈশ্বিক সমস্যা। ধর্ষণ মানেই এক ধরনের যৌন সহিংসতার অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যক্ষ জোরপূর্বক যৌনসংসর্গ। পুরুষও কদাচিৎ ধর্ষণের শিকার হয়ে থাকেন। তবে নারীর ক্ষেত্রে এর হার অনেক অনেক গুণ বেশি। বলতে গেলে প্রায় ৯৯.৯৫ ভাগ। ২০০৮ সালে সারা বিশ্বে ধর্ষণের ঘটনাগুলোকে আমলে এনে সৃষ্ট পুলিশী প্রতিবেদন থেকে জানা যায় এর সার্বিক চিত্র। এ প্রতিবেদন মূলত অসংখ্য জরিপকে একীভূত করেছে। গড়ে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) নারীর ওপর জরিপ চালানো হয়। দেখা যায়, মিশরে ধর্ষণের হার ০.১ শতাংশ, লেসেথো-এ ৯.১ শতাংশ এবং লিথুনিয়ায় ৪.৯; যেটিকে মাঝামাঝি ধরা যেতে পারে[৭৮]। ১৯৯৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মেডিকেল এসোসিয়েশনের ভাষ্যের দিকে চোখ দেয়া যেতে পারে। সংস্থাটি বলছে, যার সত্যতাও যথেষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, ধর্ষণ হচ্ছে সবচেয়ে কম নথিবদ্ধ সহিংসতার উদাহরণ।[৭৯] তাছাড়া পৃথক বিচারালয়ে ধর্ষণের অভিযোগ গঠন, বিচার পরিচালনা ও প্রমাণসাপেক্ষে দোষী সাব্যস্ত করার ঘটনায় বিপুল তারতম্য দেখা যায়। পৃথক বেশ কিছু সমীক্ষা থেকে প্রতীয়মান হয়, নারীর ওপর যৌন সহিংসতার ঘটনা যতটা অপরিচিত

---

৭৮ *Rape at the National Level, number of police recorded offenses*, (United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems (UN-CTS)).

৭৯ American Medical Association, *Sexual Assault in America*, (Chicago: AMA, 1995).

Dhaka University Institutional Repository

লোকের দ্বারা ঘটে, তারচেয়ে বেশি ঘটে পরিচিত লোকের দ্বারা। অপরাধ অনথিভুক্ত থাকার এটি একটি কারণ হতে পারে। তাছাড়া মৃত্যুভীতি ও সমাজভীতির বিষয় তো রয়েছেই।[৮০]

ধর্ষিতার প্রতি সহিংসতা

ধর্ষণের শিকার নারীকে ধর্ষণ পরবর্তীতে ধর্ষকের, সংস্কৃতির, নিজ পরিবারের এবং আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে শারীরিক নির্যাতন থেকে শুরু করে অনেক হুমকির মুখোমুখি হতে হয়। এমনও হয়েছে যে, ধর্ষিত নারীটি ধর্ষকের বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনের হাতেও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। অবশ্য ধর্ষকের বিরুদ্ধে যাতে কোনো বিচার না করা হয় কিংবা ধর্ষককে যাতে চিহ্নিত না করা হয় সেজন্যও অনেকভাবে নারীর উপর নির্যাতন করা হয়। আবার কখনো যদি কোনো নারী ধর্ষণের জন্য আইনের কাছে বিচার চাইতে যায়, তখন তাকে বিভিন্ন পর্যায়ে গঞ্চনারও শিকার হতে হয়। অনেক দেশে ধর্ষণের শিকার নারীকে সম্মানহানির কারণে পরিবারের সদস্যরা হত্যাও করে থাকে।[৮১]

বৈবাহিক ধর্ষণ

বিবাহিত অবস্থাতেও নারীর সঙ্গে জোরপূর্বক যৌনমিলকে ধর্ষণ হিসেবে বলা হয়েছে। যদিও এটা বিভিন্নভাবে অবেহলা বা এড়িয়ে যাওয়া হয়। আন্তর্জাতিক কনভেনশন করে বিষয়টিকে আইনের আওতায় আনা হয়েছে, যাতে অপরাধের মাত্রা কমানো যায়। এখনও অনেক দেশে স্বামীর হাতে ধর্ষণকে বৈধ মানা হয়। বিবাহ, ধর্ষণ, যৌনতা, লিঙ্গভিত্তিক কর্মকাণ্ড এবং আত্মমর্যাদার প্রশ্নে ঐত্যিগতভাবেই কিছু ভিন্নতা রয়েছে। ১৯৬০-৭০ সালের দিকে পশ্চিমা দেশগুলোতে স্বামীর হাতে স্ত্রীর ধর্ষণ হওয়ার বিষয়টিকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার কিছু দেশ এবং ইউরোপের সাবেক কমিউনিস্ট ব্লকগুলোতে ১৯৭০ সালের পূর্বেও স্বামীর হাতে ধর্ষণ বৈধ ছিল। যদিও পরবর্তী ত্রিশ বছরে অনেক পরিবর্তন হয় ওই দেশগুলোতে।

কানাডাতে ১৯৮৩ সালে বৈবাহিক সম্পর্ককালীন ধর্ষণকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। সে সময় ধর্ষণকে যৌন হয়রানি আখ্যা দেয়া হয়।[৮২] আয়ারল্যান্ড এটা অবৈধ ঘোষণা করে ১৯৯০ সালে।[৮৩] পশ্চিমের দেশগুলোতে প্রায় আড়াইশ বছর ধরে এই কালো কানুনটি প্রচলিত ছিল। ১৯৯১ সালে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস, একই বছর নেদারল্যান্ডস এবং ইউরোপের সর্বশেষ দেশ হিসেবে জার্মানি ১৯৯৭ সালে এ বিষয়ে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[৮৪]

প্রসঙ্গ: বিবাহোত্তর ধর্ষণ। এ বিষয়টি এতোটাই উপেক্ষিত যে শব্দটা অনেকেরেই চমকিত হওয়ার কারণ। বিবাহোত্তর ধর্ষণ বিষয়ে ধর্মীয় মতভেদ রয়েছে। দুটো প্রধান ধর্ম; খ্রিস্ট ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। উল্লেখ্য, দুই ধর্মেই বিবাহপূর্ব যৌনসংসর্গ পাপ হিসেবে স্বীকৃত। বাইবেলের ১ করিন্থিয়ান ৭:৩-৫ এ বিবাহোত্তর কর্তব্য সম্বন্ধে বলা আছে। 'স্ত্রীর নিজ শরীরের ওপর অধিকার নেই, সে অধিকার স্বামীর। আর একইভাবে স্বামীরও নিজ শরীরের ওপর অধিকার নেই, আছে তার স্ত্রীর। সুতরাং কেউ কারও সঙ্গে বঞ্চনা কোরো না।'[৮৫] বাইবেলের এ বাণীকে অনেক গোঁড়া বিবাহোত্তর ধর্ষণের বিরুদ্ধে কাজে লাগান। এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ রাসুল (স.) এর

---

৮০ Antonia Abbey, Renee BeShears, A. Monique Clinton-Sherrod, Pam McAuslanof, Women Quarterly, *"Similarities and differences in women's sexual assault experiences based on tactics used by the perpetrator"* (Department of Community Medicine and Psychology, Wayne State University, 2004), Issue : 28, p. 323–332

৮১ http://zeenews.india.com/news/uttar-pradesh/rape-victim-threatened-to-withdraw-case-in-up_694364.html, & http://www.bbc.com/news/world-africa-13760895 , Visited on 10 August, 2015

৮২ William O'Grady. *Crime in Canadian Context: debates and controversies* (London, Oxford University Press, 2011)

৮৩ Jennifer Temkin, *Rape and the legal process* (Oxford University Press, 2002), p. 86

৮৪ Marita Kieler, Tatbestandsprobleme der sexuellen Nötigung, Vergewaltigung sowie des sexuellen Mißbrauchs widerstandsunfähiger Personen, (Tenea; 2003)

৮৫ https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+corinthians%207:3-7:5&version=NKJV, Visited on 10 August, 2015

Dhaka University Institutional Repository

একটি হাদীসকেও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। গুড়ার্থ উদ্ধার না করে, কিংবা ভুল ব্যাখ্যা করে তারা নিম্নোক্ত হাদীসকে ইসলামে বিবাহোত্তর ধর্ষনের উৎসাহদান কিংবা অনুমতি হিসেবে গণ্য করে থাকে। রাসুল (স.) বলছেন, 'স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করার পর স্ত্রী যদি সে আহ্বান অগ্রাহ্য করে; এবং এতে স্বামী যদি রুষ্ট হয়ে বিছানা নেয়, তবে ভোর হওয়ার আগ পর্যন্ত ফেরেশতারা ওই স্ত্রীকে অভিশাপ দিতে থাকে।'[৮৬] মূলতঃ পারিবারিক শান্তি এবং দাম্পত্য জীবনের সম্পর্ক অটুট রাখার লক্ষ্যে রাসুল (স.)-এর কাছ থেকে হাদীসটি বর্ণিত হলেও তাকে ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে ইসলাম বিদ্বেষীরা। এই হাদীসটি ব্যবহার কওে অনেকে তো বিবাহোত্তর ধর্ষণের বিষয়টিকে তাচ্ছিল্য সহকারে উড়িয়ে দিয়ে থাকেন।

ইভটিজিং

ইভটিজিং আমাদের যাপিত জীবনের এক প্রাত্যহিক দুষ্ট ক্ষত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেশের হাজারো সমস্যা ছাপিয়ে ইভটিজিং এখন প্রধান সামাজিক সমস্যা। সাম্প্রতিকালে ভয়ংকর এ সমস্যার হিংস্র থাবায় ক্ষত বিক্ষত ও অপমানের দহনে জ্বলতে থাকা বহু কিশোরী-তরুণীর আত্মহননের নির্মম পথ বেছে নেয়া এবং সেই সাথে ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটেদের হাতে জাতি গড়ার কারিগর মহান শিক্ষক কিংবা মমতাময়ী মা ও অভিভাবকের মৃত্যুতে সৃষ্টি হয়েছে গভীর উদ্বেগ।

ইভটিজিং প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি, পথেঘাটে উত্যক্ত করা বা পুরুষ দ্বারা নারীনিগ্রহ নির্দেশক এমন একটি কাব্যিক শব্দ যা মূলতঃ ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও নেপালে ব্যবহৃত হয়। 'ইভ' দিয়ে পৌরানিক আদিমাতা হাওয়া অর্থে সমগ্র নারীজাতিকে বোঝানো হয়।

এটি তারুণ্যে সংঘটিত একধরনের অপরাধ। এটি একধরনের যৌন আগ্রাসন, যার মধ্যে রয়েছে যৌন ইঙ্গিতবাহী মন্তব্য, প্রকাশ্যে অযাচিত স্পর্শ, শিস দেওয়া বা শরীরের সংবেদনশীল অংশে হস্তক্ষেপ। কখনো কখনো একে নিছক রসিকতা গণ্য করা হয় যা অপরাধীকে দায় এড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অনেক নারীবাদী সংগঠন আরো উপর্যুক্ত শব্দ দিয়ে ইভটিজিংকে প্রতিস্থাপনের দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে 'ইভ' শব্দের ব্যবহার নারীর আবেদনময়তাকে নির্দেশ করে, যে কারণে উত্ত্যক্ত হওয়ার দোষ নারীর উপর বর্তায়, আর পুরুষের আচরণ আগ্রাসনের পরিবর্তে স্বাভাবিক হিসেবে ছাড় পায়।

ইভটিজাররা নানান সৃজনশীল কৌশলে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে থাকে। ফলে এ অপরাধ প্রমাণ করাও কঠিন। এমনকি অনেক নারীবাদী একে 'ছোটখাটো ধর্ষণ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

অপরিচিত কারো হাতে যৌন হয়রানির যে কোনো ধরনের ঘটনা অপরাধ হিসেবে প্রমান করা খুব কঠিন। কারণ সমাজে বিভিন্ন স্থানভেদে হয়রানির বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে। ইভটিজিংয়ের মতো ঘটনা জনসমক্ষে, রাস্তায় এবং গণপরিবহনেও হতে পারে।[৮৭] কিছু নারীবাদী লেখক দাবি করেন যে, এ ধরনের ব্যবহার ক্ষুদ্রার্থে ধর্ষণের সমান।[৮৮] কিছু দিক-নির্দেশিকা বইয়ে (গাইডবই) অবশ্য নারীদের রক্ষণশীল পোশাক পরিধান করে পুরুষের এ ধরনের আচরণের শিকার না হতে বলে। যদিও ভারতীয় নারী এবং রক্ষনশীল পোশাক পরা অনেক বিদেশী নারীও হয়রানির অভিযোগ করে থাকেন।[৮৯]

---

৮৬ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৩), খ. ৪, পৃ. ৩০৯, হাদীস নং- ৩৪০৬

৮৭ Farah Faizal, Swarna Rajagopalan, *"In Public Spaces: Security in the Street and in the Chowk", Women, Security, South Asia: A Clearing in the Thicke* (California: SAGE Publications, October 3, 2005), p. 45

৮৮ Emerson Dobash, Rebecca, Russell, *Rethinking Violence Against Women* (California: SAGE Publications, 1998), p. 58

৮৯ Nidhi Dutt, *Eve teasing in India: Assault or harassment by another name*, (Mumbai: BBC News, 13 January 2012), http://www.bbc.com/news/magazine-16503338, Visited on 10 August, 2015

Dhaka University Institutional Repository

ইভটিজিং কী?

খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থের নাম বাইবেলের প্রধান চরিত্র Adam এবং Eve, পবিত্র কোরআনে তাঁদেরকে বলা হয়েছে আদম এবং হাওয়া। বাইবেলের Eve ও কোরআনের হাওয়া একজনই। সুতরাং, এই Eve শব্দটির উৎপত্তি বাইবেলে। বাইবেলে Eve শব্দ দ্বারা হাওয়াকে বুঝালেও বর্তমানে শব্দটির অর্থের ব্যপকতা লক্ষ্য করা যায়। Eve শব্দটির যৌগিক অর্থ হাওয়া; কিন্তু গুড়ার্থে রমনী, নারী, নায়িকা, প্রিয়তমা। ব্যবহারিক অর্থ আরো আছে। সাধারণত ১৩ থেকে ১৯ বছরের মেয়েদেরকে বোঝায়, যাদের বলা হয় 'teen ager'। Eve teasing বলতে নারীকে বিরক্ত করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইয়ার্কি ঠাট্টার মাধ্যমে আমরা দাদি-নানিকেও বিরক্ত করি। কিন্তু সেটা Eve teasing এর মধ্যে পড়ে না।

ইভটিজিং-এর সংজ্ঞা

ইভটিজিং শব্দটি যৌন হয়রানির একটি অমার্জিত (slang) ভাষা। ইভ Eve দ্বার বাইবেলে বর্ণিত প্রথম নারী হাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। আর টিজিং (Teasing) বলতে ঠাট্টা করা, বিরক্ত করা, বিব্রত করা ইত্যাদি বুঝায়।[৯০] সুতরাং ইভটিজিং (Sexual Harassment) বলতে নারীর প্রতি বিব্রতকর, লজ্জাকর, নিপীড়নমূলক যে কোনো আচরণ বুঝায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ শব্দটি (Sexual Harassment) এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত। ১৯৯৯ সালে সাংবাদিক সুসান ব্রাউন মিলার সর্বপ্রথম (Susan Brown Miller) in our time; memoir of a Revolution, New york, Dial priss, ১৯৯৯ উক্ত গ্রন্থেও ভূমিকায় উল্লেখ আছে, "There once was a time when the concept of equal pay for equal work did not exist, when women of all ages were "girls", when abortion was a back-alley procedure, when there was no such thing as a rape crisis center or a shelter for battered women, "sexual harassment" had not yet been named and defined."

পরিভাষায় ইভটিজিং একটি ব্যাপকার্থক পরিভাষা, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুসারে ইভটিজিং (যৌন হয়রারি ও নিপীড়ন) বলতে বুঝায়: শারীরিক স্পর্শের মত অপ্রত্যাশিত যৌনকাঙ্খামূলক ব্যবহার। প্রশাসনিক, কর্তৃত্বমূলক অথবা পেশাগত ক্ষমতার অপব্যবহার করে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্বেগ বা চেষ্টা, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষাগত আচরণ, যৌন সম্পর্কের দাবি বা অনুরোধ, পর্নোগ্রাফি প্রদর্শন, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গি। অশালীন অঙ্গভঙ্গি, অশালীন ভাষায় প্রয়োগসহ যৌন কামনা থেকে হয়রানি। চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল ফোন, এসএমএস, পোস্টার, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, নোটিশ বোর্ড, দেয়ালে লিখনের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা। ব্ল্যাকমেইলিং এবং চরিত্র হনন-এর উদ্দেশ্যে স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ। লিঙ্গীয় ধারণা থেকে বা যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, খেলাধূলা, সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক তৎপরতায় বাধা প্রদান। প্রেমের প্রস্তাব দেওয়া এবং প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণে চাপ সৃষ্টি ও হুমকি প্রদান। মিথ্যা আশ্বাস, প্রলোভন বা প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা।

'২০০৮ সালে যৌন হয়রানি রোধে বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক রীট আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০০৯ সালের ১৪ই মে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানি ও নিপীড়নরোধের লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রদানপূর্বক নির্দেশনাবলী জারি করেন। বিচারপতি এ. এফ. সোলায়মান চৌধুরী বলেন, সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে আরেক ব্যক্তি সভ্যতা, ভদ্রতা ও নীতি নৈতিকতা জলাঞ্জলি দিয়ে অশালীন ও আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি বা বাক্য প্রয়োগ করার একটি মারাত্মক রূপ ইভটিজিং।[৯১]

সর্বোপরি ইভটিজিং হলো ব্যক্তি চরিত্রের নগ্নরূপের এক চরম বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ আচরণ, যা শারীরিক নির্যাতন, 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৮নং আইন) এর '৩' নং ধারার 'ক'

---

[৯০] Editorial Board, *Britannica* (USA: Encyclopaedia Britannica, Inc, 1768), Vol.5, p.119

[৯১] উপ-সম্পাদকীয় কলাম, *ইভটিজিং আপন বেঁধে রাখি* (ঢাকা: দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৬ নভেম্বর ২০১০)

Dhaka University Institutional Repository

নং উপধারা: "শারীরিক নির্যাতন" অর্থে এমন কোন কাজ বা আচরণ করা, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির জীবন, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা বা শারীরের কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে অপরাধমূলক কাজ করিতে বাধ্য করা বা প্ররোচনা প্রদান করা বা বলপ্রয়োগও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে'। মানসিক নির্যাতন 'পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৮নং আইন) এর '৩' নং ধারার 'খ' নং উপধারাা: 'মানসিক নির্যাতন' অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহও অন্তর্ভূক্ত হইবে, যথা: (অ) মৌখিক নির্যাতন, অপমান, অবজ্ঞা, ভীতি প্রদর্শন বা এমন কোন উক্তি করা, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি-মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়; (আ) হয়রানি; অথবা (ই) ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অর্থাৎ স্বাভাবিক চলাচল, যোগাযোগ বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা মতামত প্রকাশের উপর হস্তক্ষেপ। যৌন নির্যাতন "পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৮নং আইন) এর '৩' নং ধারার 'গ' নং উপধারা: 'যৌন নির্যাতন' অর্থে যৌন প্রকৃতির এমন আচরণও অন্তর্ভূক্ত হইবে, যাহা দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্ভ্রম, সম্মান বা সুনামের ক্ষতি হয়'। নারী নির্যাতন 'জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত (১৯৯৩-এর ডিসেম্বর) নারী নির্যাতন বিষয়ক ঘোষণার (UN Declaration on the Elimination of Violence against Women) এর ধারা (১) : এই ঘোষণা মতে নারী নির্যাতন বলতে বুঝাবে সেই ধরণের জেন্ডারভিত্তিক সহিংস আচরণ, যাতে নারীর শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি ও দুঃখ কষ্টের কারণ হবে এবং যাতে কোনো নারীর ব্যক্তিগত ও বাইরের জীবনে নিষ্ঠুরভাবে কোনো স্বাধীনতায় আঘাত ও বাধা সৃষ্টি করে'।

মানহানি– বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪৯৯ ধারা 'মানহানি (Deffamation) : যদি কোন ব্যক্তি জেনে বা ইচ্ছাকৃতভাবে অপর কোন ব্যক্তির নিন্দাবাদ প্রণয়ন করে কিংবা সুনাম নষ্ট করার জন্য কোন কার্য করে, তবে সেই ব্যক্তি উক্ত অপর ব্যক্তির মানাহানি করেছে বলে গণ্য হবে।' ইসলামী আইনে মানহানি বলতে– মিথ্যা রটনা, ভুল ধারণা, বিদ্রুপ করা, হেয় প্রতিপন্ন করা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। মনাহানি সম্পর্কে মাহাগ্রন্থ আল-কুরআনের কতিপয় আয়াত, সূরা আল-হুজরাত: ৬, ১১-১২, সূরা আন-নূর: ০৪, সূরা আল-ইসরা: ৩৬, সূরা আল-হুমাযাহ: ০১।[৯২] ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে যা ফৌজদারী কার্যবিধি 'ফৌজদারী কার্যাবলী' Code of criminal procedure, ১৮৯৮ (Act 5 of 1898)" অর্থ, মোতাবেক অপরাধ বলে গণ্য, যা শিশু, 'শিশু' আঠারো বছর পূর্ণ হয় নাই এমন কোন ব্যক্তি।[৯৩]

ইসলামী দৃষ্টিকোণে 'শিশু' হলো, ১৪/১৫ বছরের পূর্ব পর্যন্ত।[৯৪]সাবালক, 'বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অন্য সব ব্যক্তি (১ম অনুচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত) আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার পর সাবালকত্ব লাভ করেছে মর্মে গণ্য হবে এবং তদ্‌পূর্বে নয়।[৯৫]

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উত্যক্ত করা ও মানহানি করা অর্থে পবিত্র কুরআনে ইভটিজিং শব্দের ব্যবহার হয়েছে। মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী: 'হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে (পর্দানশীন হিসেবে) চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।'[৯৬] এছাড়া কুরআনে একে অপবাদ নামের সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে- 'যারা সতী-স্বাধী, নীরিহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকাল ও পরকালে ধীকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।[৯৭]

---

[৯২] তারেক মোহাম্মদ জায়েদ ও শহীদুল ইসলাম, *প্রচলিত ও ইসলামী আইনে মানহানি : এক তুলনমূলক বিশ্লেষণ, ইসলামী আইন ও বিচার* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগেল এইড সেন্টার, সংখ্যা: ২৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর: ২০১০), পৃ. ১২৯-১৪৭

[৯৩] পরিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ (২০১০ সালের ৫৮ নং আইন) এর '২' নং ধারার '১৮'নং উপধারা

[৯৪] মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান, *ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর বয়স–সীমা: সমস্যা ও সমাধান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বর্ষ: ৪৮, সংখ্যা: ৪র্থ, এপ্রিল-জুন: ২০০৯), পৃ. ১৯৫

[৯৫] সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ (১৮৭৫ সালের ৯নং আইন) এর '৩' নং ধারার ২য় অনুচ্ছেদ

[৯৬] আল কুরআন, ৩৩:৫৯

[৯৭] আল কুরআন, ২৪: ২৩

Dhaka University Institutional Repository

ইভটিজিং যে কেবল টিনএজারের মধ্যেই ঘটে তা নয়। যে কোন মেয়ে বা নারী–যে বয়সের হোক না কেন, অন্য কোন পুরুষ কর্তৃক আপত্তিকর আচরণের শিকার হলেই তা ইভটিজিং। বিবাহ-পূর্ব ভালোবাসা, অশালীন কথাবার্তা বলা, প্রেমপত্র, মোবাইল ফোনে শ্রুতিকটু আলাপ, জনতার ভিড়ে পরপুরুষ কর্তৃক ইচ্ছাকৃত ধাক্কা-ধাক্কি, স্পর্শ করা, চোখের ভাষায় অশুভ ইঙ্গিত করা, কথনে, ইঙ্গিতে ইন্দ্রীয় অনুভুতি উপলব্ধি করবার দূরভিসন্ধিকে ইভ টিজিং বলা হয়।

ইভটিজিং-এর ইতিহাস

ইভটিজিংয়ের এই সমস্যাটি প্রথম জনসমক্ষে আসে ১৯৭০ সালে।[৯৮] ওই দশকে অনেক নারী কলেজে এবং কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত শুরু করে, এর মানে এই যে, তারা আর সমাজের রীতি অনুসারে পুরুষদের হাত ধরে চলছে না। এর ফলে সমস্যাটিও উল্লেখজনকহারে বাড়তে থাকে।[৯৯] খুব শীঘ্রই ভারত সরকার অবস্থা নিরুপন করে বিচারিক এবং আইনী প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা গ্রহন শুর করে। এই ইস্যুটি বন্ধ করতে পুলিশকে ব্যবহার করা হয় এবং পুলিশ ইভটিজারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে শুরু করে। সাদা পোশাক পরিহিত নারী পুলিশ নিয়োজিত করা হয়, যা বেশ কার্যকরী ছিল। অনেক রাজ্যে পুলিশ নারীদের সহায়তার জন্য হেল্পলাইনের ব্যবস্থাও করে। শুধু তাই নয় থানাগুলোতে নারী পুলিশ এবং বিশেষ পুলিশ সেল গঠন করা হয়।

সেই সময় অনেক নারীই যৌন হয়রানি বিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ করতে আসে। আর ধীরে ধীরে বিষয়টি নিয়ে জনগণের ভাবনাও পরিবর্তন হতে থাকে। পাশাপাশি অপরাধের ঘটনাও ভিন্ন মাত্রা পেতে থাকে, অনেক স্থানেই এসিড ছুড়ে মারার মতো ঘটনাও ঘটে। আর এর ফলে তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে এসিড সন্ত্রাসকে অজামিনযোগ্য অপরাধ হিসেবে দেখা হয়। অনেকগুলো নারী সংস্থা এবং যারা নারীর অধিকার নিয়ে কাজ করে তারা বলতে থাকেন যে, ওই সময় অনেক গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। এর আগে এমন অপরাধগুলোকে সামাজিকভাবে অথবা আইন প্রয়োগকারী সংস্থারাই মিটিয়ে নিতো। কিন্তু নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইন করার জন্য অনেক সংস্থার অবিরত কাজ করতে থাকলে 'দ্য দিল্লি প্রোহিবিসন অব ইভটিজিং (দিল্লি ইভটিজিং নিষিদ্ধকরণ) বিল ১৯৮৪' পাস হয়।[১০০]

ভারতের চেন্নাইয়ে ১৯৯৮ সালে ছাত্রী সারিকা সাহার মৃত্যু হয় দক্ষিণ ভারতের কিছু আইনের কারণে।[১০১] হত্যাকাণ্ড হয়েছে এই চার্জ গঠন করা হলেও, একে আত্মহত্যা হিসেবে দেখানোর জন্য কয়েক ডজন রিপোর্ট করা হয়েছিল।[১০২] ২০০৯ সালে ফেব্রুয়ারিতে, এমএস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তাদের পরিবার এবং বিজ্ঞান বিভাগের সামনে চারজন পুরুষের হাতে নিগৃহীত হয়। এসডি হল হোস্টেলে এক ছাত্রীর অবস্থানকে কেন্দ্র করে পুরুষ ছাত্ররা ওই সময় বাজে মন্তব্য করেছিল।[১০৩]

মাঝে মাঝে সামাজিক লোকলজ্জার ভয়ে মেয়েরা কোন অভিযোগও জানায় না। কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ জনগণের শাস্তির বিনিময়ে অপরাধীদের ছেড়ে দেয়। ২০০৮ সালে দিল্লির এক আদালত ১৯ বছর বয়সী এক তরুণকে

---

৯৮ "Eve-Teasing", *Time*, 12 September 1960. http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,897530,00.html, Visited on 20 june, 2015

৯৯ Mangai Natarajan, "Role of Women Police", *Women Police in a Changing Society: Back Door to Equality* (Farnham, UK: Ashgate Publishing Ltd, 2008), p. 54

১০০ প্রাগুক্ত।

১০১ Murder charges in eve-teasing case. *Indian Express*, 27 July 1998 https://web.archive.org/web/20121015021542/http://www.expressindia.com/ie/daily/19980727/20850084.html, Visited on 17 June, 2015

১০২ Mangai Natarajan, *"Role of Women Police"*, প্রাগুক্ত।

১০৩ The Times of India, *'MSU hostel girls beat up eve teasers'*, (Vadodara: 23 February 2009), http://goo.gl/HeDeET, Visited on 17 June, 2015

Dhaka University Institutional Repository

গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেয়। কারণ সেই তরুণ স্কুল-কলেজের বাইরে ছাত্রীদের নিয়ে বাজে বক্তব্য সম্বলিত লিফলেট প্রচার করছিল।[১০৪]

ইভটিজিং এমন একটা ব্যাধি যা শুধু নারীদের কেই না নারীদের সাথে সাথে গোটা সমাজের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইভটিজিং-এর কারনে কত মেয়ে অকালে ঝরে পড়ছে। এক দিকে মা-বাবা যেমন হারাচ্ছে তাদের সন্তান তেমনি দেশ হারাচ্ছে তার উন্নয়নের সোনালী ভবিষ্যত। দিন দিন ইভটিজিং এর প্রকোপ বেড়েই চলছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর কোন ভাল প্রতিকার হচ্ছে না। সরকার ইভটিজিং-এর বিরূদ্ধে বিভিন্ন প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করলেও এর কোন সমাধান হচ্ছে না। যার কারনে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে অনেক মেয়েই অকালে হারিয়ে যাচ্ছে। কয়েক বছর আগেও শুধু মাত্র রাস্তায় মেয়েদের ইভটিজিং এর শিকার হতে হত। কিন্তু বর্তমানে নতুন নতুন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ইভটিজাররা ইভটিজিং এর জন্য নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করছে।

রাস্তা-ঘাটে ছাড়াও অনেক সময় মোবাইল ফোনেও মেয়েরা ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে থাকে। অনেক সময় পবিত্র শিক্ষাঙ্গনে এমন কী শ্রেণী কক্ষেও মেয়েরা ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে থাকে। এর নজির পাওয়া যায় ঢাকা জেলার ধামরাই থানার হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শ্রেণীকক্ষে ক্লাস চলাকালীন সময়ে স্থানীয় এক বখাটে ছেলে ক্লাসে ঢুকে এক ছাত্রীকে উত্যক্ত করে। আবার গত ২০ মার্চ (২০১৪) নাটোরে এক স্কুল ছাত্রীকে স্কুলের ভেতরে মেয়েদের কমনরুমে ঢুকে উত্যক্ত করেছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপরাধীদের শাস্তি না হওয়ায় একই অপরাধ বার বার করে থাকে।[১০৫]

অনেক সময় অপরাধীদের অনেক সহজেই ছাড়া পেয়ে যাওয়ার কয়েকটি কারণ থাকে। তারমধ্যে একটি প্রধান কারণ হচ্ছে অভিভাবকদের নীরবতা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অভিভাবকেরা লোক-লজ্জার ভয়ে উপর্যুক্ত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। শুধুমাত্র অভিভাবকরাই নয়, ধামরাই হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘটনায় দেখা গেছে যে, শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট হওয়ার ভয়ে এই অন্যয়ের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে উল্টো বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যেখানে মেয়েরা তাদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে অভিভাবক ও শিক্ষকদের দেখে সেখানে তারা লোক-লজ্জার ভয়ে নীরব ভূমিকা পালন করে।

এ বছর ২০ মার্চ (২০১৪) এক স্কুল ছাত্রী ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। কিছু দিন পর স্কুল যাওয়া শুরু করলে একই ঘটনার পূনরাবৃত্তি ঘটে। প্রথমে মেয়েটির অভিভাবকেরা লোক লজ্জার ভয়ে চুপ করে থাকে। অপরাধীরা অনেক সময় প্রভাবশালী হওয়ার কারনে ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে। প্রভাবশালী হওয়ার কারনে ভুক্তভোগীরা সঠিক সমাধান পায় না। আইনের সহযোগিতা চাইলেও তারা অপরাধীদের দ্বারা আরও নানাভাবে হয়রানির শিকার হতে থাকে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদের অবহেলার কারনেও দোষীরা কোন শাস্তি পায় না। নাটোরের ঘটনায় দেখা যায়, স্কুলের ভেতর উক্ত ছাত্রী ইভটিজিং এর শিকার হলে স্কুল কর্তৃপক্ষ পুলিশের কাছে বিষয়টি জানালেও পুলিশ এ ব্যপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এরপর আবার উত্যক্ত করায় মেয়েটির বাবা থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়ের করার কারণে সেই বখাটে যুবকরা মেয়েটির বাবাকে মেরে আহত করে রেখে যায় এবং যাওয়ার সময় তার কাছ থেকে নগদ টাকাও ছিনিয়ে নেয়। এ ব্যপারে পুলিশের বক্তব্য, 'অপরাধীদের কাউকে ধরতে পারেনি। অপরাধীদের ধরার চেষ্টা চলছে।'

আবার ২০১২ সালের ১৭ নভেম্বর এক ঘটনায় দেখা যায় যে, নারায়ণগঞ্জের কলেজ ছাত্রী ফারহানার সাথে যে দূর্ঘটনা ঘটেছিল তার সুষ্ঠ সমাধানও হয়নি। অপরাধী শামীমকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ওই ঘটনায় অপরাধী শামীম ফারহানাকে কু-প্রস্তাব দেয়। ফারহানা প্রস্তাবে রাজি না হলে রাস্তায় অপরাধী শামীম তার

---

[১০৪] Indian Express News Service, *'Youth held for eve-teasing, told to distribute handouts',* 10 June 2008. https://goo.gl/gGdWCz, Visited on 17 June, 2015

[১০৫] তথ্য আপা প্রকল্প, http://info.totthoapa.gov.bd/gender/ইভটিজিং-□□-□□□□□. Visited on 20 August, 2015

Dhaka University Institutional Repository

শ্লীলতাহানি করে। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে ফারহানা আত্মহত্যা করে এবং তার মৃত্যুর জন্য শামীমকে দায়ী করে যায়।[১০৬]

শুধুমাত্র এক ফারহানাই নয়, প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন যায়গায় তার মত অনেক মেয়েই এমন সব জঘন্য অপরাধের শিকার হচ্ছে। যার কারনে অকালে শিক্ষা জীবন থেকে ঝরে পড়ছে অনেক মেয়ে। অনেক সময়ই দেখা যায়, নারী তার জীবনের অমূল্য সম্পদ 'সতীত্ব', এমনকি জীবন পর্যন্ত দিতে হয় অনেককে। কখনও কখনও অপরাধীর প্রস্তাবে রাজি না হলে, এসিড দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় মেয়েদের চেহারা, শরীর।

নারীদের প্রতি এসিড সন্ত্রাস

এসিড ছুড়ে মারা যাকে এসিড সন্ত্রাসও বলা হয়ে থাকে। যে বা যারা কোনো লক্ষ্য হাসিলের জন্য বা হিংসার বশবর্তী হয়ে কিংবা প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে অপর একজনের শরীরে এসিড ছুড়ে মারে, সেই ঘটনাটিকেই এসিড সন্ত্রাস বলা হচ্ছে।[১০৭] বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সালফিউরিক, নাইট্রিক অথবা হাইড্রোক্লোরিক এসিড ব্যবহার করা হয় এই কাজে। অপরাধীরা তাদের শিকারের দিকে এই রাসায়নিক উপাদানগুলো ছুড়ে মারে, বিশেষ করে মুখে। যাতে সেই মুখটি ঝলসে যায় এবং ত্বকের টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক সময় এসিড হাড়েরও ক্ষতি করে ফেলে।[১০৮] এই সন্ত্রাসের দীর্ঘমেয়াদী খেসারত হিসেবে চিরতরে অন্ধ অথবা বিকলাঙ্গও হয়ে যায় অনেকে। ৭৫-৮০ শতাংশ কেসেই এই এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয় নারী এবং শিশুরা। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত এবং কম্বোডিয়ায় এসিড সন্ত্রাসের হার সবচেয়ে বেশি।[১০৯]

নারী ও শিশু পাচার

পাচার বলতে দেশের ভেতরে অথবা দেশের সীমানার বাইরে বিক্রয়, বিনিময় বা অন্য কোন অবৈধ কাজে নিয়োগের জন্য নারী, শিশু বা কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তর করাকে বুঝায়। মানুষ নিয়ে ব্যবসা ও মুনাফাকারীরা শিশু, নারী বা কোন ব্যক্তিকে ফুসলিয়ে, অপহরণ করে, অবরুদ্ধ করে যে অবৈধ কাজ করে তাকেই পাচার বলে।

সাম্প্রতিক সময়ে মানব পাচার সবচেয়ে বেশি আলোচিত ইস্যু। থাইল্যান্ডে পাচারকারীদের ঘাঁটি উদঘাটন এবং গনকবরের সন্ধান পাওয়ার পর থেকে নড়ে-চড়ে বসে বিশ্ব মোড়লরা। এরপরই একে একে বেরিয়ে আসতে থাকে মানব পাচারের রোমহর্ষক সব ভয়ংকর কাহিনী। বাংলাদেশ থেকে অভিবাসনপ্রত্যাশী এবং মায়ানমারের বিপন্ন রোহিঙ্গা উপজাতিদের নিয়ে মানব পাচারের ভয়ংকর বাস্তবতা সামনে চলে আসে। ছোট ছোট ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে হাজার হাজার বাংলাদেশী এবং রোহিঙ্গাকে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া কিংবা ইন্দোনেশিয়া পাঠানোর নাম করে মানব পাচার করা হয়। বিষয়টি যখন প্রকাশ্যে চলে আসে, তখন থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া কিংবা ইন্দোনেশিয়া এর বিপক্ষে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। অথচ, একই সময়ে পাচারকারীদের নৌকায় করে হাজার হাজার মানুষ তখনও সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছিল। ক্ষুদা-তৃষ্ণায় হাহাকার পড়ে গিয়েছিল বিপন্ন মানুষগুলোর মধ্যে। এমনকি খাদ্যের জন্য একটি নৌকায় মারামারিতে শতাধিক মানুষের মৃত্যুর সংবাদও এসেছে মিডিয়ায়।

বিগত কয়েক দশকে সমগ্র বিশ্বজুড়ে নারী ও শিশু পাচারের মাত্রা আশংকাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ নারী ও শিশু পাচারের একটি উৎস এবং ট্রানজিট রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। প্রতিদিন এদেশ থেকে উলেখযোগ্য সংখ্যক নারী ও শিশু বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত দিয়ে, বঙ্গোপসাগর কিংবা

---

[১০৬] তথ্য আপা প্রকল্প, http://info.totthoapa.gov.bd/gender/ইভা□□□-□□-□□□□□. Visited on 20 August, 2015

[১০৭] Krishan Vij, *Textbook of Forensic Medicine and Toxicology: Principles and Practice,* (5th Edition, Elsevier India, 2003), p. 462.

[১০৮] Jordan Swanson, *'Acid attacks: Bangladesh's efforts to stop the violence'* (Harvard University: Harvard Health Policy Review, 2002), **3** (1). p. 3

[১০৯] Tom de Castella, BBC News Magazine, *'How many acid attacks are there?'* (9 August 2013). Visited on 20 August, 2015

Dhaka University Institutional Repository

বিমানযোগে পাচার হয়ে যাচ্ছে। পাচারকৃত নারী ও শিশুদের নিয়োগ করা হচ্ছে পতিতালয়ে বা অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং শ্রমঘন অমানবিক কর্মক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, পাচারকৃত নারী-শিশু কিংবা পুরুষদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করে তাদেরকে জীবনের মতো শেষ করে দেয়। বাংলাদেশের নারী ও শিশুর এ ধরণের নির্মম পরিণতি কোন সচেতন নাগরিকের কাম্য নয়। সরকার, বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন ও বেসরকারী সাহায্য সংস্থা নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহন করেছে। এই পাচার প্রতিরোধে সবচেয়ে জরুরী হলো সমাজের সকল অংশের মাঝে নারী ও শিশু পাচার প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফল সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা।

নারী ও শিশু পাচার বলতে কী বুঝায়?

বিশ্বায়নের যুগে পুঁজি, পণ্য ও প্রযুক্তির মত পৃথিবী জুড়ে শ্রমের চলাচলও সহজ হওয়ার কথা। কিন্তু জটিল ইমিগ্রেশন নীতির কারণে গত শতাব্দিগুলোর তুলনায় বতমান সময়ে বৈধ পথে শ্রম অভিবাসন অনেক কম ঘটেছে। তবে পৃথিবী জুড়ে মানুষের চলাচল থেমে থাকেনি। নানা অবৈধ উপায়ে মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে গমন করছে। বিভিন্ন ধরণের অনিয়মিত চলাচলের মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো নারী ও শিশু পাচার।

আন্তর্জাতিকভাবে নারী ও শিশু পাচারকে আধুনিকযুগের দাসপ্রথা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পাচার প্রতিরোধে সকলে একমত হলেও, পাচার কাকে বলে- এ বিষয়ে বড় ধরণের বিভ্রান্তি রয়েছে। পাচারের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, পদ্ধতি সবই আগের তুলনায় অনেক জটিল হয়ে গেছে। অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের অনিয়মিত অভিবাসন অনেক সময় পাচারের মত ফলাফল তৈরি করছে।

সাধারণত: যে কোন ধরনের শোষণের উদ্দেশ্যে জোর খাটিয়ে, ছল চাতুরী, ভয় ভীতি প্রদর্শন করে এবং চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে অথবা যাকে পাচার করতে চায় তার ওপর কতৃত্ব রয়েছে এমন ব্যক্তিকে আইন বহির্ভূত উপায়ে টাকা দেওয়া-নেওয়া করার মাধ্যমে লোক সংগ্রহ, স্থানান্তর, আশ্রয়দান ও অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ ইত্যাদি যে কোন কর্মকান্ডকে পাচার বলে গন্য করা হয়। ইন্টারন্যাশনাল অগানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের (আইওএম) ব্যাখ্যা অনুযায়ী মানুষ পাচার তখনই ঘটে যখন একজন অভিবাসী জাতীয় অথবা আর্ন্তজাতিক সীমান্ত অতিক্রম করে অবৈধভাবে (চাকুরি প্রাপ্তির নিমিত্তে, অপহৃত হয়ে, বিক্রিত হয়ে) কোন কাজে নিযুক্ত হন। পাচারকারী এই কর্মকান্ডের যে কোন পর্যায়ে উক্ত অভিবাসীকে প্রতারণা, পীড়ন বা অন্য যে কোন শোষণের মাধ্যমে তার মানবাধিকার লঙ্ঘন করে অথনৈতিক বা অন্য যেকোন প্রকার মুনাফা অর্জন করে।

জোরপূর্বক বিবাহ

জোরপূর্বক বিবাহ মানে, দুই পক্ষকেই তাদের অমতে জোর করে বিয়ে দেয়া। দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকার দেশগুলোতে জোরপূর্বক বিয়ের প্রচলন খুব বেশি। এই জোর করে বিয়ে দেয়ার কারণে প্রায়শই দুই পরিবারের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করে। আর এই অশান্তি মেটাতে অনেক সময় নারীকেই প্রাণ দিতে হয়।[১১০]

এছাড়াও এশিয়ার কিছু দেশ যেমন কিরগিজস্তান, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান এবং কাওকাসুস অথবা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ বিশেষত ইথিওপিয়ায় অপহরণ করে বিয়ে করার রীতি প্রচলিত আছে। এমনও হয় যে, জোর করে বিয়ে করতে না পেরে নারীটিকে ধর্ষণ করা হয়। আর ধর্ষণের পর অনেকসময় বিয়ে করা ছাড়া উপায় থাকে না নারীদের। তখন গ্রামবাসী একপ্রকার জোর করেই ওই ধর্ষক পুরুষের সঙ্গে নারীটির বিয়ে দিয়ে দেয়।[১১১]

সংঘবদ্ধ সহিংসতা

---

[১১০] BBC Ethics guide, *Slavery: Modern slavery*, http://www.bbc.co.uk/ethics/slavery/modern/modern_1.shtml#section_2, Visited on 20 August, 2015

[১১১] BBC News, *'Ethiopia: Revenge of the abducted bride'*, 18 June 1999, http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/371944.stm, Visited on 20 August, 2015

Dhaka University Institutional Repository

২০১০ সালে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্ট করে যে, আলজেরিয়ার হাস্‌সি মেসেউদ এলাকায় একজন নারী সংঘবদ্ধ আক্রমনের শিকার হয়েছিল। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে, কিছু নারী যৌন নিগ্রহের শিকার হয় এবং তারা যে শুধু নারী বলে আক্রমনের শিকার হয়েছে তা নয়। বরঞ্চ তারা একা বাস করে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন বলেও তাদের উপর হামলা করা হয়।[১১২]

যৌন হয়রানি

প্রকৃতিতে যৌন হয়রানি অবমাননাকর, অনাহূত এবং অনভিপ্রেত। বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। যা এক কথায় গুন্ডামি এবং বলপ্রয়োগের ক্ষমতাকেই বোঝায়। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি বা পুরস্কারের ফাঁদে ফেলে এই হয়রানি করা হয়। এটা মৌখিক বা শারীরিক দুইই হতে পারে। এবং এটা সাধারনত অধস্তনদের প্রতি উর্দ্ধতনদের আচরণ হয়ে থাকে। ১৯৬৪ সালের সিভিল রাইটস আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রে যৌন হয়রানিকে বৈষম্য হিসেবে দেখা হয়, যা ওই আইনকে লঙ্ঘন করে। দ্য কাউন্সিল অব ইউরোপ কনভেনশন নারীর প্রতি সহিংসতা এবং গৃহঅভ্যন্তরে সন্ত্রাস প্রতিরোধে যৌন হয়রানির যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে তা হলো, 'এমন অনাহূত মৌখিক, মৌখিক নয় অথবা শারীরিক সংযোগসহ অথবা ছাড়া কোনো একজন ব্যক্তির অনিচ্ছায় তার মর্যাদাহানি করাকেই বলা হচ্ছে যৌন হয়রানি।'[১১৩]

মানবপাচার এবং বলপূর্বক বেশ্যাবৃত্তি

জোরপূর্বক, মিথ্যা আশ্বাস দেখিয়ে এক শ্রেনীর মানুষকে তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে পাচার করে নিয়ে যাওয়া হয়। গোটাবিশ্বে সবেচেয়ে বেশি মানবপাচারের শিকার হয় নারী ও শিশুরা। মানবপাচার প্রতিরোধে প্রোটোকল অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তিকে পাচার করা মানে পরিবহন, লোকবল নিয়োগ, স্থানান্তর, ক্ষমতার অপব্যবহার কিংবা বলপ্রয়োগ বা ভিন্ন উপায়ে একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একজন ব্যক্তির উপর নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠা করা, সেই ব্যক্তির অবস্থানের সুবিধা গ্রহণ করে বেশ্যাবৃত্তি, জোরপূর্বক শ্রমে খাটানো, যৌনাঙ্গ ছেদসহ বিভিন্ন সহিংসতাকে বোঝায়।

মানাবপাচার বিষয়টি অবৈধ হওয়ায় এর সঠিক পরিসংখ্যান জানা সম্ভব নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, চলতি তথ্যপ্রমাণ এই নির্দেশ করে যে, বিভিন্ন স্থান থেকে যারা মানবপাচারের শিকার হয় তাদের দিয়ে অধিকাংশকেই বাসা-বাড়িতে কাজ কিংবা বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োজিতত করার জন্য নারী এবং শিশুদের ব্যবহার করা হয়। ইউরোপে ২০০৬ সালের এক জরিপে দেখা যায়, পাচারের শিকার হওয়া নারীরা শারীরিক, মানসিক অথবা যৌন হয়রানির কারণে তাদের মানসিক এবং শারীরিক ক্ষতি হয়।[১১৪] তৃতীয়পক্ষ দ্বারা সঞ্চালিত জোরপূর্বক বেশ্যাবৃত্তিকে বলা হচ্ছে যৌনপেশা। এই জোরপূর্বক বেশ্যাবৃত্তিতে যে বা যারা শিকারের উপর জোর খাটায় তারা মূলত শিকারের উপর তাদের কর্তৃত্ব খাটাতে চায়।

বিধবাদের প্রতি খারাপ আচরণ

বিধবা হলেন সেই নারী যার স্বামী মারা গিয়েছে। বিশ্বের কিছু স্থানে বিধবারা ঘোরতর নির্যাতনের শিকার হয়। আর এই নির্যাতনের পেছনে থাকে ঐতিহ্য বা ধর্মীয় গোড়ামিপনা। বিধবাদের আত্মাহুতি দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিল ভারতে। যদিও ভারতে সতীদাহ এখন বিলুপ্ত প্রথা। তবে এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটছে। যেমন,

---

[১১২] Amnesty International, *'Algerian authorities must investigate and stop attacks against women'*, (23 April 2010), http://www.amnesty.org.au/news/comments/22931/, Visited on 20 August, 2015

[১১৩] Council of Europe , *Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence* (CETS No. 210). http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210, Visited on 20 August, 2015

[১১৪] World Health Organization, Human trafficking, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77394/1/WHO_RHR_12.42_eng.pdf?ua=1, visited on 20 August, 2015

Dhaka University Institutional Repository

১৯৮৭ সালে রুপ কানোয়ার সতীদাহ অথবা ২০০২[১১৫] এবং ২০০৬[১১৬] সালে প্রত্যন্ত ভারতে ঘটে যাওয়া কিছু সতীদাহের ঘটনা।

ডাকিনীবিদ্যা চর্চার অভিযোগে অভিযুক্ত

পনেরো থেকে আঠেরো শতক পর্যন্ত ইউরোপে ডাকিনীবিদ্যা চর্চার অভিযোগে অভিযুক্তকে হত্যার রীতি প্রচলিত ছিল। বিশেষ করে উত্তর আমেরিকার ইউরোপীয়ান কলোনিগুলোতে এই চর্চা ছিল সবচেয়ে বেশি। আজও সাব-সাহারা আফ্রিকার, উত্তর ভারত, পাপুয়া নিউগিনির কিছু অঞ্চলে ডাকিনীবিদ্যা চর্চার অভিযোগে অভিযুক্তদের হত্যা করা হয়। এছাড়াও কিছু দেশ আছে যেখানে বৈধভাবেই ডাকিনীবিদ্যা চর্চাকারীদের হত্যার বিধান আছে। দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে সৌদিআরবসহ আরও কয়েকটি রাষ্ট্র।[১১৭]

[১১৫] BBC News. *Arrests in Indian ritual burning*, 7 August 2002, http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2178102.stm, visited on 20 August, 2015

[১১৬] BBC News, *'Sons arrested in sati death probe',* (21 September 2006), http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/5366506.stm, visited on 20 August, 2015

[১১৭] Amnesty International, *Saudi Arabia: Beheading for 'sorcery' shocking*, 12 December 2011, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2011/12/saudi-arabia-beheading-sorcery-shocking/, visited on 22 August, 2015

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ নারীর প্রতি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

যুদ্ধে ধর্ষণ, সামরিক সংঘাত চলাকালে যৌন দাসত্ব

সামরিক পরিবেশও নারীর প্রতি যৌন সহিংসতা বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সমানভাবে সক্ষম। যতদূর পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস জানা যায়, ততদূরে দেখতে পাওয়া যায় যুদ্ধের সময়ে নারীর ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলো।[১১৮] বাইবেলেই যুদ্ধে ধর্ষণের কথা একাধিকবার এসেছে। 'জেরুজালেমের বিরুদ্ধে আমি সমস্ত জাতিকে সংঘবদ্ধ করেছি। ওই শহর দখলে আসবে, বাড়িগুলো লুণ্ঠিত হবে, নারীরা ধর্ষিত হবে... 'জিসারিয়াহ ১৪:২। ছোটো শিশুদের হত্যা করা হবে তার বাবা মায়ের সামনে, বাড়িঘর হবে শূন্য এবং প্রত্যেকের স্ত্রী হবে ধর্ষিত... ইসাইয়া ১৩:১৬।

যুদ্ধ-ধর্ষণের মূল হোতা সৈনিকরা, তারা ছাড়া বেসামরিক নাগরিকগণও ধর্ষণ ও লুটতরাজে অংশ নেয়, যে সব সংঘটিত হয় সাধারণত সশস্ত্র যুদ্ধ চলাকালীন, অথবা সামরিক শক্তি কোনো এলাকা অধিকার করে রাখাকালীন। এ শ্রেণীর ধর্ষণের অধিভুক্ত হবে সেনাক্যাম্পে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার ব্যাপারটিও, যেটিকে যৌন দাসত্ব বলা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান সেনাবাহিনী বিশাল পতিতালয় স্থাপন করতো, ওখানে অন্তরীন নারীদের নাম দেয়া হয়েছিল 'আরামদায়ী' নারী। যুদ্ধবন্দি নারীদের বাধ্য করা হতো সেখানে সৈনিকদের কাছে দেহদান করতে, অস্ত্রের মুখে, বহু নারী সেখানে অকথ্য নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাদের আরও ব্যবহার করা হতো শত্রু শিবিরে প্রবেশের ফাঁদ হিসেবে, ব্যবহৃত হওয়ার পর পুরুষদের মধ্যে যথেচ্ছ ভাগ করে দেয়া হতো।[১১৯]

'কভনো ঘেটো'য় সামরিক অভিযান পরিচালনার সময় নারীর ওপর সামরিক সহিংসতার উল্লেখযোগ্য কিছু নথি আছে। নাজিরা ওখানে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করতো মেয়েদের, পুরুষদেরও রেহাই দিতো না এবং ইহুদি নারী-পুরুষদের যৌন সংসর্গে আসতে বাধ্য করতো।[১২০]

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে সামরিক ধর্ষণ ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়েছে পাকিস্তানী সৈনিক ও তার দোসরদের দ্বারা। নয় মাস সময়ের মধ্যে কয়েক লাখ নারীকে ধর্ষনের শিকার হতে হয়েছে। সুসান ব্রাউনমিলার তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন, আট বছর থেকে পঁচাত্তর বছর বয়েসী নারীরা নির্বিচারে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।[১২১]

বসনিয়ায় সার্বীয় সামিরক অভিযানের সময় নারীর ওপর সহিংসতা অভিনব মাত্রা পায়। যুদ্ধে জাতিতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংহারের অংশ হিসেবে ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনকে বেছে নিয়েছিল সার্বিয়রা। বসনিয়ার নারীদের এমনভাবে যৌন নির্যাতন করা হয়েছিল যেন একটি জাতির মানসিক শক্তির জায়গাটি পুরোপুরি ধসে পড়ে এবং জোরপূর্বক জাতিতাত্ত্বিক মিশ্রতা যেন তৈরি হয়। সে সময় ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ বসনীয় নারী ধর্ষণের শিকার হন। অথচ ২০১০ সাল নাগাদ মাত্র ১২টি মামলার বিচার হয়েছে।

১৯৯৮ সালে রুয়ান্ডার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ধর্ষণকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। বিচারক নাভানেত পিল্লাই বলেন, অনাদিকাল থেকে ধর্ষণ যুদ্ধের অন্যতম অপ-অনুসঙ্গ। আজ থেকে এটি যুদ্ধপরাধের অন্তর্ভুক্ত হলো। আমরা এর মাধ্যমে পরিষ্কার করে দিতে চাই, যুদ্ধ আর কখনও যুদ্ধের কলংকজনক পুরস্কার-স্মারক হবে না।

---

[১১৮] Bernard M Levinson, *Gender and Law in the Hebrew Bible and the Ancient Near East* (2004), p. 203

[১১৯] Tessa Morris-Suzuki, *Japan's 'Comfort Women': It's time for the truth (in the ordinary, everyday sense of the word)*, (The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, March 8, 2007), http://apjjf.org/-Tessa-Morris-Suzuki/2373/article.html, visited on 22 August, 2015

[১২০] Andrea Dworkin, *Scapegoat: The Jews, Israel and Women's Liberation* (Free Press, 2000), p. 316

[১২১] Susan brownmiller, *'Against our will'*, In William F. Schulz, *The Phenomenon of Torture: Readings and Commentary* (University of Pennsylvania Press, 2007), p. 88–94

Dhaka University Institutional Repository

২০০৬ সালের ঘটনা। ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি মার্কিন সেনাজোটের পাঁচ সদস্য জোটবদ্ধ হয়ে ১৪ বছর বয়েসী এক ইরাকি কিশোরীকে ধর্ষণ ও হত্যা করে। স্থান ইরাকের আল মাহমুদিয়াহ। মেয়েটিকে জোটবদ্ধ ধর্ষণের পর তার মাথায়, তলপেটে ও পায়ে গুলি করা হয়। সবশেষে শরীরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।[১২২]

১৯৯৫ সালে যুদ্ধফেরত নারীদের ওপর পরিচালিত এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ৯০ শতাংশ নারী যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ২০০৩ এর জরীপে ৩০ শতাংশ নারী বিবৃতি দিয়েছেন, তারা সেনাসদস্যদের দ্বারা জোটবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। ২০০৪ সালের এক জরীপে থেকে দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধে চিকিৎসাসেবা দানকারী নারীদের ৭১ শতাংশই ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।[১২৩]

জোরপূর্বক নির্বীর্যকরণ এবং গর্ভপাত

জোর করে নির্বীর্যকরণ এবং জোর করেগর্ভপাত লিঙ্গভেদে সংঘটিত সহিংসতা। উজবেকিস্তান এবং চীনে এ ধরনের সংঘটনের বহু প্রমাণাদি পাওয়া গেছে।[১২৪]

পুলিশ ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্যাতন

পুলিশকেও আইনের বাহকের ভূমিকা থেকে বেরিয়ে এসে ধর্ষণকাজে রত হতে দেখা যায়, এবং ওই সকল ক্ষেত্রে এমনিতেই কম অভিযুক্ত এ সহিংসতা আরও চলে যায় পর্দার অন্তরালে। অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করতে এসে পুলিশের হাতে ধর্ষিত হওয়ার নথিও রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই পুলিশ তদন্তে সহায়তার ধুয়ো তুলে গিয়ে ধর্ষণ করে এসেছে এবং অনেক অনুরোধ উপরোধ সত্ত্বেও রেহাই দেয়নি। অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষণের শিকার হতে হয়েছে ভবিষ্যত সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে কাজ লাভের বিনিময়ে।[১২৫]

পুলিশ এবং সামরিক শক্তির হাতে নারীর প্রতি যৌন সহিংসতার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি ক্রমক্ষয়িষ্ণু গণস্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা এবং সুবিধার সঙ্গে যুক্ত। এবং পতিতালয়ের মতো ক্রমবর্ধমান অসামাজিক জোটগুলোর সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গেও যুক্ত।[১২৬] আর এই ঘটনাগুলো বারবার ফিরে আসে আইনের দুর্বল শাসনের কারণে। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর নিম্ন পর্যায়ে সাংগাঠনিকতার অভাব এবং পেশাদারীত্বের অভাবও একটা বড় কারণ। পুলিশদের একটি বৃহৎ অংশ ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের সঙ্গে যুক্ত, আঘাত পরবর্তী মানসিক বৈকল্যের শিকাররা যাদের অন্যতম লক্ষ্য।[১২৭] একই সঙ্গে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণকারীদের পুলিশের ছত্রছায়ায় সংঘটিত তৎপরতায় এসটিআই এবং এইচআইভি সংক্রমণের অধিক হুমকির মুখে পড়ছে মানুষ, যেখানে কনডমের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কমে আসছে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোয়।[১২৮]

পাথর ছুড়ে মারা

---

১২২ CNN.com, *Soldier: 'Death walk' drives troops 'nuts',* (Aug 8, 2006), http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/08/08/iraq.mahmoudiya/index.html, visited on 22 August, 2015.

১২৩ BBC News, *US ex-soldier guilty of Iraq rape,* (7 May, 2009), http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8039257.stm, visited on 22 August, 2015

১২৪ CNN.com, *Soldier: 'Death walk' drives troops 'nuts',* প্রাগুক্ত।

১২৫ Cheryl Hanna, *'No Right to Choose: Mandated Victim Participation in Domestic Violence Prosecutions,'* (Harvard Law Review, 1996), Vol. 109, p.1850–1910

১২৬ Leo Beletsky, Gustavo Martinez, Tommi Gaines, *'Mexico's northern border conflict: collateral damage to health and human rights of vulnerable groups'.* (Washington: Rev Panam Salud Publica, May. 2012), vol.31 n.5, p. 403-410

১২৭ Steffanie A Strathdee, Remedios Lozada, Gustavo Martinez, *'Social and structural factors associated with HIV infection among female sex workers who inject drugs in the Mexico-US border region'*, (Published: April 25, 2011), *PLoS ONE* 6 (4): e19048

১২৮ Leo Beletsky, Gustavo Martinez, Tommi Gaines, *'Mexico's northern border conflict: collateral damage to health and human rights of vulnerable groups',* প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পাথর বা ঢিল ছুড়ে মারা হলো সেই 'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট (বড় শাস্তি)' যেখানে একদল মানুষ কোনো অপরাধে একজনকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত পাথর ছুড়তে থাকে। ইরান, সৌদি আরব, সুদান, পাকিস্তান, ইয়েমেন, দুবাই এবং নাইজেরিয়ার কিছু রাজ্যে আইন করে এই শাস্তি দেয়ার বিধান রাখা হয়েছে। পাথর মারা বা বেত্রাঘাত হলো ক্রমাগত মানবশরীরে প্রহারের আইন। দেশ ভেদে একেক অপরাধের জন্য এই শাস্তি দেয়া হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবাহ বহির্ভূত যৌনমিলন, সম্পর্ক করে বিয়ে, বিয়েতে অবাধ্য, অন্য পুরুষের হাতে ধর্ষণ ইত্যাদি কারণে নারীদের পাথর ছুড়ে বা বেত্রাঘাতে হত্যা করা হয়।[১২৯]

যৌনাঙ্গ ছেদ

নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ বিষয়ে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের (ডব্লিউএইচও) বক্তব্য হলো, নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ বা ক্ষতবিক্ষত করার প্রশ্নে যে কোনো কর্মকাণ্ডই অপরাধ।[১৩০] ২০১৩ সালের ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী, আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের ১২৫ মিলিয়ন নারী এবং শিশু মেয়েকে এই যৌনাঙ্গ ছেদের ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে।[১৩১] ডব্লিউএইচও আরও জানায়, 'এই কাজ করায় নারীর শরীরে কোনো সুবিধা হয় না' এবং 'এর ফলে নারী শরীরে অত্যাধিক রক্তক্ষরণ এবং প্রস্রাবে অসুবিধাসহ কিডনি সংক্রান্ত সমস্যাও হতে পারে, অনেক সময় এই কারণে অনেক নারীর মৃত্যুও হয়।' "The procedure has no health benefits for girls and women" and "Procedures can cause severe bleeding and problems urinating, and later cysts, infections, infertility as well as complications in childbirth increased risk of newborn deaths" and "FGM is recognized internationally as a violation of the human rights of girls and women. It reflects deep-rooted inequality between the sexes, and constitutes an extreme form of discrimination against women".[132]

ইউনিসেফের রিপোর্ট অনুযায়ী, নারী যৌনাঙ্গ ছেদের ঘটনা সবচেয়ে বেশি সংগঠিত হয়েছে সোমালিয়া (৯৮ শতাংশ নারী), গিনি (৯৬ শতাংশ নারী), জিবুতি (৯৩ শতাংশ), মিসর (৯১ শতাংশ), ইরিত্রিয়া (৮৯ শতাংশ), মালি (৮৯ শতাংশ), সিয়েরালিওন (৮৮ শতাংশ), সুদান (৮৮ শতাংশ), গাম্বিয়া (৭৬ শতাংশ), বুরকিনা ফাসো (৭৬ শতাংশ), ইথিওপিয়া (৭৪ শতাংশ), মৌরিতানিয়া (৬৯ শতাংশ), লাইবেরিয়া (৬৬শতাংশ) এবং গিনি বিসাউয়ে (৫০ শতাংশ)।[১৩৩]

কিছু স্থানীয় আইনজীবীর মতে, সংস্কৃতিগত চর্চার সঙ্গে যুক্ত এই নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ বিষয়টি। আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশেই এটাকে সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে দেখা হয়। এমনকি কিছু স্থান যেখানে জাতীয়ভাবে একে নিষিদ্ধ করা স্বত্ত্বেও এই কাজ হয়। নারীর যৌনাঙ্গ ছেদকে 'ক্ষতিকর ঐতিহ্যবাহী চর্চা'[১৩৪] বলে অভিহিত করা হয়েছে ইন্টার-আফ্রিকান কমিটি থেকে। গ্লোবালাইজেশনের কারণে নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ বিষয়টি আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের সীমানা পেরিয়ে অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম,কানাডা, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রেও ছড়িয়ে গেছে।[১৩৫] যদিও বলা হচ্ছে এটা হয়েছে অভিবাসীদের কারণে।

হস্তক্ষেপবাদী পন্থা: নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সিভিল সোসাইটি কিছু পদক্ষেপের কথা বলে, যা অভিযুক্ত দেশগুলোতে করা যেতে পারে:

---

১২৯ BBC News, *'Maldives girl to get 100 lashes for pre-marital sex',* (26 February 2013), http://www.bbc.com/news/world-asia-21595814, visited on 10 July, 2015

১৩০ WHO, Female genital mutilation, *Key facts,* http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/en/, visited on 10 July, 2015

১৩১ Unicef, Female Genital Mutilation/Cutting, http://goo.gl/PIFWk6, visited on 10 July, 2015

১৩২ WHO, Female genital mutilation, প্রাগুক্ত।

১৩৩ Unicef, Female Genital Mutilation/Cutting, প্রাগুক্ত।

১৩৪ Bettina Shell-Duncan, *'From Health to Human Rights: Female Genital Cutting and the Politics of Intervention'* (American Anthropological Association, First published: June 2008)

১৩৫ Martha Nussbaum, *Sex and Social Justice*, (USA: Oxford University Press, 2000), p. 120-121

Dhaka University Institutional Repository

১. নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ একটা স্বাস্থ্য ইস্যু (স্বাস্থ্য ঝুকি রয়েছে)

২. নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ বিষয়টি মানবাধিকার সম্পর্কিতও (মানবাধিকার সংক্রান্ত পদক্ষেপ)

অনেকেই এটাও বলেন যে, যখন নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় তখন এটা অবশ্যই জরুরী যে ইতিহাস বিশেষ করে ১৯ শতকে চীনের পা বেধে রাখা বিরোধী ক্যাম্পেইন থেকে শেখা যেতে পারে।[১৩৬]

জনস্বাস্থ্য সমস্যা: বিভিন্ন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলো নারীদের খৎনা প্রথার বিরোধীতা করছে মূলতঃ স্বাস্থ্যচিন্তা থেকে। সংস্থাগুলো থেকে বলা হচ্ছে, এই প্রথার ফলে নারীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। নারীর স্বাস্থ্য, প্রজননক্ষমতা এবং যৌনানুভূতিও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই যৌনাঙ্গ ছেদের কারণে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অনুসন্ধান অনুযায়ী,[১৩৭] 'যেসব নারী যৌনাঙ্গ ছেদের শিকার হয়েছে তাদের সন্তান ধারনের সময় অনেক কষ্ট পেতে হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই মারা যায়।'[১৩৮] অধিকন্তু, সংক্রমণ, মাসিক সমস্যা এবং বেদনাদায়ক যৌনমিলনের ফলে ব্যর্থসন্তান জন্মদান ও মস্তিস্কের ক্ষতিও হয়ে থাকে। এছাড়াও এইডস হওয়ারও ঝুঁকি রয়ে যায়। সবচেয়ে ক্ষতি হয় ওই নারীর মানসিক অবস্থার।[১৩৯]

মানবাধিকার ইস্যু: ১৯৯৩ সালে ভিয়েনার বিশ্ব কনফারেন্স অন হিউম্যান রাইটসে নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ বিষয়ে প্রথমবারের মতো বলা হয়, 'নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়টি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ইস্যুর অন্তূর্ভক্ত। তখন থেকেই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ইস্যুতে নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ বন্ধ করার বিষয়টি মূখ্য ভূমিকা পালন করে।[১৪০]

শুরুর দিককার পশ্চিমা নীতির সঙ্গে বৈশ্বিক মানবাধিকার বিষয়টি পার্থক্য ছিল। নারীর যৌনাঙ্গে অঙ্গহানি বিষয়টি স্বাস্থ্য সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল না। পরবর্তীতে পশ্চিমা ফেমিনিস্টরা এটা পরিবর্তন করতে সাহায্য করে এবং এটা নিশ্চিত করতে পারে যে, নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ করলে তা নারীর শরীরে এবং যৌনতায় প্রভাব ফেলে। আর এটা নারীর অধীনতার প্রতীক।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের কথা মাথায় রেখে এই মূলনীতিগুলো তৈরি করা হয়েছে। এর পক্ষের সমর্থকরা জোর দিয়ে বলেন যে, নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ বিষয়টি মানুষের মৌলিক অধিকার হরনের সমান এবং তারা আরও বলে যে, নারী এবং শিশুর মৌলিক অধিকারসহ জীবনের অধিকার প্রশ্নেও নারীর যৌনাঙ্গ ছেদ বন্ধ করা উচিত। শেল-ডানকানের মতে, এই সহিংসতা শুধু নারীর উপরই হয় না এটা শিশুর উপরও হয়।[১৪১]

নারী খৎনা নিরুৎসাহিতকরণ: নারীদের খৎনা করাকে নিরুৎসাহিত করতে পর্যাপ্ত সামাজিক অভিযানের সংখ্যা বাড়ছে না। স্বাস্থ্যকেন্দ্রিক এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোর উদ্যোগ বারবার সমালোচিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যখাত কিভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে জ্ঞাতব্য। অনেকক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নারীর খৎনাকে নিরুৎসাহিত করা দূরে থাকে, চিকিৎসালয়েই হচ্ছে তার সংঘটন।[১৪২] দেখা যাচ্ছে, নিয়মতান্ত্রিকতার চাদরের নিচেই চলছে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা এবং স্বাস্থ্যবিধিকর্তাদের তত্ত্বাবধায়নে চলছে স্বাস্থ্যহীনতার আয়োজন। শেল ডানকান বলছেন: নারীদের খৎনাকে নিরুৎসাহীত করতে গিয়ে একটা চূড়ান্তরকম ভুল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বারবার ব্যর্থ হতে হচ্ছে। এর ক্ষতিকর দিক হিসেবে স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়া এবং মাতৃত্বকালীন অসুবিধাগুলোর কথা তুলে ধরা যাচ্ছে না, যে কারণে যৌনতাবোধও প্রাধান্য পাচ্ছে। আর এটা প্রকারান্তরে নারী-খৎনাপন্থীদের বক্তব্যকেই জোরালো প্রমাণিত করছে।[১৪৩]

---

১৩৬ Kwame Appiah, Anthony, *"The art of social change"*, (New York Times, October 22, 2010), http://goo.gl/PzZPZV, Web address last visited on 10 July, 2015.

১৩৭ WHO, Female genital mutilation, প্রাগুক্ত।

১৩৮ Bettina Shell-Duncan, *'From Health to Human Rights: Female Genital Cutting and the Politics of Intervention'*, Ibid

১৩৯ Sheila Rule, '*FEMALE CIRCUMCISION IS DEBATED IN THRID WORLD'*, (New York Times, July 29, 1985), http://goo.gl/l9ygvs, Visited on 10 July, 2015

১৪০ Bettina Shell-Duncan, *'From Health to Human Rights: Female Genital Cutting and the Politics of Intervention'*, প্রাগুক্ত।

১৪১ প্রাগুক্ত।

১৪২ প্রাগুক্ত।

১৪৩ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

মানবাধিকার সংস্থাগুলো যথেষ্ট পরিমাণ আইনগত নিয়মবিধির ভরারোপ করতে পারছেন না, মানুষের কাছে তাদের নির্দেশনাগুলো। আদিবাসীগোত্রীয়দের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ সংযোগ না থাকার কারণে তাদের বোধগম্য হওয়ার মতো করে প্রচারণা চালানো সম্ভবপর হচ্ছে না, আইনের শাসন না থাকার কারণে নিপাট সচেতনতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা কোনো কাজে আসছে না। যে কারণে 'নারীদের খৎনাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে উত্তর-ঔপনিবেশিক এ নবনীতি যদি কোনো কার্যকর পরিবর্তন আনতে চায়, তো আদিবাসীদের মনোজগতে প্রবেশের মাধ্যমে ধীরে তাদের ভেতর ধারণাগত পরিবর্তন সাধন করতে হবে, যেটা মানবাধিকার সংস্থাগুলোর বর্তমান ক্রিয়াকাণ্ডকে ছাপিয়ে নতুন এক লক্ষ্য হতে পারে।'

স্তনবিনষ্ট

কিশোরী বা শিশুবয়সে অনেক মানব সমাজে স্তনবিনষ্ট করা হয়। বাঁশ বা পাথর গরম করে নিষ্ঠুর প্রক্রিয়ায় স্তনের কোষগুলো থেৎলে দেয়া হয় যেন আর না বাড়তে পারে।[১৪৪] এটা সাধারণত বিশেষ কিছু মানবগোষ্ঠীতে জননীই তার সন্তানের ওপর প্রয়োগ করে থাকেন, যেন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের চোখে তার মেয়েটি অধিক আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে না পারে। এর মাধ্যমেই হয়ত তার সতীত্ব রক্ষা করা সম্ভব হবে।[১৪৫] এটা মূলত ক্যামেরুনের একটি অপসংস্কৃতি, পরবর্তীকালে মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকায়ও পালিত হতে দেখা গেছে এটা। স্তনবিনষ্টের সময় মেয়েদের যে বিভীষিকার ভেতর দিয়ে যেতে হয় তা তুলনাহীন। শারীরিক এবং মানসিক বৃদ্ধির মুখে এটা অপ্রতিরোধ্য প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত সহিংসতা

'ধাত্রীবিদ্যা সহিংসতা' সরাসরি সন্তান জন্মদানে শারীরিক উপায়কে নির্দেশ করে। অধিকাংশ উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশেই দেখা যায়, হাতে গোনা কিছু জিনিসপত্র দিয়ে সন্তান জন্মদানের মতো জটিল প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়। এর ফলে অনেক সময়ই নারীর শরীরে হরমোনজিনত সমস্যা দেখা দেয়। সঠিক উপায়ে সন্তান জন্মদান না করানোর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মা এবং শিশুর শারীরিক সমস্যা থেকে যায়।[১৪৬] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সতর্ক করে জানায়, 'অপ্রয়োজনীয় শল্যচিকিৎসার কারণে নারীর শরীরে সমস্যা হতে পারে।' অনেক দেশেই সিজার করে সন্তান জন্মদানের বিষয়টি ক্রমশ বাড়ছে (চীনে ৪৬%, এশিয়ার অন্যান্য দেশে ২৫%, ইউরোপীয় এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতেও ২৫%) এবং সিজার করলে অধিক অর্থ পাওয়া যায়, যে কারণে ডাক্তররা সিজার করতেও উদ্বুদ্ধ করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আরও জানায় যে, এর ফলে নারীর শরীর রক্তশূণ্য হয়ে যেতে পারে এবং সিজারে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। অনেক সময়ই সন্তান দীর্ঘমেয়াদী ট্রমার মধ্যে থাকে। ইংল্যান্ডের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবার হিসাব অনুযায়ী, সিজারে সন্তান হওয়ার পর নারীদের টানা কয়েক মাস বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। অন্যদিকে আমেরিকান কংগ্রেস অবসটেট্রিসিয়ানস অ্যান্ড গাইনোকলোজিস্ট সূত্র জানায়, বিশেষত ১৯৫০ থেকে ৮০ সালের মধ্যে দেখা গেছে সিজার করার সময় অনেক নারীর যৌনাঙ্গেই সূচ রয়ে গেছে। এরফলে অনেকসময় স্বামীর যেমন ক্ষতি হয়েছে তেমনি দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে হয়েছে ওই নারীদের।[১৪৭]

---

১৪৪ Randy Joe Sa'ah, Cameroon girls battle 'breast ironing', (Yaounde: BBC News. 23 June 2006), http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/5107360.stm, visited on 14 June, 2015

১৪৫ প্রাগুক্ত।

১৪৬ Dubravko Habek, *"Possible feto-maternal clinical risk of the Kristeller's expression"* (Central European Journal of Medicine, Jun 2008), Volume 3, Issue 2, p. 183-186

১৪৭ Julie M.L.C.L. Dobbeleir, M.D., Koenraad Van Landuyt, M.D., Ph.D., and Stan J. Monstrey, M.D., Ph.D, *'Aesthetic Surgery of the Female Genitalia',* (Seminars in Plastic Surgery, May 2011), 25(2): 130-141

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সম্প্রতি জানায় যে, 'স্বাভাবিক জন্মে'র বিপরীতে অবশ্যই একটি যৌক্তিক কারণ থাকতে হবে। এই উদ্দেশ্যর লক্ষ্য হলো সর্বোচ্চ নিরাপত্তা এবং সতর্কতার সঙ্গে একজন সুস্থ ও সবল মা এবং শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

সম্মানজনক এবং মানবিক জন্মের জন্য লড়াই

লাতিন আমেরিকায় সিজার করে অধিক বাচ্চা জন্ম দানের কারণে অনেক সংস্থাই স্বাভাবিক সন্তান জন্মদানের কথা বলছেন। অনেক গুনী ব্যক্তি যেমন ও. ফার্নান্দেজ এক বিশ্লেষণে, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার এবং অবসেট্রিক ভায়োলেন্সের সম্পর্ক দেখিয়েছেন।[১৪৮] পৃথিবী জুড়ে অনেক এনজিও আছে যারা সম্মানজনক এবং মানবিক উপায়ে সন্তান জন্মদানের পক্ষে লড়াই করছে। যেমন ধরা যাক, কানাডিয়ান অর্গানাইজেশন হিউম্যানিজ বার্থ অথবা স্প্যানিশ অ্যাসোসিয়েশন এল পার্তো এস নুয়েস্ত্রো। যুক্তরাষ্ট্রে তরুণী মায়েরা এই লড়াইয়ের পক্ষে এবং যাদের কম উপার্জন তারাও যাতে স্বাভাবিক উপায়ে সন্তান জন্মদান করতে পারে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করছেন। দ্য বার্থ ট্রমা অ্যাসোসিয়েশন তেমনি একটি সংস্থা, তাদের দাবি যে, নারীদের পোস্ট নাটাল ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার অথবা বার্থ ট্রমা হয় সাধারণত জন্মদান প্রক্রিয়ার কারণে। এর ফলে অনেক সময় গর্ভধারীনির চারপাশের মানুষের দ্বারা বাজে ব্যবহারের শিকার হন তারা।[১৪৯]

ভেনেজুয়েলাতে, মেক্সিকোর ভেরাক্রুজ, চিয়াপাস, গুয়ানাজয়াতো এবং দুরাঙ্গো নারীর স্বাভাবিক জন্মদান বিষয়ে আইন করা হয়েছে। ভেনেজুয়েলার অর্গানিক ল অন দ্য রাইট অব ওম্যান টু এ লাইফ ফ্রি অব ভায়োলেন্স'টি ২০০৬ সালে অনুমোদিত হয়।

মেক্সিকোর গ্রুপ অর ইনফরমেশন অন প্ল্যানড রিপ্রোডাকশন(জিআইআরই) সন্তান জন্মদানের সময় জন্মদাত্রীর সন্তান জন্মদানে যারা সাহায্য করে তাদের মধ্যে মানসিক এবং আবেগজনিত সমস্যা দেখা দেয়। এটা আরও উল্লেখ করে যে, জোরপূর্বক নির্বীজন করা নারীর প্রতি সহিংসতা স্বরুপ, যা আনুপাতিকহারে আদিবাসী নারীদের উপর প্রভাব ফেলে।

ক্রীড়াঙ্গনেও নারীর প্রতি সহিংসতা

নারীর প্রতি খেলাধুলা সংক্রান্ত সহিংসতা যে কোনো শারীরিক, যৌন এবং মানসিকও বোঝায়। পুরুষ খেলোয়াড়, ভক্ত অথবা কোচের হাতে খেলা চলাকালীন অথবা খেলা শেষেও নিগৃহীত হতে পারে নারী খেলোয়াড়রা।[১৫০]

তথ্যপ্রমানাদি নির্দেশ করে যে, সমসাময়িক খেলাধুলার সঙ্গে নারীর প্রতি সহিংসতার সম্পর্ক রয়েছে। যেমনটা, ২০১০ সালের বিশ্বকাপছাড়াও, অলিম্পিক এবং কমনওয়েলথ গেমসে দেখা গেছে। খেলা সম্পর্কিত সহিংসতা বিভিন্ন স্থানে, বাসায়, ক্লাব, হোটেল রুম এবং রাস্তাতেও হতে পারে।[১৫১] মূলতঃ পুরুষ অ্যাথলেটদের হাতেই নারী অ্যাথলেটরা নির্যাতনের শিকার হয় বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের কলিজিয়েট অ্যাথলেটিক কমিউনিটিতে নারীর প্রতি সহিংসতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০১০ সালে ইউভিএ ল্যাক্রোস হত্যাকাণ্ড, যেখানে একজন পুরুষ অ্যাথলেট তার বান্ধবীকে হত্যা করে। ২০০৪ সালে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফুটবল স্ক্যান্ডালে জানা যায় যে, সেখানে নয়টি যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটে। সূত্র জানায় যে, গড়পড়তা শিক্ষার্থীদের তুলনায় অ্যাথলেটদের মধ্যে নারী অ্যাথলেটরা

---

১৪৮ I.O Fernández, *'PTSD and Obstetric Violence'*, (Midwifery Today, 2013), Volume 105

১৪৯ Clare Goldwin, *"So what IS going wrong in Britain's labour wards?"*, (London: Daily Mail Online, 30 January 2013), http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2270941/Birth-trauma-Libby-ORourke-Toni-Harman-Julie-Hainsworth-traumatic-labours-Britains-hospital-wards.html, visited on 14 June, 2015

১৫০ Catherine Palmer, *Violence against women and sport: Literature review*, (London: Durham University, 2011), p. 2-5

১৫১ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সবেচয়ে বেশি যৌন হয়রানির শিকার হয়।[১৫২] প্রতি তিনটি কলেজের মধ্যে একটি কলেজে এই হয়রানির ঘটনা ঘটে। কলেজগুলোতে পুরুষ অ্যাথলেটের সংখ্যা মাত্র তিন দশমিক তিন শতাংশ, অথচ তাদের দ্বারাই কলেজে ১৯% এবং বাড়িতে ৩৫% যৌন সহিংসতার ঘটনা ঘটে।[১৫৩]

প্রযুক্তির মাধ্যমে নারী নির্যাতন

সমাজে নারীর প্রতি অন্যান্য নির্যাতনের পাশাপাশি নতুন মাত্রা হিসেবে যোগ হয়েছে তথ্য প্রযুক্তি সন্ত্রাস বা সাইবার ক্রাইম। ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, মোবাইল ফোন একদিকে যেমন মানুষের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনছে, তেমনি কিছু বিকৃত রুচির মানুষের (সাইবার সন্ত্রাসী) কারণে সেটি মারাত্মক ক্ষতির কারণও হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে সাইবার অপরাধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব অপরাধের শিকার হচ্ছে নারীরা।

মোবাইল ফোনের হরেক রকমের 'অপশন', আর ইন্টারনেট এখন হয়ে উঠেছে এসব বিভৎস লোকদের নারী বধের প্রিয় অস্ত্র। মোবাইল ফোনে কথার মাধ্যমে তো বটেই, ক্ষুদে বার্তা পাঠিয়ে, ক্যামেরা বা ভিডিও ধারণ করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে নারীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে সাইবার সন্ত্রাসীরা। আর এসব বিকৃত রুচির মানুষদের সবচেয়ে অসহায় শিকার মেয়েশিশুরা। জীবন ভালভাবে শুরু না হতেই তথ্যপ্রযুক্তির নোংরা ব্যবহার যাদের জন্য অভিশাপ হয়ে এসেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, অনলাইনে পুরুষের তুলনায় মেয়েরাই বেশি নির্যাতিত হয়। জাতিসংঘের হিসাবে, অনলাইনে আগ্রাসী আচরণ, নিপীড়ন, অশালীন ভাষার ব্যবহারসহ ছবি পরিবর্তনের ৯৫ শতাংশ ঘটনারই শিকার হয় নারী।

এসব ঘটনার বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দায়ী তাদের পুরুষ বন্ধু বা সাবেক স্বামী। আমাদের দেশের অভিজ্ঞতাই বলে প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী থেকে শুরু করে ঘরের গৃহবধূ, স্কুলপড়ুয়া শিশুসহ যে কোনো বয়সের নারীই এদের লক্ষ্যবস্তু। আর দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য এসব চক্রের শিকার হয়ে কিছু কিছু নারী পর্যন্ত এদেরই অংশ হয়ে ওঠে এবং জড়িয়ে পড়ে সাইবার অপরাধে। নারী সংক্রান্ত সাইবার অপরাধের কতগুলো পরিচিত রূপ আছে। যেমন, কোনো একটি মেয়ের ছবি বা ভিডিও চিত্র কৌশলে ধারণ করে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় মোবাইলে ক্ষুদেবার্তা, ফেসবুক বা অন্য কোনো মাধ্যম ব্যবহার করে।

ফেসবুকের মতো সামাজিক যোগাযোগ ওয়েবসাইটে একবার ছড়িয়ে পড়লে তা নিমিষেই শত শত ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। আবার ইমেইল বা ফেসবুকের মাধ্যমে অশ্লীল ছবি পাঠানো, হুমকি প্রদান, ব্ল্যাকমেইলিং, খুব কাছের ব্যক্তি বা পরিচিতজন দ্বারা একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ের ভিডিও ধারণ করে তা প্রচার, ফেসবুকে ছদ্মনামে ঠিকানা খুলে মেয়েদের সাথে যোগাযোগ করে নানাভাবে তাদের যৌন উৎপীড়ন করা ইত্যাদি।

Internet & ICT sexual harrassment in Bangladesh- তে বলা হয়েছে, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে নারী নিপীড়ন দেশে ক্রমশ বাড়ছে। এখনই যদি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা না যায় তাহলে অচিরেই তা আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে।

---

[১৫২] Jeff Brady, *"Scandal Returns to University of Colorado Football"*, (NPR weekend edition. NPR, June 14, 2009), http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=105381707, visited on 14 June, 2015

[১৫৩] Statistics, *The National Coalition Against Violent Athletes*. http://www.ncava.org/Statistics.html, Visited on 14 June, 2015

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ নারী নির্যাতনের কারণসমূহ

নারী নির্যাতন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভয়ানক রূপ নিয়েছে। বিশেষ করে উন্নত বিশ্ব তথা পশ্চিমা বিশ্বে নারীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হচ্ছে। পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাংলাদেশেও নারী নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন ভারী হচ্ছে। এই সভ্যতায় নারী পণ্য হিসেবে গণ্য। পশ্চিমা বিশ্ব নারী-পুরুষ সম অধিকারের বুলি আওড়িয়ে নারী অধিকার সংরক্ষণের চেয়ে অধিকার হরণের দিকে বেশি উৎসাহিত করছে। আর ইসলামে বর্ণিত নারী অধিকারকে তুচ্ছভাবে মানব সমাজে তুলে ধরার প্রয়াস চালাচ্ছে। অথচ সে সকল দেশে নারীদের অধিকার দেয়া তো দূরের কথা, সেখানে নারীদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে ইসলামের পূর্ব যুগ তথা জাহেলী যুগের নারীদের চরম দুর্দশার আর লজ্জাজনক কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। নিম্নে, নারী নির্যাতনের বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করা হলো-

ইসলামী শিক্ষার অভাব

ইসলামী শিক্ষা মানুষকে নৈতিক চরিত্রবান হতে সহায়তা করে। ভাল-মন্দ পার্থক্য করতে শেখায়। ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিকভাবে ইসলামী শিক্ষা দেয়া এবং বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে ইসলামী নিয়ম-কানুন মেনে চলার অভ্যাস করানো প্রয়োজন। মূলতঃ এ কাজে প্রথমিকভাবে পিতা-মাতাকেই অগ্রনী ভূমিকা পালন করতে হবে। আমাদের দেশে পরিপূর্ণভাবে ইলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক না থাকার কারণে অনেকাংশে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য সর্বস্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামী শিক্ষা আবশ্যিক করা সময়ের দাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। সেখানে সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে। সেখানে রয়েছে কুরআন ও হাদিসের বাস্তব, নৈতিক এবং যুগপোযোগি শিক্ষা। যা কালোত্তীর্ণ, যুগোত্তীর্ণ ও সার্বজনীন। অতএব সকল সমস্যার সমাধানের জন্য ইসলামী শিক্ষার দিকেই আমাদের ধাবিত হতে হবে। রাসুল সা. বলেছেন, 'তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দু'টি জিনিসকে আঁকড়ে ধরবে। একটি হচ্ছে-আল্লাহর বাণী পবিত্র আল কুরআন, আরেকটি আমার বাণী আল-হাদিস।'[১৫৪]

অপসংস্কৃতি ও মিডিয়ার প্রভাব

অপসংস্কৃতি ও মিডিয়া নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। বিশেষ করে পশ্চিমা আর ভারতীয় অপসংস্কৃতি মিডিয়ার মাধ্যমে শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়েও ছড়িয়ে পড়েছে। ডিস কালচার, মোবাইল, ইন্টারনেট, সিডি, ভিসিডি, বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এ গুলিই যুবক-যুবতিরা দেখছে এবং সে গুলো অনুকরণ আর অনুসরণ করতে উৎসাহিত হচ্ছে। বিশেষ এক গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমানে যারা ধর্ষণ, ব্যভিচার, ইভটিজিং, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ করছে এদের অধিকাংশই এ কাজের দৃশ্য অনেকবার বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে দেখে থাকে।

সুতরাং, নারীদেরকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা আর মিডিয়াকে ভাল কাজে ব্যবহার করার কোনো বিকল্প নেই। যে সকল সামগ্রীর মাধ্যামে অশ্লীলতা বৃদ্ধি পায় এ সকল জিনিস ক্রয়-বিক্রয় ইসলামে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।'[১৫৫]

এই আয়াতে মুফাসসিরগণ 'লাহউল হাদিস' এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন- 'লাহউল হাদিস' এর মধ্যে 'হাদীস' শব্দের অর্থ কথা, কিসসা-কাহিনী এবং 'লাহউ' শব্দের অর্থ গাফেল হওয়া। যে সব বিষয় মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ থেকে গাফেল করে দেয় সেগুলোকে 'লাহউ' বলা হয়। মাঝে মাঝে এমন কাজকে 'লাহউ' বলা হয়, যার

---

[১৫৪] ইমাম মুসলিম (র.), *সহীস মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ৮৯, হাদীস নং- ২৮১৭

[১৫৫] আল কুরআন, ৩১ : ৬

Dhaka University Institutional Repository

কোন উল্লেখযোগ্য উপকারীতা নেই। কেবল সময়ক্ষেপন এবং মনোরঞ্জনের জন্য করা হয়। আলোচ্য আয়াতে 'লাহউল হাদিস' শব্দের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ সাহাবী, তাবেয়ী ও তাফসীরবিদগণের মতে, গান, বাদ্যযন্ত্র ও অনর্থক কিসসা-কাহিনীসহ যেসব বস্তু মানুষকে এবাদত ও স্মরণ থেকে গাফেল করে, সেগুলো সবই 'লাহউল হাদিস'। বুখারী ও বায়হাকী স্ব-স্ব কিতাবে 'লাহউল হাদিস'-এর এ তাফসীরই অবলম্বন করেছেন।[১৫৬]

দুনিয়াতে যারা অশ্লীতা প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।'[১৫৭]

নেশা জাতীয় দ্রব্যের সহজলভ্যতা

নারী নির্যাতনের আরেকটি কারণ নেশাজাত দ্রব্য গ্রহণ করা। মদ, গাজা, ইয়াবা, আফিম, হিরোইন, ফেনসিডিল এগুলো সহজলভ্য হওয়ার কারণে, বিশেষ করে যুবক-যুবতি এগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়ছে অনেক বেশি। নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। ফলে, তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বিভিন্ন অপকর্ম করে বেড়ায়। বিশেষ করে পুরুষরা নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন করতেও দ্বিধাবোধ করে না। নারী নির্যাতন রোধ করার জন্য নেশাজাত দ্রব্যের সহজলভ্যতা বন্ধ নিশ্চিত করা প্রয়োজন প্রশাসনের পক্ষ থেকেই। এবং নেশাজাত দ্রব্য যাতে সহজ বেচা-কেনা করা না যায় সে ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা এবং তা কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এ কাজের সাথে জড়িতদের অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান কার্যকর করতে হবে।

মেয়েদের অশালীন পোশাক

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশালীন পোষাকের কারণে নারীরা নির্যাতনের শিকার হয়। কোন নারী যদি, শর্টকার্ট, আঁটো-সাঁটো পোশাক পরে হেলে দুলে যেতে থাকে, তাহলে রাস্তার বখাটে ছেলেরা তার দিকে অবশ্যই দৃষ্টি দেবে, টিজ করতে উৎসাহী হবে এবং সময় ও স্থান ভেদে ধর্ষণের মত অপরাধও ঘটিয়ে ফেলতে ইচ্ছুক হবে। ইভটিজিং ও ধর্ষণের অন্যতম কারণই হচ্ছে- নারীদের বেপর্দা চলাফেরা করা। এ ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তাছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন, তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে।'[১৫৮]

অপর একটি সূরাতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন- 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে– মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শণ করবে না।'[১৫৯]

নবী (স.) এর খাদিমা মায়মুনা বিনতে সা'দ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে নারী তার পরিবারের লোকদের বাইরে সুসজ্জিতা হয়ে ঠাক-ঠমকে চলে, তার উদাহরণ হলো কিয়ামতের দিবসের আঁধারের মত, সে দিন তার জন্য কোন আলো থাকবে না।'[১৬০]

অশালীন পোশাক পরিহীতাদের আখিরাতে কঠিন শাস্তি রয়েছে। হাদিসে এসেছে, 'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেছেন, জাহান্নামী দু'ধরনের। যাদের আমি (এখনও) দেখতে পাইনি। একদল লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে পেটাবে। আর একদল স্ত্রী লোক যারা, বস্ত্র

---

১৫৬ মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শাফী (রঃ), অনুবাদ ও সম্পাদনা: মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, *তাফসীর মাআরেফুল কুরআন* (মদীনা মোনাওয়ারা : খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহাদ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ১০৫২

১৫৭ আল কুরআন, ২৪ : ১৯

১৫৮ আল কুরআন, ২৪ : ৩১

১৫৯ আল কুরআন ৩৩ : ৩৩

১৬০ ইমাম তিরমিযী, অনু: মাওলানা ফরীদ উদ্দিন মাসউদ, *জামে আত-তিরমিযী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, জুন ১৯৯২), খ. ৩, পৃ. ৪৪৭, হাদীস নং- ১১৬৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা, যারা অন্যদের আকর্ষণকারীনি ও আকৃষ্টা তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার খুশবুও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ বহুদূর হতে পাওয়া যাবে।[১৬১]

বাবা মায়ের উদাসীনতা

ছেলে-মেয়েদের উত্তমরুপে গড়ে তোলায় পিতা-মাতার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে উঠতি বয়সে তারা কাদের সাথে মিশছে, কোথায় যাচ্ছে, বন্ধু কারা, কি করছে না করছে- সেদিকে নজর রাখা জরুরি। ছেলে-মেয়েরা কোথায় যাচ্ছে, কি করছে, খারাপ-বখাটেদের সাথে সঙ্গ দিচ্ছে কি না সে দিকে পিতা-মাতার সতর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন। অনেক সময় পিতার ব্যস্ততা আর উদাসীনতর কারণে ছেলে-মেয়ে বিপথগামী হয়ে থাকে। ফলে নারী নির্যাতনের পরিমান এবং মাত্রাও বেড়ে যায়।

পরকীয়া

সাধারণত কোনো সম্পর্কে জড়িত থাকা অবস্থায় পরিবারের সদস্যদের চাপাচাপিতে অন্য জায়গায় বিয়ের কারণে স্ত্রীর ওপর হতে পারে নির্যাতন। বিয়ের পরেও যদি স্ত্রী মনের মতো না হয়, তখন দেখা যায় অনেক স্বামীই পরকীয়ায় মজে যান। তখন সংসার বা স্ত্রী তার মূল্যহীন। আর এই মূল্যহীন সম্পর্কে থেকে পুরুষের মেজাজও অনেক সময় পরিবর্তণ হয়ে যায়। হতে পারে খিটখিটে স্বভাবের। পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনে অবহেলা শুরু হয়। একসময় দেখা যায় এসব নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে শুরু কলহ-বিবাদ। পরবর্তীতে নির্যাতনের শিকার হতে হয় স্ত্রী।

সন্দেহ

বিয়ের প্রথম দিকের সময়গুলো হয়তো স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মাঝেই থাকে মধুর সম্পর্ক। স্বপ্নের মত কেটে যেতে থাকে একেকটি দিন। কিন্তু; কিছুদিন যেতে না যেতেই স্ত্রীর বন্ধু বা আত্মীয়দের আচরণ কিংবা অন্য যে কোন কারণে মনের মাঝে খটকা লেগে যেতে পারে। আর তখনি হয়তো স্বামীর মনে সন্দেহ দানা বাধতে শুরু করে। সেই সন্দেহ অবসান না হওয়া পর্যন্ত মনে মনে তা আগ্নেয়গিরির তোলপাড় চালাতে থাকে। একটা সময় পর নিচক সন্দেহেন বশেই স্ত্রীর ওপর শুরু হয় নির্যাতন।

দৈহিক মিলনে অনীহা

অনেক নারীর দৈহিক মিলনে ভীতি বা নিপুণতার অভাবে বেশ অনীহা থাকে। কিন্তু পুরুষটি তার অনীহাকে দুর্বলতা ভাবে। মানসিক বোঝাপড়া না করেই স্ত্রীর ওপর চড়াও হয়। নিজের শারীরিক চাহিদা পুরণে নারীর ওপর নেমে আসে ঝড়। প্রকারান্তরে নারীটি তার স্বামীর কাছে যৌন হয়রানির শিকার হতে থাকে দিনের পর দিন। এতে এক সময় সে অসুস্থও হয়ে পড়তে পারে।

নেশাগ্রস্ততা

অনেক পুরুষেরই নেশা করার বদ অভ্যাস থাকে। নেশাগ্রস্ত স্বামী বিনা কারণেই স্ত্রীর ওপর চড়াও হতে পারে। তাকে গালমন্দ, মারধর, ঘরের জিনিস-পত্র নষ্ট করাসহ জীবননাশেরও কারণ হতে পারে।

---

[১৬১] ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬১, হাদীস নং- ৫৩৯৭

Dhaka University Institutional Repository

যৌতুক

সমাজের একটা কলঙ্কিত অধ্যায় হল বিয়ের জন্য যৌতুক প্রদান। অভাবী বাবা মা যৌতুকের আশ্বাস দিয়ে মেয়ে বিয়ে দিলেও দারিদ্রতার কারণে তা অনেক সময় পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। আর তখনই কথায়, কাজে কিংবা আঘাতের মাধ্যমে শ্বশুরালয়ে শুরু হয় নির্যাতন।

বন্ধ্যাত্ব

বন্ধ্যাত্ব নারী নির্যাতনের অন্যতম একটি কারণ। একটি নারীর বিয়ের পর তার শশুরবাড়ির মানুষরা অবশ্যই চাইবে তার মাধ্যমে তাদের বংশের আলো জ্বলুক। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন কারণে কোন নারী যদি দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম না হন, তাহলে সেই নারীর প্রতি নেমে আসে নির্যাতনের স্টিম রোলার। এমনকি তালাক পর্যন্তও হতে পারে।

মেয়ে সন্তান জন্মদান

এখনও কন্যা সন্তান জন্মদান বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সমাজে দুর্ভাগ্যজনক মনে করা হয়। যে কারণে কোন নারী যদি পুরুষ সন্তান জন্ম দিতে না পারে, শুধু মেয়ে সন্তান জন্ম দেয় তাহলে তার ওপর শুরু হয় নির্যাতন।

মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম-এর মতে নারী নির্যাতনের কারণ

এছাড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের, 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম' কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ' নামক সংকলন গ্রন্থে নারী নির্যাতনের নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লিখিত হয়েছে।[১৬২]

১. দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব
২. অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা এবং আংশিক বেকারত্ব
৩. আবাসন এবং স্থানচ্যুতি
৪. মদ এবং অপব্যবহার
৫. হতাশা এবং আশাহীনতা
৬. ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রন
৭. সংঘর্ষ এবং নির্যাতনের ভেতর বেড়ে ওঠা
৮. পুরুষত্ব সম্পর্কিত বিকৃত ধারনা
৯. সচেতনার অভাব
১০. শিক্ষার অভাব
১১. বহুবিবাহ
১২. ব্যভিচার
১৩. স্বেচ্ছাচারিতা
১৪. শৈশবকালীন নির্যাতনের অভিজ্ঞতা (বাবা কর্তৃক মাকে নির্যাতনের চিত্র)
১৫. সঠিক যোগাযোগ এবং মিথস্ক্রিয়ার অভাব
১৬. দৈনন্দিন জীবনের বিভেদ
১৭. যৌতুক
১৮. অল্পবয়সী স্ত্রী

[১৬২] ড. আবুল হোসেন, সংগ্রহ ও সম্পাদনা এবং প্রকল্প পরিচালক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

১৯. ক্ষুদ্রঋণ সমিতি অথবা অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে স্ত্রীর যোগাযোগ অথবা সদস্যপদ
২০. অবিরত সন্তান উৎপাদন
২১. বন্ধ্যা স্ত্রী
২২ ছেলে সন্তান জন্মদান না করা

নারী নির্যাতনের আরও কিছু কারণ

এছাড়াও নারী নির্যাতনের আরও বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে। সঙ্গী এবং যৌনসঙ্গীর হাতে পরিবার অথবা বাইরে সংগঠিত অপরাধগুলোর অনেক কারণ রয়েছে। কিছু কারণ আছে যা সরাসরি সহিংসতার সঙ্গে যুক্ত এবং কিছু ঘটনা আছে সহিংসতা এবং সহিংসতার অভিজ্ঞতার সঙ্গেই যুক্ত। যেমন–

১. শিক্ষার অনগ্রসরতা
২. সন্তানদের প্রতি অসদাচরন
৩. পারিবারিক সহিংসতা প্রত্যক্ষ করা
৪. অসামাজিক ব্যক্তিত্বজনিত সমস্যা
৫. মদের ক্ষতিকর ব্যবহার
৬. একাধিক সঙ্গী অথবা তাদের পিতা-মাতার নাস্তিক্যবাদিতা
৭. সহিংসতা এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যতা ধারণ করে যে আচরণ
   ক) সহিংসতার অতীত ইতিহাস
   খ) বৈবাহিক অনৈক্য এবং অসন্তোষ
   গ) সঙ্গীদের মধ্যে যোগাযোগ সমস্যাসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নারী নির্যাতনে বাংলাদেশের পরিস্থিতি

- প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ধর্ষণ
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যৌতুক
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ : এসিড সন্ত্রাস
- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : ইভটিজিং
- সপ্তম পরিচ্ছেদ : নারী ও শিশু পাচার
- অষ্টম পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে পরিস্থিতি
- নবম পরিচ্ছেদ : নারীদের আত্মহত্যার ভয়াবহ চিত্র
- দশম পরিচ্ছেদ : পতিতাবৃত্তি- বাংলাদেশ পরিস্থিতি
- একাদশ পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে নারীর আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি মূল্যায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়
নারী নির্যাতনের বাংলাদেশ পরিস্থিতি

বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ভয়ানক রূপ নিয়েছে। অতীতের চেয়ে নারী ও শিশুদের ওপর পাশবিক নির্যাতনের ঘটনা বর্তমান সময়ে বেড়েছে কয়েকগুণ। পাশবিকতার শিকার হচ্ছে স্কুল-কলেজের ছাত্রী ও কোমলমতি শিশুরাও। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও ঘটছে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ। ধর্ষণের পর হত্যাকাণ্ড ও লাশ গুম করা হচ্ছে হরহামেশা। এতেই ক্ষ্যান্ত হচ্ছে না নরপশুরা। পরিচয় নিশ্চিহ্ন করতে নারীকে পুড়িয়েও মারছে। জোরপূর্বক আপত্তিকর ছবি তোলা, মোবাইলে আপত্তিকর ভিডিও আপলোড করে প্রচার, ঘটনা প্রকাশ না করতে সাদা কাগজে স্বাক্ষর আদায় করার মতো ঘটনাও ঘটছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে গিয়েও কাজ হয় না বাংলাদেশে। অধিকাংশ ঘটনায় থানায় মামলা হলেও গ্রেফতার হয় না অপরাধী। কেউ গ্রেফতার হলেও মামলা বেশিদূর এগোয় না। প্রভাবশালী বা ক্ষমতাসীনদের হুমকি, কখনওবা তাদের মধ্যস্থতায় মীমাংসা করতে বাধ্য হয় নিরীহ ব্যক্তিরা। পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাবে নারী নির্যাতন মামলার সাক্ষীও পাওয়া যায় না। এসব কারণে ক্রমেই শ্লীলতাহানি ও হত্যার মতো অপরাধ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে। পাশবিক নির্যাতনের পর ভিডিওচিত্র ধারণ করে ইন্টারনেট, মোবাইলে প্রকাশ করে সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হচ্ছে ধর্ষিতার পরিবারকে। এসব ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করতে হুমকি দিতে থাকে বখাটে এবং দুর্বৃত্তরা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে গিয়েও নির্যাতিত পরিবারগুলো আশ্রয় পাচ্ছে না। পায় না ন্যায় বিচার। অপরাধীদের সঙ্গে থানা পুলিশের যোগসাজশের অভিযোগ রয়েছে। ইভটিজিং নামে যৌন হয়রানি ও নারীদের ওপর সহিংসতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়লেও তা যেন দেখার কেউ নেই। লজ্জা ও অপমানের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে নিরূপায় নারীরা আত্মহত্যার পথও বেছে নিচ্ছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে পত্রিকার পাতা খুললেই নারী নির্যাতনের রোমহর্ষক সব খবর চোখে পড়ে। নৈতিকতা আর সামাজিক অবক্ষয়, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতার কারণে সার্বিকভাবে দেশে নারী নির্যাতনের চিত্র ক্রমে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বর্তমান সময়ে এসে বাংলাদেশে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা কমছে না, বরং ক্রমশ বাড়ছে। তারই কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরা হল এখানে।

মহিলা পরিষদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালের প্রথম ছয় মাসে (জানুয়ারি-জুন) ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৪৩১টি। এর মধ্যে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৮২ জন নারী। ধর্ষণের পরে ৪৫ জন নারীকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছেন আরও ৫১ জন। যৌতুকের কারণে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ১২৭টি, যৌতুকের কারণে নির্যাতনের শিকার ৯০ জন। আর নির্যাতন সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন ৮০ জন।[১]

পুলিশ সদর দফতরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সর্বশেষ সাত মাসেই দেশের বিভিন্ন থানায় নারী নির্যাতন মামলা হয়েছে ১১ হাজার ৯১৩টি। ২০১৩ সালে দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনায় মামলা হয় ১৯ হাজার ৬০১টি, ২০১২ সালে ২০ হাজার ৯৪৭টি, ২০১১ সালে ২১ হাজার ৩৮৯টি এবং ২০১০ সালে ছিল ১৭ হাজার ৭৫২টি। মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৪ সালের বছরের প্রথম আট মাসে দেশে ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৪১৪ জন।[২]

---

১ মহিলা পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে পরিবেশি তথ্য থেকে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে বিবিসি বাংলা অনলাইন, মঙ্গলবার, ২২ জুলাই, ২০১৪, ১০:২৭ বাংলাদেশ সময়।

২ মেহেদী হাসান, *'আত্মহত্যার দীর্ঘ মিছিল'* (ঢাকা: দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪), ১ম পাতায় প্রকাশিত প্রধান প্রতিবেদন।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি ২০০১- জুন ২০১২ এর চিত্র নিম্নরূপ:

সাল	সহিংসতার ধরন									
	যৌতুকের জন্য সহিংসতা	এসিড আক্রমণ	অপহরণ	ধর্ষণ	ধর্ষণের পর খুন	খুন	অপহরণ	গাচার	অন্যান্য ধরনের সহিংসতা	মোট
২০০১	২৯৮৬	১৫৩	১৬৯১	৩১৭৮	২০	৮২	৬৩	৬৩	৪৭২২	১২৯৫৮
২০০২	৪৯২২	২০৯	২২৩৬	৪৩৯৫	২২	৯০	৮৩	৭৪	৬৭০০	১৮৪৩১
২০০৩	৫৮৬৯	২৫৮	২২৬২	৪৪৪২	২৮	৭৩	১২০	৭৪	৭১৫২	২০২৭৮
২০০৪	৩০৮১	২০৮	১৫৯৪	৩০৯৭	১৭	৬২	১৫৪	৬৮	৪৫৬৪	১২৮২৫
২০০৫	৩১৩০	২০৬	২০৬৯	২৭৯৬	২২	৯৭	৪৯	১৫৮	২৯৪৯	১১৪৫৬
২০০৬	৩৪১৭	১৪৬	২০৮৭	২৫৬৬	১৪	১০৯	৭৫	১০৭	২৫৫৮	১১০৭৯
২০০৭	৪১৪৬	১৭৭	২৭৩৬	৩৪৯৫	৩৩	১৪২	৭৪	১১৫	৩৩৭৪	১৪২৯০
২০০৮	৪৪৮৭	১৬৩	২৮১৪	৩৩৮৭	৬৫	১৩১	৮৭	১০৫	৩০৩২	১৪৩৩১
২০০৯	৪০৬১	১২৯	২৭১২	২৯০০	৩৯	১৩৯	৯৪	১০০	২,৬৯৫	১২৯২৭
২০১০	৫৩৩১	৯৭	৩৩৯১	৩৩২৮	২৫	১৭৬	১২০	১১৭	৩৭৬৮	১৬৩৫৩
২০১১	৭৮৭৯	৮৮	৪১০৯	৩৬৩৮	২৮	২৮০	১৫৯	-	৪৫২৮	১৯৮৮৯
২০১২ (জুন পর্যন্ত)	৩৬৬৮	৪৯	২০৭৭	১৮৬৯	১৯	১১৬	৬৩	-	১,৩৯৪	১০০২৯
মোট	৫২,৯৫৭	১৮৮৩	২৯,৮৯৮	৩৮,৭৯১	৩২৬	১৪৯৭	১১০১	৯৫৯	৪৮,৪৩৪	১,৭৪,৮৫০

সূত্র: পুলিশ সদরদপ্তর, বাংলাদেশ, তথ্য সংগ্রহের সময় কাল জুলাই ২০১২

যৌতুকের জন্য নারীদের ওপর সহিংসতার পরিমানও কম নয়। বরং, বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের অন্যতম প্রধান হাতিয়ারই হচ্ছে যৌতুক। যৌতুকের কারণে হত্যা, নির্যাতন যেন এখন নৈমিত্তিক ঘটনা। শুধু তাই নয়, যৌতুকের কারণে হত্যা শেষে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার ঘটনাও ঘটছে বিভিন্ন স্থানে।

২০১২ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে প্রাপ্ত এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ৬৪৮ জন বিবাহিত নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে ২১৭ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ৪১৯ জন বিবাহিত নারী বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। ওই সময়কালে ১২ জন বিবাহিত নারী যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়া যৌতুক সহিংসতার প্রতিবাদ করতে গিয়ে একজন পুরুষ নিহত ও ১০ জন পুরুষ আহত হন এবং যৌতুকে কলহের কারণে ৩ জন শিশুকে হত্যা ও ১ জনকে আহত করা হয়েছে।

২০১২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর যশোর শহরের বারান্দিপাড়া লিচুতলায় নয়ন বেগম নামে এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূকে যৌতুকের জন্য আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে তার স্বামী আবু কালাম। একই বছর ৮ জুলাই যশোর সদর উপজেলার সুলতানপুর গ্রামে যৌতুকের জন্য অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ সালমাকে (২০) তার স্বামী তিতুমীর ও তার বাবা আইয়ুব আলী হত্যা করে ঘরে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়।[৩]

উল্লিখিত ঘটনা দুটি খণ্ডচিত্র মাত্র। শুধু উদাহরণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে। প্রতিনিয়তই দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটছে নারীর প্রতি এমন সহিংসতা। যৌতুকলোভিদের নির্যাতন থেকে কোনমতেই রেহাই মিলছে না অসহায় নারীদের।

জাতিসংঘে বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের রিপোর্ট

নারী নির্যাতনে বাংলাদেশের চিত্র ভয়াবহ। ঘরে এবং বাইরে কোথাও আজ নিরাপদ নেই নারীরা। বাংলাদেশ নারী নির্যাতন ভয়াবহ চিত্র নিয়ে করা একটি বিশেষ রিপোর্ট ২০১৪ সালের এপ্রিলে জমা দেওয়া হয় জাতিসংঘের মহাসচিবের দপ্তরে।

বাংলাদেশের নারীদের পরিস্থিতি সম্পর্কে এই বিশেষ রিপোর্টটি তৈরী করার দায়িত্বে ছিলেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনের নারীর প্রতি সহিংসতাসংক্রান্ত বিশেষ প্রতিনিধি বা স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার রাশিদা

[৩] ২০১২ সালের ৯ জুলাই ও ১৫ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ঘটনা থেকে সংগৃহীত।

Dhaka University Institutional Repository

মঞ্জু। মহাসচিবের দপ্তর থেকে এ রিপোর্টটি জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের ২৬তম অধিবেশনে (২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত) উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা নিয়ে নানা ধরনের উদ্বেগজনক তথ্য দেওয়া হয়েছে।[৪]

জাতিসংঘের বিশেষ ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘরে বা বাইরে প্রতিনিয়ত সহিংসতার ঝুঁকির মধ্যে থাকেন বাংলাদেশের নারীরা। বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ মনে করে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে শারীরিকভাবে আঘাত করা যায়। প্রায় ৬০ শতাংশ বিবাহিত নারী জীবনে কোনো না কোনো সময়ে স্বামী কিংবা তার পরিবার বা উভয়ের দ্বারা নির্যাতিত হন। এখানে নারীর প্রতি সহিংসতাগুলোর মধ্যে অ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে, এর পরেই রয়েছে ধর্ষণ। এমনকি বাংলাদেশে এমন অনেক সহিংসতাও আছে, যা রাষ্ট্রই ঘটায় বা রাষ্ট্র কোনো ব্যবস্থা নেয় না।[৫]

বিশেষ রিপোর্ট প্রস্তুতকারী জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি রাশিদা মঞ্জু বলেছেন, বাংলাদেশে নারীরা পরিবারেই সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হন। ২০১৩ সালের প্রথম আট মাসে যৌতুকের কারণে নারী নির্যাতনের ৩২৭টি ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় ১১০ জনকে হত্যা করা হয়, নয়জন আত্মহত্যা করেন আর ২০৮ জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন। এখানে নারীর প্রতি সহিংসতার বড় হাতিয়ার হচ্ছে অ্যাসিড নিক্ষেপ ও ধর্ষণ। ২০১৩ সালের প্রথম আট মাসে ২২ জন নারী অ্যাসিড নিক্ষেপের শিকার হন। অন্যদিকে একই সময়ে ধর্ষণের ৬৬১টি ঘটনার অভিযোগ পাওয়া যায়। এর মধ্যে গণধর্ষণের ঘটনা ছিল ১৮৮টি। এসব ঘটনায় ৪৯ জন নারীকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছিল, আর পাঁচজন নারী ঘটনার পর আত্মহত্যা করেছিলেন।[৬]

রাশিদা মঞ্জু বলেছেন, গ্রাম্য সালিসের নামেও নারীকে নির্যাতন করা হয়, ফতোয়া দেওয়া হয়। অনেক নারীই সহিংসতার বিচার চাইতে প্রথাগত সালিসব্যবস্থার মুখোমুখি হন। কিন্তু তা নারীকে আরও বেশি সহিংসতার দিকে ঠেলে দেয়। ফতোয়া (অপব্যবহারের) দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়ার পর অনেক নারীর আত্মহত্যা করার ঘটনাও রয়েছে।[৭]

বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা হলেও বাংলাদেশে এখনো এটি একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। গ্রামে অধিকাংশ পরিবার অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে বিয়ে দিতে বাধ্য হয় ধর্ষণ থেকে রক্ষা করতে। এ ক্ষেত্রে ভুয়া জন্মসনদ ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার বিশ্বে অন্যতম সর্বোচ্চ।[৮]

জাতিসংঘের মহাসচির দপ্তরে জমা দেওয়া ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নারী অধিকারভিত্তিক সংগঠন এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠন যারা নারী অধিকার নিয়ে কাজ করছে, তাদের প্রতিনিধিরাও সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। নারী মানবাধিকার নিয়ে কাজ করায় কেবল যে তারা সহিংসতার শিকার হচ্ছেন তা নয়, নারী হওয়ার কারণেও তাদের সহিংসতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বাংলাদেশে সমাজ বা রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা নারী মানবাধিকারকর্মীরা হয়রানির শিকার হন, তাদের নানাভাবে কলঙ্কিত করা হয়। এসবের মধ্যে রয়েছে, মৌখিক হুমকি, প্রশাসনিক হয়রানি এবং যৌন হয়রানি। এ ধরনের অধিকাংশ ঘটনায় শাস্তিও হয় না। এ ছাড়া নারী মানবাধিকারকর্মীরা বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর সদস্যদের দ্বারা অপহৃত হওয়া। মানবাধিকারকর্মীদের গ্রেপ্তার ও বন্দী করাসংক্রান্ত বেশ কিছু তথ্য গত দুই বছরে বাংলাদেশ সরকারের নজরে আনা হয়েছে।[৯]

নারীর প্রতি সকল বৈষম্য সনদ বা সিডও দিবস উপলক্ষে দৈনিক প্রথম আলোর 'বেশি খুন স্বামী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হাতে' শীর্ষক বিশেষ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের নারী নির্যাতনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিষদ ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনের শুরুতেই তথ্য দেওয়া হয়েছে, 'স্বামী ও তার পরিবারের সদস্যদের হাতে

---

৪ *দেশের নারী-বৈষম্যের করুণ চিত্র জাতিসংঘে-* শীর্ষক প্রতিবেদন, (ঢাকা: দৈনিক প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪), প্রথম পাতা।

৫ প্রাগুক্ত।

৬ প্রাগুক্ত।

৭ প্রাগুক্ত।

৮ প্রাগুক্ত।

৯ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

২০০৯ সাল থেকে গত পাঁচ বছরে খুন হয়েছেন এক হাজার ১৭৫ জন নারী। অথচ খুন হওয়া নারীর পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের সংখ্যা বরাবরের মতোই নগণ্য।'[১০]

ওই প্রতিবেদনেই মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) উদৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের (২০১৪) জুন পর্যন্ত সময়ে (ছয় মাস) ১৫৩ জন নারী শুধু পারিবারিক বলয়ে খুন হয়েছেন। এর মধ্যে স্বামীর হাতে খুন হয়েছেন ১১২ জন। তবে মামলা হয়েছে মাত্র ৭১টি। স্বামীর পরিবারের সদস্যরা মিলে খুন করেছেন ৪১ জন নারীকে। এ ক্ষেত্রেও মামলা হয়েছে মাত্র ২৪টি।

আসকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০৯ সালে স্বামীর হাতে খুন হন ১৯৭ জন নারী। মামলা হয় ৯৮টি। স্বামীর পরিবারের সদস্যদের হাতে খুন হন ২৬ জন, মামলা হয় ১৫টি। ২০১০ সালে স্বামীর হাতে খুন হন ২২৫ জন, মামলা হয় ৯৩টি। স্বামীর পরিবারের সদস্যদের হাতে খুন হন ৪৭ জন, মামলা হয় ১৯টি। ২০১৩ সালে স্বামীর হাতে খুনের ঘটনা ২১১, মামলা হয় ১২৬টি। একইভাবে এ সময় স্বামীর পরিবারের হাতে ৪৮ জন খুন হলেও মামলা হয় ৩৮টি। আসক ১২টি দৈনিক পত্রিকা থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী নারীদের বেলায় এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটছে।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জাতীয় পর্যায়ে একটি জরিপ পরিচালনা করে। 'ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন (ভিএডব্লিউ) সার্ভে ২০১১' শীর্ষক সমন্বিত এই জরিপ ২০১৩ সালেরস ৩০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

বিবিএসের জরিপ অনুযায়ী দেশে বিবাহিত নারীদের ৮৭ শতাংশ স্বামীর মাধ্যমে কোনো না কোনো সময়ে, কোনো না কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হন। এক-তৃতীয়াংশের বেশি বিবাহিত নারী জীবনের কোনো না কোনো সময়ে স্বামীর মাধ্যমে যৌন নির্যাতনেরও শিকার হন। এ ছাড়া মানসিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনের বিভিন্ন চিত্রও উঠে এসেছে এ জরিপে।[১১]

---

[১০] *'বেশি খুন স্বামী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হাতে'*- শীর্ষক প্রতিবেদন (ঢাকা: দৈনিক প্রথম আলো, ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১৪), পৃ. ১

[১১] *'ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন (ভিএডব্লিউ) সার্ভে ২০১১'* শীর্ষক সমন্বিত জরিপ, (ঢাকা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) কর্তৃক প্রকাশিত, ২০১৩) ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ

সারা পৃথিবীতে বাড়ছে নারী নির্যাতন। পুরাতন নির্যাতনের সাথে যুক্ত হচ্ছে নির্যাতনের নতুন নতুন মাত্রা এবং ধরণ। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নারী নির্যাতনের যে সব তথ্য-উপাত্ত ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো নারী নির্যাতন ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে।

নারী নির্যাতনে শুধুমাত্র বাংলাদেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় আনলেই বোঝা যায়, আজও ঘরে-বাইরে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে নারী। নারীর মর্যাদা ও সম-অধিকারের দাবিতে ১০০ বছরেও বেশি সময় ধরে সারা পৃথিবীতে নারী দিবস উদযাপিত হচ্ছে। সর্বক্ষেত্রে নারীরা এগিয়ে গেলেও নারীর পিছু ছাড়েনি নির্যাতন। বাংলাদেশেই দেশে প্রতিদিন কত ধরনের নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। বিশ্বের আজ এমন কোনো কর্মস্থল নেই যেখানে নারীর সরব পদচারণা নেই। নারী সব জায়গায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে কাজ করে চলেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে, নারীরা যত বেশি এগুচ্ছে ততই তাদের জীবনে অত্যাচার-নির্যাতনের নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও নারী নির্যাতনের মাত্রা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান এবং সূত্র প্রাপ্ত তথ্য থেকে বাংলাদেশে নারীর প্রতি নির্যাতনের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরা হলো–

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ধর্ষণ

ধর্ষণ পৃথিবীর প্রাচীনত অপরাধগুলোর মধ্যে একটি। বাংলাদেশও ধর্ষক নামক ঘৃণ্য নরপশুদের হাত থেকে মুক্ত নয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ব্যাপকাকার ধারণ করছে ধর্ষণ নীতি। নতুন বছর শুরু হয় সবার জন্য সুন্দর দিনের অপেক্ষায়, কিন্তু বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন, দেশের বিভিন্ন স্থানে অহরহ এসিড সন্ত্রাসসহ, নারীরা, এমনকি শিশুদের ধর্ষণ এবং নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে। রেহাই পাচ্ছে না ৪ বছরের শিশু থেকে ৭০ বছরের বৃদ্ধাও। এ ধরনের খবর প্রতিনিয়তই গণমাধ্যমে আসছে। কিন্তু অপরাধীরা সাজা পাচ্ছে এমন খবর খুব একটা চোখে পড়ছে না। আরো দুঃখজনক হলো ক্ষমতাসীন কোন ব্যক্তি নারী নির্যাতনের সাথে জড়িত থাকলে তার শাস্তি দেয়ার কোন নজিরই থাকছে না। বাংলাদেশের মত দেশে যেদেশে প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা দু'জনেই নারী সেখানে– ধর্ষক, এসিড সন্ত্রাসী, নারী নির্যাতনকারীরা এভাবে পার পেয়ে যাচ্ছে তা সত্যই নিরাশাব্যঞ্জক।

'অধিকার' নামক একটি মানবাধিকার সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১২ সালের জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর এই নয় মাসে ৩৩৮ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এদের মধ্যে ১৫৮ জন নারী ও ১৮০ জন মেয়ে শিশু। ১৫৮ জন নারীকে ধর্ষনের পর হত্যা করা হয়েছে আর ৬৮ জন গনধর্ষনের শিকার হয়েছে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের লিগ্যাল এইড উপপরিষদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৭ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে নারীর ওপর সব মিলিয়ে ২৪ ধরনের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ৫৫ হাজার ৯৯৫টি। এর মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা সাত হাজার ২৩২টি। ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা এক হাজার ৩৭২টি। গণধর্ষণের ঘটনা দুই হাজার ৮৫৪টি। ধর্ষণ–সংক্রান্ত এই তিন ধরনের অপরাধ ঘটে ১১ হাজার ৪৫৮টি। ধর্ষণ–সংক্রান্ত অপরাধের পরেই সংখ্যার দিক দিয়ে বেশি অপরাধ হত্যাকাণ্ডের। হত্যাকাণ্ড ঘটে ১০ হাজার ১৬১টি। এর পরই বেশি ঘটনা শারীরিক নির্যাতনের। নারীর ওপর এ ধরনের সহিংসতার ঘটনা ঘটে পাঁচ হাজার ৬২৭টি। সংখ্যার দিক দিয়ে বিবেচনায় এর পরই অবস্থান আত্মহত্যাজনিত অপরাধের। একই সময়ে পাঁচ হাজার ৩৫৮ নারী আত্মহত্যার শিকার হন। দেখা গেছে, ১৪ বছরের এই হিসাব ধরে প্রতিবছরে গড়ে ধর্ষণ-সংক্রান্ত অপরাধ ঘটেছে ৮১৮টি। প্রতিদিন ঘটছে এ ধরনের দুটি অপরাধ। প্রকাশ হওয়া ঘটনার আড়ালে ধর্ষণের অনেক ঘটনা থেকে যাচ্ছে আড়ালে। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন সংস্থার কাছে এ ধরনের মামলার সংখ্যা বাড়ছে।

২০০৮ সালে মহিলা পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত একটি গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, প্রভাবশালীদের মাধ্যমে ৩০ শতাংশ এবং সরকারি চাকুরেদের মাধ্যমে ১১ শতাংশ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। আত্মীয়স্বজনদের মাধ্যমে ১৮ ও প্রতিবেশীদের মাধ্যমে ৩১ শতাংশ ধর্ষণ হয়। অভিভাবকদের মাধ্যমে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ১০ শতাংশ। ২০০৮ সালে মহিলা পরিষদের উদ্যোগে প্রকাশিত ওই গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ধর্ষণের শিকার হওয়াদের সবচেয়ে বেশি ৩১ শতাংশই হচ্ছে ১১ থেকে ১৫ বছরের মেয়ে। এর পরই রয়েছে ১৬ থেকে ২০ বছরের মেয়েরা।[১২]

বাংলাদেশে ধর্ষণ সমস্যার তীব্রতা বোঝার জন্য নিচের টেবিলটির আশ্রয় নেয়া যেতে পারে–

মাস হিসেবে ধর্ষনের রিপোর্ট (২০০৫-২০০৭)

মাস	২০০৫	২০০৬	২০০৭
জানুয়ারী	১৫৩	১৫৯	১২৩
ফেব্রুয়ারী	১৭৭	১৮১	১৭৯
মার্চ	২২৭	২৩৫	৩২৫

[১২] http://info.totthoapa.gov.bd/gender/বাংলাদেশের-বর্তমান-পরিস্থিতি, Visited on 20 July, 2015 (উপরোল্লিখিত তথ্য ও পরিসংখ্যানগুলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় মহিলা সংস্থার তথ্য আপা প্রকল্প ওয়েবসাইট থেকে নেয়া)|

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল	২০৩	২৪৬	৩৩১
মে	২৫০	২২১	৩৭৩
জুন	২৪৮	২২০	৩২২
জুলাই	২৪৬	২৩৭	৩২৯
আগস্ট	২৪৭	২৩২	২১৬
সেপ্টেম্বর	২৫৬	১৭৮	২৮৭
অক্টোবর	২১৭	১৮৮	২৮০
নভেম্বর	১৮৪	২০০	২৬২
ডিসেম্বর	১৪৮	১৫৬	২১৮
সর্বমোট	২৫৫৬	২৪৫৩	৩৩৪৫

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ জেন্ডার স্ট্যাটিসটিকস- ২০০৮

দিনে গড়ে ৯ নারী-শিশু ধর্ষণের শিকার!

২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসের শুরুর দিকে দৈনিক সমকাল পত্রিকার প্রথম পাতায়, 'দিনে গড়ে ৯ নারী-শিশু ধর্ষণের শিকার'– শীর্ষক একটি ব্যাপক তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। ওই একটি রিপোর্টেই বাংলাদেশে ধর্ষণের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে নানা তথ্য-উপাত্ত ও বিশেষজ্ঞ মতামত তুলে ধরা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ওই রিপোর্টের বেশ কিছু অংশ এখানে উপস্থাপন করা হল-

'পুলিশ ও মানবাধিকার সংগঠনের মতে, থানায় দায়ের হওয়া মামলা এবং পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যে নারী ও শিশু ধর্ষণের প্রকৃত পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে না। প্রতিনিয়ত ধর্ষণের যে ঘটনা ঘটে, প্রকাশ পায় এর এক-চতুর্থাংশ। অধিকাংশ ধর্ষণের ঘটনাই নির্যাতিতের পরিবার গোপনের চেষ্টা করে। কিন্তু এরপর যে তথ্য পাওয়া যায় সেটা ভয়াবহ। প্রতিদিন গড়ে ৯ নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়ে বিচারের আশায় থানায় মামলা করেন। এর মধ্যে গড়ে ৪টি ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হয়। সংশ্লিষ্টদের মতে, সচেতনতার অভাবেই বাড়ছে ধর্ষণের মতো ঘটনা। নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোতে ধর্ষণের ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে। চলতি বছরের (২০১৩) ৬ জানুয়ারি পিরোজপুরের নাজিরপুরে ৮ বছরের শিশু আঁখিকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। তার লাশ উদ্ধার করা হয় বাড়ির পাশের বাগানের ভেতর থেকে।

একই দিনে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও ৪ জনকে ধর্ষণের খবর পাওয়া যায়। শুধু ওই দিনই নয়, সারাবছরই রাজধানীসহ সারাদেশে ঘটে এ ধরনের নৃশংস ঘটনা। এসব ঘটনার কিছু কিছু বিচ্ছিন্নভাবে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেলেও অধিকাংশই থেকে যায় আড়ালে। তবে চলতি বছরের প্রথম থেকেই অতীতের তুলনায় অনেক বেশি ধর্ষণের খবর পাওয়া যাচ্ছে। মহিলা আইনজীবী সমিতির নির্বাহী পরিচালক সালমা আলী সাম্প্রতিক সময়ের এসব ঘটনাকে সিরিজ অপরাধ বলে মন্তব্য করেন। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নেতাদের মতে, টাঙ্গাইলের স্কুলছাত্রী গণধর্ষণের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে সারাদেশের মানুষ এক কাতারে দাঁড়িয়েছে, ধর্ষকদের কঠোর শাস্তি দাবি করছে। এ কারণেই ভিকটিমের পরিবারগুলো তথ্য প্রকাশ এবং তারা ধর্ষকদের কঠোর শাস্তি দাবি করছে।

পুলিশ সদর দফতরের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে গত ৪ বছরে সারাদেশে ১২ হাজার ৯৭১ নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছিল ৩ হাজার ৫৬৩টি ধর্ষণের ঘটনা। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ২০১২ সালে ৩ হাজার ৫১০ নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছিল। পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল ১ হাজার ৮৩৭টি ঘটনা। ২০১১ সালে ৩ হাজার ৩৪৪টি ধর্ষণের ঘটনার মধ্যে ৭১১টি ঘটনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছিল। এ ছাড়া ২০১০ সালে ৩ হাজার ২৪৩ নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হলেও

Dhaka University Institutional Repository

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছিল ৫৫৯টি ঘটনা এবং ২০০৯ সালে ২ হাজার ৯৭৭টি ধর্ষণের ঘটনার মধ্যে প্রকাশ হয়েছিল ৪৫৬টি।

মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থাগুলো দাবি করেছে, প্রকাশিত পরিসংখ্যান ধর্ষণসংক্রান্ত ঘটনার সুনির্দিষ্ট তথ্য নয়। প্রকাশিত এসব ঘটনার বাইরেও প্রচুর ঘটনা থেকে যায়, যা পরিবার এবং পারিপার্শ্বিক কারণে অজানা থেকে যায়। পুলিশ সদর দফতরও এ বক্তব্য সমর্থন করে বলেছে, অধিকাংশ ধর্ষণের ঘটনা পরিবার থেকে গোপন করা হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে পারিবারিকভাবে আপস-মীমাংসাও করা হয়। এ কারণে কখনোই ধর্ষণের প্রকৃত পরিসংখ্যান জানা যায় না। এসব পরিসংখ্যান দেখে শুধু এটুকু অনুমান করা সম্ভব, ধর্ষণের ঘটনা এই সমাজে কতটা মহামারী আকার ধারণ করেছে।

নারী ও শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন সংগঠনগুলোর মতে, ধর্ষণের সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তি না হওয়ার কারণে এ ধরনের অপরাধ দিন দিন বাড়ছে। পাশাপাশি মাদকের বিস্তার, বেকারত্ব এবং সচেতনতার অভাবেও সমাজে ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে। আর এসব ঘটনার প্রধান শিকার হচ্ছে নিম্ন আয়ের পরিবারগুলো। এসব পরিবার সব সময়ই নানা ধরনের টানাপড়েনের মধ্যে থাকে। এর সুযোগ নেয় এক ধরনের নরপশুরা। তারা সুযোগ বুঝে এসব পরিবারের শিশুদের নিজের কাছে নেয় এবং অবুঝ শিশুরা তাদের লালসার শিকার হয়। ১ আগস্ট লৌহজংয়ে ধর্ষণের শিকার হয় এক বাক-প্রতিবন্ধী। ওইদিনই ধর্ষিতার পরিবারকে হুমকি-ধমকি দিয়ে থানায় বসেই ঘটনার রফা করে ফেলেন স্থানীয় প্রভাবশালী নেতারা। গত বছরের (২০১২) ১এপ্রিল রাজধানীর কাফরুল থানার ইব্রাহিমপুরে ২ বছর ৪ মাস বয়সী এক শিশুকে আদর করার নামে বাসায় ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে স্থানীয় এক যুবক। ২০১১ সালে মোহাম্মদপুরে টিভি দেখার জন্য ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করা হয় ৭ বছরের এক শিশুকে। ২১ জুন মীরসরাইয়ে ৬ বছরের শিশু ধর্ষণের শিকার হয়। শুধু এ কয়েকটি ঘটনাই নয়, প্রতিনিয়ত রাজধানীসহ সারাদেশে ঘটছে এ ধরনের অনেক ঘটনা।

সামাজিক অবক্ষয়, আকাশ সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব, আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকা, পর্নো ছবির অবাধ বিক্রির কারণেও দেশে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে নারী ও শিশু ধর্ষণের ঘটনা। দেশে প্রতিনিয়ত ধর্ষণের শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। ধর্ষকরা শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষ্যান্ত থাকছে না, ঘটনা ধামাচাপা দিতে ঘটাচ্ছে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের তথ্যানুযায়ী, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রায় তিন হাজার নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৫০০ জনকে। ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছে অর্ধশত নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে।

মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার তথ্যানুযায়ী, ২০১২ সালে ধর্ষণের পর ৫৫ নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। এ ছাড়া গণধর্ষণের শিকার হয়েছিল ৩৮ নারী ও শিশু। ২০১১ সালে গণধর্ষণ করা হয়েছিল ৭৩ নারী ও শিশুকে এবং ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছিল অন্তত ৭০ নারী ও শিশুকে। ২০১০ সালে গণধর্ষণ করা হয়েছিল ৯০ নারী ও শিশুকে এবং হত্যা করা হয়েছিল ৬০ জনকে।

মানবাধিকার কর্মী এলিনা খানের মতে, বাংলাদেশে ধর্ষণের মতো ঘটনা বেড়ে যাওয়ার পেছনে মাদক বড় ভূমিকা পালন করে। যারা মাদক সেবন করে তাদের মধ্যে এক ধরনের মানসিক বিকৃতি তৈরি হয়। এরপরই তারা নানা অনৈতিক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ধর্ষণের ঘটনা তার মধ্যে অন্যতম।

মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবুল বাশারের মতে, দেশে দিন দিন ধর্ষণের ঘটনা বাড়ছে। যেসব ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশ হয় তা প্রকৃত ঘটনার তুলনায় খুবই কম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ষিতা পরিবার এবং সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশের সহযোগিতা না পাওয়ায় নিজেকে গুটিয়ে রাখে।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার দাবি করেছে, সামাজিক লোকলজ্জার ভয়ে ধর্ষণের শিকার হয়ে বেশিরভাগ নারীই বিচার চাইতে যান না। আবার যেসব নারী বিচার চাইতে যান, তাদের পুলিশ, প্রশাসন ও সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে যথেষ্ট হেনস্তা হতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পুলিশ মহাপরিদর্শক হাসান মাহমুদ খন্দকার সমকাল পত্রিকাকে বলেন, অনেক সময়ই দেখা যায় বিপরীত পক্ষকে ফাঁসাতে ধর্ষণের ঘটনা সাজিয়ে মামলা করা হয়। এ কারণে ধর্ষণের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাগুলো পুলিশ সচেতনভাবে তদন্ত করে। মামলার তদন্ত শেষে পুলিশ যথাসময়ে অভিযোগপত্র দাখিলের চেষ্টা করে বলেও জানান তিনি।[১৩]

বাংলাদেশে নারী অধিকার নিয়ে কাজ করে এমন একটি বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ বলছে ২০১৪ সালের প্রথম ছয় মাসে ২২০৮ জন নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সংস্থাটি এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য তুলে ধরে নারীর প্রতি এ ধরনের সহিংসতার অবসানে ধর্ষণ-বিরোধী আইন কার্যকরসহ বেশ কিছু সুপারিশও করে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলছে, এ ধরনের তথ্য তাদের কাছে না এলেও সংস্থাটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সংবাদ সম্মেলনে মহিলা পরিষদ বলেছে, ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত ছ'মাসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৪৩১টি এবং এর মধ্যে গণধর্ষনের শিকার হয়েছেন ৮২ জন। এ সময়কালে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৪৫ জনকে। এছাড়া ধর্ষণের চেষ্টার শিকার হয়েছেন আরও ৫১ জন।

মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়েশা খানম বিবিসিকে বলেছেন, ধর্ষণের ঘটনা সাম্প্রতিক সময়ে বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি শুধু নারী নির্যাতন হিসেবে বিবেচনা করলে হবে না, বরং তিনি মনে করেন এটিকে একটি বিশেষ পরিস্থিতি হিসেবে দেখতে হবে। তিনি বলেন, 'হঠাৎ করে গত দু-তিন মাস (২০১৪ সালের প্রথমাংশে) ধরে অনেক বেড়ে গেছে। ধর্ষণ, অপহরণের পর হত্যা, ধর্ষণের পর হত্যা আমরা দেখছি। তুলনামূলক ভাবে বেড়েছে।'

সরেজমিন ঘটনাগুলো যাচাই করেছেন কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'অবশ্যই। ৬০%-এর বেশি। আমাদের শাখা কমিটিগুলো এগুলো নিয়ে কাজ করছে, মামলা করছে।' নারী প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরকার বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজেও সন্তুষ্ট নন বলে জানান মিসেস খানম।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যক্রমে হতাশা প্রকাশ করলেও মিসেস খানম মনে করেন এ ধরনের বাহিনীগুলোকেই এ সব ঘটনা প্রতিরোধে সক্রিয় ও দক্ষ করে তুলতে হবে। মহিলা পরিষদের পক্ষ থেকে দেয়া তিনি নানা প্রস্তাবও দেন যেগুলো তিনি মনে করেন নারীর প্রতি সহিংসতা কমিয়ে আনতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তিনি বলেন, 'ধর্ষণ বিষয়ে আইন সংশোধন করা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আরও তৎপর হওয়া এবং সাক্ষীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা দরকার। মামলা অনেক ঝুলে আছে, ডিএনও পরীক্ষা নিশ্চিত করা এবং অপরাধ প্রমাণের বোঝা এখনো নারীর উপর সেটাও পরিবর্তন করা দরকার।'

ধর্ষণের ঘটনা বেড়ে যাওয়া ছাড়াও নারী নির্যাতনের ঘটনাগুলোর বিষয়ে মহিলা পরিষদের দেয়া তথ্যগুলোর বিষয়ে কথা বলেছিলাম মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব তারিকুল ইসলামের সাথে।

তিনি জানান মহিলা পরিষদের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। 'পরীক্ষা করে দেখবো কি কি পদক্ষেপ নেয়া যায়, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর এবং মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টদের আরও তৎপর হওয়ার বিষয়টিও আমরা দেখবো।' মি. ইসলাম অবশ্য বলেন সাধারণত এসব বিষয়ে তথ্যের জন্য তারা পুলিশের রিপোর্ট ও মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ব্যবস্থার উপর নির্ভর করেন। এর বাইরে কোন সূত্র থেকে তথ্য পেলে সেটিও তারা বিবেচনায় নিয়ে ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। তবে মহিলা পরিষদ বলছে, এ সব পদক্ষেপ সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুরা ন্যায়বিচার পাওয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক প্রভাবকেই সংস্থাটি অন্যতম বাধা হিসেবে বিবেচনা করছে।[১৪]

---

[১৩] ধর্ষণ সম্পর্কিত উপরোক্ত তথ্যগুলো, দৈনিক সমকাল, ১২ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে প্রথম পাতায় প্রকাশিত প্রতিবেদন 'দিনে গড়ে ৯ নারী-শিশু ধর্ষণের শিকার' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে সংগৃহীত, প্রতিবেদক: নাহিদ তন্ময় ও শামীমা মিতু।

[১৪] রাকিব হাসনাত সুমন, *বাংলাদেশে ছয় মাসে ধর্ষিত ৪৩১ জন: মহিলা পরিষদ* (ঢাকা: বিবিসি বাংলা, ঢাকা ২২ জুলাই ২০১৪)।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ষণ অপরাধের কারণসমূহ

গ্রামেগঞ্জে আজকাল 'ধর্ষণ'ই যেন বিনোদনের উপাদানে পরিণত হয়েছে। ঘরে ঘরে নিকটাত্মীয় কর্তৃকও অনেকে ধর্ষিত ও যৌন নিপীড়নের শিকার হন। বিশেষ করে শিশুরা। মেয়ে শিশুর বাইরে সুদর্শন ছেলে শিশুরাও আক্রান্ত হয়। আবাসিক হল-হোস্টেলে সমলিঙ্গীয় পর্যায়েও জোরপূর্বক যৌন আচরণের ঘটনা রয়েছে। সাধারণত গ্রামে-গঞ্জে, বস্তিসহ দরিদ্র অঞ্চলে ধর্ষণের ঘটনার খবর প্রকাশিত হয়। একটা মেয়ে যখন লেখাপড়া করতে বা কাজের খোঁজে শহরে আসে, তখন সে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে পড়ে। এ ক্ষেত্রে অনেকে সহযোগিতার আড়ালেও তাকে ধর্ষণ করে বা যৌনতায় আবদ্ধ হতে বাধ্য করে। এসবই অন্যায়। ফৌজদারি অপরাধ।

এর বাইরে অফিস-আদালতে, কর্মস্থলে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে থাকে। শিশু-কিশোরী ধর্ষণের ঘটনা বেশি ঘটে পরিবারে, নিকটাত্মীয় দ্বারা। এসব ঘটনার অনেক কিছুই প্রকাশ পায় না। একইভাবে শিক্ষিত মহল, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্তের মধ্যেও অনেক দুর্ঘটনা রয়েছে যা প্রকাশ পায় না। এসব ঘটনায় অনেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে বড় ধরনের আঘাতপ্রাপ্ত হন। রোগী হয়ে যান। যার প্রভাব ভিকটিমকে আজীবনও বহন করতে হয়।

যে সব কারণে ধর্ষণের মতো সবচেয়ে ভয়াবহ নারী নির্যাতন সংগঠিত হচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে–

১. পর্নোগ্রাফি

আবহমানকাল থেকে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে আসছে। অতীতের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে এ ধরনের ঘটনায় প্রধান নিয়ামকের ভূমিকায় রয়েছে পর্নোগ্রাফি। তথ্যপ্রযুক্তি বা ইন্টারনেটসহ মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, ল্যাপটপ ইত্যাদিতে পর্নোছবি দেখে থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, একজন মানুষ যখন পর্নোগ্রাফি দেখে, তখন তার মস্তিষ্ক থেকে হরমোন নিঃসরণ হয়। এ ঘটনা থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যৌনাচারে উৎসাহিত হয়। এ ধরনের মানুষ তখন যৌন আচরণ করার জন্য কুকুরের মতো হয়ে ওঠে। রাতভর পর্নোগ্রাফি দেখে দিনভর সঙ্গী খুঁজে । এভাবে এ রকম পরিস্থিতিতে যৌনতা যে একটি সুস্থ আচরণের বহিঃপ্রকাশ সেই বিবেচনা অনেক ক্ষেত্রেই কাজ করে না। মেয়েরা যে শ্রদ্ধার পাত্র, সেই বিবেচনা উধাও হয়ে যায়। ধৈর্য্য থাকে না। জোর করে যৌন আচরণ করতে চায় ব্যক্তি। অনেক ক্ষেত্রে এমনও ঘটে যে, প্রেমিকাকে নিয়ে হয়তো ডেটিংয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে প্রেমিকার শুধু আড্ডা-আলাপ লক্ষ্য থাকলেও পর্নোগ্রাফিতে আসক্ত প্রেমিক জোর করে। এ জোরের ঘটনা শরীর আর মনের বেশি বিরুদ্ধে গেলে তা হয়তো প্রকাশিত হয়। নইলে এ ধরনের ধর্ষণের ঘটনাও রয়ে যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে।

২. মাদক

মাদকের ভয়ঙ্কর প্রভাব যুব সমাজকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ধর্ষণের আরেক নিয়ামকও বটে এই মাদক। এমনও অনেক মাদক রয়েছে যা সেবীকে যৌনতায় প্রবৃত্ত করে। কিছু কিছু নাটক, চলচ্চিত্রসহ বিশ্ব সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান ব্যক্তিকে ধর্ষণে উৎসাহিত করে। এসব উপাদান বিশেষ করে নতুন প্রজন্মকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নষ্ট করছে। মেয়েরা ভোগের বস্তু- এমন ধারণা তাদের মধ্যে প্রোথিত করছে।

৩. মূল্যবোধের আবক্ষয়

জাতীয়ভাবে আমাদের নিজস্ব পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রয়েছে। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনধারা অত্যন্ত মজবুত। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ব সংস্কৃতির যে সুনামি চলছে, তা আমাদের পারিবারিক-সামাজিক-নৈতিক মূল্যবোধ ভেঙেচুরে খান খান করে দিচ্ছে।

৪. প্রযুক্তির সহজলভ্যতা

সাম্প্রতিক সময়ে ধর্ষণের ঘটনা আশংকাজনক হারে বেড়ে গেছে। মূলতঃ পারিবারিক ও সামাজিক প্রথা ও সংস্কার ধুলিসাৎ, সামাজিক ও নৈতিকতার চরম অবক্ষয়, তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার বিশেষ করে ল্যাপটপ-

Dhaka University Institutional Repository

কম্পিউটার-মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা ও জবাবদিহিতাবিহীন ব্যবহারের সুযোগ, পর্নগ্রাফির অবাধ বিস্তার, বিশ্ব সংস্কৃতির নেতিবাচক দিকের আগ্রাসনই ধর্ষণের ঘটনা বাড়িয়ে দিয়েছে।

৫. অন্যান্য কারণ

এসব কারণগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্বল পারিবারিক বন্ধন, দুর্বল সামাজিক কাঠামো, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, দারিদ্র্য, বিচারহীনতা। আরও রয়েছে স্থানীয় ও জাতীয় সংস্কৃতি চর্চার অভাব, সুষ্ঠু ও সুস্থ ধারার বিনোদনের অনুপস্থিতি, কিশোর-কিশোরীদের ক্রীড়া-কর্মকাণ্ডের অভাব ইত্যাদি। সমাজে যতসংখ্যক ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে, ততটার বিচারের খবর আমরা পাই না। গণমাধ্যমে এ ধরনের খবর তেমন একটা দেখাও যায় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে ধর্ষকরা শুধু পারই পায় না, পুরস্কৃতও হয়।

ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয়

সামাজিক এই অপরাধের বিস্তার রোধ করতে হলে আইনের কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করা এবং ধর্মীয় শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার চেতনাবোধ জাগ্রত করা গেলে এই অপরাধ প্রবণতা অনেকখানি কমে আসবে। সমাজকে মানুষের বসবাসযোগ্য রাখতে হলে এই অপরাধ প্রবণতাকে রোধ করার বিকল্প নেই। দুর্বৃত্তরা যাতে কোনোভাবেই আইনের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখা দরকার, অপরাধের শাস্তি না হওয়া অপরাধ বিস্তারের অন্যতম প্রধান কারণ। আজকের ধর্ষণজনিত অপরাধ বৃদ্ধির পেছনে একই কারণ বিদ্যমান। একই সঙ্গে সচেতন নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে অপরাধের বিরুদ্ধে। গড়ে তুলতে হবে শক্ত প্রতিরোধ। ধর্ষকদের পক্ষে কেউ যদি আদালতে না লড়েন, সেটা হবে অন্যতম একটি প্রতিরোধ। তবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাজ থেকে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ প্রবণতা দূর করা সম্ভব। ধর্ষণ প্রতিরোধে করণীয় কার্যাবলীকে নিম্নলিখিত ভাবে চিহ্নিত করা যায়-

প্রথম: সরকারকে ধর্ষকের কঠোরতম শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে যাতে করে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ধর্ষক বের হয়ে যেতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে। প্রচলিত আইনের ব্যত্যয় না ঘটলে এবং আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারলে শুধু ধর্ষণই নয় সকল প্রকার অনাচার সমাজ থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়: ধর্ষণের শাস্তি ব্যাবস্থা হতে হবে দ্রুত এবং এই শাস্তির প্রচার করতে হবে বেশ ভালোভাবে। এতে করে অন্তত শাস্তির ভয়ে হলেও কিছু মানুষ ধর্ষণের অপরাধ থেকে দূরে থাকবে।

তৃতীয়: মেয়েরা যে মানুষ শুধু ভোগ্য বস্তু না এটা সর্বস্তরের মানুষ পুরুষ এবং মহিলা সবাইকে বুঝতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

চতুর্থ: ধর্ষণ অপরাধ এবং প্রতিটা ধর্মে ধর্ষণকারীর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান আছে এটা সম্ভাব্য সকল উপায়ে মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। একটা নারীর বেশভূষা, ধর্ম, চালচলন পেশা যাই হোক না কেন তা তার ধর্ষণের কারণ হতে পারে না। আমাদের ধর্ম আর আইন তাই বলে। কোনভাবে কোন যুক্তিতেই ধর্ষণের মত ঘৃণ্য অপরাধ সমর্থন যোগ্য নয়।

পঞ্চম: শিশু ধর্ষকদের কঠোরতম শাস্তি, আর আমাদের সমাজের সর্বস্তরে শিশু ধর্ষণ নিয়ে আলোচনা করার দরকার। অনেক মা-বাবাই জানে না ছেলে শিশু ও মেয়ে শিশু ধর্ষণ হয়, চাইল্ড molestation হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিচিত কারো দ্বারা। এ বিষয়ে অনেক সচেতন হওয়া দরকার সরকার ও সমাজের প্রতিটা মানুষের।

ষষ্ঠ: শুধুমাত্র আইন করে কোনদিনও ধর্ষণ বন্ধ করা যাবে না, তাতে যত কঠোর শাস্তিরই বিধান থাক না কেন। আমাদের বুঝতে হবে যে প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। তাই সামাজিক সচেতনতা, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধের চর্চা এবং ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলাই এই অবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে।

সপ্তম: নারীদের নিজেদেরই তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অর্থাৎ, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্ষণ প্রতিরোধে সবচেয়ে বেশি দরকার নৈতিকতা আর সামাজিক মূল্যবোধের চর্চা এবং জণসচেতনতা।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদেরকে বুঝতে হবে একজন ধর্ষিত মেয়ের কোন অপরাধ নেই, তিনি অপরাধের শিকার হয়েছেন এবং সমাজ তার পাশেই আছে। যদি তিনি তাৎক্ষনিক কোন সহায়তা পান, তাহলে তার শরীর এবং পোষাক থেকেই অপরাধী সনাক্তকরণ এবং প্রমানের জন্য যথাযথ আলামত সংগ্রহ করা যাবে। সেই ক্ষেত্রে তিনি যেন কোন ভাবেই পানি দিয়ে বা পোষাক পরিবর্তন করে আলামতগুলো নষ্ট না করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ যৌতুক

বাংলাদেশের ১৯৮০ সনের যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইনে যৌতুকের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ: যৌতুক অর্থ- (ক) কোন এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে, অথবা (খ) বিবাহের কোন এক পক্ষের পিতামাতা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোন পক্ষকে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে বিবাহের মজলিসে বা বিবাহের পূর্বে বা পরে যে কোন সময়ে বিবাহের পণ রূপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদানে অঙ্গিকারাবদ্ধ যে কোন সম্পত্তি বা জামানত।[১৫]

২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণয়ন করা হয়। তাতেও যৌতুকের ব্যাপক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এ আইনটি ২০০৩ সালে সংশোধন হয়। সংশোধিত আইনে যৌতুকের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা এই: যৌতুকের অর্থ–

(অ) কোন বিবাহে বর বা বরের পিতামাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সাথে জড়িত বরপক্ষের অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে বিবাহের পণ হিসেবে বিবাহের অন্য পক্ষে বরপক্ষের অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্তবিবাহের সময় বা তৎপরে বা বৈবাহিক সর্ম্পক বিদ্যমান থাকাকালে বিবাহ স্থির থাকার শর্তে বিবাহের পণ হিসাবে প্রদত্ত বা প্রদানে সম্মত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ।[১৬]

তবে দেনমোহর যৌতুকের অন্তর্ভুক্ত নয়। যৌতুক নিষিদ্ধ করণ আইন ১৯৮০তে যৌতুকের সংজ্ঞা দেওয়ার পর বলা হয়েছে, শরীয়ত মোতাবেক প্রদেয় দেনমোহর, বা মোহরানা ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।'[১৭] তদ্রুপ ভারতের ১৯৬১ সনের যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন থেকেও মোহরকে বাদ দেওয়া হয়েছে।[১৮]

বাংলাদেশে কখন কীভাবে যৌতুক প্রথার প্রচলন শুরু

মুসলিম আইন অনুযায়ী পাত্রীকে মোহরানা পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে উল্টো পাত্রী পক্ষকে যৌতুক দিতে বাধ্য করা হচ্ছে! ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে যৌতুক নামক প্রথা অপরিচিত ছিল না। সমীক্ষায় দেখা যায়, বাংলাদেশে ১৯৪৫-১৯৬০ সালে যৌতুকের হার ছিল ৩%। ১৯৮০ সালে আইনগতভাবে যৌতুক নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু তারপর থেকে যৌতুকের হার অনেকাংশে বেড়েছে, যা ২০০৩ সালে ছিল ৭৬%।[১৯] সাম্প্রতিক (২০০৮) ব্র্যাক ও আমেরিকার পপুলেশন কাউন্সিলের সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা ভেদে যৌতুকের হার হচ্ছে ২০% থেকে ৮০%।[২০]

বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা প্রচলনের মূল কারণ

১ সমাজ বিজ্ঞানীর মতে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।[২১]

২ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অনুযায়ী আমাদের দেশে যৌতুক প্রথা প্রতিষ্ঠার পেছনে মুসলিম বিবাহ সংক্রান্ত আইন-কানুন পরিবর্তন (দ্বিতীয় বিবাহে অত্যন্ত কঠোরতা ও বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনত ঝামেলাপূর্ণ) ও বাকীতে মোহরানা (deferred bride price) দেওয়ার প্রবণতাকেও দায়ী করা হয়েছে।[২২]

---

[১৫] যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৮০, আইন নং ০৫

[১৬] ধারা-২, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০৩

[১৭] যৌতুক নিষিদ্ধ আইন ১৯৮০, আইন নং ৩৫

[১৮] বাংলা পিডিয়া, প্রাগুক্ত, খ. ৮ম, পৃ. ৪৫৫

[১৯] Siwan Anderson, *The Economics of Dowry and Brideprice* (Journal of Economic Perspectives, 2007), Vol. 21, p. 151–174

[২০] Sajeda Amin, *Reforming marriage practices in Bangladesh* (Brief no, 31 January 2008)

[২১] Santi Rozario, *Purity and Communal Boundaries: Women and Social Change in a Bangladeshi Village* (Dhaka: The University Press Ltd, 2004)

Dhaka University Institutional Repository

৩ কন্যার বৈবাহিক জীবনের নিশ্চয়তার লক্ষ্যে 'সিকিউরিটি মানি' (Security money) হিসেবে যৌতুক দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। অন্যদিকে পাত্ররাও মোহরানা বাকীতে পরিশোধ করতে চায়। এজন্য কন্যার অভিভাবকরাও বড় অংকের মোহরানা ধার্য করে যা বেশীর ভাগ পাত্রই পরিশোধ করার সমর্থ রাখে না। কিন্তু আইন অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছেদ হলে ঐ মোহরানা আদায় করা হয়। যার ফলে এতে বিবাহ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।[২৩]

৪ যৌতুক গ্রহণে মানুষের লোভ অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে তরুন সমাজের বেশীর ভাগ যৌতুককে খারাপ দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে। কিন্তু দূর্মূল্যের বাজারে ফাও (Free বিনা পরিশ্রমে) পেতে সবারই থাকে প্রচণ্ড আকাংখা থাকে। এজন্য সাধারণত পাত্রপক্ষকে ঘর সাজানোর উপকরণ (যেমন ফ্রীজ, টেলিভিশন, ফার্নিচার, মোটর সাইকেল) সংগ্রহে উদগ্রীব দেখা যায়।

যৌতুকের ভয়াবহতা

বারবার আইন করেও যৌতুক বন্ধ করা যাচ্ছে না। নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে তা সহজেই বোঝা যায়। ২০০৩ সালের জুলাই মাসে প্রাপ্ত জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে পূর্ববর্তী ১০ বছরে ৫০ শতাংশ নারী যৌতুকের কারণে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০০১ সালে সারা দেশে অন্তত ১২৮ জন মহিলা যৌতুকের কারণে খুন হয়েছে, আত্মহত্যা ১৮ জন, নির্যাতনের শিকার হয়েছে ৪০ জন, তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে ১৫ জন। এজন্য মামলা হয়েছে ২, ৭৭১টি।

জাতীয় মহিলা আইনজীবি সমিতির এক জরিপে প্রকাশ, ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত যৌতুকের জন্য খুন হয়েছে ৬৮৫ জন নারী, শারীরিক নির্যাতন ৫৮২ জন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের নারী নির্যাতন সেলের হিসাব অনুযায়ী যৌতুকের কারণে ২০০০ সালে পারিবারিক আদালতে মামলা হয়েছে ৬৭৫ টি। ২০০১ সালে ৪১২ টি, ২০০২ সালে ১২০ টি ও ২০০৩ সালে ১৪১ টি।[২৪]

জাতীয় দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিনে'র একটি শিরোনাম হল, 'যৌতুক : নোয়াখালি ও ভৈরবে দুই গৃহবধু খুন।' রিপোর্টারের বক্তব্য অনুযায়ী, নোয়াখালিতে যৌতুকের জন্য চার সন্তানের জননীকে পিটিয়ে ও শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। একই কারণে কিশোরগঞ্জে ৩ সন্তানের জননীকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে গৃহকর্তা।[২৫]

এ ধরনের সংবাদ প্রায় প্রতিদিনই প্রকাশিত হয়। যৌতুক এখন মহামারীর আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে নারীরা পুরুষ কর্তৃক যত প্রকার নির্যাতিত হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যৌতুকের শিকার। বর্তমানে এ যৌতুক একটি প্রথা হিসেবে দেখা দিয়েছে। যা নারী সমাজের জন্য এক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুগ যুগ ধরে এ যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে। আজ যৌতুক নামক এ কু-প্রথাটি ক্রমান্বয়ে সমাজের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের নারীরা উন্নয়নের পথে অনেক দূর এগিয়েছে কিন্তু যৌতুকসহ বিভিন্ন অশুভ সামাজিক প্রথা সামাজিকভাবে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে এখন প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। দেশে যৌতুক বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে কিন্তু তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। সরকারকে এদিকে নজর দেয়া দরকার যাতে কেউ আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে বেরিয়ে আসতে না পারে। যৌতুক প্রথার ফলে আজ নারীর মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হচ্ছে। তারা আজ সমাজে মানুষ হিসেবে মর্যাদা পাচ্ছে না। কাজেই এই মানবতা বিরোধী কু-প্রথার অচিরেই অবসান হওয়ার

---

[২২] Attila Ambrus, Erica Field, Maxio Torero, *Muslim family law, prenuptial agreements and the emergence of dowry in Bangladesh* (The Quarterly Journal of Economics 2010), 125 (3), 1349-1397

[২৩] Hanne Cecilie Geirbo, Nuzhat Imam, *The Motivations Behind Giving and Taking Dowry Research Monograph* Series No. 28, (BRAC, July 2006)

[২৪] পিআইডি ইউনিসেফ ফিচার, তথ্য অধিদপ্তর ইউনিসেফ থেকে প্রকাশিত 'মা ও শিশু' বই থেকে সংগৃহীত।

[২৫] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২মে, ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

দরকার। তা না হলে এই বাংলাদেশ নামক ক্ষুদ্র দেশে পরিবারে কখনও শান্তি আসবে না। নারী যাতে নিগৃহীত নিপীড়িত না হয় এ জন্য এ হীন যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে এখনই গণআন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ জন্য দরকার সরকার ও জনগণের সমন্বিত উদ্যোগ।

নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ বাড়িয়ে যৌতুক বিরোধী কঠোর আইন প্রয়োগ করে যৌতুককে সমাজ থেকে চিরতরে বিদায় করতে হবে। তাহলে দেশে আসবে শান্তি, আর পরিবার হবে সুখের।

সমাজে যৌতুক হলো একটি কঠিন সামাজিক রোগ। আমাদের সমাজে গরীব-ধনী সব পরিবারেই যৌতুক প্রথা বিদ্যমান। যৌতুকের জন্য নারীনির্যাতনের ঘটনা দিন দিন বেড়ে চলেছে। গ্রাম- শহর সব জায়গাতেই স্ত্রীরা স্বামীদের বা তাদের পরিবারের সদস্যদের দ্বারাপ্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে, কখনো কখনো মারাও যাচ্ছে। একাধিক সন্তানসহ নারীকে প্রায়ঃশই ঘর সংসার হারাতে হয় যৌতুকের কারণে। বাংলাদেশে হত্যাকান্ডের শিকার নারীর বিরাট অংশই যৌতুকের বলি। আমাদের প্রচলিত আইন যৌতুক প্রথা সমর্থন করে না। আইনে যৌতুক দেয়া ও নেয়া উভয়ই অপরাধ।

সাধারণ অর্থে 'যৌতুক' বলতে বিয়ের সময় মেয়ে পক্ষের কাছ থেকে ছেলে পক্ষের দাবী- দাওয়া আদায়কে বুঝালেও, আইনে বিয়ের শর্ত হিসেবে বর বা কনে যে কোন পক্ষের দাবী-দাওয়াকে যৌতুক বলে। ১৯৮০সালের যৌতুক নিরোধ আইন অনুসারেপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যদি কোন পক্ষ অপর পক্ষকে বিয়ের আগে-পরে-চলাকালীন যে কোন সময় যে কোন সম্পদ বা মূল্যবান জামানতহস্তান্তর করে বা করতে সম্মত হয় সেটাই যৌতুক বলে বিবেচ্য হবে। সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের উপহার যৌতুক হিসেবে গণ্য হবে না। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে যে এই উপহার অবশ্যই বিয়ের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় এমন কেউ প্রদান করতে হবে এবং বিয়ের পণযৌতুক হিসেবে প্রদান করতে পারবেন না, উপহার হিসেবে দিতে হবে। অর্থাৎ বিয়ের শর্ত হিসেবে ৫০০ টাকার সমমূল্যের কোন কিছুও দেয়া যাবে না, দিলে তা আইন অনুসারে যৌতুক হবে এবং অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ অনুসারে বিবাহ স্থির থাকার শর্তে বা বিবাহের পণ হিসেবে প্রদত্ত বা প্রদানে সম্মত অর্থ, যে কোন সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদকে যৌতুক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মুসলিম বিয়ের দেনমোহর যৌতুক নয় কারণ, ১৯৮০ সালের যৌতুক নিরোধ আইনের ২(খ) ধারায় বলা হয়েছে- যৌতুক বলতে মুসলিম ব্যক্তিগতআইন (শরিয়ত) মোতাবেক ব্যবস্থিত দেনমোহর বা মোহরানা বুঝাবে না।

যৌতুক দেয়া-নেয়া উভয়ই আইনের চোখে সমান অপরাধ। যৌতুক নেয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ যা প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ ৫ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড হতে পারে। যৌতুক আদায়ের জন্য নির্যাতন করলে বা স্ত্রীর মত্যু ঘটালে সর্বোচ্চ শাস্তি।

যৌতুক প্রতিরোধে আইন

১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়। এতে আছে কেউ যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করিলে অথবা প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করলে সে ৫ বছর পর্যন্ত (এক বছরের কম নয়, আবার ৫ বছরের বেশি নয়) কারাদন্ড বা ৫ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডণীয় হবে।[২৬]

যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০

১৯৮০ সনের ৩৫ নং আইন

যেহেতু বিবাহের যৌতুক আদান-প্রদান নিরোধ করিয়া আইন প্রণয়ন করা যুক্তিযুক্ত

[২৬] নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০৩ ধারা ১১/(ক); গাজী শামসুর রহমান, *ইসলামী আইনের ভাষ্য*।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ১।

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং বলবৎ হওয়ার তারিখ-

১) এই আইনকে যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ বলা হইবে।

২) সরকার অফিসিয়াল গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখে নির্ধারণ করিবেন সেই তারিখ হইতে ইহা বলবৎ হইবে।

ধারা ২।

সংজ্ঞা

এই বিষয়ে বা প্রসঙ্গে যদি না বিরোধী কিছু থাকে, তাহা হইলে এই আইনে যৌতুক অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দিতে সম্মত হওয়া কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত-

ক) বিবাহের এক পক্ষের দ্বারা বিবাহের অপর পক্ষের প্রতি, অথবা

খ) বিবাহের সময় বা বিবাহের পূর্বে বা পরে যে কোন সময় উক্ত পক্ষগণের বিবাহের প্রতিদান হিসাবে বিবাহের যে কোন পক্ষের মাতা-পিতা দ্বারা বা অপর কোন ব্যক্তির প্রতি, কিন্তু যে ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রযোজ্য তাহাদের ক্ষেত্রে যৌতুক বা মোহর অন্তভূক্ত করে না।

ধারা ৩।

যৌতুক আদান-প্রদান জন্য শাস্তি

এই আইনের কার্যকারিতা শুরু হইবার পর হইতে যদি কোন ব্যক্তি যৌতুক প্রদান করে কিংবা গ্রহণ করে অথবা প্রদান বা গ্রহণে সহায়তা করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচ বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং এক বছরের কম মেয়াদের নহে, অথবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা ৪।

যৌতুক দাবির শাস্তি–

এই আইনের কার্যকারিতা শুরু হইবার পর হইতে যদি কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে বা বরের পিতা বা অভিভাবকের নিকট হইতে যৌতুক দাবি করে, তাহা হইলে সে পাঁচ বছর মেয়াদ পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবে এবং এক বছরের কম মেয়াদের নহে, অথবা কারাদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ধারা ৫।

যৌতুক আদান বা প্রদানের চুক্তি অবৈধ হইবে

যৌতুক আদান বা প্রদানের যে কোন প্রকার চুক্তি অবৈধ হইবে।

ধারা ৬।

[১৯৮৪ সালের ৬৪ অধ্যাদেশ দ্বারা বাদ দেওয়া হয়েছে]

ধারা ৭।

অপরাধ আমলে নেওয়া

১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধিতে (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) যাহাই থাকুক না কেন-

ক) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নতর কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার করিতে পারিবেন না;

খ) অপরাধের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে অভিযোগ আনায়ন করা ব্যতীত কোন আদালত এইরূপ অপরাধ আমলে আনিবেন না;

গ) এই আইনের অধীন অপরাধের জন্য দণ্ডাদেশ দেওয়া কোন ব্যক্তিকে এই আইনে অনুমোদিত যে কোন শাস্তি মঞ্জুর করা একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে আইনসংগত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধারা ৮।

অপরাধসমূহ আমলে অযোগ্য, জামিন অযোগ্য এবং মীমাংসাযোগ্য

এই আইনের অধীন প্রত্যেকটি অপরাধ আমল অযোগ্য জামিন অযোগ্য এবং মীমাংসাযোগ্য হইবে।

ধারা ৯।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১) এই আইনের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করিবার জন্য সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিবেন।

২) এই ধারার অধীন প্রণীত প্রত্যেকটি বিধি প্রণয়নের পর পরই জাতীয় সংসদে উত্থাপন করিতে হইবে এবং যে সেশনে উপস্থাপিত হইয়াছে উহা শেষ হইবার আগি যদি সংসদ বিধিতে সামান্য কোন পরিবর্তন করিতে সম্মত হন অথবা সম্মত হন যে, বিধি প্রণয়ন করা হইবে না তাহা হইলে অবস্থামত বিধিটি শুধু সেই পরিবর্তনরূপে কার্যকর থাকিবে অথবা উহার কার্যকারিতা থাকিবে না, তবে শর্ত থাকে যে, সেই বিধির অধীন পূর্বে কৃত কোন কিছুর বৈধতা ক্ষুন্ন না করিয়াই সেইরূপ সামান্ন পরিবর্তন বা নাকচকরণ হইবে।

যৌতুক আইনের সংশোধন

নারী ও শিশুর উপর নির্যাতন রোধ করবার এই আইন ২০০৩ সালে সংশোধিত হয়েছে। যৌতুক বিরোধী কিংবা যৌতুকের কারণে নারীর উপরে নির্যাতন রোধ করবার জন্য এই আইনে যৌতুক দাবি করে নারীর উপরে অত্যাচার করবার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। 'যদি কোনো নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামী পক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্য ঘটানোর চেষ্টা করেন, উক্ত নারীকে আহত করেন বা আহত করবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি–

[ক] মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদন্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

[খ] আহত করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে বা আহত করার চেষ্টা করার জন্য অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অনুন্য পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দন্ডের অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন। এই আইনের বিধানে এই সকল অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো জামিন পাইবেন না, যদি অভিযোগকারী অসম্মতি জানান, যদি আদালত মনে করে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষি হইবার যুক্তি সংগত কারণ আছে, কিংবা যদি ট্রাইবুনাল [বিশেষ আদালতে নারী নির্যাতন আইনের মামলার বিচার হয়] মনে করে অভিযুক্তকে মুক্তি দিলে ন্যয় বিচার বাধাগ্রস্থ হবে।

মামলার নিস্পত্তি হতে হবে ১৮০ দিনের মধ্যে

যদি আদালত মনে করে অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতার বা তাহাকে বিচারের জন্য সোপর্দকরণ এড়ানোর জন্য পলাতক রহিয়াছেন কিংবা আত্মগোপন করিয়াছেন। কিংবা পেপারে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার পরে অনধিক ৩০ কর্ম দিবসের ভেতরে তিনি নিজেকে আদালতে সোপর্দ না করিলে। কিংবা জামিনে মুক্তি পাইবার পর ফেরার হইলে, আদালত তাহার অনুপস্থিতিতে বিচার সমাপ্ত করতে পারবে। সাধারণত আদালতে আসামী হাজির না হলে বিচারিক শুনানী শুরু করার নিয়ম নেই।

যৌতুক বিরোধী আইনের অপপ্রয়োগ

আইনটির কঠোরতা বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে এর অপপ্রয়োগও লক্ষণীয়। জেলা শহরগুলোর অনেক জেলহাজতে এই মামলায় মিথ্যা অভিযুক্ত অনেক আসামী জামিন অযোগ্য বিধায় বিচার সমাপ্ত হওয়ার দিন

Dhaka University Institutional Repository

গুনছেন। এমন কি বাদীকে এই মামলার আসামী করবার পরে বিবাদী পক্ষও বাদী পক্ষকে হেনেস্তা করবার জন্য একই রকমের মামলা দায়ের করেছে। ফলে বাদী পক্ষের মানুষ এবং বিবাদী পক্ষের মানুষ উভয়েই জেলহাজতে। এবং আইনের কঠোরতা এমনই যে অভিযুক্ত নয় চতুর উকিল আসামী পুরুষ এবং তাহার সকল পরিজনকে অভিযুক্ত হিসেবে দেখায়। মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয় অনেক সময়ই। অনেক সময়ই প্রকৃত অভিযুক্ত নির্দিষ্ট ১৮০ দিনের সময়সীমার ভেতরে আদালতে উপস্থিত হইতে পারে না। মামলার জটও প্রচুর। অপপ্রয়োগের কারণে এই বলিষ্ঠ আইনটিও উপযোগিতা হারিয়েছে।

মানুষের প্রতিহিংসা কিংবা প্রতিশোধ পরায়নতা এবং এর সাথে অর্থলোভী উকিল খুব ভয়ংকর সংযোগ। তারা হয়রানির জন্য এই মামলার আসামি হিসেবে যে কাউকেই অভিযুক্ত করতে পারেন। এবং যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাকে ধরে বেঁধে আদালতে হাজির করে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ভারতও যৌতুক এবং নারী নির্যাতন রোধ করবার জন্য এমন একটা আইন করেছিলো, এটা অনেকটা মুক্তিপণ আদায়ের কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশেষত সম্পন্ন পরিবারের মানুষদের সাথে এই প্রক্রিয়ায় আইনি ভয়ভীতি দেখিয়ে কেউ কেউ অর্থ উপার্জন করছে। পাশা বদলে গেছে একেবারে। যারা একটা সময় যৌতুকের দাবিতে স্ত্রীর উপরে অত্যাচার করতো। কঠোর আইনের কারণে তারাই এখন শিকার, তাদের এই আইনের ভয় দেখিয়ে কনেপণ আদায় করছে কন্যা পক্ষ। এটাও অভিপ্রেত নয়।

যারা যৌতুক নেন না, তারাও কি যৌতুক থেকে মুক্ত?

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারে তথাকথিত যৌতুক প্রথা সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অন্যভাবে কন্যার পরিবারকে চাপের মধ্যে রাখা হয়, যেটা যৌতুকের অন্তর্ভূক্ত। ইসলামীক ভাবধারা মতে কন্যার পরিবারকে বিয়ের সামাজিক অনুষ্ঠান পালনে নিরুৎসাহি করা হয়েছে। তবে পাত্র পক্ষকে সামর্থানুযায়ী বউভাত (ওলিমা) করতে উৎসাহি করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সামাজিক ও বরপক্ষের চাপে কন্যাপক্ষকে রীতিমতো ঘটা করে বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হয়। বর্তমানে বিয়েতে আবার আমদানী করা হয়েছে ভিনদেশী নতুন নতুন অনুষ্ঠান (যেমন: এনগেজমেন্ট, গায়ে হলুদ (বরপক্ষ ও কনেপক্ষের আলাদা), মেহেদী, আকদ, ফিরানি, হানিমুন ইত্যাদি। যার ফলে অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সময় দেউলিয়া হওয়ার উপক্রম হয়। অন্যদিকে পাত্রকে সমাজের মুখ রক্ষা করতে গিয়ে সামর্থের অধিক খরচ করতে বাধ্য করা হয়। আর এর প্রভাব পড়ে নব-দম্পতির পারিবারিক জীবনে। অভাব-অনটন দিয়ে শুরু হয় নতুন পরিবারের যাত্রা। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে ঐ বিয়েকে উত্তম ও কল্যাণকর বিয়ে বলা হয় যেখানে খরচ ও জাঁকজমক কম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ এসিড সন্ত্রাস

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এই সহিংসতার সবচেয়ে বীভৎস রূপ সম্ভবত এসিড সন্ত্রাস। যদিও বলা হয়ে থাকে যে, এসিড সন্ত্রাস কমানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অন্যান্য দেশগুলোর জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে; কিন্তু প্রতিনিয়ত পত্রিকার পাতায় আসা এসিড সন্ত্রাসের খবর এখনও সচেতন সমাজকে সংকুচিত করে।

এসিড সন্ত্রাসের ভয়াবহ চিত্র

এসিড সন্ত্রাস বাংলাদেশের জন্য নতুন নয়। প্রতিনিয়ত নারীরা এসিড সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছেন। এসিড সন্ত্রাস দমনের জন্য কঠিন আইন থাকলেও এই আইনের ফলাফল খুব একটা ভালো নয়। পরিসংখ্যান বলছে, আমাদের দেশে এসিড সন্ত্রাসের পরিমাণ কমে আসছে। কিন্তু সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রতিদিনের শিরোনামে দেশের কোনো না কোনো প্রান্তে এসিড সন্ত্রাসের শিকার হওয়ার ঘটনা চোখে পড়ে।

বাংলাদেশে প্রথম এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে ১৯৬৭ সালে। তখনও সমাজে এসিড সন্ত্রাস ততটা মারাত্মক হয়ে উঠেনি। এরপর আবার এসিড সন্ত্রাস আলোচায় আসে ১৯৯৬ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরে। শামীমা নামক এক নারীর ওপর এসিড হামলা চালায় এক নরপশু। তখন তার বয়স মাত্র ১৪ বছর। শামীমা বলেন, 'আমি এখন আর আয়না দেখি না। কিন্তু যখনই আমি আমার নাক অথবা কান স্পর্শ করি, তখনই মনের আয়নায় ওই দৃশ্য ভেসে ওঠে।'[২৭] এরপর থেকে বিভিন্ন সময় এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে। এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের হিসাবে, ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৩ হাজার ২৪০টি এসিড হামলার ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল ২০০২ সাল। ওই বছর প্রায় ৫০০ এসিড হামলার ঘটনা ঘটে।

এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৯৯ সালে এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে ১৬৫টি, ২০০০ সালে ২৪০টি, ২০০১ সালে ৩৫১টি, ২০০২ সালে ৪৯৪টি, ২০০৩ সালে ৪১৬টি, ২০০৪ সালে ৩২৬টি, ২০০৫ সালে ২২১টি, ২০০৬ সালে ১৮২টি, ২০০৭ সালে ১৬২টি, ২০০৮ সালে ১৪৩টি, ২০০৯ সালে ১২৫টি, ২০১০ সালে ১২০টি এবং ২০১১ সালে ৯১টি, ২০১২ সালে ৭১ টি, ২০১৩ সালে ৬৯ টি, ২০১৪ সালে ৫৬টি এবং সর্বশেষ চলতি ২০১৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন ১৪জন।[২৮]

এসিড আক্রমণের ফলাফল

১. নারী নির্যাতনের নৃশংসতম একটি ধরণ হচ্ছে এসিড নিক্ষেপ। এসিড সন্ত্রাসের পরিণতিতে একজন নারীর শারীরিক মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমরা বা অন্যরা এক্ষেত্রে শুধু সহানুভূতি জানাতে পারি, সমব্যাথি হতে পারি। কিন্তু; তার যে ক্ষতি হয়ে যায় তা থেকে মুক্তি দিতে পারি না। এসিড নামক রাসায়নিক এ দাহ্যপদার্থটির ভয়াবহতা এত ব্যাপক যে, যা চামড়ার নিচের টিস্যু, এমনকি হাঁড় পর্যন্ত গলিয়ে দেয়। এসিড সন্ত্রাসের যে কোনো ঘটনা মনুষ্য চেতনাকে আহত করে।

২. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও এসিড সারভাইভার্স ফাউন্ডেশন (এএসএফ)-এর হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের মাঝামাঝি থেকে ২০১২ সালের শেষার্ধ্ব পর্যন্ত সারাদেশে ৩ হাজার ৮৬টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। আর এতে আহত হয়েছে অন্তত ৩ হাজার ৩৯২ জন। এদের প্রায় সবার নাক ও চোখসহ মুখমন্ডল এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মারাত্মভাবে ঝলসে যাওয়ায় জীবন এক কঠিন উপাখ্যানে পরিণত হয়েছে। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক।

---

[২৭] তথ্য আপা প্রকল্প, http://info.totthoapa.gov.bd/gender/□□□□-সন্ত্রাস-□□□-□□□□□□□□□-□□□□-□□□□-0. Visited on 20 September, 2015

[২৮] তথ্য আপা প্রকল্প, http://www.acidsurvivors.org/Statistics, Visited on 20 September, 2015

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখজনক এ উপাখ্যানের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হলে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও দোষীদের শাস্তি প্রদানের বিষয়ে আরও মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন।

৩. এসিড সন্ত্রাসে ভুক্তভোগীর জীবনে যে যন্ত্রণা ও বিভীষিকার সৃষ্টি হয় তা অনুধাবন করে বাংলাদেশ সরকার এই ধরণের অপরাধের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে সচেতনতা সৃষ্টি ও এসিড দগ্ধদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করেছে।

৪. এসিড সহিংসতা রোধে এসব আইন ও এ সংক্রান্ত বিধিমালা হলেও দেশে এসিড সন্ত্রাস সেভাবে কমেনি। এজন্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা পর্যালোচনা করে এর যথার্থ সংশোধন প্রয়োজন। ১২মে ২০০৯ সালে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে এসিড সারভাইভরসদের নিয়ে আয়েজিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এসিড সন্ত্রাসের মামলা ৯০ দিনের মধ্যে শেষ হওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন। পাশাপাশি জাতীয় এসিড নিয়ন্ত্রন কাউন্সিলের ২১তম সভায় মামলাগুলো পর্যালোচনা করে একটি মনিটরিং সেল গঠন করার কথাও জানানো হয়। বাংলাদেশের দণ্ডবিধি অনুযায়ী এসিড ছোড়ার শাস্তি হিসেবে রয়েছে সর্বনিম্ন ৭ থেকে ১২ বছরের জেল বা সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এই আইন বিদ্যমান থাকলেও অনেক সময় আইনের অপর্যাপ্ততা ও প্রয়োগ না করার কারনে এসিড নিক্ষেপকারী দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শতকরা ৩০ভাগ এসিড নিক্ষেপকারী দোষী স্বাব্যস্ত হলেও উচ্চ আদালতে তাদের আপিলের কারনে দণ্ড স্থগিত হয়ে যায়। বর্তমানে প্রায় ৩০০টি মামলা নিম্ন আদালতে প্রক্রিয়াধীন আছে। পুলিশ সদস্যদের দুর্নীতি ও তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারনে অধিকাংশ মামলা যথাযথভাবে তদন্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে এসিড নিক্ষেপকারী ছাড়া পেয়ে যায় ও বাদী উপযুক্ত বিচার পায় না।

এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন

প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মত পুরুষতান্ত্রিক দেশে নারীকে স্বাধীন মানুষ হিসেবে কল্পনাই করা হয় না। তাই নারী অবদমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় সহিংসতার নানা ধরণ। সে কারণেই দেখা যায় পেছনের পটভূমি যাই হোক না কেন যৌতুক থেকে শুরু করে পারিবারিক সহিংসতা, জমি-সম্পত্তি, টাকা-পয়সা সংক্রান্ত বিরোধ, বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধ, প্রেম-বিবাহ, যৌন সম্পর্কে অসম্মতি সবক্ষেত্রে নারী ভুক্তভোগীর সংখ্যাই বেশি। বাংলাদেশে সরকারি সহযোগিতার পাশাপাশি বেসরকারিভাবে এসিড আক্রান্ত নারীদের পুনর্বাসনের জন্য যে প্রতিষ্ঠানের কথা অবশ্যই বলা উচিত তা হল এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন (এএসএফ)।

এএসএফের প্রতিষ্ঠার আগে এসিড হামলায় আক্রান্তদের চিকিৎসার ও পুনর্বাসন এবং এসিড সন্ত্রাসের প্রতিরোধের জন্য কোন সমন্বিত উদ্যোগ ছিল না। ফলে বাংলাদেশে এসিড সন্ত্রাস ব্যপক বিস্তৃতি লাভ করে। প্রথমদিকে কিছু এনজিও বিচ্ছিন্নভাবে এসিড আক্রান্ত নারীদের আইনি ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান শুরু করে। কিন্তু তা ছিল অপর্যাপ্ত, নির্যাতিত নারীদের জন্য সরকারী আশ্রয়তের তকনণ মমটিই ছিল আক্রান্তদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। এ আশ্রয়গুলোর অপর্যাপ্ততার মূল কারণ মানুষের স্বভাবজাত সামাজিক ঝোঁকপ্রবনতার মধ্যেই নিহিত। একজন এসিড আক্রান্তকে যতই সুযোগসুবিধা ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হোক না কেন তাকে সাধারণ সমাজে সুস্থভাবে বাঁচার সুযোগ না করে দিতে পারলে প্রকৃত সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়।

এই চিন্তাধারা থেকেই কেবলমাত্র এসিডকে উপলক্ষ করে একটি স্বাধীন ও স্বাবলম্বী ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তাছাড়া তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিট ছাড়া অন্য কোথাও চিকিৎসার সুব্যবস্থাও ছিল না। আর এসিড সহিংসতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্যোগ ছিল খুবই সীমিত।

এই প্রেক্ষাপটের এক পর্যায়ে ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউনিসেফ প্রণীত একটি প্রতিবেদনে এসিড হামলায় আক্রান্তদের সাহায্য এবং পুনর্বার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রোধকল্পে এ ধরনের একটি ফাউন্ডেশন গঠনের সুপারিশ করা হয় এবং পাশাপাশি এর অপরিহার্যতার প্রতিও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় CIDA

Dhaka University Institutional Repository

(কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি) এবং ইউনিসেফ একসাথে কাজ করা শুরু করে। এ সময় কয়েকটি বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবচনায় আনতে হয় -

ক. এসিডদগ্ধ ও তাদের নিকট আত্মীয় স্বজনদের নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা করা।

খ. আক্রান্তদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

গ. নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ঘ. তাদের পুনর্বাসনে সাহায্য করা।

এ সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় রেখেই পরবর্তী বছরের মে মাসে এএসএফের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর প্রতিষ্ঠা প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের অনেক আত্মনিবেদিত স্বেচ্ছাসেবক এবং ট্রাস্টিদের প্রভূত সহযোগিতা ছিল। ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে সংঘটিত প্রতিটি এসিড হামলার ঘটনা রেকর্ড করে। সংগৃহীত প্রতিটি সহিংসতার ঘটনার বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র প্রতিবাদের মুখে, ২০০২ সালে সরকার দুইটি আইন জারি করে– একটি হলো এসিডের সহজলভ্যতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং অন্যটি হলো এসিড নিক্ষপকারীদেরকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদানের জন্য।

এই আইনগুলো এবং ফাউন্ডেশনের গণসচেতনতা কর্মসূচিকে ধন্যবাদ, এসিড হামলার সংখ্যা ২০১১ সালে ৮৪তে নেমে এসেছে, যা ২০০২ সালে ৪৯৪ ছিল। এসিডে ঝলসে যাওয়ার চিকিৎসায়, কয়েক বছর ধরে কয়েকবার অপারেশন করানোর প্রয়োজন হয়, যা ব্যয়বহুল। ফাউন্ডেশন ঢাকায় একটি হাসপাতাল পরিচালনা করে থাকে যেখানে চারজন পূর্ণ-কালীন ডাক্তার রয়েছেন। সেই সাথে, ঢাকার নেতৃস্থানীয় হাসপাতালগুলোর চারজন প্লাস্টিক সার্জন ভিকটিমদের জন্য স্বেচ্ছাসেবা দিয়ে থাকেন।

এসিড সন্ত্রাস পরিসংখ্যান

১৯৯৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত

সাল	এসিড আক্রান্তের সংখ্যা	সারভাইভারসের সংখ্যা
১৯৯৯	১৬৫	১৬৭
২০০০	২৪০	২৪০
২০০১	৩৫১	৩৫২
২০০২	৪৯৪	৪৯৬
২০০৩	৪১৬	৪১৯
২০০৪	৩২৬	৩৩৩
২০০৫	২২১	২৭৬
২০০৬	১৮২	২২৩
২০০৭	১৬২	১৯৯
২০০৮	১৪৩	১৮৫
২০০৯	১২৮	১৫৮
২০১০	১২১	১৫৯
২০১১	৯২	১১৯
২০১২	৭১	৯৮
২০১৩	৬৮	৮৪
২০১৪	৫৮	৭২
সর্বমোট	৩২৪২	৩৫৮৯

সূত্র : এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন[২৯]

[২৯] http://www.acidsurvivors.org/Statistics/1, Visited on 20 September, 2015

Dhaka University Institutional Repository

২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত ২১টি এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে গেছে। এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের তথ্যে উঠে এসেছে এসব ভয়াবহতার চিত্র।

মাস	এসিড আক্রান্তের সংখ্যা	সারভাইভারসের সংখ্যা
জানুয়ারি	৪	৮
ফেব্রুয়ারি	৩	৫
মার্চ	৪	৪
এপ্রিল	৩	৮
মে	৫	৬
জুন	২	২
সর্ব মোট	২১	৩৩

২০০২ সালে বাংলাদেশ সরকার এসিড সন্ত্রাস দমনে কঠোর আইন প্রণয়ন করে। অভিযুক্তদের দ্রুত বিচারের পাশাপাশি এসিডের ব্যবহার, মজুত ও বিক্রির ওপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। এসিড নিক্ষেপকারীর জামিন নামঞ্জুর ও এক বছরের মধ্যে তাদের বিচার শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, আগে যেখানে বছরের পর বছর লেগে যেত। অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তি দেয়ায় বিধান করা হয়েছে। বাংলাদেশের দণ্ডবিধি অনুযায়ী এসিড ছোড়ার শাস্তি হিসেবে রয়েছে সর্বনিম্ন ৭ থেকে ১২বছরের জেল বা সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। এই আইন বিদ্যমান থাকলেও অনেক সময় আইনের অপর্যাপ্ততা ও প্রয়োগ না করার কারনে এসিড নিক্ষেপকারী দিব্যি ঘুরে বেড়ায়। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শতকরা ৩০ভাগ এসিড নিক্ষেপকারী দোষী স্বাব্যস্ত হলেও উচ্চাদালতে তাদের আপিলের কারনে দণ্ড স্থগিত হয়ে যায়। বর্তমানে প্রায় ৩০০টি মামলা নিম্ন আদালতে প্রক্রিয়াধীন আছে। অনেক সময় পুলিশ সদস্যদের দুর্নীতি ও তথ্যের অপর্যাপ্ততার কারনে অধিকাংশ মামলা যথাযথভাবে তদন্ত করা সম্ভব হয় না। ফলে এসিড নিক্ষেপকারী ছাড়া পেয়ে যায় ও বাদী উপযুক্ত বিচার পায় না।

২০১৩ সালের বিভিন্ন মাসের তথ্য উপাত্ত এদেশে এখনও এসিড সন্ত্রাস কি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে আছে তার সাক্ষ্য দেয়:

সাল: ২০১৩

মাস	এসিড আক্রান্তের সংখ্যা	সারভাইভারের সংখ্যা
জানুয়ারী	৬	৮
ফেব্রুয়ারী	৫	৫
মার্চ	২	২
এপ্রিল	৬	৯
মে	৪	৭
জুন	৪	৬
জুলাই	৮	৮
আগস্ট	৮	৯
সেপ্টেম্বর	১০	১৩
অক্টোবর	৬	৬
নভেম্বর	৮	১০
ডিসেম্বর	১	১
সর্বমোট	৬৮	৮৪

সূত্র : এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন

Dhaka University Institutional Repository

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে ২০১৩ সালের এমন কোন মাস নেই যখন কোন এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেনি যা অত্যন্ত হতাশাব্যাঞ্জক। এই এসিড সন্ত্রাসের শিকার আসলে কোন শ্রেণী? নিচের টেবিলটি এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সহায়ক হবে:

সাল ২০১২

মাস	এসিড আক্রান্তের সংখ্যা	সারভাইভারের সংখ্যা
১৮ বছরের নিচে	৯	২৩
১৯-২৫	৪	১৯
২৬-৩৫	৬	১২
৩৬-৪৫	৬	১১
৪৬-৫৫	১	২
৫৫ উর্ধ্বে	৪	১
মোট	৩০	৬৮
সর্বমোট	৯৮	

সূত্র : এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী ভুক্তভোগীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি। সাধারণত ১৮ বছর বয়সের নারীরা এ সন্ত্রাসের শিকার হয় সবচেয়ে বেশি। এসিডের সারভাইভরস ফাউন্ডেশনের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে এসিডের শিকার জনগোষ্ঠির মধ্যে শতকরা ৪৭ ভাগ নারী, ২৬ভাগ পুরুষ ও ২৭ ভাগ শিশু।

এসিড সন্ত্রাসের কারণ

বাংলাদেশে এসিড নিক্ষেপ নারী নির্যাতনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রেম বা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি না হলেই মানুষ নামের নরপশুরা এসিড নিক্ষেপ করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে। পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলাদেশের অধিকাংশ এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে থাকে প্রেমঘটিত কারণে। আবার অনেক সময় যৌতুকের কারণেও এসিড ছোড়া হয়। বখাটে ছেলেরা অনেক সময় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এসিড ছুড়ে নারীর মুখ ঝলসে দেয়। শত্রুতা করেও অনেকে মেয়েদের মুখে এসিড ছুড়ে মারে। কোনো সভ্য সমাজে এটা কল্পনাও করা যায় না। এসিডদগ্ধ নারী কোনোভাবে বাঁচতে পারলেও তাঁকে জীবন্মৃত অবস্থায়, মাথা নিচু করে কোনোভাবে দিনাতিপাত করতে হয়। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো এসিড নিক্ষেপের ঘটনা সাধারণত নিম্নবিত্ত বা নিন্ম মধ্যবিত্ত পরিবারের মধ্যে বেশি হয়ে থাকে এবং নগরাঞ্চলে গ্রামাঞ্চলের চেয়ে এর প্রভাব খুব কম। এসিড নিক্ষেপের মতো নৃশংস অপরাধ নির্মূল করতে জনসচেতনতা সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এই সন্ত্রাসের ব্যাপকতা তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর যে কোনো দেশের চেয়ে মাত্রাতিরিক্ত। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ চিত্র আরো ভয়াবহ। উগ্র ও ধ্বংসাত্মক এ সন্ত্রাসের ভয়াবহতা থেকে আজকাল শিশু, বৃদ্ধ এমনকি পুরুষরাও রেহাই পাচ্ছে না। এ সন্ত্রাস রুখতে সংশ্লিষ্ট আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং এসিডের সহজলভ্যতা রুখতে হবেই।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এসিড সন্ত্রাসের কারণ অনুসন্ধান প্রসঙ্গে এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের ২০১২ সালের একটি তথ্যচিত্র পর্যালোচনা করা যেতে পারে–

Dhaka University Institutional Repository

২০১২ সালের এসিড আক্রমনের কারণ[৩০]

কারণ	পুরুষ	নারী	শিশু
যৌতুক	-	৮	-
পারিবারিক সহিংসতা	২	১০	৫
জমি/সম্পত্তি/টাকা সংক্রান্ত বিরোধ	৮	১৪	২
বিবাহ সংক্রান্ত বিরোধ	-	৫	১
প্রেম/বিবাহ/ যৌন সম্পর্কে অসম্মতি	৩	৫	১৪
অজানা	১	১	১
অন্যান্য	৮	৬	৪
সর্বমোট	২২	৪৯	২৭

সম্প্রতি ঘটা কিছু এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা

এসিড নিক্ষেপ নারীর প্রতি সহিংসতার বাস্তব চিত্র প্রদর্শন করে কেবল। নিচে এই ঘৃণ্য সহিংসতার অতি সম্প্রতি ঘটা কিছু ঘটনার মাধ্যমে এর ভয়াবহতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে–[৩১]

ঘটনা ১ : কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় এক যুবক চতুর্থ শ্রেণীর মাদ্রাসাছাত্রীকে ধরে নিয়ে এসিড দিয়ে তার বুকে নিজের নাম লিখে দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ৬ জুন ২০১৩ এ ঘটনা ঘটে। এলাকাবাসী জানান, সাইফুল ইসলাম ওরফে শিপু (২২) নামের এক যুবক দু'তিন মাস ধরে চতুর্থ শ্রেণীর ওই ছাত্রীকে মাদ্রাসায় আসা-যাওয়ার পথে উত্ত্যক্ত করে আসছিলো। এতে মেয়েটির অসহায় বাবা বাধ্য হয়ে তার মাদ্রাসায় যাওয়া বন্ধ করে দেন।

ওই ছাত্রীর মা বলেন, ৬ জুন বিকেলে তার মেয়ে বাড়ির পাশের খালে গোসল করতে গেলে সাইফুল তাকে ধরে পাশের জঙ্গলে নিয়ে যায়। পরে তার মেয়েকে ছোরার ভয় দেখিয়ে তার বুকে এসিড দিয়ে নিজের নাম 'সাইফুল' লিখে দেয়। এ সময় তার মেয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। তিনি বলেন, স্থানীয় লোকজন তার মেয়েকে জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেখে খবর দিলে তারা তাকে উদ্ধার করেন। সেদিনই সাইফুলের বাবা উপর্যুক্ত বিচারের আশ্বাস দিয়ে চিকিৎসার জন্য তার মেয়েকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করান। কিন্তু তার মেয়ে একটু সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি টালবাহানা শুরু করেন।

ঘটনা ২ : সম্প্রতি এসিড অভিশাপের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে কুমিল্লার দাউদকান্দির মাদ্রাসা ছাত্রী পঞ্চদশী ফারজানা আক্তার। মাদ্রাসার মেধাবী ছাত্রীটির দিকে এলাকার বখাটেদের নজর পড়ে তাদের প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এসিড নিক্ষেপ করে ঝলসে দেওয়া হয় ফারজানার মুখ। ২২ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে গত ৩ ডিসেম্বর ২০১৩ ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে। ফারজানা যখন রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তখন জানালা দিয়ে তাকে লক্ষ্য করে এসিড ছোড়া হয়। এসিডে ফারজানার মুখ দগ্ধ হওয়ার পাশাপাশি তার ভাগ্নে ফয়সাল ও কাজের মেয়ে খাদিজাও গুরুতর আহত হয়।

ঘটনা ৩ : নোয়াখালী জেলার ফারহানা আরেকজন ভিকটিম, এখন তার বয়স ১৪ বছর। ১৬ জুন ২০১০ তারিখে স্থানীয় গুণ্ডারা তার বাড়ির ভেতরে ঢুকে তার উপর এবং তার বোন ও বোনের ছেলের উপর এসিড ছুঁড়ে মারলে তার মুখ ও চোখ পুড়ে যায়। তিনি বলেন, 'আমার দোষ ছিল আমি তাদের অশ্লীল প্রস্তাবে রাজি হইনি'। তিনি জানান, এই ঘটনার জন্য দায়ী দুই যুবকের কোনো শাস্তি হয়নি, কারণ তাদের একজনের চাচা সেই অঞ্চলে অত্যন্ত প্রভাবশালী।

---

৩০ http://www.acidsurvivors.org/Statistics, Visited on 20 September, 2015

৩১ তথ্য আপা প্রকল্প, http://info.totthoapa.gov.bd/gender/□□□□-সন্ত্রাস-□□□-□□□□□□□□-□□□-□□□□. Visited on 20 September, 2015

Dhaka University Institutional Repository

এসিড সন্ত্রাস রোধের উপায়

আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যাতে আর কোনো নারী এসিড সন্ত্রাসের শিকার না হয়। এসিড সন্ত্রাস বন্ধে এবং এসিড আক্রান্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন সংগঠন এবং এককভাবেও অনেকে অবিরাম কাজ করে চলেছেন। এদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই আজ এসিড সন্ত্রাসের ভয়াবহতা কমতে শুরু করেছে। তবে এই ধারাবাহিকতা ধরে রেখে এসিড সন্ত্রাসের শেকড় পুরোপুরি উপড়ে ফেলতে হবে। আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তরে বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এসিড সহিংসতায় যেমন সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় নারী সমাজ, তেমনি এসিড আক্রমণকারীর সিংহভাগ হলো পুরুষ। এসিড সন্ত্রাসের ভয়াবহতা, আইনগত শাস্তি, পারিবারিক ও সমাজিক বিপর্যয়ের কথা যদি একজন পুরুষ কিশোর বয়সেই জানতে পারে, তাহলে বড় হয়ে এসিড সন্ত্রাসী দানবে পরিণত হবার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়। পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে, এসিড সন্ত্রাসের শিকার অধিকাংশ নারীর বয়স ১৮ কিংবা তারচেয়েও কম। তাই নতুন প্রজন্মের তরুণীদের মধ্যে এসিডদগ্ধদের পুনর্বাসন, আইনি সহায়তার বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতার বীজ বুনতে পারলে, সময় এলে তারাও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস পাবে।

মূলতঃ তাঁত, স্বর্ণ ও ব্যাটারি কারখানার জন্য এসিড প্রয়োজনীয় একটি উপাদান হলেও আলু-পটলের মতো নির্বিচারে দেশের সর্বত্র এর কেনাবেচা চলছে। এছাড়া কিছু জেলার সীমান্ত এলাকায় চোরাইপথে আসা এসিড একটি সহজলভ্য পণ্যে পরিণত হওয়ায় যে কেউ খুব সহজেই তা সংগ্রহ করে মানুষের জীবন বিপন্ন করে তুলছে। লাইসেন্সভুক্ত প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কারও কাছে এসিড বিক্রি করার নিয়ম নেই। সমাজ থেকে এসিড সন্ত্রাস নির্মূল করতে হলে সর্বাগ্রে এর ব্যবহার কঠোর নজরদারির আওতায় এনে তা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি এসিড সংক্রান্ত মামলার রায়ে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহারের পাশাপাশি আইনের ফাঁক গলিয়ে অপরাধী যাতে পার পেয়ে না যায়, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।

দেশের প্রচলিত আইনে এসিড সন্ত্রাসের কঠোর শাস্তির বিধান থাকলেও তার প্রয়োগ নেই বললেই চলে। অপরাধীরা মামলার তদন্ত সংশ্লিষ্টদের প্রভাবিত করে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার পেয়ে যায়। এ অবস্থার প্রতিরোধে এসিড সন্ত্রাসের তদন্ত ও বিচারের সময় নির্দিষ্ট করে দেয়ার কথা ভাবা যেতে পারে। তদন্তের ক্ষেত্রে তদন্ত কর্তৃপক্ষের গাফিলতি থাকলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণেরও বিধান থাকতে হবে। এসিড সন্ত্রাসে জড়িতদের সাজা বৃদ্ধিরও উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। এর পাশাপাশি যৌক্তিক কারণ ছাড়া এসিড ক্রয়-বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথাও ভাবা যেতে পারে। কোনো মানুষের ওপর এসিড নিক্ষেপ তাকে হত্যা করার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। এ অপরাধের শিকার যারা তাদেরকে সারা জীবন বিড়ম্বনার মধ্যে কাটাতে হয়। এমন বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যুবরণও অনেক সময় কাম্য হয়ে দাঁড়ায়। এ অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের কোনোভাবেই ক্ষমা পাওয়া উচিত নয়। এ সন্ত্রাস নির্মূলের কর্মসূচিতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে।

দেশী-বিদেশি এনজিও এবং সুশীল সমাজের কল্যানে এসিড সন্ত্রাস দিনে দিনে কমছে। সরকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্নভাবে তাদের কর্মসূচী চালিয়ে আসছে। তার মধ্যে এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন, প্রথম আলো পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এসিডদগ্ধদের আর্থিকভাবে সহায়তা করছে ও এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জনমত তৈরী করে যাচ্ছে। এছাড়া আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি এসিডদগ্ধদের জন্য আইনীভাবে লড়ছে ও নৈতিক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এসিড সন্ত্রাস পুরোপুরি নির্মূল করতে এ ধরণের এনজিওগুলোর কর্মপরিধি আর ও বাড়াতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ইভটিজিং

ইভটিজিং দক্ষিন এশিয়ার একটি অন্যতম সমস্যা। এ শব্দটি মূলতঃ একটি পুরুষ দ্বারা নারীকে যৌন নিপীড়ন, উত্যক্ত করা বা লাঞ্ছনা প্রদান বুঝাতে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তান এই তিনটি দেশে সর্বাধিক পরিমানে ব্যবহৃত হয়। ইভটিজিং শুধু একটি সামাজিক সমস্যাই নয়, বরং এটি একটি ভয়াবহরকমের সামাজিক ও মানসিক ব্যাধি। বাজে অঙ্গভঙ্গী, অশ্লীল মন্তব্য, অশ্লীল ছবি ও ভিডিও প্রদর্শন, শিষ বাজানো, গায়ে হাত দেয়া, হাততালি দেয়া ইত্যাদি ইভটিজিংয়ের সাধারন কিছু উদাহরন। আধুনিক ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ারযুগে মোবাইলে মিসড কল দেয়া বা অশ্লীল মেসেজ আদান প্রদান করাও ইভটিজিংয়ের পর্যায়ে পড়ে।

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় ই-তথ্য কোষে ইভটিজিংয়ের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ইভটিজিং বলতে কোন মানুষকে বিশেষ করে কোন নারী বা কিশোরীকে তার স্বাভাবিক চলাফেরা বা কাজ কর্ম করা অবস্থায় অশালীন মন্তব্য করা, ভয় দেখানো, তার নাম ধরে ডাকা এবং চিৎকার করা, বিকৃত নামে ডাকা, কোন কিছু ছুঁড়ে দেয়া, ব্যক্তিত্বে লাগে এমন মন্তব্য করা, ধীক্কার দেয়া, তার যোগ্যতা নিয়ে টিটকারী দেয়া, তাকে নিয়ে অহেতুক হাস্যরসের উদ্রেক করা, রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে ধাক্কা দেয়া, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা, ইঙ্গিতপূর্ণ ইশারা দেয়া, সিগারেটের ধোয়া গায়ে ছাড়া, উদ্দেশ্যমূলকভাবে পিছু নেয়া, অশ্লীলভাবে প্রেম নিবেদন করা। উদ্দেশ্যমূলকভাবে গান, ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি করা, চিঠি লেখা, পথরোধ করে দাঁড়ানো, প্রেমে সাড়া না দিলে হুমকি প্রদান ইত্যাদিও ইভটিজিং-এর মধ্যে পড়ে। বর্তমানে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগে মোবাইল ফোন এবং ই-মেইলের মাধ্যমেও ইভটিজিং হয়ে থাকে।[৩২]

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ইভটিজারদের প্রায় ৩৩ শতাংশই মধ্যবয়স্ক লোক এবং শতকরা ১১জন নারী অফিসে তার বসের দ্বারা কোন না কোনভাবে নির্যাতিত হচ্ছেন। আরো এক সমীক্ষায় দেখা গেছে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতি ৫১ সেকেন্ডে একজন নারী টিজিং এর শিকার হচ্ছেন।

ইভটিজিংয়ের কারণে একটি মেয়ে তার শিক্ষাজীবন, পারিবারিক বা সামাজিকভাবে যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার প্রতিকারের জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে তাকে রক্ষা করার জন্য সুস্পষ্ট কোনো আইন দেখা যায় না। ফলে একজন নারী এ রকম অপমানজনিত পরিস্থিতিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আত্মহত্যার পর বখাটেদের বিচারের জন্য বা আত্মহত্যায় প্ররোচনার জন্য দণ্ডবিধির ৩০৬ ধারায় বিধান দেয়া আছে, যা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ৯-এর 'ক' ধারায় আত্মহত্যার প্ররোচনা এবং তার সাজা সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানে সর্বোচ্চ সাজা ১০ বছর, সর্বনিম্ন ৫ বছর। কিন্তু এখানে বাদীকে প্রমাণ করতে হবে, আসামি ভিকটিমের সঙ্গে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভিকটিমের সম্ভ্রমহানি করেছিল এবং এই সম্ভ্রমহানির প্রত্যক্ষ কারণে ভিকটিম আত্মহত্যা করেছিল। অর্থাৎ সম্ভ্রমহানির ঘটনায় ভিকটিমের কোনো ইচ্ছা ছিল না। আসামি ভিকটিমকে পরিকল্পিতভাবে ইভটিজিং করে। ইভটিজিংয়ের কোনো সুনির্দিষ্ট আইন না থাকায় বখাটেদের উৎপাত বেড়ে যাচ্ছে।

'দণ্ডবিধি' বাংলাদেশের অপরাধসংক্রান্ত প্রধান আইনগ্রন্থ। এতে মোট ৫১১টি ধারা আছে, যার মধ্যে কেবল একটি ধারা, যার নম্বর ৫০৯ ইভটিজিং সমর্থিত, যার সর্বোচ্চ সাজা এক বছর অথবা অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ড। আবার বখাটেদের অপরাধ প্রমাণ করাও যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন' যার মধ্যে ইভটিজিং সম্পর্কিত কোনো বিধানের কথা বলা নেই। ডিএমপি অ্যাক্টে একটিমাত্র ধারা আছে, যার নম্বর ৭৬, যা দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারাকে সমর্থন করে। সচরাচর এ ধারায় সর্বোচ্চ ২ হাজার টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে।

আইনের ক্ষেত্রে ইভটিজিং বন্ধে অপ্রতুলতা থাকার ফলে নির্যাতনের এই হাতিয়ার থেকে নারীদেরকে রক্ষা করা যাচ্ছে না কোনভাবেই। সামাজিক সচেতনতাই এ ক্ষেত্রে কম কার্যকরী একটি মাধ্যম হতে পারে। মেয়েদের প্রতি বখাটেদের উৎপাত বা ইভটিজিং বন্ধে অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, ছেলেমেয়ের বৈষম্য দূর, প্রচলিত

[৩২] জাতীয় ই তথ্য কোষ 'http://infokosh.gov.bd/atricle/ ইভটিজিং' Web address Last Visited on 20 September, 2015

Dhaka University Institutional Repository

আইনের দুর্বলতা কাটিয়ে কঠোর আইন প্রণয়ন এবং সামাজিক আন্দোলন বা প্রতিরোধ গড়ে তোলাই হবে ইভ টিজিং বন্ধের মূলমন্ত্র।

বাংলাদেশে ইভটিজিং পরিস্থিতি

ইভটিজিং আমাদের দেশের উঠতি বয়সের মেয়েদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দেশের প্রতিটি এলাকায় দিন দিন বখাটে ছেলেদের উৎপাত বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে অল্প বয়সী নারী বা কিশোরীরা ভীষণভাবে ইভটিজিংয়ের শিকার হচ্ছে। এসব অত্যাচারীর খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য অনেক নারী বা কিশোরীকে আত্মাহুতিও দিতে হচ্ছে। আজকাল অনেক ছেলেই মেয়েদের সঙ্গে ভালোবাসার অভিনয় করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার নারীত্বকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। সে দৃশ্য ভিডিও করে তাদের ব্ল্যাকমেইলও করছে। একপর্যায়ে নারীদের জীবন এমন অসহনীয় হয়ে উঠছে যে তারা লোকলজ্জার ভয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। নারী উন্নয়ন শক্তি, আইন ও শালিস কেন্দ্র, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সংস্থাসহ বিভিন্ন এনজিও ইভটিজিং প্রতিরোধে কাজ করছে। এ বিষয়ে নারী উন্নয়ন শক্তি মোট ৪০টি এলাকায় ৪০টি কমিটি গঠন করেছে। এলাকায় কোনো ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সালিসের ব্যবস্থা করার জন্য আইনজীবীরা কাজ করছেন। বস্তিতে বস্তিতে দলীয় আলোচনার আয়োজন করছে। বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সংস্থা ইভটিজিং বন্ধে আইন তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইভটিজিং প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৩ জুন এ দিবস উদযাপন করছে।

আইন ও শালিস কেন্দ্রের তথ্যমতে, ২০১৪ সালের প্রথম চার মাসে ১৪ জন নারী ও কিশোরী আত্মাহুতি দিয়েছে। পুলিশ বলেছে, তিনজন লোক খুন হয়েছে ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে। অনেক নারী ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় দা দিয়ে কুপিয়ে, এমনকি এসিড নিক্ষেপ করে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছে। ইভটিজিংসহ যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে আইন আছে বা সংশোধন হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে আইনের সঠিক প্রয়োগ নেই এ জন্য এ ধরনের অপরাধ ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং উল্লেখযোগ্য কোনো শাস্তির দৃষ্টান্ত নেই বলে ইভটিজিং এবং যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছে না।

বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় মহিলা সংস্থার তথ্য ভাণ্ডারে ইভটিজিং এর নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে-

২০১০ সালের জানুয়ারী থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত ইভটিজিংয়ের কারণে আত্মহত্যা করেছে ২৬ জন তরুণী। আর ইভটিজিংয়ের প্রতিবাদ করায় খুন হয়েছেন ১০ জন পুরুষ ও ২ জন নারী। বখাটেদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন ১৬৬ জন নারী, প্রতিবাদ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হয়েছেন ৭৭ জন পুরুষ।

৪১ শতাংশ ছাত্রী স্কুল প্রাঙ্গণকে নিরাপদ হিসেবে বিবেচনা করে না। ৬৩ দশমিক ছয় শতাংশ ছাত্রছাত্রী বলেছে, শিক্ষকরা তাদের প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। ১৬ দশমিক সাত শতাংশ ছাত্রী জানিয়েছে তারা শিক্ষকদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। ৩৮ দশমিক এক শতাংশ ছাত্রছাত্রী জানিয়েছে, তাদের চেনা অন্য কেউ এমন নির্যাতনের শিকার হয়েছে যা তারা জানে। ২০১০ সালের ১ অক্টোবর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশে গত ৬ মাসে নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে ২ হাজার ৫৮৬ জন। এছাড়াও ২০০৯ সালে সাত জন মেয়ে বখাটেদের উৎপাতের কারণে আত্মহত্যা করে। এর আগে ২০০৬ সালে পাঁচ জন, ২০০৭ সালে পাঁচজন এবং ২০০৮ সালে নয়জন মেয়ে ইভটিজিংয়ের কারণে বাধ্য হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। গত ৪ বছরের (২০০৯-২০১৩) রেকর্ড ছাড়িয়ে চলতি বছরের (২০১৩) ১ নভেম্বর পর্যন্ত ইভটিজিংয়ের কারণে আত্মহত্যা করেছে ২৬ জন তরুণী। মহিলা পরিষদের তথ্যানুসারে ২০০৯ সালে ইভটিজিংয়ের ঘটনা ঘটেছে ৭৮টি। ২০১৩ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৭২টিতে। আগের বছরের (২০১২) তুলনায় বেড়েছে ৩৯.৬ ভাগ হারে।[৩৩]

[৩৩] তথ্য আপা প্রকল্প, http://info.totthoapa.gov.bd/, Visited on 20 September, 2015

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সংঘটিত 'ইভটিজিং' এর একটি সমীক্ষা

১. পুলিশ সদর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ২০০৯ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ইভটিজিং-এর অপরাধে মামলা হয়েছে ১০৫টি, জিডি ৩৩৭টি, থানায় অভিযোগ ১২৯৬ জনের বিরুদ্ধে। গ্রেফতার হয়েছে মাত্র ৫২০ জন।[৩৪]
২. জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির গবেষণা অনুযায়ী ২০০৯ সালে ৭ মেয়ে বখাটেদের উৎপাতে আত্মহাত্যা করে। আর ২০১০ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫তে এবং মোট ইভটিজিং এর প্রত্যক্ষ শিকার হয় ৫২ জন।[৩৫]
৩. বিভাগভিত্তিক কয়েক মাসের (২০১০ সালে) ইভটিজিং-এর পরিসংখ্যানে দেখা যায়; রাজশাহীতে ১৩টি মামলা, সিলেটে ১৮টি মামলা, বরিশালে ২৭টি মামলা, ৪টি জিডি, রংপুরে ৫টি মামলা, চট্টগ্রামে ২৩৭টি ইভটিজিং এর ঘটনা ঘটে।

ইভটিজিং প্রবনতার কারণ

বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় মহিলা সংস্থার তথ্য ভাণ্ডারে ইভটিজিং প্রবনতার কারন সম্পর্কে বলা হয়েছে[৩৬]–
১. বিপরীত লিঙ্গের (নারী) প্রতি প্রবল আকর্ষণ
২. লিঙ্গ বৈষম্যকে গুরুত্ব না দেয়া
৩. পর্যাপ্ত নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব
৪. ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যাবস্থা
৫. নৈতিক অবক্ষয়
৬. সামাজিক মূল্যবোধ, শিষ্টাচার, বড়দের সন্মান, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি'র অভাব।
৭. মেয়েদের প্রতি ছেলেদের হীন মানসিকতা।
৮. পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেকে মেয়েদের শুধু ভোগ্য পণ্য মনে করে
৯. সামাজিক অবক্ষয়।

যে কারণে ইভটিজিং হয়

ইভটিজিং আমাদের সমাজে ভয়াবহ ক্যান্সার রোগের মতো প্রকট আকার ধারণ করেছে। গ্রাম–শহর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এর ব্যাপকতা। এ কারণে বেড়েছে নারীর আত্মহনন। আধুনিক সমাজের মরণব্যাধি এ ইভটিজিংয়ের শুধু নারী নয়, শিকার হচ্ছেন প্রতিবাদকারী শিক্ষক, মা কিংবা অভিভাবকরাও। দেশব্যাপী ব্যাপকহারে বেড়ে যাওয়া ইভটিজিংয়ের পেছনে রয়েছে নানাবিধ কারণ। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় মহিলা সংস্থার তথ্য ভাণ্ডারে ইভটিজিং এর কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে[৩৭]-

১) ধর্মীয় অনুশাসন না থাকা
২) নৈতিক জ্ঞানের অভাব
৩) নারীকে অবলা মনে করা
৪) পাশ্চাত্যের ফ্রি সেক্সের প্রভাব
৫) প্রেমের কারণে বা প্রেমে ছ্যাঁকা খাওয়ার কারণে
৬) নারী দেহের প্রতি আকর্ষণের কারনে
৭) অভিভাবকের অতি প্রশ্চয় বা উদাসীনতার কারণে

---

৩৪ দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ০৯
৩৫ দৈনিক প্রথম আলো, ২৮ অক্টোবর ২০১০, পৃ. ০৯
৩৬ তথ্য আপা প্রকল্প, http://info.totthoapa.gov.bd/, Web address Last Visited on 20 September, 2015
৩৭ তথ্য আপা প্রকল্প, http://info.totthoapa.gov.bd/, Web address Last Visited on 20 September, 2015

Dhaka University Institutional Repository

৮) নাটক, সিনেমা, গল্পে, উপন্যাসে বিবাহ পূর্ব প্রেমলীলা/ পরকীয়া প্রেমের কারণে
৯) যথেচ্ছ মোবাইল ফোনের অপব্যবহারের কারণে
১০) ইভটিজিং-এর পরিনাম না জানার কারণে
১১) ধনী লোকের জামাই হওয়ার লোভে
১২) অতি আধুনিকা মেয়েদের অশালীন আচরণের কারণে
১৩) ভূক্তভোগীরা আইনের আশ্রয় না নেয়ার কারণে
১৪) আইন শক্তিশালী না হওয়ার কারণে
১৫) আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ না থাকার কারণে
১৬) পাঠ্য পুস্তকে আছে, এমন কিছু অনৈতিক বিষয় পাঠ করে বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখাতে গিয়ে

ইভটিজিংয়ের আরও কিছু কারণ

ইভটিজিংয়ের জন্য অন্যান্য যেসব কারন দায়ী তা হল–

১. স্বভাবজাত ঝোঁক
২. ইসলামী শিক্ষার অভাব
৩. ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি উদাসীনতা
৬. পারিবারিক শিক্ষার অভাব
৭. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়
৮. পারিবারিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়
৯. নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব
১০. নারীকে পন্য ও ভোগ্যবস্তু মনে করা
১১. নারীর উগ্র পোশাক ও চলাফেরা
১২. স্যাটেলাইট টিভির অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রদর্শন
১৩. সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার অভাব
১৪. অপসংস্কৃতির প্রভাব
১৫. সন্তানের বেড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাতা-পিতার অসচেতনতা
১৬. অসৎ সঙ্গ
১৭. নেশা ও মাদকাসক্তি
১৮. বেকারত্ব ও অশিক্ষা
১৯. লিঙ্গ বৈষম্যমূলক সামাজিক ব্যবস্থাপনা
২০. ইভটিজিং বিরোধী স্বতন্ত্র কোন আইন না থাকা
২১. ইভটিজিং বিষয়ক অপরাধ বিষয়ে অজ্ঞতা
২২. শিক্ষা ব্যবস্থায় সুস্থ চরিত্র গঠন উপযোগী যথাযথ ধর্মীয় শিক্ষার কারিকুলাম বাস্তবায়ন না করা
২৩. রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা
২৪. আইন ও বিচারব্যবস্থার দুর্বলতা
২৫. সামাজিক দায়বদ্ধতা না থাকা
২৬. তথ্য–প্রযুক্তির অপব্যবহার
২৭. পারিবারিক শৃংখলার অভাব
২৮. হতাশাব্যঞ্জক জীবন
২৯. সুস্থ বিনোদনের অভাব

Dhaka University Institutional Repository

৩০. প্রশাসনিক অবহেলা
৩১. অর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড
৩২. একে অপরের প্রতি মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধের অভাব।[৩৮]
৩৩. মিডিয়ায় অশ্লীলতা
৩৪. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা
৩৫. মাতা-পিতার অবাধ্যতা
৩৬. নৈতিক অবক্ষয়
৩৭. যথাযত আইনের অভাব
৩৮. আইনের প্রয়োগ না থাকা
৩৯. নারীর প্রতি সমাজের (পুরুষদের) নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
৪০. রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক সম্পর্ক
৪১. পর্নোগ্রাফির ব্যাপক ছড়াছড়ি

যে সব উপায়ে ইভটিজিং হয়ে থাকে

ইভটিজিং এক ধরণের নারী নির্যাতন। স্কুল-কলেজগামী ছাত্রী, শিক্ষিকা, কর্মপথে যাতায়াতকারী কর্মজীবী নারীসহ প্রতিটি নারীই প্রায় সর্বত্রই কোনো না কোনোভাবে ইভটিজিংয়ের শিকার হয়ে থাকেন। মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট তথা প্রযুক্তির অপব্যবহারের অপকৌশলসহ বাচনিক, অবাচনিক কিংবা শারীরিক উপায়ে বখাটেরা ইভটিজিং করে থাকে।

১. বাচনিক–অশালীন মন্তব্য
২. শিস বাজানো
৩. উদ্দেশ্যপূর্ণ যৌন আবেদনময়ী গান গাওয়া
৪. হুমকি প্রদান
৫. অবৈধ যৌন সম্পর্কের দাবি বা অনুরোধ
৬. অনভিপ্রেত বিয়ের প্রস্তাব
৭. অবাচনিক– লম্পট চাহনী
৮. অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি
৯. উস্কানিমূলক তালি বাজানো
১০. যৌন অর্থবাহী ছবি বা ভিডিও দেখানো
১১. অস্বস্তিপূর্ণ অপলক দৃষ্টি
১২. পিছু নেয়া
১৩. মোবাইলে কুরুচিপূর্ণ ম্যাসেজ পাঠানো বা মিসকল দেওয়া
১৪. উড়ন্ত চুমুর (Flying kiss) ইঙ্গিত
১৫. চলার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
১৬. শারীর– ঘাড় ও কাঁধে হাত দেয়া
১৭. গা ঘেঁষে দাঁড়ানো
১৮. জড়িয়ে ধরা, চুমু খাওয়া
১৯. শারীরিক সম্পর্কের মতো অপ্রত্যাশিত যৌনাকাঙ্খার ব্যবহার

[৩৮] নাজনীন আখতার, *ইভটিজিং-১*, (ঢাকা: দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৯ মে, ২০১০), প্রথম পাতা।

Dhaka University Institutional Repository

২০. শরীরে ধাক্কা দেয়া

২১. ব্ল্যাকমেইল বা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে স্থির বা চলমান (ভিডিও) চিত্র ধারণ করা ইত্যাদি।

ইভটিজিং-এর ক্ষতিকর দিক বা এর প্রভাব

ইভটিজিং নারী জীবনের সবচেয়ে খারাপ ও ভয়ানক অভিজ্ঞতা। নারী জীবনে বিষাক্ত এ ইভটিজিংয়ের মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। ইভটিজিং নারীকে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইভটিজিং নারীর অবাধ চলার স্বাধীনতায় বাধার সৃষ্টি করে, কেড়ে নেয় তার অফুরান প্রান চাঞ্চল্য। ইভটিজিংয়ের উৎপাত শুধু ভুক্তভোগী নারীটির উপরই নয়; বরং তা আছড়ে পড়ে তার পুরো পরিবারের ওপর। অনেকসময় পুরো সমাজের ওপর। ফলশ্রুতিতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত নারী হারিয়ে যায় হতাশার অথৈ সাগরে, যার চূড়ান্ত সমাপ্তি ঘটে নির্মম আত্মহননের মধ্য দিয়ে।

অথচ ইভটিজিং-এর প্রভাব নারীর প্রাণের নির্মম আত্মবলিদানেই শেষ হয় না। বরং তার বিষবাষ্পের বিষক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুরো সমাজ। বাধাপ্রাপ্ত হয় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ ইভটিজিংয়ের ৬৫ থেকে ৭০ভাগ ঘটনা ঘটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশপাশে। স্কুল বা কলেজগামী মেয়েরাই এক্ষেত্রে ইভটিজিংয়ের শিকার হয় বেশি। ফলে ইভটিজিং থেকে বাঁচতে শিক্ষাজীবন থেকে অকালে ঝরে পড়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী শিক্ষার্থী। ফলে বেড়ে যায় বাল্য বিবাহের প্রবণতা, যা আমাদের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। স্কুল বা কলেজগামী নারী শিক্ষার্থীর সাথে সাথে ইভটিজিংয়ের শিকার হন কর্মজীবী নারীরাও। চলার পথে কিংবা কর্মস্থলে সহকর্মীর টিজিংয়ের শিকার হন তারা। ক্ষেত্রবিশেষে টিজিংয়ের অতিষ্ঠ নারী বাধ্য হয় তার চাকরি ছাড়তে, যা নারীর আত্মনির্ভরশীলতার পথকে ধ্বংস করে দেয়। অথচ বিশাল জনগোষ্ঠীর এ বাংলাদেশে নারীর আত্মকর্মসংস্থান তথা আত্মনির্ভরশীলতা অপরিহার্য। এমনিভাবে ইভটিজিং দেশের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের চরম ক্ষতি সাধন করে চলেছে।

ইভটিজিং-এর ফলে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে, সংক্ষেপে সেগুলো হচ্ছে–

১) স্কুল কলেজগামী মেয়েরা রাস্তাঘাটে নিরাপত্তার অভাববোধ করে, স্কুলে খারাপ ফলাফল করে, স্কুল অনুপস্থিতি বেড়ে যায়।

২) মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়, স্কুলে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়।

৩) কর্মের পরিধি কমে যায়, নারীদের বাইরে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়, চাকরী হারানোর শঙ্কা বাড়ে, নারীদের আয় রোজগার কমে যায়

৪) নারীর ব্যক্তিগত জীবন অন্যদের নজরদারির বিষয়ে পরিণত হয়– যখন মানুষজন নারীর পোশাক, সাজ-সজ্জা, জীবন যাপন সব কিছু পরীক্ষা করে

৫) মানুষজনের গালগল্পের বিষয়ে পরিণত হয়ে আপমানিত হওয়া

৬) অপমানিত হয়ে অনেক মেয়ে আত্মহত্যার মত পথ বেছে নেয়

৭) চরিত্রবান হয়ে ওঠার পথে বাঁধা হয়ে দাড়ায়

৮) বংশের মান মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়

৯) নারীর যৌন অস্তিত্ব মুখ্য হয়ে উঠে- অন্যান্য গুন গৌণ হয়ে যায়

১০) চরিত্রহনন হয় এবং সম্মান ও মর্যাদা হারায়

১১) যে পরিবেশে ইভটিজিং-এর হয়রানি ঘটে, সে পরিবেশের উপর নারী আস্থা হারায় এবং ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।

১২) মানুষের উপর বিশ্বাস হারায়

১৩) ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি হয়- এতে বিবাহ বিচ্ছেদ, বন্ধুত্বে ফাটল ও সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়

১৪) অন্যরা যেমন ভিকটিমের কাছ থেকে দূরে চলে যায় তেমনি ভিকটিমও নিজেকে গুটিয়ে নেয় একাকীত্বের মাঝে

১৫) স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দেয়, যেমন- হতাশা, দুশ্চিন্তা, আকারণে ভয় পাওয়া, ঘুম না হওয়া

Dhaka University Institutional Repository

১৬) দুঃস্বপ্ন দেখা, লজ্জা পাওয়া, নিজেকে অপরাধী ভাবা, মনোযোগ কমে যাওয়া, নেশা করার প্রবণতা, উচ্চ রক্তচাপ, খাদ্যাভাস বদল, ওজন বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া, আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি।
১৭) পারিবারিক শান্তি ব্যহত হয়,
১৮) অভিভাবক চিন্তিত হয়ে পড়েন,
১৯) সমাজে বখাটে ছেলেদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়,
২০) আইন শৃংখলার অবনতি ঘটে।

ইভটিজিংয়ে আইনগত প্রতিকার

ভারতীয় আইনে ইভটিজিং নামে কোনো শব্দ ব্যবহার করে না, যে কারণে শুরুর দিকে এমন নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তিরা ভারতীয় পেনাল কোড ২৯৪ ধারা অনুযায়ী বিচার চাইতো। এই ধারা বলে কোনো পুরুষ যদি কোনো নারী বা মেয়েকে গান অথবা ঠাট্টা ছলেও টিজ করে তাহলে তাকে নূণ্যতম তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। ভারতীয় পেনাল কোডের ২৯২ ধারায় স্পষ্ট করেই বলা আছে যে, পর্নোগ্রাফি অথবা বাজে ছবি, বই অথবা পত্রিকার কারণে যদি কোনো নারীর সম্মানহানি ঘটে তাহলে দুই বছরের কারাদণ্ডসহ দুই হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। বারবার একই অপরাধ করলে অপরাধীকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করার বিধান রয়েছে। ৫০৯ ধারা অনুযায়ী, কোনো নারীর প্রতি অশোভন আচরণ এবং নেতিবাচক মন্তব্য বা নারীর গোপনীয়তা নষ্ট করলে এক বছরের কারাদণ্ডের জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।
দ্য ক্রিমিনাল ল অ্যাক্ট ২০১৩ সালে ভারতীয় পেনাল কোডে পরিবর্তন আনে। যৌন হয়রানিকে ৩৫৪(এ) ধারার আওতায় এনে তিন বছরের কারাদণ্ডসহ জরিমানার বিধান করে। এই সংস্কারে যে কোনো নারীকে যৌন হয়রানি কিংবা উত্যক্ত করাকে অপরাধ হিসেবে দেখা হয়। দ্য ন্যাশনাল কমিশন অব ওম্যান- ১৯৮৮ সালে ইভটিজিং রোধে একটি প্রস্তাবনা দিয়েছিল। সেটা তৎকালীন সময়ে ভারত সরকার পাস করেছিল। ভারতীয় সংসদ 'দ্য সেক্সুয়্যাল হ্যারাসমেন্ট অব উম্যান অ্যাট ওয়ার্কপ্লেস অ্যাক্ট'-২০১৩ পাস করে, যার ফলে বিভিন্ন খাতে কর্মরত নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ২০১৩ সালের ৯ ডিসেম্বর থেকে এই অ্যাক্ট চালু হয়।
বাংলাদেশের ইভটিজিং প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন নেই। তবে দেশে বিদ্যমান কয়েকটি আইনে এ সম্পর্কিত ধারণা উল্লেখ আছে–

১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, ধারা ১০
২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩, ধারা ১০
৩. দন্ডবিধি (অপরাধ সংক্রান্ত প্রধান আইন গ্রন্থ), ধারা ২৯০-২৯৪ ৩৫৪ ৫০৯
৪. ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬, ধারা ৭৬

নিম্নে প্রচলিত কয়েকটি আইনের ধারা উল্লেখ করা হলো:

১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, ধারা: ১০।

'যৌন পীড়ন, ইত্যাদির দণ্ড। যদি কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন বা কোন নারীর শ্লীলতাহানি করেন তাহা হইলে এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অনুন্য তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।'
'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশেধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫ বলে নতুন ধারা ১০ প্রতিস্থাপিত'

২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩, ধারা: ১০।

Dhaka University Institutional Repository

'নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা, ইত্যাদির শাস্তি। কোন নারীর সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত (Wilrul) কোন কার্য দ্বারা সম্ভ্রমহানি হইবার প্রত্যক্ষ কারণে কোন নারী আত্মহত্যা করিলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপ কার্য দ্বারা আত্মহত্যা করিতে প্ররোচিত করিবার অপরাধে অপরাধী হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সম্ভ্রম কারদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।' 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০নং আইন) এর ধারা ৪ বলে নতুন ধারা ৯ক প্রতিস্থাপিত।

উল্লেখ্য ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১০(২) ধারায় যৌন নিপীড়নের সংজ্ঞায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে (অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি' শব্দটি ২০০৩ সালের সংশোধনীতে বাদ দেয়া হয়েছে)।

৩. বাংলাদেশে দণ্ডবিধি ১৮৬০ (সংশোধিত) ২০০৪ এর ২৯০, ২৯৪, ৩৫৪, ৫০৯ ধারা।

৪. ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অধ্যাদেশ, ০৯৭৬ ধারা: ৭৬।

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২৮ নং অনুচ্ছেদের ২নং ধারা।

'রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।' 'এছড়াও সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১০, ১৯-১,২, ২৭ ২৮-১,২,৩, ২৯-১,২-ধারাগুলো দ্বারা নারী পুরুষের সমতা বিধানের কথা ঘোষণার দ্বারা ইভটিজিং এর প্রতি আইনগত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।'

ইভটিজিং প্রতিরোধে সাম্প্রতিক আইনী পদক্ষেপ

দেশব্যাপী ইভটিজিংয়ের ভয়াবহ বিস্তারে আতঙ্কিত সবাই। পাশাপাশি বিব্রত সরকারও। তাই নারীর নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং সহসাই সামাজিক সন্ত্রাসে পরিণত হওয়া ইভটিজিং নির্মূল ও প্রতিরোধকল্পে সাম্প্রতিককালে নেয়া হয়েছে নানা আইনী পদক্ষেপ। উদাহরণস্বরূপ-

১. ভ্রাম্যমান আদালত

ইভটিজিং বন্ধে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে ভ্রাম্যমান আদালত আইনে দন্ডবিধির ৫০৯ ধারা সংযোজন করা হয়, যা ৯ নভেম্বর ২০১০ থেকে কার্যকর হয়। এ আদালতের মাধ্যমে ইভটিজারদের তাৎক্ষণিক শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট এ ধারা প্রয়োগ করে অপরাধীকে ঘটনাস্থলে বিচার করে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদন্ড বা অর্থদন্ড কিংবা উভয় দন্ডে দন্ডিত করতে পারেন।

২. প্রতিরোধ কমিটি

উত্ত্যক্তকরণ বন্ধে শিক্ষা মন্ত্রনালয় থেকে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাজের বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'ইভটিজিং প্রতিরোধ কমিটি' গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩. মোবাইল হেল্পলাইন

কোনো নারী ইভটিজিংয়ের শিকার হলে কিংবা হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে মোবাইল হেল্পলাইনে সরাসরি ফোন করে অভিযোগ করতে এবং আইনি সহায়তা নিতে পারবেন। সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান দি হাঙ্গার প্রজেক্ট ও উইন্ডমিল ইনফোটেক লিমিটেড যৌথভাবে ডিসেম্বর-২০১০ থেকে এ সেবা চাল করেছে।

৪. উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধ দিবস

ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন নিরাপত্তা বিধানের জন্য সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ার লক্ষ্যে ১৩ জুন ২০১০ প্রথমবারের মতো সারাদেশে ছাত্রী উত্ত্যক্তকরণ প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। এর আগে ২০০৯ সালের ১৪ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ যুগান্তকারী এক রায়ে টিজ করাকে যৌন হয়রানি হিসেবে আখ্যায়িত করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এ বিষয়ে সংসদে কোনো আইন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত হাইকোর্ট বিভাগের রায়টিকে আইনের মতো বাধ্যতামূলক হিসেবে মেনে চলতে বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ নারী ও শিশু পাচার

বাংলাদেশ থেকে বহির্বিশ্বে নারী ও শিশু পাচারের চিত্র ভয়াবহ। এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ৩০ হাজার নারী ও শিশু দালালের মাধ্যমে বিদেশে পাচার হচ্ছে। বিভিন্ন তথ্য সূত্রে জানা যায়, মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, গত ২০ বছরে শুধু মধ্যপ্রাচ্যে নারী ও শিশু পাচারের সংখ্যা দুই লাখের বেশি। প্রতিমাসে দেশ হতে ৭শ' থেকে একহাজার নারী ও শিশু পাচার হচ্ছে। এদের মধ্যে বেশির ভাগ পাচার হয় ভারত ও পাকিস্তানে। পাচারকৃত নারীদের অধিকাংশকে ওই দেশগুলোর পতিতালয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়। ভারতের নয়াদিল্লি ও পাকিস্তানের করাচিতে ১০ হাজার বাংলাদেশি নারী বাধ্যতামূলক পতিতাবৃত্তি পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। একটি আইনজীবী সংস্থার সমীক্ষায় দেখা গেছে, পাকিস্তানেই প্রতি বছর নারী ও শিশু পাচারের গড় সংখ্যা ৫ থেকে ৬ হাজার। গত দশ বছরে শুধু পাকিস্তানে পাচার হয়েছে ২ লাখের বেশি নারী। ভারতের সমাজকল্যাণ বোর্ডের সূত্র মতে, ওই দেশে মোট ৫ লাখ বিদেশি পতিতা রয়েছে। যার অধিকাংশই বাংলাদেশি। মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, পাকিস্তান ছাড়াও এ দেশের নারী মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, হংকং প্রভৃতি দেশে পাচার হচ্ছে।

বাংলাদেশ থেকে নারী পাচারের পরিসংখ্যান ভিত্তিক চিত্র

বাংলাদেশ থেকে ভারতে নারী ও শিশু পাচার বেড়েই চলেছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (ইউএনডিপি) গবেষণায় দেখা গেছে গত ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে ৩ লাখ নারী ও শিশু ভারতে পাচার হয়েছে।

এদিকে সেভ দ্য চিলড্রেনের তথ্যমতে, গত পাঁচ বছরে দেশ থেকে প্রায় ৫ লাখ নারীকে নানাভাবে পাচার করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাচার হওয়া এসব নারীর কিছু অংশ মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরলেও মিলছে না এদের স্বাধীনতা। স্বাধীনভাবে চলাফেরাতো দূরের কথা, পরিবারের সদস্যদের কাছেও এরা অবহেলার পাত্র। এ অবহেলা ও তুচ্ছ–তাচ্ছিল্যের কারণে অনেক পাচার হওয়া নারী পরিবারের কাছে ফিরতে চায় না। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে পতিতা পল্লীগুলোতে বিক্রি হওয়া নারীদের ক্ষেত্রেও ঘটছে একই ঘটনা। পাচার রোধে সংশ্লিষ্টদের আরও কঠোর হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া পাচার হওয়া নারীদের ফেরত আনার পর যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্রও জরুরি। এক শ্রেণীর মানুষ নারী ও শিশু পাচারকে ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে। তাদের এ ব্যবসা চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতেই চলে এবং পাচার হওয়া অধিকাংশ নারীকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়।

দেশের ১৮টি রুট দিয়ে প্রতিবছর প্রায় ২০ হাজার নারীও শিশু অবৈধ পথে পাচার হচ্ছে ভারতে। পাচারের শিকার বেশির ভাগ নারীদের স্থান হয় ভারতের পতিতা পল্লিতে। ভারতীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ডের এক তথ্য থেকে জানা যায়, সেখানের বিভিন্ন পতিতা পল্লিতে প্রায় ৫ লাখ পতিতাকর্মী রয়েছে। এর বেশির ভাগ বাংলাদেশী। বিয়ে, চাকরি এবং আর্থিক প্রলোভনে পড়ে অনেকে পাচার হয়ে থাকে। ভারতের মুম্বাই পতিতা পল্লীতে ৪ মাস এবং কারাগারে ৪ বছর কাটানোর পর সেখান থেকে ফিরে এসে সেখানের অমানুষিক নির্যাতনের চিত্রতুলে ধরে নারায়নগঞ্জের ফতুল্লার মেয়ে তানিয়া আক্তার (২০)। পুলিশ ও সাংবাদিকদের জানায়, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নানা প্রলোভেন আর মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তরুণীদের কৌশলে ভারতে পাচার করে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করা হচ্ছে। পতিতা পল্লীগুলোতে দেহ ব্যবসার জন্য তরুণীদের শারীরিক নির্যাতনসহ নানা প্রকার নির্যাতন চালানো হয়। তানিয়া আরো জানায়, পতিতাপল্লীর বাড়িতে অবস্থানকালীন দেহ ব্যবসায় সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তানিয়া ও তার চাচাতো বোন বকুলকে নানাভাবে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। গায়ে গরম পানি ঢেলে, ব্লেড দিয়ে জখম সহ ওই স্থানে লবণ দিয়ে নির্যাতন করা হত। ওই পতিতা পল্লীতেই ৬০ থেকে ৬৫ জন বাংলাদেশী কিশোরীদের সঙ্গে তানিয়ার পরিচয় হয়। তাদের মধ্যে ফতুল্লা ও এর আশপাশ এলাকার ১০ থেকে ১২ জনও রয়েছে। তবে তাদের

Dhaka University Institutional Repository

নাম পরিচয় বলতে পারেনি। রুবেল নামের এক পাচারকারীর খপ্পরে পড়ে তানিয়া ও বকুল ভারতে পাচার হয়। পাচারের শিকার তানিয়ার বক্তব্যের সাথে ভারতের সমাজ কল্যাণ বোর্ডের তথ্যের মিল পাওয়া যায়।[৩৯]

পাচারের শিকার ৬০ ভাগ কিশোরীর বয়স ১২ বছর থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০ হাজার নারী ও শিশু ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ থেকে নারী ও শিশু পাচারের উদ্বেগজনক দীর্ঘ পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে সম্প্রতি পুলিশের এক সম্মেলনে। পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির আওতায় 'বাংলাদেশ পুলিশের টেকসই সংস্কার : আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে কর্মকৌশল', শীর্ষক উক্ত সম্মেলনে জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনিসেফের বরাত দিয়ে ইউএনডিপি'র ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে গত ১০ বছরে ৩ লাখ নারী ও শিশু পাচার করে ভারতে নেয়া হয়েছে। একই সময়ে পাকিস্তানে ২ লাখ নারী ও শিশু পাচার হয়ে গেছে। পাচার হওয়া এসব নারী ও শিশুদের বয়স ১২ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে।

হিসাব অনুযায়ী, প্রতি মাসে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৪শ' নারী-শিশু পাচার হয়ে যাচ্ছে। এসব নারী-শিশু বাংলাদেশী ও আন্তর্জাতিক পাচারকারী একাধিক মাফিয়া চক্রের শিকারে বন্দী হয়ে করুণ পরিণতি বরণ করছে। ২০০৯ সালের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ৫ বছরে ৮৭ হাজার পাচারকৃত শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। ২০০৯-১০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক নারী ও শিশু পাচার বিষয়ক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষ পাচারের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও এই অপরাধের সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে পারেনি।[৪০]

যে সকল কারণে নারী ও শিশু পাচারের শিকার হয়

বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ বাংলাদেশ। অধিকাংশ পরিবারই দুস্থ, নিঃস্ব ও অসহায়। আর এ পরিস্থিতির পূণ সদ্ব্যবহার করছে বাংলদেশসহ আন্তজাতিকভাবে সংঘবদ্ধ এক শ্রেণীর প্রতারক। তারা প্রলোভন দেখিয়ে অসহায় পিতামাতার মেয়েদের শহরে চাকুরি বা যৌতুকবিহীন বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাচার করে দিচ্ছে অন্ধকার জগতে। পাচারকারীদের প্রলোভনের শিকার হচ্ছে দেশের ছিন্নমূল, ভবঘুরে নারী ও তাদের অভিভাবকবৃন্দ এবং দারিদ্র্যের নিষ্পেশনে জর্জরিত অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা নারীরা। অসহায় নারীরা সুন্দরভাবে বাঁচার আশায় নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাচারকারীদের পাতা জালে জড়িয়ে পড়ছে। পিতামাতারা অর্থ উপার্জনের আশায় বেশি বেতনের চাকরীর প্রলোভনে পড়ে বা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় না জেনে শিশু সন্তানদের তুলে দিচ্ছে পাচারকারীদের হাতে। এভাবে শিশুরাও প্রতারণার শিকার হয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে পাচারকারীরা পিতামাতার অসতর্কতার সুযোগ নিয়ে শিশুদের চুরি করে পাচার করে দিচ্ছে। যে সব কারণে পাচারকারীরা সহজে নারী ও শিশু এবং শিশুদের অভিভাবককে প্রতারণা করতে সক্ষম হয় তার মধ্যে রয়েছে

১. দারিদ্র্য
২. সীমান্ত অতিক্রমের সহজ প্রক্রিয়া
৩. সমাজে মেয়েদের অবমূল্যায়ন
৪. শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব
৫. পিতামাতার অসাবধানতা ও অসতর্কতা

---

৩৯ তথ্য আপা প্রকল্প, http://info.totthoapa.gov.bd/gender/□□□□□□□-থেকে-□□□-□□□□□-পরিসংখ্যান-ভিত্তিক-চিত্র, Visited on 20 September, 2015

৪০ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক পত্রিকা থেকে নারী ও শিশু পাচারের সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর পেছনে প্রায় সব ক্ষেত্রেই অন্যতম কারণ হিসেবে নিহিত রয়েছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নারীর নিম্নমানের পেশা, চাকুরীর সুযোগের অভাব, মাথাপিছু নিম্ন আয়, সম্পদে নারীর অনধিকার, চাকুরির ক্ষেত্রে সমান সুযোগের অভাব ইত্যাদি। দারিদ্র্য ও বেকারত্বের চরম পরিস্থিতিতে দরিদ্র নারী এবং তাদের পরিবার বিয়ে ও চাকুরির প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হয়। সাধারণত: দেখা যায়, যে এলাকার নারী-পুরুষরা পাচারের শিকার হয় সেই এলাকার লোকজন অত্যন্ত দরিদ্র, সেখানে ভূমিহীনদের সংখ্যাধিক্য, খাদ্যাভাব এবং চরম বেকারত্ব বিরাজমান। এই পরিস্থিতিতে এসব এলাকার পিতামাতারা নগদ অর্থ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এমন কারো কাছ থেকে পরিবারের নারী ও শিশুদের জন্য বিবাহ বা চাকরির প্রস্তাব পেলে তা গ্রহন করতে দেরি করে না। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং ভোগ্যপণ্য পাওয়ার লোভে পাচারকারীরা নিজেদের নিপুণভাবে পরিচালনা করে থাকে এবং এটা পর্যায়ক্রমে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে যার ফলাফল হিসেবে অসংখ্য নারী পাচারের শিকার হয়। যে সকল উপায় বা কারণে নারী ও শিশু পাচার হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১. সীমান্ত অতিক্রমের সহজ প্রক্রিয়া

ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় ১৯৪৭ সালে এবং পুণরায় ১৯৭১ সালে রাজনৈতিক বিভাজন এই এলাকার পরিবারগুলোকে বিভক্ত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। দেশ বিভাগের কারণে এই বিভক্ত পরিবারগুলোর সদস্যরা একে অন্যকে সীমান্তের একপাশ হতে অন্য পাশে আনা-নেওয়ার কাজে নিয়োজিত। সীমান্ত অতিক্রম করে এক পরিবারের সদস্যরা অন্য পরিবারের সদস্যদের সাথে যুক্ত হওয়ার বাসনা অনেক সময় নারী ও শিশু পাচারকে ত্বরান্বিত করে। উদাহরণ হিসেবে রাজশাহী অঞ্চলের বিভক্ত পরিবারগুলোর কথা উলেখ করা যায়। রাজশাহীতে বসবাসরত অনেক পরিবারের সদস্যই সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গের মালদহ এবং মুর্শিদাবাদে তাদের আত্মীয়স্বজন বা দেশ বিভাগের সময় থেকে যাওয়া পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে দেখা করতে যায়। সীমান্ত পার হয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করতে যাওয়ার সময় নারী ও শিশুরা অনেক সময় ভুল পথে পরিচালিত হয়। এছাড়া, সাতক্ষীরায় অভিবাসন কতৃপক্ষের অনুমতি এবং বৈধ কাগজপত্র ব্যতিরেকে বিভিন্ন কারণে যেমন আত্মীয়স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ, চিকিৎসানপণ্য চোরাচালান ইত্যাদির জন্য ভারতীয় সীমান্ত এলাকায় যাওয়া একটি স্বাভাবিক বিষয়।

২. সমাজে মেয়েদের অবমূল্যায়ণ

নারী ও শিশু পাচারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কারণ হলো পরিবারে নারীর অধস্তন অবস্থান যা সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মূল্যবোধ, আচার-আচরণ ও সামাজিক রীতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। আমাদের সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান তার বৈবাহিক অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের পিতামাতারা মেয়েদের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত বিয়ের উপর্যুক্ত বয়স ১৮ বছরের কম হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের বিয়ে দেওয়া দায়িত্ব বলে মনে করে যার দুটি খারাপ পরিণতি রয়েছে।

যেসব ছেলে বিয়েতে যৌতুক চায় না, কন্যাদায়গ্রস্থ দরিদ্র পিতামাতারা তাদের সাথে খোঁজ-খবর ছাড়াই কম বয়সী মেয়েদের বিয়ে দেয়ার কথা চিন্তা করে। অনেক পাচারকারী এই দূর্বলতার সুযোগ নেয়। তারা অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে বিদেশে পাচার করে দেয়।

দ্বিতীয় পরিণতি হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে সহায়সম্বলহীন পিতামাতা বিয়ের সময় যৌতুকের দাবী মেনে নিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করে কিন্তু পরবর্তীকালে আর শোধ করতে পারে না। তখন মেয়েটি তার স্বামী ও তার পরিবারের সদস্যদের নির্মম নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। একদিকে মেয়েটি বাবার বাড়িতেও ফিরে যেতে পারে না, অন্যদিকে নির্যাতনের নির্মমতা সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। এরকম অসহায় অবস্থার সুয়োগ নেয় পাচারকারী চক্র। বিয়ের পর স্ত্রী রেখে পালিয়ে যাওয়া এবং বৈবাহিক সন্ত্রাস পাচারের কারণ হিসেবে কাজ করে। যুবতী,

Dhaka University Institutional Repository

অবিবাহিত, অথবা স্বামী পরিত্যক্তা এবং বিধবা নারী সমাজ ও পরিবারের কাছে বোঝাস্বরূপ। এই শ্রেণীর নারীর কাছে বিকল্প কর্ম অথবা বিবাহের প্রস্তাব আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। তারা পাচারকারী চক্রের সদস্যদের বিবাহ বা লোভনীয় চাকুরির প্রস্তাবে সহজেই সাড়া দেয় আর শেষ পর্যন্ত পাচারকারীদের পাতা জালে আটকা পড়ে।

৩. শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব

স্থানীয় জনগণের মধ্যে শিক্ষা ও তথ্যের ঘাটতি নারী ও শিশু পাচার পরিচালনার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। সর্বোপরি, আইন ও মানাধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষের নিপীড়ন ও নির্যাতন সহ্যশক্তি অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দেয়। সীমান্ত অতিক্রমের নিয়ম সম্পর্কে অজ্ঞতা, অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়া ইত্যাদি এর সাথে সমন্বয় ঘটে থাকে। দারিদ্র্য ও বেকারত্বের চরম পরিস্থিতিতে দরিদ্র নারী এবং তাদের পরিবার বিয়ে এবং চাকুরীর প্রস্তাবে প্রলুব্ধ হয়। সাম্প্রতিককালের বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবি সমিতি কর্তৃক ১৭৭ জন নারীর উপর পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, পাচারের শিকার এই নারীদের বেশির ভাগই চাকরি অপেক্ষা বিয়ের প্রস্তাবেই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিল। অজ্ঞতার কারণেই পাচারের পথে গিয়েছিল। আর তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল পতিতাবৃত্তি, বিয়ে, গৃহপরিচারিকা, ক্ষুদ্র শিল্প, কারখানার (কার্পেট, মাছ শুকানো) শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক এবং এ জাতীয় আরো অনেক নির্যাতনমূলক পেশায় কাজ করতে।

জন্ম নিবন্ধন না থাকায় পাচার হওয়া নারী ও শিশুদের বয়সের কোন রেকর্ড থাকে না এবং মেয়েদের বিয়ের জন্য আইন নির্ধারিত নূন্যতম বয়স হওয়ার পূর্বেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। অন্যদিকে, বিবাহ নিবন্ধন না থাকার দরুন স্বামীর পদমর্যাদা, সামাজিক অবস্থান এবং বর্তমান কিছুই জানা যায় না এবং তথাকথিত স্বামীকে খুঁজে বের করাও সম্ভব হয় না। অন্যদিকে নারী ও শিশুদেরকে তাদের আত্মীয়স্বজন বা গ্রামবাসীর মাধ্যমে শহর অঞ্চল, মধ্যবিত্ত পরিবার ও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে কাজ দেয়ার নাম করে নিয়ে আসা হয়। প্রায়ই তাদের পিতামাতা ও অন্যান্য বিষয়ে কিছু জানা থাকে না। চাকরিদাতা ও চাকরি বিষয়ক কোন নিবন্ধন না থাকায় নারী ও শিশুরা সহজেই তাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়া তারা যদি অন্য পেশায় অথবা অন্য স্থানে চলে যায় সেক্ষেত্রে তাদেরকে খুঁজে বের করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, সামাজিক আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং নিরক্ষরতা পরিবারে নারী ও মেয়ে শিশুদের নিম্ন অবস্থান ও বৈষম্যের প্রতিষ্ঠা করেছে। বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, কিছু একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সহিংসতা টিকিয়ে রাখতে প্রভাব ফেলে।

৪. পিতামাতার অসাবধানতা ও অসতর্কতা

দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, দরিদ্রতা এবং শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবের সাথে সাথে পিতামাতার অসাবধানতা ও অসতর্কতার কারণে প্রতিদিন অনেক নারী ও শিশু পাচারের শিকার হয়। পাচারকারীরা নারী ও শিশু পাচারের জন্য বিভিন্ন প্রতারনামূলক কৌশল অবলম্বন করে। পিতামাতাকে বেশি বেতনে চাকরির কথা বলে উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে শিশুদের পাচার করে নিয়ে যায়। ছোট শিশুদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে বাবা-মার অজান্তেও অনেক সময় চুরি করে নিয়ে যায়।

এছাড়াও রয়েছে নদী ভাঙন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অত্যধিক জনসংখ্যা, ভূমিহীনতা, বেকারত্ব, আয়ের স্বল্পতা, পিতামাতার সন্তান লালন-পালনে অক্ষমতা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, যৌতুক, প্রেমে ব্যর্থতা, উচ্চাকাঙ্খা, সামাজিক নিরাপত্তার অভাব, স্বল্পকালীন চাকরি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দূর্নীতি ইত্যাদি কারণ পাচারের মাত্রাকে বাড়িয়ে তোলে।

নারী ও শিশু পাচারের উদ্দেশ্য

দৈনিক পত্রিকার সংবাদগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় নারী ও শিশুদের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পাচার করা হয়-

Dhaka University Institutional Repository

১. পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা।
২. পর্নোগ্রাফি সিনেমায় ব্যবহার করা।
৩. মধ্যপ্রাচ্যে উটের জকি হিসেবে ব্যবহার করা।
৪. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা।
৫. শরীরের রক্ত বিক্রি করা।
৬. চোখ, কিডনিসহ শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেটে ব্যবসা।
৭. মাথার খুলি, কঙ্কাল রপ্তানি করা।

যেভাবে নারী-শিশু পাচার করা হয়

ইউনিসেফ ও সার্কের এক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে ৪ হাজার নারী-শিশু পাচার হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত এদেশ থেকে কমপক্ষে ১০ লক্ষ নারী ও শিশু পাচার হয়ে গিয়েছে। গোটা বিশ্ব জুড়েই রয়েছে পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তারা গরীব ঘরের ছেলে, মেয়ে ও নারীদের পাচারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করে। তারা নারী পাচারের জন্য কতিপয় কৌশল অবলম্বন করে। যেমন- দেশ ও বিদেশে চাকুরির মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে, জোরপূর্বক অপহরণ করে, খাবার-জামাকাপড় দেওয়ায় প্রলোভন দেখিয়ে পাচার করে থাকে। কখনো পাতানো বিয়ের মাধ্যমে দরিদ্র ও অশিক্ষিত কিশোরী ও যুবতীদের ফাঁদে ফেলে। কোন কোন পাচারকারী চক্র শিক্ষিত ও সুন্দরী মেয়েদের দূর্লভ বৃত্তি, ফেলোশিপ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরির ওয়ার্ক পারমিট দেখিয়ে প্রলুব্ধ করে। তারা পাচারকৃত নারীদের অনেক সময় মক্ষীরানীদের কাছে বিক্রি করে দেয়। পরবর্তীসময়ে তারা সমাজে পতিতা হিসেবে চিহ্নিত হয়। অনেক মহিলা দরিদ্রতা ও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেতে স্বেচ্ছায় এ পেশায় এসে থাকে। অনেকে উন্নত জীবনের আশায় পাচারকারীদের প্রলোভনে পা দিয়ে দেশের বাইরে পাড়ি জমায়।

পাচারের রুটসমূহ

এশিয়ার মধ্যে নারী পাচারের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ হলো বাংলাদেশ, প্রথম বৃহৎ দেশ হলো নেপাল। পাচারকারীরা বিভিন্ন পথে নারী ও শিশু পাচার করে থাকে, যথা– স্থল পথে, জল পথে অথবা বিমান পথে। বাংলাদেশ থেকে পাচারের যে উদাহরণগুলো পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, বিমান যোগে কিছু পাচার হয়, তবে স্থল পথে সীমান্ত অতিক্রমের মাধ্যমেই বেশি সংখ্যক নারী ও শিশু পাচার হয়। এদেশের সাথে ভারতের ৪,২২২ কিলোমিটার এবং মায়ানমারের সাথে ২৮৮ কিলোমিটার সীমান্ত এলাকা রয়েছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-বঙ্গ সীমানা দিয়েই পাচার বেশি হয়। বাংলাদেশের পাচারকারীরা ভারতের বিভিন্ন সীমান্ত ব্যবহার করে পাকিস্তান, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে নারীদের পাচার করে। দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার সীমান্ত পথ দিয়ে পণ্য সামগ্রী পাচারের পাশাপাশি নারী ও শিশু পাচার হয়ে থাকে। এসব অঞ্চলের ১১টি রুট পাচারের উদ্দ্যেশে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়ার জন্য যশোরের বেনাপোল একটি অত্যন্ত সহজ ও সুপরিচিত রুট। এখান থেকে বাস ও ট্রেনের যোগাযোগ খুব ভাল হওয়ায় পাচারকরীরা খুব সহজেই কলকাতা পৌছে যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের বনগাঁও সীমান্ত শহরটি বেনাপোল থেকে মাত্র ১০কিলোমিটার দূরে, যেখানে গোটা বাংলাদেশ থেকে সংগ্রহ করা নারী ও শিশুদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়। বৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের মাধ্যমেই হোক আর অবৈধ অনুপ্রবেশের মাধ্যমেই হোক পাচারের উদ্দেশ্যে বড় ধরণের কোন কেন্দ্রে পাঠানোর জন্য তাদেরকে বনগাঁওয়ে নিয়ে আসা হয়। বেনাপোল ছাড়া যশোর থেকে পাচারকারীরা সাধারণত ভোমরা, কলারোয়া, দর্শনা, জীবননগর ও ঝাউডাঙ্গা সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে নারী ও শিশু পাচার করে থাকে। এছাড়াও কুষ্টিয়া ও সাতক্ষীরার বিভিন্ন বর্ডার এলাকা দিয়ে পাচার করা হয়। যশোর থেকে নাভারন চৌরাস্তা দিয়ে ভারতে যাওয়া খুবই সহজ। বৈধভাবে ভারতে

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়া বেশ ঝামেলা পূর্ণ হওয়ায় পাচারকারী চক্র বিডিআর প্রশাসনের উদাসীনতার সুযোগে এই পথে অবৈধভাবে ভারতে যায়। সাম্প্রতিককালে শোনা যাচ্ছে যে সুন্দরবনকে পাচারের পথ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ গহীণ অরণ্যে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তৎপরতা কম থাকায় তারা খুব সহজেই সীমান্ত পাড়ি দিতে পারছে। আবার একদল পাচারকারী আকাশ পথকেই পাচারের নিরাপদ পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। বৈধ অভিবাসনের নামে অনেক নারী আকাশ পথে বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

ভারতীয় পাচারকারী, হস্তান্তরিত নারী ও শিশুকে কলকাতা, দিলি ও মুম্বাইয়ের পতিতালয়ে বিক্রি করে কিংবা সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্যে পাচার করে। দীর্ঘকাল ধরে দেহ ব্যবসা এবং নারী ও শিশু বিক্রয়ের জন্য কলকাতা নিরাপদ স্থান হিসেবে পরিচিত। আর মুম্বাই নগরীকে পাচারের ট্রানজিট পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যশোরের অধিকাংশ ট্রানজিট পয়েন্টের সাথে ভারতের বিশেষ করে চব্বিশপরগনার পয়েন্ট গুলোর সুক্ষ্ম যোগাযোগ রয়েছে।

এছাড়া সমুদ্রপথেও রয়েছে পাচারের বিশাল একটি রুট। মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুর-থাইল্যান্ডে চাকরি দেওয়ার নাম করে নৌপথে হাজার হাজার মানুষ পাচারের বড় ধরনের রুট মানুষের নজরে আসে সম্প্রতি। যখন, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়া সীমান্তে গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রতিদিনই কক্সবাজার সীমান্ত দিয়ে নৌকা কিংবা ট্রলারে করে হাজার হাজার মানুষকে পাচার করে দেওয়া হয়। যাদের মধ্যে থাকে নারী এবং শিশুও।

পাচারকারী কারা

২০০৪ সালের নারী ও শিশু নিযার্তন দমন আইন অনুযায়ী, পাচারকারী সেই ব্যক্তি যে পতিতাবৃত্তি বা নীতিবর্হিভূত বেআইনী কাজে নিয়োজিত করার উদ্দ্যেশে কোন নারীকে বিদেশ থেকে আনয়ন করেন অথবা, বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা, বেচাকেনা করেন অথবা, ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দ্যেশে হস্তান্তর করেন অথবা, একই উদ্দ্যেশে নারীকে তার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন। উলেখিত কাজগুলোর যে কোন একটির সাথে জড়িত ব্যক্তি পাচারকারী হিসেবে অভিহিত হবেন।

পাচারকারী কোন বিশেষ ব্যক্তি নয়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক ব্যক্তি এই কাজের সাথে জড়িত থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একজন মূল হোতা এবং দালাল থেকে শুরু করে আত্মীয়-পরিজনও সহযোগী হিসেবে এ কাজে যুক্ত থাকতে পারে। বোঝার সুবিধার্তে প্রকৃতি অনুযায়ী পাচারকারী চক্রকে চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি-

১. মূল হোতা
২. দালাল
৩. সংগ্রহকারী
৪ সহযোগী

১. মূল হোতা

যে ব্যক্তি পাচারের মূল ব্যবসা পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাকে পাচারকারী চক্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। পাচার সংক্রান্ত অর্থের লেনদেন এবং পাচার প্রক্রিয়ার প্রশাসনিক কার্যাবলী এই ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকে। মূল হোতা যে দেশের নাগরিক সে দেশে তার কর্মক্ষেত্র বা দপ্তর থাকতে পারে আবার তার কর্ম এলাকা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে অন্য দেশের পাচারকারী চক্রের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতে সে পাচার কার্য সম্পন্ন করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

২. দালাল

দালাল হলো সেই মধ্যস্বত্বভোগী, দেশের ভিতরে বিভিন্ন যার এলাকার নেটওয়ার্ক আছে। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নারী ও শিশু সংগ্রহ করে এবং পাচারকারী চক্রের প্রতিনিধি অথবা পাচারকৃতদের ব্যবহারকারী সংগঠনের হাতে তুলে দেয়।

৩. সংগ্রহকারী

দালালের নেটওয়ার্কের অভ্যন্তরে যেসব ব্যক্তি স্থানীয়ভাবে লোক সংগ্রহ করে দেয় তাদেরকে বলা যেতে পারে সংগ্রহকারী। আরও ব্যাখ্যা করলে সংগ্রহকারী বলতে বোঝায় পাচারের কাজে নিয়োজিত সেই সব লোক যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নারী ও শিশু সংগ্রহের কাজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সংগ্রহকারী সাধারণত নিজ গ্রাম হতে নারী ও শিশু সংগ্রহ করে না, অন্যান্য গ্রাম থেকে তাদের সংগ্রহ করে থাকে। অপেক্ষাকৃত ছোট দালাল আবার নিজেই সংগ্রহকারীর ভূমিকা পালন করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রহকারী একেবারে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। যেমন, ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন পতিতালয়ে কর্মরত নারীদের কেউ কেউ দেশে ফেরত আসে। কাজ এবং উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে নিজ গ্রাম বা এলাকা থেকে কিছু মেয়েকে সংগ্রহ করে পতিতালয়ে নিয়ে যায়। বিনিময়ে পতিতালয়ের মালিকের কাছ থেকে কিছু অর্থলাভ করে। পাচারের পুরো প্রক্রিয়াটি সে ব্যক্তিগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

১. সহযোগী

পাচার একটি সংগঠিত চক্রের কাজ। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অংশ যেমন পরিবার, স্থানীয় নেতা, ব্যবসায়ী, পরিবহন শিল্পে কর্মরত লোক, স্থানীয় মাস্তান-এরা বুঝে অথবা না বুঝে কিছু অর্থনৈতিক প্রলোভনে পড়ে পাচারের কাজে সহায়তা করে। এই শ্রেণীকে নারী ও শিশু পাচারের সহযোগী বলা যায়। ২০০৪ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী, এরাও পাচারকারীর সংজ্ঞায় পড়ে। পাচারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা নারী ও শিশুর পরিবার থেকে শুরু করে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী পর্যন্ত এ ধরনের সহযোগী ব্যক্তিদের পাওয়া যায়।

২. পরিবার

একজন দালাল যখন সংগ্রহের কাজ করে তখন পরিবারের সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রে জেনে শুনেও নারী বা শিশুকে পাচারকারীদের হাতে তুলে দেয়। দুলাভাই শালীকে অথবা মামা ভাগ্নীকে পাচারকারীদের হাতে তুলে দেয়ার মত ঘটনাও ঘটে থাকে।

৩. পরিবহন চালক এবং মালিক

পাচারের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত নারী ও শিশুদেরকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের পরিবহন ব্যবহার করা হয়। যেমন রিক্সা, ভ্যান, বাস, নৌকা, ট্রাক ইত্যাদি। এ সকল যানবাহনের চালকরা জেনে বা না জেনে স্থানান্তরের কাজটি করে থাকেন। এরাও পাচারের সহযোগী।

৪. ঘাট মালিক

নারী ও শিশুদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করার পর সীমান্তবর্তী এলাকায় এনে জড়ো করা হয়। এই এলাকাগুলো ঘাট নামে পরিচিত। ঘাট একটি মাঠ হতে পারে, নদীর তীর হতে পারে এমনকি একটি বাড়িও হতে পারে। স্থানীয় প্রভাবশালী লোকজন অবৈধ উপায়ে মানুষ পারাপারের লক্ষ্যে সহায়তা করার জন্য এই ঘাটগুলো ইজারা নেয়। নারী ও শিশু পাচারের জন্য এই ঘাটগুলো ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘাট মালিকগণ পাচারের সহযোগী হিসেবে কাজ করে।

৫. সীমান্তরক্ষী বাহিনী

মানুষ পাচারের ক্ষেত্রে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সম্পৃক্ততার কথা সর্বজনবিদিত। তাদের সহযোগীতা ছাড়া পাচারকারীদের পক্ষে নিয়মিত সীমান্ত পারাপার সম্ভব না। অনেক ক্ষেত্রেই পাচার কাজে সরাসরি যুক্ত না হলেও অর্থের বিনিময়ে তারা সীমান্ত পারাপারে পাচারকারীদের সহযোগীতা করে।

Dhaka University Institutional Repository

পাচারের ফলাফল

নারী ও শিশু পাচার একটি অবৈধ স্থানান্তর প্রক্রিয়া। নারী ও শিশুদের অপহরন করে অথবা নানা রকম ছলচাতুরি ও প্রলোভনের আশ্রয় নিয়ে পাচার করা হয়। পাচারকৃত নারী ও শিশুদের নীতি বহির্ভূত ও অমানবিক কাজে নিয়োগ করা হয়। পাচারকৃত কোন নারী বা শিশু ফিরে এলে বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সমস্যার সম্মূখীন হয়। এক কথায় পাচার ভিকটিম-এর জীবনের সাথে সাথে পরিবার ও সমাজে ভয়াবহ ফলাফল তৈরি করে। পাচারকরীদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার পর থেকে উদ্ধার হয়ে দেশে ফিরে আসা পর্যন্ত পাচারকৃত নারী ও শিশুরা বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতার সম্মূখীন হয়। বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া নারী ও শিশুর সবচেয়ে বড় অংশ যায় ভারত ও পাকিস্তানে । এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ যেমন সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহে নারী ও শিশুদের নানা ধরণের বাধ্যতামূলক শ্রমে ব্যবহার করা হয়।

পাচারের পর নারীর অবস্থা

বিভিন্ন দেশে পাচারকৃত নারীদের মূলত নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে বাধ্য করা হয়।

* পতিতাবৃত্তি
* যৌন পর্যটন
* রক্ষিতা
* বাধ্যতামূলক শ্রম
* ক্রীতদাস
* যৌন ছায়াছবি বা পত্রপত্রিকায় নগ্ন মডেল
* কলকারখানায় ঝুঁকিপূর্ণশ্রম

১. পতিতাবৃত্তি

বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ নারী পাচার হয়ে বিদেশে যাচ্ছে তার সিংহভাগকে জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়। পতিতাবৃত্তিতে পাচারকৃত মেয়েদের নিয়োগ নির্ভর করে তাদের বয়স ও দৈহিক সৌন্দয্যের ওপর। এক পরিসংখ্যানে পাওয়া যায়, কলকাতার বিভিন্ন পতিতালয়ে বাংলাদেশী প্রায় ২০ হাজার মেয়ে রয়েছে। বিপুল অংকের টাকার বিনিময়ে পাচারকারীরা একেকজন নারীকে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়। এদের মধ্যে অনেক কিশোরীও রয়েছে। পতিতালয়ে প্রথম থেকেই নারীরা মানসিক ও দৈহিক উভয় প্রকার নির্যাতনের শিকার হতে থাকে। পতিতাবৃত্তিতে অস্বীকৃতি জানালে সর্দারাণী বা পতিতালয়ের মালিকদের হাতে তাদের নির্যাতিত হতে হয়। তাদেরকে বদ্ধ ঘরে আটকে রাখা হয়। এমনকি এসিড দিয়ে শরীরের অংশ বিশেষ পুড়িয়ে দেয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। স্বাস্থ্যগত ও মানসিক দিক বিবেচনায় পতিতালয়ে বিক্রি হয়ে যাওয়া নারী অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে। সঠিকভাবে নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বিভিন্ন যৌন রোগে তারা আক্রান্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এইডস-এর মত ভয়াবহ ব্যাধিরও সংক্রমণ ঘটে থাকে যার অবধারিত ফল মৃত্যু। অনেকে অনাকাঙ্খিতভাবে গর্ভধারণ করে। আর এই অবস্থায় জোরপূর্বক তাদের গর্ভপাত ঘটানো হয় যা তাদের স্বাস্থ্যহানী থেকে শুরু করে মৃত্যুরও কারণ হয়। এ কাজে নিয়োগ করার প্রথম দিকে তার অর্জিত পুরো টাকাই পতিতালয় কর্তৃপক্ষ নিয়ে নেয়। পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীর স্বীয় আয়ের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এইডস আক্রান্ত যৌনকর্মীকে পতিতালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। এতে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

২. যৌন পর্যটন

পতিতালয়ে বিক্রি করা ছাড়াও অন্য ধরণের যৌন ব্যবসায়ও পাচারকৃত নারী ও মেয়ে শিশুদের কাজে লাগানো হয়। যৌন পর্যটনের জন্য পাচারকৃত নারীকে হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রয় করা হয়। পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য এ সব নারী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. রক্ষিতা

অনেক সময় ধনী ব্যক্তিরা রক্ষিতা বা সেবাদাসী হিসেবে ব্যবহারের জন্য পাচার হয়ে যাওয়া নারীদের কিনে নেয়। সেখানে তাদের মুক্তভাবে চলাচল, মত প্রকাশ বা নিজের ব্যপারে কথা বলারও কোন অধিকার থাকে না।

৪. বাধ্যতামূলক শ্রম

পকিস্তানে পাচার হয়ে যাওয়া বেশির ভাগ নারীই শিকার হয় বাধ্যতামূলক শ্রমের। বিশেষ করে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোকেরা তাদের কিনে নিয়ে যায় এবং বিয়ে করে। এইসব নারী তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম স্ত্রী হিসেবে শস্য উৎপাদন ও অন্যান্য কাজে শ্রম দিতে বাধ্য হয়। মানুষের বসবাসের অনুপযোগী মরুভূমি অঞ্চলে প্রখর রোদে ভেড়া চরানো, পানি টানা ইত্যাদি কষ্টদায়ক কাজ করতে বাধ্য হয়। অর্থনৈতিকভাবে তারা মোটেও লাভবান হয় না। ক্রয় করে স্ত্রী হিসেবে গ্রহন করা হয় বলে সামাজিকভাবেও এরা নিগৃহীত হয়। প্রয়োজনবোধে স্বামী আবারও তাকে বিক্রি করে দিতে পারে।

৫. ক্রীতদাসী

অনাকর্ষণীয় দেহ বা চেহারার অধিকারী পাচারকৃত মেয়েদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ক্রীতদাসী হিসেবে গৃহকার্যে ব্যবহারের জন্য ভারত-পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা কম মজুরীতে, ক্ষেত্র বিশেষে বিনা মজুরীতে কাজ করতে বাধ্য হয়।

৬. যৌন ছায়াছবি বা পত্রপত্রিকায় নগ্ন মডেল

অনেক নারী পতিতালয়ের মতো এলাকায় শ্রম দেয়া থেকে রক্ষা পেলেও তাদেরকে অশ্লীল যৌন সিনেমায় জোরপূর্বক নিয়োগ করা হয়।

৭. কলকারখানায় ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম

পাচারকৃত নারীদের কার্পেট কারখানা ও কাঁচ কারখানা সহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণকাজে নিয়োজিত করা হয়। শ্রমে নিয়োজিত নারীর স্বীয় আয়ের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

পাচারবিরোধী আইন

বাংলাদেশ নারী ও শিশু পাচারের একটি উৎস দেশ হিসেবে পরিচিত। এ কারণে এদেশে নারী ও শিশু পাচারের বিষয়ে আইনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে পাচার বিষয়ক বিচারের কাজ বিভিন্ন আইনের মধ্য দিয়ে করা হয়েছে। কেননা ২০০০ সাল পর্যন্ত পাচার সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কোন আইন ছিল না। ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে আইন প্রণীত হয় এবং ২০০৩-এ এই আইনের কিছুটা সংশোধনী দেয়া হয়। এই আইনে বিভিন্ন ধরণের নারী নির্যাতনের মধ্যে পাচারকে বেশ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয় এবং পাচারকার্যে নিয়োজিতদের শাস্তি দেওয়া হয়।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধনী ২০০৩)

আইনের ধারা ৫-এ বলা হয়েছে যে,

১. যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতিবহির্ভূত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিদেশ হতে আনেন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা কোন নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করেন, বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন নারীকে তাহার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

২. যদি কোন নারীকে কোন পতিতার নিকট বা পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবস্থাপকের নিকট বিক্রয়, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপভাবে হস্তান্তর করিয়াছেন

Dhaka University Institutional Repository

তিনি, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তিনি উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৩. যদি কোন পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা পতিতালয়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কোন নারীকে ক্রয় বা ভাড়া করেন বা অন্য কোনভাবে কোন নারীকে দখলে নেন বা জিম্মায় রাখেন, তাহা হইলে তিনি, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতা হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ক্রয় বা ভাড়া করিয়াছেন বা দখলে বা জিম্মায় রাখিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

এই আইনের ধারা ৬-এ বলা হয়েছ

১. যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনী বা নীতিবহির্ভূত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ হইতে আনয়ন করেন বা বিদেশ প্রেরণ বা পাচার করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা উক্তরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে নিজ দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

২. যদি কোন ব্যক্তি কোন নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল, শিশু বা মাতৃসদন নার্সিং হোম, ক্লিনিক ইত্যাদি বা সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবকের হেফাজত হইতে চুরি করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনী বা নীতিবহির্ভূত উদ্দ্যেশে কোন শিশুকে বিদেশ থেকে আনে বা বিদেশে পাঠায় অথবা কেনাবেচা করে বা এরকম কোন শিশুকে নিজ দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং এর অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডিত হবে।

একইভাবে ধারা ৭-এ উল্লেখ করা হয়েছে

১. যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৫-এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে বা অনুর্ধ্ব-১৪ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দন্ডনীয় হইবেন।

২. অর্থাৎ, যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৫-এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে অপহরন করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারদন্ড বা চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে এবং এর অর্থদন্ডেও দন্ডিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে বাল্যবিয়ে পরিস্থিতি

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে মাসে প্রকাশিত ইউনিসেফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে ১৫ বছর বয়স হওয়ার আগেই শতকরা ৩৯ শতাংশ মেয়ের এবং ১৮ বছরের মধ্যে ৭৪ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। বাংলাদেশে বাল্যবিয়ের গড় হার ৬৫ শতাংশ। ১৫ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিয়ের এই হার বিশ্বে সর্বোচ্চ। এই বিবেচনায় বাল্যবিয়ের হারে শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ। ২০১২ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল তৃতীয়। প্রতিবেদনে বলা হয়, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতে বাল্যবিয়ের গড় হার ৪৩ শতাংশ, নেপালে ৪১ শতাংশ, আফগানিস্তানে ৪০ শতাংশ, ভুটানে ২৬ শতাংশ, পাকিস্তানে ২৪ শতাংশ, শ্রীলংকায় ১২ শতাংশ এবং মালদ্বীপে ৪ শতাংশ। ভারতে ব্রিটিশ-ভারতের আইন অনুযায়ী ছেলেদের বিয়ের বয়স ২১ এবং মেয়েদের ১৮।

ইউনিসেফের এই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশে ১৫ বছরের কম বয়সী বিবাহিত মেয়েদের ২০ শতাংশ ২৪ বছর বয়স হওয়ার আগেই দুই বা ততোধিক সন্তানের মা হচ্ছে। এর ফলে প্রসূতি মৃত্যুর হার এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যাও তাদের ক্ষেত্রে বেশি হচ্ছে। গর্ভধারণকালীন এবং প্রসবের সময় এসব কিশোরী মায়ের উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবাও নিশ্চিত করা হচ্ছে না বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বিশ্বে বর্তমানে ৭০ কোটি নারী বাল্যবিয়ের শিকার, যার মধ্যে প্রতি তিনজনের একজনেরই বিয়ে হয়েছে ১৫ বছর বয়সের নীচে।

বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, এক দশক ধরে বাংলাদেশে ৬৬ শতাংশ ক্ষেত্রে ১৯ বছর বয়সের আগেই বাল্যবিয়ের শিকার নারীরা গর্ভবতী হচ্ছে। এই বয়সসীমায় মা হওয়া ৩০ শতাংশ নারী এবং ৪১ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে।

বাল্যবিয়ের কারণ সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়, ৬০ ভাগ ক্ষেত্রেই দরিদ্রতার কারণে গ্রামাঞ্চলে বাবা-মা মেয়েদের ১৫ বছরের নিচেই বিয়ে দিচ্ছেন। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তার সংকট এবং বখাটের হাত থেকে বাঁচাতে ৩০ শতাংশ ক্ষেত্রে মেয়েদের দ্রুত বিয়ে দেওয়া হচ্ছে।[৪১]

[৪১] *'বিয়ের বয়স কমবে কেন'* শীর্ষক বিশেষ প্রতিবেদন, (ঢাকা: দৈনিক সমকাল, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৪), প্রথম পাতা।

Dhaka University Institutional Repository

নবম পরিচ্ছেদঃ নারীদের আত্মহত্যার ভয়াবহ চিত্র

২০১৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশ পুলিশ সদরের প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৩ সালে দেশে ১০ হাজার ১২৬ জন আত্মহত্যা করেছে। এদের বেশির ভাগের বয়স ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। আত্মহত্যাকারীদের ৬০ ভাগ নারী। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের অন্যান্য দেশে আত্মহত্যাকারীদের মধ্যে বেশির ভাগ পুরুষ হলেও বাংলাদেশে বেশির ভাগ আত্মহত্যাকারী নারী। ২০১২ সালে বাংলাদেশে আত্মহত্যাকারী ১০১৬৭ জনের মধ্যে নারী ছিলেন ৫৭৭৩ জন ও পুরুষ ৪৩৯৪ জন। ২০১১ সালে বাংলাদেশে আত্মহত্যা করে সাড়ে ৯ হাজারের বেশি মানুষ।[৪২]

পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায় রংপুরের বদরগঞ্জে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শেষ সাত মাসে ১২ জন আত্মহত্যা করে, যার মধ্যে আটজনই স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী। এ ছাড়া কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ২০১৩ সালে ১৯ জন আত্মহত্যা করে যার বেশির ভাগই কিশোর-কিশোরী। এভাবে সারা দেশে যে সংখ্যক মানুষ আত্মহত্যা করছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমানে কিশোর-কিশোরী।[৪৩]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী আত্মহত্যায় শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান দশম। ২০১১ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৩৮তম। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৫-২৯ বছর বয়সীদের মৃত্যুর দ্বিতীয় প্রধান কারণ আত্মহত্যা। যে সংখ্যক মানুষ আত্মহত্যা করে তার থেকে ২০ গুণ মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়।[৪৪]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনেই দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের প্রায় সব দেশে নারীর তুলনায় ৩/৪গুণ বেশী আত্মহত্যা করে পুরুষরা। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে হয় তরা উল্টোটা। বাংলাদেশে পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশী আত্মহত্যা করেন। ২০১২ সালে আত্মহত্যাকারী ১০১৬৭ জনের মধ্যে নারী ছিলেন ৫৭৭৩জন ও পুরুষ ৪৩৯৪জন।

আত্মহত্যার কারণ

শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়ে সাধারণত নারীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। তবে আত্মহত্যা প্ররোচনার আইনগত কোন সংজ্ঞা না থাকায় এ দেশে নির্যাতনকারীদের কোন শাস্তি হয় না। কঠিন শাস্তির অপরাধ করা সত্ত্বেও এর মুখোমুখি না হওয়ায় পুরুষরা নারীদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা না থামানোয় বর্তমানে আত্মহত্যার পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে।

তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করেও মহিলা, কিশোর, যুবক-যুবতী বা বৃদ্ধদের আত্মহত্যা ঘটনা ঘটছে। তবে এটা ঠিক, খোঁজ নিলে জানা যাবে, তুচ্ছ ওই একটি ঘটনার আগে আরও একশ'টি ঘটনা ঘটেছে, দিনের পর দিন যা আত্মহত্যাকারী মুখ বুজে সহ্য করেছে। সবশেষে এসে যখন দেখল, এ মানসিক বা শারীরিক অত্যাচার যন্ত্রনা তার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়, তখন সে আত্মহত্যা করছে।

রাজধানী ঢাকার জিআরপিসহ ৪২টি থানা এলাকা ও আশপাশের জেলাগুলোতে প্রতিদিন শতাধিক নারী ও পুরুষ আত্মহত্যার অপচেষ্টা করে ব্যর্থ হন। আত্মহত্যার অপচেষ্টাকারী বেশিরভাগই নারী। তাদের অধিকাংশ আবার ছাত্রী কিংবা গৃহবধূ। এসব আত্মহত্যার নেপথ্যে থাকে জীবনসঙ্গীর পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়া, পারিবারিক শাসন, প্রেমের ক্ষেত্রে পরস্পরের সম্পর্কের অবনতি ইত্যাদি কারণ।

বখাটেদের ইভটিজিং বা উৎপাতের কারণে আত্মহত্যা বাড়ছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে, সচেতনতার অভাব, সামাজিক বৈষম্য, আইনি দুর্বলতার কারণে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অপারগতা এবং প্রচলিত আইনে শাস্তি বিধান যথেষ্ট না থাকাও অন্যতম কারণ। বখাটেদের উৎপাত বা ইভটিজিং রোধে

---

৪২ মেহেদী হাসান, '*আত্মহত্যার দীর্ঘ মিছিল*', দৈনিক নয়াদিগন্ত, প্রাগুক্ত।

৪৩ প্রাগুক্ত।

৪৪ প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে সুস্পষ্ট প্রতিকারের কোনো বিধান না থাকায় এই সামাজিক ব্যাধি রোধ করা যাচ্ছে না।

আত্মহত্যা প্ররোচনার শাস্তি

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)-এর ৯ক ধারায় নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনার শাস্তির বিধানে বলা হয়েছে, কোনো নারীর সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কোনো কার্য দ্বারা সম্ভ্রমহানি হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণে কোনো নারী আত্মহত্যা করলে ওই নারীকে অনুরূপ কার্য দ্বারা আত্মহত্যা করতে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে বলা হবে। এ আইনেও ১০ বছর শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

শাস্তি পায় না বলেই আমাদের সমাজের পুরুষরা সহনশীল হচ্ছে না। স্ত্রীদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে আত্মহত্যার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, এতে স্বামীর বিরুদ্ধে আত্মহত্যার প্ররোচনার অভিযোগ এ ধারায় আনা যায় না। এখানেও আত্মহত্যার প্ররোচনার সংজ্ঞা স্পষ্ট নয়। শাস্তি দিতে হলে আইন সংশোধন করতে হবে। আত্মহত্যার প্ররোচনার সংজ্ঞা স্পষ্ট করতে হবে আইনে।

Dhaka University Institutional Repository

দশম পরিচ্ছেদঃ পতিতাবৃত্তি- বাংলাদেশ পরিস্থিতি

বাংলাদেশ থেকে যে পরিমাণ নারী পাচার হয়ে বিদেশে যাচ্ছে তার সিংহভাগকে জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়। পতিতাবৃত্তিতে পাচারকৃত মেয়েদের নিয়োগ নির্ভর করে তাদের বয়স ও দৈহিক সৌন্দর্য্যের উপর। এক পরিসংখ্যানে পাওয়া যায়, কলকাতার বিভিন্ন পতিতালয়ে বাংলাদেশী প্রায় ২০ হাজার মেয়ে রয়েছে। বিপুল অংকের টাকার বিনিময়ে পাচারকারীরা একেকজন নারীকে পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়। এদের মধ্যে অনেক কিশোরীও রয়েছে। পতিতালয়ে প্রথম থেকেই নারীরা মানসিক ও দৈহিক উভয় প্রকার নির্যাতনের শিকার হতে থাকে। পতিতাবৃত্তিতে অস্বীকৃতি জানালে সর্দারাণী বা পতিতালয়ের মালিকদের হাতে তাদের নির্যাতিত হতে হয়। তাদেরকে বদ্ধ ঘরে আটকে রাখা হয়। এমনকি এসিড দিয়ে শরীরের অংশ বিশেষ পুড়িয়ে দেয়ার মতো ঘটনাও ঘটে। স্বাস্থ্যগত ও মানসিক দিক বিবেচনায় পতিতালয়ে বিক্রি হয়ে যাওয়া নারী অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে। সঠিকভাবে নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বিভিন্ন যৌন রোগে তারা আক্রান্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এইডস এর মত ভয়াবহ ব্যাধিরও সংক্রমণ ঘটে থাকে যার অবধারিত ফলাফল মৃত্যু। অনেকে অনাকাঙ্খিতভাবে গর্ভধারণ করে। আর এই অবস্থায় জোরপূর্বক তাদের গর্ভপাত ঘটানো হয় যা তাদের স্বাস্থ্যহানী থেকে শুরু করে মৃত্যুরও কারণ হয়। এ কাজে নিয়োগ করার প্রথম দিকে তার অর্জিত পুরো টাকাই পতিতালয় কর্তৃপক্ষ নিয়ে নেয়। পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত নারীর স্বীয় আয়ের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এইডস আক্রান্ত যৌনকর্মীকে পতিতালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। এতে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ : কিছু পরিসংখ্যান

পতিতাবৃত্তির প্রসার যেভাবে ব্যাপক আকার ধারন করছে, তা বাংলা সংস্কৃতির মূলধারায় পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে না। নারীর শরীর নিয়ে বিকিকিনি করার এই বর্বর চর্চার উনুনে নি:শব্দে ফুঁ দিয়ে যাচ্ছি আমরা। আজ বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় পতিতাবৃত্তি নিচুতলা থেকে উচুতলায় প্রসারমাত্র এক দুরারোগ্য সামাজিক ব্যাধি।

পতিতাবৃত্তি এখন এক সর্বত্র চলে। পতিতা (যৌনকর্মী) এখন খুঁজতে হয় না। অবশ্য মানবিক কারনেই এখন আর পতিতা বলা হয় না। তদের পেশার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলা হয়ে থাকে. যৌনকর্মী।

এখন নগরময় গিজ গিজ করে যৌনকর্মী। ভাসমান যৌনকর্মীদের দাপট ইদানীং বেড়ে গেছে। ভাসমান যৌন কর্মীরাই বেশি সমস্যার গৃষ্টি করে। বিকেল থেকে শুরু হয় এদের কাজ। সারারাত চলে খদ্দের শিকারের প্রাণপাত চেষ্টা। বাংলাদেশে ঢাকা শহরের রমনা পার্ক, বলধা গার্ডেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সংসদ ভবনের আশপাশ, স্টেডিয়াম এলাকা ভাসমান পাতিতাদের নিরাপদ অশ্রয়স্থল। সিলেট, চট্টগ্রাম সহ বিভাগীয় শহরের রেলষ্টেশন গুলোতে রয়েছে তাদের ব্যাপক উপস্থিতি। দশ বছরের বালিকা রয়েছে এদের ভীড়ে, রয়েছে ৪৫ বছরের প্রৌঢ়াও। রাতের সহচরী এরা। এদের শরীর ঘিরে রাত ঘনায় প্রতিদিন। বিকাল কেটে যেতে না যেতেই ঝুপ ঝুপ অন্ধকার নেমে আসে এদের শরীরের মৌতাত ঘিরে। এই অন্ধকারে সওদা করে বেড়ায় ওরা। শহরে গ্রামে সবখানেই চলে পতিতাবৃত্তি। স্টেশনের বেঞ্চিতে ট্রেনের খালি কামরায়, পার্কে চলে যৌনতার সুড়সুড়ি। বর্তমানে হোটেল রেষ্টুরেন্ট বিউটি পার্লার, নার্সিং হোম হাসপাতাল, এপার্টমেন্ট, লঞ্চের কামরা, ড্যান্স ক্লাব, সিনেমা হল, বাজারের পরিত্যক্ত ঘর, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চলে নীরব পতিতাবৃত্তি। বিভিন্ন মডেলিং ফার্ম, বিজ্ঞাপন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানে চলে নানা কৌশলে যৌনতা। আবার গার্মেন্টসের মহিলা শ্রমিকরা অধিক স্বছলতার জন্য পতিতাবৃত্তি করে। (এখানে সব শ্রমিকদের কথা বলা হয়নি)। সমাজে যে হারে পতিতাবৃত্তি সংক্রমন ঘটছে তা ভবিষ্যতে ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে, সন্দেহ নেই।

মূলত: শিল্প বিপ্লব পরোক্ষভাবে বেশ্যাবৃত্তিকে উৎসাহিত করেছে। এ বিপ্লবের ফলে ব্যাপক নগরায়ন ঘটে। অর্থনৈতিক শোষনের দরোজা খুলে যায়। আধুনিক পতিতাবৃত্তি উন্মেষ ঘটে সঙ্গে সঙ্গে। নগরায়ন, অর্থনৈতিক শোষন ও সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার এই ত্রিবিধ কারণে আধুনিক বেশ্যাবৃত্তি বিশ্বব্যাপী সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্টিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নবাব সিরাজউদদৌলার পতনের পর এ ভূখন্ডে পতিতারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আমদানী হতে থাকে। ইংরেজ এবং তাদের রাজকর্মচারীদের মনোরঞ্জনের জন্যই লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি প্রদেশ থেকে বাঙ্গালী ও বেশ্যাদের ঝাঁকে ঝাঁকে এই বাংলায় নিয়ে আসা হয়।

'কোম্পানী আমলে ঢাকা' গ্রন্থে জেমস টেলর উল্লেখ করেছেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও ঢাকা শহরে সংগঠিত আকারে পতিতাবৃত্তির অস্তিত্ব ছিল। ১৯০১ সালের ব্রিটিশ আদম শুমারিতে পতিতাদের চিহ্নিত করা হয়েছে 'অদক্ষ শ্রমিক– যারা কৃষি কাজে নিয়োজিত নয়' বলে। বাংলাদেশে ১৯৭৪ ও ১৯৮১ সালের আদম শুমারি পতিতাদের পতিতা পরিচিতিকে তুলে ধরা হয় পেশা হিসাবে।[৪৫]

১৯৯৯ সালের এক হিসেবে উঠে আসে, বাংলাদেশের প্রায় তিন লাখ নারী ভারতের পতিতালয় এবং ২ লাখ নারী পাকিস্তানের পতিতালয়ে কাজ করছে।[৪৬] ৬০ থেকে ৬৫ হাজার তালিকাভুক্ত পতিতা রয়েছে বাংলাদেশে। নিষিদ্ধ পল্লীতে থেকে দেহ ব্যবসা করার মত রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজন হলেও দেশব্যপী প্রায় লক্ষাধিক পতিতার আবাসস্থল এখন নিষিদ্ধ পল্লীতে। এছাড়া প্রায় অর্ধলক্ষ পতিতা রয়েছে ভাসমান। এদের কোন কাগজপত্র, নির্দিষ্ঠ কোন উপস্থিতি নেই। ১৯৯৬ সালের এক পরিসংখ্যানে উঠে এসেছে, 'রাজধানী ঢাকা নগরীতে ৩০,০০০ এবং নারায়নঞ্জে ১৫,০০০ পতিতা রয়েছে বলে পুলিশের ধারণা। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পতিতা নারায়গঞ্জের টানবাজার (যদিও এখন টানবাজারের অস্তিত্ব নেই), এদেশের সবচেয়ে বড় রেডলাইট এরিয়া। প্রায় পাঁচ হাজার পতিতা ছিল এই পল্লীতে। ময়মসসিংহে আছে প্রায় আটশ পতিতা। বর্তমানে সারাদেশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য ভাসমান পতিতা, যাদের সঠিক হিসাব দেয়া মুস্কিল।'[৪৭]

পতিতাবৃত্তির জন্য দায়ী কারণগুলো বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন রকম। বাংলাদেশে পতিতাবৃত্তির মত দায়ী মূখ্য কারণ দারিদ্র্যকে গবেষকরা চিহ্নিত করলেও আরোও অনেক কারণ বিদ্যমান-

পতিতাবৃত্তির জন্য দায়ী কারণ	**শতকরা হার**
দারিদ্র্য	৫৫.১২
প্রেমিক কতৃক প্রতারিত ও বিক্রি	১৭.০৮
স্বামী কতৃক বিক্রি	০১.৪৭
সৎমা কতৃক বিক্রি	০২.৭২
স্বামী পরিত্যক্তা ও স্বামীর প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয়ে	০৮.২৯
দুর্বৃত্ত কর্তৃক হাইজ্যাক, ধর্ষিতা ও বিক্রি	১৫.১২

বস্তুত: পতিতাবৃত্তি জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দরিদ্রতা কাজ করলেও এর সাথে বিভিন্ন সমাজিক, মনস্তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক কারণ জড়িত থাকতে পারে। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পতিতাবৃত্তি জন্য দায়ী নিম্মোক্ত কারণ গুলো চিহ্নিত করা যেতে পারে[৪৮]

১. দারিদ্র ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা
২. বিবাহ বিচ্ছেদ
৩. প্রেমে ব্যর্থতা
৪. দালালের প্রতারনা
৫. শিল্পায়ন ও শহরায়ন

---

৪৫ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা: স্বরুপ ও সমাধান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)

৪৬ ইয়াসমিন আজিজ, *আমরা যেভাবে পাচার হয়েছিলাম*, (ঢাকা: ২৪ ফেব্রুয়ারি, দৈনিক প্রথম আলো, ১৯৯৯)

৪৭ শাকিল রিয়াজ, (ঢাকা: দৈনিক জনকণ্ঠ: ১৫ নভেম্বর, ১৯৯৬)

৪৮ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা: স্বরুপ ও সমাধান*, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

৬. উচ্চবিলাসী জীবনের মোহ

৭. অপসংস্কৃতির অনুপ্রেবেশ ও যৌনাচারে সামাজিক নিয়ন্ত্রনহীনতা।

উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে পতিতাবৃত্তির জন্য বংশানুক্রমিকতা, সামাজিক অস্থিরতা, অশুভ শক্তির বিস্তার, নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌতুক প্রথা, অপহরণ, ইভটিজিং এবং বয়সের ব্যাপক দুরত্বে রব-কনের বিবাহ ইত্যাদিকে পতিতাবৃত্তির জন্য দায়ী করা হয়।

পাতিতাবৃত্তি করে নানা বয়সের মেয়েরা। নানা কারনে এরা আসে এ জঘন্য পেশায়। কেউ পাচার হয়ে, কেউ প্রতারিত হয়ে, কেউ দালালের খপ্পরে পড়ে, আবার কেউ গার্মেন্টসের চাকুরীর নামে কিংবা মডেলিং এর নামে প্রতারিত হয়ে। এদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীভেদ বিদ্যমান।

১৯৯৪ সালে একটি জরিপে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের মহিলা পতিতাদের ধরন এরকম-

মহিলা পতিতাদের ধরন শতকরা হার

অবিবাহিতা ৫৩.১০%

বিবাহিতা ২৪.২১%

বিধবা ১৫.৭৯%

মাসিক চিকিৎসা সাময়িকীর ১৯৯৪ সালের একটি জরিপে দেখা যায় পতিতালয়ে কোন শ্রেনীর খদ্দেরদের উপস্থিতি কি রকম-

খদ্দেরদের ধরন শতকরা হার

ছাত্র ৪৩.৮০%

ব্যবসায়ী ১৬.০৪%

চাকুরিজীবি ২৬.০১%

রিক্সাওয়ালা ০৫.৪৮%

দিনমজুর ০১.৩৭%

বাস ড্রাইভার ০১.৩৭%

অন্যান্য ০৫.৪৮%

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে নারীর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি মূল্যায়ণ

বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কাজে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। শিক্ষা, চাকরি কিংবা ব্যবসা, এমনকি সমাজ সংস্কারে এখন নারীদের অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফুর্ত। তা সত্ত্বেও নারীর সার্বিক অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে না।

পেশাগত কাজে নারীদের অংশগ্রহণ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নারীরা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়েছে। শ্রমশক্তি প্রতিবেদনের সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে, বাংলাদেশে ১৯৮৫-৮৬ সালে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণের হার উৎপাদনমুখী কর্মক্ষেত্রে ছিল ৯.৯ ভাগ। পরিস্থিতি উন্নতি হয়ে, ১৯৯০-৯১-এ এসে দাঁড়ায় ১৪.১ ভাগে। ২০০০ সাল নাগাদ সে হারে বেড়েছে তিন গুণ। বর্তমানে বৃদ্ধির হার ৫ ভাগের বেশি। তথ্য সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশের মোট ৮ কোটি নারীর শতকরা ৪০ জন গ্রামে বাস করে। যাদের অধিকাংশই নিজ সংসার ছাড়া বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাজে যুক্ত রয়েছে।

শ্রমশক্তির অন্য এক জরিপে দেখা যায়, বর্তমানে শ্রমজীবী নারীর শতকরা ৭৮.৮ ভাগ কৃষি ও মাছ ধরার কাজ করে। শতকরা ৪০ জন বিনা পারিশ্রমিকে পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিত। সমীক্ষায় দেখা যায়, শিশু লালন-পালনসহ একজন নারী পারিবারিক কাজে ১৪ থেকে ১৮ ঘন্টা কাজ করে। কিন্তু, এদের উৎপাদিত মূল্য অর্থনীতিতে অদৃশ্য থাকে। চাকরিতে বেশির ভাগ নারী শিক্ষা, চিকিৎসা এবং নার্সিং পেশায় নিয়োজিত। ব্যবস্থাপনা এবং নীতি-নির্ধারণী কর্মকর্তা হিসেবে নারীর সংখ্যা শতকরা মাত্র সাত জন।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ২০০৯ সালে পোশাক প্রস্তুতকারী কারখানায় ৩ লাখের বেশি নারী শ্রমিক কাজ করছে। যা মোট নারী শ্রমিকের ৯০ ভাগ। মাত্র কয়েক বছরে তৈরী পোশাক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বেড়েছে কয়েকশ' গুণ। সম্প্রতি এক পরিসংখ্যানে প্রকাশিত হয়েছে, বাংলাদেশে প্রায় সাড়ে চার হাজার তৈরী পোশাক কারখানায় কাজ করছেন প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক। যার ৯০ শতাংশই নারী। অথচ পোশাক, নির্মাণ ও অন্যান্য উৎপাদন কারখানায় মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারী বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া গার্মেন্টস শ্রমিক অসন্তোষগুলোর দিকে তাকালেই এই চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদিও, শ্রম দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা কোন ক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে নেই। অধিকাংশ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় প্রসূতিকালীন ছুটি দেওয়া হয় না। অথচ নারীর কর্ম জীবনে ন্যুনতম ৬ মাস প্রসূতিকালীন ছুটি বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রগুলোতে অনুমোদিত। পোশাক শিল্প-কারখানায় বেশিরভাগ শিপমেন্ট হয় রাতে। কিন্তু, এক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তা যথাযথ নয়।

নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও বর্তমান পরিস্থিতি

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। বিশাল এই জনশক্তিকে কাজে না লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি দেশের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশ সরকার এই জনশক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য দৃশ্যমান কিছু উদ্যেগ গ্রহণ করছে ঠিক; কিন্তু এসব উদ্যোগ কতটা কার্যকরি তার প্রমান পাওয়া যাচ্ছে না। গত কয়েক বছর ধরেই নারী উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তার জন্য বাজেটে ভাল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরেও নারী উন্নয়নে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা এবং এই বাজেটে নারী উদ্যোক্তার জন্য ঋণ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে হয়েছে।[৪৯] এ ধরনের সরকারী উদ্যোগের ফলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বাড়বে বলে সাধারণভাবে ধারণা করা যায়। পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তারা আরও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

তবে সংসদে অর্থমন্ত্রীর ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেট পেশের পর সুশীল সমাজের অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, এই নির্দিষ্ট পরিমাণ অংকই কী নারী উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট বরাদ্দ? বরাদ্ধকৃত এ অর্থ নারীর উন্নয়নে কিভাবে ব্যবহৃত

[৪৯] অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাৎসরিক বাজেট, ঢাকা: ২০১৪-১৫ অর্থবছর, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

হবে সেটাও কিন্তু সুস্পষ্ট করা হয়নি। ফলে অস্বচ্ছতা এবং অস্পষ্টতার বেড়াজালে আটকে থাকছে এদেশে নারীর সত্যিকার উন্নয়ন চিত্র।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে নারী উন্নয়নের জন্য রাখা বরাদ্ধ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ নানা আশাবাদ ব্যক্ত করেছে। একই সঙ্গে নারীর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ততা বাড়াতে আরও কিছু সুবিধা দেয়ার জন্য প্রস্তাবও দিয়েছে তারা। প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে নারীর ব্যক্তিগত করমুক্ত আয়সীমা ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা নির্ধারণ, অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ নিশ্চিত করা।[৫০]

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে কম। কর্মজীবী নারীর অধিকাংশ আবার চাকরিজীবী। বাংলাদেশে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা খুব কম বলা চলে। যথাযথ পড়াশোনা, ঘরের বাইরে যাওয়া, ব্যবসায় পুঁজির যোগান, সমাজ ও পরিবারের সার্বিক সহযোগিতা একজন উদ্যোক্তার জন্য জরুরী। যোগ্যতা প্রমাণের পরিপূর্ণ সুযোগ না পেলেও বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমেই বাড়ছে। শ্রমিক থেকে শুরু করে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চতর পর্যায়ে রয়েছে নারীর বিচরণ। চাকরির পাশাপাশি উদ্যোক্তা হয়ে অনেক নারী গড়ে তুলছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। শুধু নিজেই প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে সমাজ উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে। বিশ্লেষকদের মতে, নারীকে এখন নারী নয় বরং একজন যোগ্য মানুষ হিসেবেই ভাবতে শুরু করেছে সমাজ।

সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান এ বক্তব্যেরই সমর্থন দেয়। বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডির গবেষণাপত্র 'অর্থনীতির মূলধারায় নারীর অংশগ্রহণ'-এ উল্লেখ রয়েছে, অতিদ্রুত অর্থনীতিতে বিশেষভাবে চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা বাড়ছে।'

মোট শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ১৯৯৫-৯৬ সালে ছিল ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ, ২০০২-০৩ সালে ২৬ দশমিক ১ শতাংশ, ২০০৫-০৬ সালে ২৯ দশমিক ২ শতাংশ এবং ২০১১-১২ সালে তা হয়েছে ৩৯ দশমিক ১ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর গবেষণায় বলা হয় ২০০৬ সালে এক কোটি ১৩ লাখ নারী কর্মক্ষেত্রে ছিল। ২০১০ সালে এ সংখ্যা বেড়ে এক কোটি ৬২ লাখ হয়। সিপিডির গবেষণায় বলা হয়েছে, বর্তমান প্রেক্ষাপটে নারী এখনও তার পূর্ণ যোগ্যতা অনুযায়ী অর্থনীতিতে অংশ নিতে পারছে না। আশির দশকে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর মধ্যে নারীর সংখ্যা ১ শতাংশও ছিল না। বর্তমানে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী নারী। উচ্চ পদস্থ নারী কর্মকর্তার সংখ্যা খুব বেশি নয়। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, তবে এটা আশানুরূপ নয়।

[৫০] রেজাউল করিম খোকন, *নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও বর্তমান বাস্তবতা* (ঢাকা : দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ জুন, ২০১৪)

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচলিত আইন

- প্রথম পরিচ্ছেদ : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ : যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ : নারী নির্যাতন রোধে বিবিধ
- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : নারী নির্যাতন রোধে প্রচলিত আইনের প্রায়োগিক দিক মূল্যায়ণ
- সপ্তম পরিচ্ছেদ : প্রচলিত আইন বাস্তবায়নের বাস্তবতা এবং কিছু কেস স্টাডি

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচলিত আইন

২০০৭ সালের ২২ এপ্রিল আইন কমিশন '২০০০ সনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-এর কতিপয় ধারাসমূহের প্রস্তাবিত সংশোধনী সংক্রান্ত প্রতিবেদন' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। এতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে পাস করা আইনগুলোর প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, নারী নির্যাতনের বিষয়গুলো সর্বপ্রথমে বিধিবদ্ধ রূপ লাভ করে ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি আইনের মাধ্যমে। এ আইনের মধ্যে নারীদের ওপর সংঘটনযোগ্য অপরাধ যেমন ধর্ষণ, নারী অপহরণ, নারীর ওপর আঘাত, এসিড নিক্ষেপসহ সমাজে সব ধরনের অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া এবং এসব অপরাধের শাস্তি বিধানের মাত্রা অপরাধের বিভিন্নতা অনুসারে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতন অধিক মাত্রায় প্রসারিত হওয়ায় বিভিন্ন নারী সংগঠন নারীর প্রতি বৈষম্য ও বহুমাত্রিক নির্যাতনমূলক আচরণের চিত্র তুলে ধরে নারী নির্যাতন রোধকল্পে সঠিক শাস্তি বিধান সংবলিত বিশেষ বিশেষ আইন প্রণয়নের দাবি উত্থাপন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন নামে নারীদের জন্য সর্বপ্রথম একটি বিশেষ আই প্রণয়ন করা হয়। এ আইনে যৌতুক দেওয়া-নেওয়া ও যৌতুকের দাবিতে নারীর ওপর নির্যাতন করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে সেসব অপরাধের শাস্তি বিধান করা হয়েছে। ১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ নামে একটি আইন জারি করা হয়। কিন্তু এ আইন কার্যকর হওয়ার পর এর মধ্যে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হতে থাকে। এ আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত অপরাধ ও অপরাধের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ হওয়ায় নারী নির্যাতনের অপরাধ দমনে আইনটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

১৯৯৫ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন নামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন করা হয় এবং এর মাধ্যমে ১৯৮৩ সালের অধ্যাদেশটি রহিত করা হয়। পরে মামলা পরিচালনাকালে এ আইনেরও কিছু সীমাবদ্ধতা, অসঙ্গতি ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। নারী ও শিশু নির্যাতন কার্যকরভাবে দমন করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন নামে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন পাস করা হয়। পাশাপাশি ১৯৯৫ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইনটি বিলুপ্ত করা হয়। ২০০০ সালের আইনটিই বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন দমনের জন্য প্রচলিত আইন হিসেবে বলবৎ আছে। এরপরে অবশ্য কয়েকবার আইনটিতে সংশোধনী আনা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে আরও কিছু আইনের কথা উল্লেখ করা যায়। এর মধ্যে রয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১৩, এসিড অপরাধ দমন আইন-২০০২।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)

নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধ কঠোরভাবে দমনের জন্য সরকার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণয়ন করে। ২০০০ সালে আইনটি প্রণয়নের পর ২০০৩ সালে এটি সংশোধীত হয়। এ আইনের মাধ্যমে নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সংঘটিত কয়েকটি অপরাধ চিহ্নিত করে তার দ্রুত বিচার ও শাস্তি বিধান নিশ্চিত করা হয়েছে।
নিম্নে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০টি, ২০০৩ সালে সংশোধিত অংশসহ বিস্তারিত তুলে ধরা হলো-

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

২০০০ সনের ৮ নং আইন, ১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০০, (এরপর ৪ঠা শ্রাবণ, ১৪১০/১৯শে জুলাই, ২০০৩
নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০৩ নামে সংশোধন করা হয়।)

নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন। যেহেতু নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়-
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল–

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

১। এই আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) 'অপরাধ' অর্থ এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ;

(খ) 'অপহরণ' অর্থ বলপ্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করিয়া বা ফুসলাইয়া বা ভুল বুঝাইয়া বা ভীতি প্রদর্শন করিয়া কোন স্থান হইতে কোন ব্যক্তিকে অন্যত্র যাইতে বাধ্য করা;

(গ) 'আটক' অর্থ কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন স্থানে আটকাইয়া রাখা;

(ঘ) 'ট্রাইব্যুনাল' অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কোন ট্রাইব্যুনাল;

(ঙ) 'ধর্ষণ' অর্থ ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে, Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860) এর Section ৩৭৫ এ সংজ্ঞায়িত rape';

(চ) 'নবজাতক শিশু' অর্থ অনুর্ধ্ব চল্লিশ দিন বয়সের কোন শিশু;

(ছ) 'নারী' অর্থ যে কোন বয়সের নারী;

(জ) 'মুক্তিপণ' অর্থ আর্থিক সুবিধা বা অন্য যে কোন প্রকারের সুবিধা;

(ঝ) 'ফৌজদারী কার্যবিধি' অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(ঞ) 'যৌতুক' অর্থ-

(ক) কোন বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সহিত জড়িত বর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বিবাহের পণ হিসাবে বিবাহের কনে পক্ষের নিকট দাবীকৃত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ; অথবা

(খ) কোন বিবাহের কনে পক্ষ কর্তৃক বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সহিত জড়িত বর পক্ষের অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত বিবাহের সময় বা তৎপূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান

Dhaka University Institutional Repository

থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বিবাহের পণ হিসাবে প্রদত্ত বা প্রদানে সম্মত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ;

(ট) 'শিশু' অর্থ অনধিক ষোল বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তি;

(ঠ) 'হাইকোর্ট বিভাগ' অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

দহনকারী, ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি

৪। (১) যদি কোন ব্যক্তি দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থ দ্বারা কোন শিশু বা নারীকে এমনভাবে আহত করেন যাহার ফলে উক্ত শিশু বা নারীর দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি ন' হয় বা শরীরের কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা ন' হয় বা তাহার শরীরের অন্য কোন স্থান আহত হয়, তাহা হইলে উক্ত শিশুর বা নারীর-

(ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি নষ্ট বা মুখমণ্ডল, স্তন বা যৌনাংগ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি মত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(খ) শরীরের অন্য কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হওয়ার বা শরীরের কোন স্থানে আঘাত পাওয়ার ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অসন সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন দহনকারী, ক্ষয়কারী অথবা বিষাক্ত পদার্থ কোন শিশু বা নারীর উপর নিক্ষেপ করেন বা করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, তাহার উক্তরূপ কাযের্র দরুণ সংশ্লিষ্ট শিশু বা নারীর শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনভাবে কোন ক্ষতি না হইলেও, অনধিক সাত বত্সর কিন্তু অন্যুন তিন বত্সরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীন অর্থদণ্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ, বা তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় রাখিয়া যাওয়া সম্পদ হইতে আদায় করিয়া অপরাধের দরুণ যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে বা, ক্ষেত্রমত, যেই ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবে।

নারী পাচার, ইত্যাদির শাস্তি

৫। (১) যদি কোন ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতিবিগর্হিত কোন কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিদেশ হইতে আনয়ন করেন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা কোন নারীকে ভাড়ায় বা অন্য কোনভাবে নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর করেন, বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন নারীকে তাহার দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অনধিক বিশ বৎসর কিন্তু অনুন্য দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন নারীকে কোন পতিতার নিকট বা পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা ব্যবস্থাপকের নিকট বিক্রয়, ভাড়া বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করা হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপভাবে হস্তান্তর করিয়াছেন

Dhaka University Institutional Repository

তিনি, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে বিক্রয় বা হস্তান্তর করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং তিনি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি কোন পতিতালয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারী বা পতিতালয়ের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কোন নারীকে ক্রয় বা ভাড়া করেন বা অন্য কোনভাবে কোন নারীকে দখলে নেন বা জিম্মায় রাখেন, তাহা হইলে তিনি, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, উক্ত নারীকে পতিতা হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ক্রয় বা ভাড়া করিয়াছেন বা দখলে বা জিম্মায় রাখিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

শিশু পাচার, ইত্যাদির শাস্তি

৬। (১) যদি কোন ব্যক্তি কোন বেআইনী বা নীতিগর্হিত উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে বিদেশ হইতে আনয়ন করেন বা বিদেশে প্রেরণ বা পাচার করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা উক্তরূপ কোন উদ্দেশ্যে কোন শিশুকে নিজ দখলে, জিম্মায় বা হেফাজতে রাখেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন নবজাতক শিশুকে হাসপাতাল, শিশু বা মাতৃসদন, নার্সিং হোম, ক্লিনিক, ইত্যাদি বা সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবকের হেফাজত হইতে চুরি করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

নারী ও শিশু অপহরণের শাস্তি

৭। যদি কোন ব্যক্তি ধারা ৫-এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা অন্যূন চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

মুক্তিপণ আদায়ের শাস্তি

৮। যদি কোন ব্যক্তি মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে কোন নারী বা শিশুকে আটক করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ধর্ষণ, ধর্ষণজনিত কারণে মৃত্যু, ইত্যাদির শাস্তি

৯। (১) যদি কোন পুরুষ কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

ব্যাখ্যা- যদি কোন পুরুষ বিবাহ বন্ধন ব্যতীত ২(ষোল বৎসরের) অধিক বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে বা ভীতি প্রদর্শন বা প্রতারণামূলকভাবে তাহার সম্মতি আদায় করিয়া, অথবা ৩(ষোল বৎসরের) কম বয়সের কোন নারীর সহিত তাহার সম্মতিসহ বা সম্মতি ব্যতিরেকে যৌন সঙ্গম করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নারীকে ধর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধর্ষণ বা উক্ত ধর্ষণ পরবর্তী তাহার অন্যবিধ কার্যকলাপের ফলে ধর্ষিতা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুন্য এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) যদি একাধিক ব্যক্তি দলবদ্ধভাবে কোন নারী বা শিশুকে ধর্ষন করেন এবং ধর্ষণের ফলে উক্ত নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটে বা তিনি আহত হন, তাহা হইলে ঐ দলের প্রত্যেক ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্যুন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি কোন নারী বা শিশুকে-

Dhaka University Institutional Repository

(ক) ধর্ষণ করিয়া মৃত্যু ঘটানোর বা আহত করার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(খ) ধর্ষণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বত্সর কিন্তু অন্যুন পাঁচ বত্সর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(৫) যদি পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন সময়ে কোন নারী ধর্ষিতা হন, তাহা হইলে যাহাদের হেফাজতে থাকাকালীন উক্তরূপ ধর্ষণ সংঘটিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ধর্ষিতা নারীর হেফাজতের জন্য সরাসরিভাবে দায়ী ছিলেন, তিনি বা তাহারা প্রত্যেকে, ভিন্নরূপ প্রমাণিত না হইলে, হেফাজতের ব্যর্থতার জন্য, অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অনুন্য পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনুন্য দশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

নারীর আত্মহত্যায় প্ররোচনা, ইত্যাদির শাস্তি

৪ [৯ক। কোন নারীর সম্মতি ছাড়া বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত (Wilful) কোন কার্য দ্বারা সম্ভ্রমহানি হইবার প্রত্যক্ষ কারণে কোন নারী আত্মহত্যা করিলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নারীকে অনুরূপ কার্য দ্বারা আত্মহত্যা করিতে প্ররোচিত করিবার অপরাধে অপরাধী হইবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অনুন্য পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।]

যৌন পীড়ন, ইত্যাদির দণ্ড

৫ [১০। যদি কোন ব্যক্তি অবৈধভাবে তাহার যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাহার শরীরের যে কোন অঙ্গ বা কোন বস্তু দ্বারা কোন নারী বা শিশুর যৌন অঙ্গ বা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করেন বা কোন নারীর শ্লীলতাহানি করেন তাহা হইলে তাহার এই কাজ হইবে যৌন পীড়ন এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি অনধিক দশ বৎসর কিন্তু অনুন্য তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।]

যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানো, ইত্যাদির শাস্তি

১১। যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন ৬ [কিংবা উক্ত নারীকে মারাত্মক জখম (grievous hurt) করেন বা সাধারণ জখম (simple hurt) করেন] তাহা হইলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি-

(ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদণ্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

৭ [(খ) মারাত্মক জখম (grievous hurt) করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অনধিক বার বৎসর কিন্তু অনুন্য পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(গ) সাধারণ জখম (simple hurt) করার জন্য অনধিক তিন বৎসর কিন্তু অনুন্য এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।]

ভিক্ষাবৃত্তি, ইত্যাদির উদ্দেশ্যে শিশুকে অঙ্গহানি করার শাস্তি

১২। যদি কোন ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোন শিশুর হাত, পা, চক্ষু বা অন্য কোন অঙ্গ বিনষ্ট করেন বা অন্য কোনভাবে বিকলাঙ্গ বা বিকৃত করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশু সংক্রান্ত বিধান

৮ [১৩। (১) অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধর্ষণের কারণে কোন সন্তান জন্মলাভ করিলে-

(ক) উক্ত সন্তানকে তাহার মাতা কিংবা তাহার মাতৃকুলীয় আত্মীয় স্বজনের তত্ত্বাবধানে রাখা যাইবে;

(খ) উক্ত সন্তান তাহার পিতা বা মাতা, কিংবা উভয়ের পরিচয়ে পরিচিত হইবার অধিকারী হইবে;

(গ) উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় রাষ্ট্র বহণ করিবে;

(ঘ) উক্ত সন্তানের ভরণপোষণের ব্যয় তাহার বয়স একুশ বৎসর পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রদেয় হইবে, তবে একুশ বৎসরের অধিক বয়স্ক কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে তাহার বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত এবং পঙ্গু সন্তানের ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় ভরণপোষণের যোগ্যতা অর্জন না করা পর্যন্ত প্রদেয় হইবে।

(২) সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সন্তানের ভরণপোষণ বাবদ প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন কোন সন্তানকে ভরণপোষণের জন্য প্রদেয় অর্থ সরকার ধর্ষকের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে এবং ধর্ষকের বিদ্যমান সম্পদ হইতে উক্ত অর্থ আদায় করা সম্ভব না হইলে, ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হইবেন সেই সম্পদ হইতে উহা আদায়যোগ্য হইবে।]

সংবাদ মাধ্যমে নির্যাতিতা নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধা-নিষেধ

১৪। (১) এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হইয়াছেন এইরূপ নারী বা শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তত্সম্পর্কিত আইনগত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোন সংবাদ পত্রে বা অন্য কোন সংবাদ মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাইবে যাহাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করা হইলে উক্ত লংঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

ভবিষ্যৎ সম্পত্তি হইতে অর্থদণ্ড আদায়

১৫। এই আইনের ধারা ৪ হইতে ১৪ পর্যন্ত ধারাসমূহে উল্লিখিত অপরাধের জন্য ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আরোপিত অর্থদণ্ডকে, প্রয়োজনবোধে, ট্রাইব্যুনাল অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে গণ্য করিতে পারিবে এবং অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের অর্থ দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ হইতে আদায় করা সম্ভব না হইলে, ভবিষ্যতে তিনি যে সম্পদের মালিক বা অধিকারী হইবেন সেই সম্পদ হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের উপর অন্যান্য দাবী অপেক্ষা উক্ত অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণের দাবী প্রাধান্য পাইবে।

অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি

১৬। এই আইনের অধীনে কোন অর্থদণ্ড আরোপ করা হইলে, ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টরকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা অনুরূপ বিধি না থাকিলে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অপরাধীর স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয়বিধ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতক্রমে ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় বা ক্রোক ছাড়াই সরাসরি নিলামে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রাইব্যুনালে জমা দিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল উক্ত অর্থ অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের ইত্যাদির শাস্তি

১৭। (১) যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অন্য কোন ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ করার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান তাহা হইলে মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি এবং যিনি অভিযোগ দায়ের করাইয়াছেন উক্ত ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এর অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও মামলার বিচার করিতে পারিবে।

অপরাধের তদন্ত

৯ [১৮। (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ হইলে, তাহার ধৃত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী পনের কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে; অথবা

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে ধৃত না হইলে তাহার অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্য প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা ট্রাইব্যুনালের নিকট হইতে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ষাট কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) কোন যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে অপরাধের তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন এবং তৎসম্পর্কে কারণ উল্লেখ পূর্বক তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ট্রাইব্যুনালকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ট্রাইব্যুনালকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে অবহিত হইবার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ট্রাইব্যুনাল উক্ত অপরাধের তদন্তভার অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপে কোন অপরাধের তদন্তভার হস্তান্তর করা হইলে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনের সময়ে হাতেনাতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইলে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত হইয়া পুলিশের নিকট সোপর্দ হইলে, তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী সাত কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন; অথবা

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে তদন্তের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যেও তদন্তকার্য সম্পন্ন করা না হইলে, সংশিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে উক্তরূপ তদন্তকার্য সম্পন্ন না হওয়া সম্পর্কে তাহার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ট্রাইব্যুনালকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) উপ-ধারা (২) বা উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোন তদন্তকার্য সম্পন্ন না করার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, তদন্তের আদেশ প্রদানকারী ট্রাইব্যুনাল যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তাই দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা ও অসদাচরণ তাহার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপর্যুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৭) তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর যদি ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তদন্ত প্রতিবেদনে আসামী হিসাবে উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে ন্যায়বিচারের স্বার্থে সাক্ষী করা বাঞ্ছনীয়, তবে উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী হিসাবে গণ্য করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৮) যদি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন ব্যক্তিকে অপরাধের দায় হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বা তদন্তকার্যে গাফিলতির মাধ্যমে অপরাধটি প্রমাণে ব্যবহারযোগ্য কোন আলামত সংগ্রহ বা বিবেচনা না করিয়া বা মামলার প্রমাণের প্রয়োজন ব্যতিরেকে উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী করিয়া বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে পরীক্ষা না করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উক্ত কার্য বা অবহেলাকে অদক্ষতা বা, ক্ষেত্রমত, অসদাচরণ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া ট্রাইব্যুনাল উক্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৯) ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে কোন তদন্তকারী কর্মকর্তার পরিবর্তে অন্য কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে।]

অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি

১০ [১৯। (১) এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় (Cognizable) হইবে।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনে জড়িত মূল এবং প্রত্যক্ষভাবে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইবে না, যদি-

(ক) তাহাকে মুক্তি দেওয়ার আবেদনের উপর অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেওয়া না হয়; এবং

(খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে মর্মে ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি নারী বা শিশু হইলে কিংবা শারীরিকভাবে অসুস্থ (sick or infirm) হইলে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার কারণে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হইলে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ব্যক্তি ব্যতীত এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া ন্যায়সংগত হইবে মর্মে ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হইলে তদ্‌মর্মে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনাল জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে।]

বিচার পদ্ধতি

২০। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার কেবলমাত্র ধারা ২৫ এর অধীন গঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে।

(২) ট্রাইব্যুনালে মামলার শুনানী শুরু হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবসে একটানা চলিবে।

(৩) বিচারের জন্য মামলা প্রাপ্তির তারিখ হইতে একশত আশি দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনাল বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সময়সীমার মধ্যে মামলার বিচারকার্য সমাপ্ত না হইলে, ট্রাইব্যুনাল মামলার আসামীকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে এবং আসামীকে জামিনে মুক্তি দেওয়া না হইলে ট্রাইব্যুনাল উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবে।

(৫) কোন মামলার বিচারকার্য শেষ না করিয়া যদি কোন ট্রাইব্যুনালের বিচারক বদলী হইয়া যান, তাহা হইলে তিনি বিচারকার্যের যে পর্যায়ে মামলাটি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পর্যায় হইতে তাহার স্থলাভিষিক্ত বিচারক বিচার করিবেন এবং তাহার পূর্ববর্তী বিচারক যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে যদি বিচারক কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করা অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে এমন যে কোন সাক্ষীকে তলব করিয়া পুনরায় তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১১ [(৬) কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে কিংবা ট্রাইব্যুনাল স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত মনে করিলে এই আইনের ধারা ৯ এর অধীন অপরাধের বিচার কার্যক্রম রুদ্ধদ্বার কক্ষে (trial in camera) অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।]

(৭) কোন শিশু এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে বা উক্ত অপরাধের সাক্ষী হইলে তাহার ক্ষেত্রে Children Act, 1974 (XXXIX of 1974) এর বিধানাবলী যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে।

১২ [(৮) কোন নারী বা শিশুকে নিরাপত্তা হেফাজতে রাখিবার আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল, উক্ত নারী বা শিশুর কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার্থে তাহার মতামত গ্রহণ ও বিবেচনা করিবে।]

আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার

২১। (১) যদি ট্রাইব্যুনালের এই মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে,-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতার বা তাহাকে বিচারের জন্য সোপর্দকরণ এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছে বা আত্মগোপন করিয়াছেন; এবং

(খ) তাহার আশু গ্রেফতারের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল অন্তত: দুইটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সময়, যাহা ত্রিশ দিনের বেশী হইবে না, এর মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির হইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল তাহার অনুপস্থিতিতে বিচার করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির হইবার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জামিনে মুক্তি দেওয়ার পর পলাতক হন, তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না, এবং সেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার বিচার সম্পন্ন করিতে পারিবে।

ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যে কোন স্থানে জবানবন্দি গ্রহণের ক্ষমতা

২২। (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের তদন্তকারী কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা তদন্তকারী অন্য কোন ব্যক্তি কিংবা অকুস্থলে কোন আসামীকে ধৃত করার সময় কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে, ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল বা ঘটনাটি নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তির জবানবন্দি অপরাধের ত্বরিত বিচারের স্বার্থে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লিখিতভাবে বা অন্য কোনভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থল বা অন্য কোন যথাযথ স্থানে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করিবেন এবং উক্তরূপে গৃহীত জবানবন্দি তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত সামিল করিয়া ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিবার নিমিত্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার বা ব্যক্তির নিকট সরাসরি প্রেরণ করিবেন।
(৩) যদি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বিচার কোন ট্রাইব্যুনালে শুরু হয় এবং দেখা যায় যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন জবানবন্দি প্রদানকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত জবানবন্দি মামলায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে:
তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না।

রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক, ইত্যাদির সাক্ষ্য

২৩। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন চিকিত্সক, রাসায়নিক পরীক্ষক, সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক, হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ, আঙ্গুলাংক বিশারদ অথবা আগ্নেয়াস্ত্র বিশারদকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কোন বিষয়ে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিবেদন প্রদান করিবার পর বিচারকালে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয় বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না তাহা হইলে তাহার স্বাক্ষরযুক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট এই আইনের অধীন বিচারকালে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না।

সাক্ষীর উপস্থিতি

২৪। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারের জন্য সাক্ষীর সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর সর্বশেষ বসবাসের ঠিকানা যে থানায় অবস্থিত, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত সাক্ষীকে উক্ত ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করিবার দায়িত্ব উক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার থাকিবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও সাক্ষীর সমনের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সাক্ষীকে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপার বা, ক্ষেত্রমত, পুলিশ কমিশনারকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সমেত নিবন্ধিত ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে।
(৩) এই ধারার অধীন কোন সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করিতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃত গাফিলতি করিলে ট্রাইব্যুনাল উহাকে অদক্ষতা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ, ইত্যাদি

২৫। (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে এবং ট্রাইব্যুনাল একটি দায়রা আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন যে কোন অপরাধ বা তদনুসারে অন্য কোন অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।
(২) ট্রাইব্যুনালে অভিযোগকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল

২৬। (১) এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের জন্য প্রত্যেক জেলা সদরে একটি করিয়া ট্রাইব্যুনাল থাকিবে এবং প্রয়োজনে সরকার উক্ত জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনালও গঠন করিতে পারিবে; এইরূপ ট্রাইব্যুনাল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হইবে।

(২) একজন বিচারক সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং সরকার জেলা ও দায়রা জজগণের মধ্য হইতে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনবোধে, কোন জেলা ও দায়রা জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(৪) এই ধারায় জেলা জজ ও দায়রা জজ বলিতে যথাক্রমে অতিরিক্ত জেলা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজও অন্তর্ভুক্ত।

ট্রাইব্যুনালের এখ্‌তিয়ার

২৭। ১৩[(১) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন না।

(১ ক) কোন অভিযোগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে হলফনামা সহকারে ট্রাইব্যুনালের নিকট অভিযোগ দাখিল করিলে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগকারীকে পরীক্ষা করিয়া–

(ক) সন্তুষ্ট হইলে অভিযোগটি অনুসন্ধানের (inquiry) জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং অনুসন্ধানের জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অভিযোগটি অনুসন্ধান করিয়া সাত কার্য দিবসের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিবেন;

(খ) সন্তুষ্ট না হইলে অভিযোগটি সরাসরি নাকচ করিবেন।

(১খ) উপ-ধারা (১ক) এর অধীন রিপোর্ট প্রাপ্তির পর কোন ট্রাইব্যুনাল যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে–

(ক) অভিযোগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন এবং অভিযোগের সমর্থনে প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ আছে সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উক্ত রিপোর্ট ও অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করিবেন;

(খ) অভিযোগকারী উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় নাই কিংবা অভিযোগের সমর্থনে কোন প্রাথমিক সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল অভিযোগটি নাকচ করিবেন।

(১গ) উপ-ধারা (১) এবং (১ক) এর অধীন প্রাপ্ত রিপোর্টে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ বা তত্‌সম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনাল, যথাযথ এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিলে, কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।]

(২) যে ট্রাইব্যুনালের এখ্‌তিয়ারাধীন এলাকায় কোন অপরাধ বা উহার কোন অংশ সংঘটিত হইয়াছে অথবা যেখানে অপরাধীকে বা, একাধিক অপরাধীর ক্ষেত্রে, তাহাদের যে কোন একজনকে পাওয়া গিয়াছে, সেই স্থান বা ট্রাইব্যুনালের এখ্‌তিয়ারাধীন, সেই ট্রাইব্যুনালে অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণের জন্য রিপোর্ট বা অভিযোগ পেশ করা যাইবে এবং সেই ট্রাইব্যুনাল অপরাধটির বিচার করিবে।

(৩) যদি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সংগে বা একই মামলায় করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত অন্য

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধটির বিচার এই আইনের অধীন অপরাধের সহিত এই আইনের বিধান অনুসরণে একই সংগে বা একই ট্রাইব্যুনালে করা যাইবে।

আপীল

২৮। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে, হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।

মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন

২৯। এই আইনের অধীনে কোন ট্রাইব্যুনাল, মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট মামলার নথিপত্র অবিলম্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৭৪ এর বিধান অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত মৃতুদণ্ড কার্যকর করা যাইবে না।

অপরাধে প্ররোচনা বা সহায়তার শাস্তি

৩০। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা যোগান এবং সেই প্ররোচনার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টা করা হয় বা কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে ঐ অপরাধ সংঘটনের জন্য বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে প্ররোচনাকারী বা সহায়তাকারী ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবেন।

নিরাপত্তামূলক হেফাজত

৩১। এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার চলাকালে যদি ট্রাইব্যুনাল মনে করে যে, কোন নারী বা শিশুকে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা প্রয়োজন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত নারী বা শিশুকে কারাগারের বাহিরে ও সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থানে সরকারি কর্তৃপক্ষের হেফাজতে বা ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় যথাযথ অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থার হেফাজতে রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদির জবাবদিহিতা

১৪ [৩১ক। (১) কোন মামলা ধারা ২০ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি না হইবার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালকে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রতিবেদন ত্রিশ দিনের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের নিকট দাখিল করিতে হইবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) অনুরূপ ক্ষেত্রে পাবলিক প্রসিকিউটর ও সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাকেও উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া একটি প্রতিবেদন ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে, যাহার একটি অনুলিপি সুপ্রীম কোর্টে প্রেরণ করিতে হইবে। (৩) উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন পেশকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।]

অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষা

১৫ [৩২। (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের শিকার ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষা সরকারী হাসপাতালে কিংবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন বেসরকারী হাসপাতালে সম্পন্ন করা যাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন হাসপাতালে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের শিকার ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য উপস্থিত করা হইলে, উক্ত হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিত্সক তাহার মেডিক্যাল পরীক্ষা অতিদ্রুত সম্পন্ন করিবে এবং উক্ত মেডিক্যাল পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিবে এবং এইরূপ অপরাধ সংঘটনের বিষয়টি স্থানীয় থানাকে অবহিত করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে কোন মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন না করার ক্ষেত্রে, তৎসম্পর্কে ব্যাখ্যা সম্বলিত প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কিংবা, ক্ষেত্রমত, মেডিক্যাল পরীক্ষার আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, ট্রাইব্যুনাল বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্তৃপক্ষ যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন না হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকই দায়ী, তাহা হইলে উহা দায়ী ব্যক্তির অদক্ষতা ও অসদাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং এই অদক্ষতা ও অসদাচরণ তাহার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করা হইবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে, এবং সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিতে পারিবে।]

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৩৩। সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

১৯৯৫ সনের ১৮ নং আইনের রহিতকরণ ও হেফাজত

৩৪। (১) নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১৮নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে উক্ত আইনের অধীন অনিষ্পন্ন মামলা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে এবং অনুরূপ মামলায় প্রদত্ত আদেশ, রায় বা শাস্তির বিরুদ্ধে আপীল সংশ্লিষ্ট আদালতে এমনভাবে পরিচালিত ও নিষ্পত্তি হইবে যেন উক্ত আইন রহিত করা হয় নাই।

(৩) উক্ত আইনের অধীন অপরাধের কারণে যে সমস্ত মামলার রিপোর্ট বা অভিযোগ করা হইয়াছে বা তৎপ্রেক্ষিতে চার্জশীট দাখিল করা হইয়াছে, বা মামলা তদন্তাধীন রহিয়াছে, সেই সমস্ত মামলাও উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত আদালতে বিচারাধীন মামলা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উক্ত আইনের অধীন গঠিত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালত সমূহ এই আইনের অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনাল হিসাবে গণ্য হইবে এবং উপ-ধারা (২) অনুসারে উহাতে উল্লিখিত মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করা যাইবে।

.....

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন- ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)

২০০৩ সালে এই আইনে যে সব সংশোধোনী আনা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো

১. দফা (ঞ) এবং (ট) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

২. 'ষোল বৎসরের' শব্দগুলি 'চৌদ্দ বৎসরের' শব্দগুলির পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৩. 'ষোল বৎসরের' শব্দগুলি 'চৌদ্দ বৎসরের' শব্দগুলির পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ধারা ৯ক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৪ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

৫. ধারা ১০ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৬. 'কিংবা উক্ত নারীকে মারাত্মক জখম (grievous hurt) করেন বা সাধারণ জখম (simple hurt) করেন' শব্দগুলি এবং বন্ধনীগুলি, 'উক্ত নারীকে আহত করেন বা আহত করার চেষ্টা করেন,' কমাগুলি এবং শব্দগুলির পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৭. দফা (খ) ও (গ) পূর্ববর্তী দফা (খ) এর পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৮. ধারা ১৩ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৯. ধারা ১৮ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৮ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

১০. ধারা ১৯ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ৯ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

১১. উপ-ধারা (৬) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

১২. উপ-ধারা (৮) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ১০ ধারাবলে সংযোজিত

১৩. উপ-ধারা (১), (১ক), (১খ) এবং (১গ) পূর্ববর্তী উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ১১ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত

১৪. ধারা ৩১ক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ১২ ধারাবলে সন্নিবেশিত।

১৫. ধারা ৩২ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩০ নং আইন) এর ১৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২

এসিড অপরাধ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালে ৩০টি ধারায় এসিড অপরাধ দমন আইন প্রনয়ন করে। এই আইন প্রনয়নকালে সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'যেহেতু এসিড অপরাধ সমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হলো–'।[১] এছাড়াও এসিড অপরাধ কমানোর লক্ষ্যে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০২ প্রনয়ন করা হয়।

এসিড অপরাধ দমন আইন ২০০২-এ এসিড অপরাধের যেসব ধরণ ও শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো হলো–

এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২

(২০০২ সনের ২ নং আইন)

এসিড অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে বিধান করার লক্ষ্যে প্রণীত আইন। যেহেতু এসিড অপরাধসমূহ কঠোরভাবে দমনের উদ্দেশ্যে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল–

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম

১। এই আইন এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ নামে অভিহিত হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "অপরাধ" অর্থ এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য যে কোন অপরাধ;

(খ) "এসিড" অর্থ দহনকারী, ক্ষয়কারী ও বিষাক্ত যে-কোন পদার্থও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কোন ট্রাইব্যুনাল;

(ঘ) "ফৌজদারী কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(ঙ) "হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট এর হাইকোর্ট বিভাগ।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

এসিড দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি

৪। যদি কোন ব্যক্তি এসিড দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটান তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

এসিড দ্বারা আহত করার শাস্তি

৫। যদি কোন ব্যক্তি কোন এসিড দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তিকে এমনভাবে আহত করেন যাহার ফলে তাহার-

(ক) দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হয় বা মুখমণ্ডল, স্তন বা যৌনাংগ বিকৃত বা নষ্ট হয় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

---

[১] ড. আবুল হোসেন, সংগ্রহ ও সম্পাদনা এবং প্রকল্প পরিচালক, *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

(খ) শরীরের অন্য কোন অংগ, গ্রন্থি বা অংশ বিকৃত বা নষ্ট হয় বা শরীরের কোন স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক চৌদ্দ বৎসর কিন্তু অন্যুন সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

এসিড নিক্ষেপ করা বা নিক্ষেপের চেষ্টা করার শাস্তি

৬। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির উপর এসিড নিক্ষেপ করেন বা করিবার চেষ্ট করেন, তাহা হইলে তাহার উক্তরূপ কার্যের দরুণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক বা অন্য কোনভাবে কোন ক্ষতি না হইলেও, তিনি অনধিক সাত বৎসর কিন্তু অনুন্য তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।

অপরাধে সহায়তার শাস্তি

৭। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন এবং সেই সহায়তার ফলে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হয় বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে ঐ অপরাধ সংঘটনের জন্য বা অপরাধটি সংঘটনের চেষ্টার জন্য নির্ধারিত দণ্ডে সহায়তাকারী ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবেন।

মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের, ইত্যাদির শাস্তি

৮। (১) যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের কোন ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ করার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান তাহা হইলে মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী ব্যক্তি এবং যিনি অভিযোগ দায়ের করাইয়াছেন উক্ত ব্যক্তি অনধিক সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।
(২) কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এর অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও মামলার বিচার করিতে পারিবে।

ক্ষতিগ্রস্তকে অর্থদণ্ডের অর্থ প্রদান

৯। এই আইনের অধীন অর্থদণ্ডের অর্থ প্রচলিত আইনের বিধান অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে বা তাহার বিদ্যমান সম্পদ, বা তাহার মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় রাখিয়া যাওয়া সম্পদ হইতে আদায় করিয়া অপরাধের দরুণ যে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়াছে তাহার উত্তরাধিকারীকে বা ক্ষেত্রমত, যেই ব্যক্তি শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন সেই ব্যক্তিকে বা সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তাহার উত্তরাধিকারীকে প্রদান করা হইবে।

অর্থদণ্ড বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি

১০। এই আইনের অধীনে কোন অর্থদণ্ড আরোপ করা হইলে, ট্রাইবুন্যাল সংশ্লিষ্ট জেলার কালেক্টরকে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা অনুরূপ বিধি না থাকিলে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, অপরাধীর স্থাবর বা অস্থাবর বা উভয়বিধ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতক্রমে ক্রোক ও নিলাম বিক্রয় বা ক্রোক ছাড়াই সরাসরি নিলামে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ ট্রাইব্যুনালে জমা দিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং ট্রাইব্যুনাল উক্ত অর্থ অপরাধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদানের ব্যবস্থা করিবে।

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধের তদন্ত

১১। (১) এই আইনের অধীন অপরাধের তদন্ত সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার কর্তৃক, অপরাধটি সংঘটনের তথ্য প্রাপ্তি অথবা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ তদন্তের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে, সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) যেই ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করা সম্ভব না হয় সেই ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি বিশেষ কারণ প্রদর্শন করিয়া ট্রাইব্যুনালকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে তদন্তের সময়সীমা বৃদ্ধি করা সমীচীন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল তদন্তের সময়সীমা অনধিক পনের দিন বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত বর্ধিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত না হয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা মামলার বিচার চলাকালীন যে কোন সময় ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা ন্যায়বিচারের স্বার্থে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন অপরাধের তদন্ত সম্পন্ন করা বা ক্ষেত্রমত, তৎসম্পর্কে অধিকতর তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল অতিরিক্ত অনধিক পনের দিনের মধ্যে তদন্ত বা অধিকতর তদন্ত সমাপ্তির নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) বা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্দেশিত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, ট্রাইব্যুনাল-

(ক) অন্য কোন কর্মকর্তার দ্বারা অনধিক পনের দিনের মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে; এবং

(খ) এই ধারার অধীন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ তদন্তকারী কর্মকর্তার ব্যর্থতার বিষয়টি অদক্ষতা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া উক্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) ট্রাইব্যুনাল কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে বা অন্য কোন তথ্যের ভিত্তিতে কোন একজন তদন্তকারী কর্মকর্তার পরিবর্তে অন্য কোন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

ক্ষেত্রবিশেষে আসামীকে সাক্ষী গণ্য করা

১২। তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পর যদি ট্রাইব্যুনাল তদন্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি পর্যালোচনা করিয়া এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তদন্ত প্রতিবেদনে আসামী হিসাবে উল্লিখিত কোন ব্যক্তিকে ন্যায়বিচারের স্বার্থে সাক্ষী করা বাঞ্ছনীয়, তবে উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী হিসাবে গণ্য করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক আলামত, সাক্ষ্য ইত্যাদি সংগ্রহে গাফিলতি

১৩। যদি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর ট্রাইব্যুনালের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্তকারী কর্মকর্তা কোন ব্যক্তিকে অপরাধের দায় হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বা তদন্তকার্যে ইচ্ছাকৃত গাফিলতির মাধ্যমে অপরাধটি প্রমাণে ব্যবহারযোগ্য কোন আলামত সংগ্রহ বা বিবেচনা না করিয়া বা উক্ত ব্যক্তিকে আসামীর পরিবর্তে সাক্ষী করিয়া বা কোন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে পরীক্ষা না করিয়া তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উক্ত কার্য বা অবহেলাকে অদক্ষতা বা, ক্ষেত্রমত, অসদাচরণ হিসাবে চিহ্নিত করিয়া ট্রাইব্যুনাল উক্ত কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধের আমলযোগ্যতা, অ-আপোষযোগ্যতা ও অ-জামিনযোগ্যতা

১৪। এই আইনের অধীন সকল অপরাধ আমলযোগ্য (Cognizable), অ-আপোষযোগ্য (Non-Compoundable) এবং অ-জামিনযোগ্য (Non-Bailable) হইবে।

জামিন সংক্রান্ত বিধান

১৫। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, অভিযুক্ত বা শাস্তিযোগ্য কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইবে না, যদি-

(ক) তাহাকে মুক্তি দেওয়ার আবেদনের উপর রাষ্ট্র বা, ক্ষেত্রমত, অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেওয়া না হয়; এবং

(খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে মর্মে ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হন; অথবা

(গ) তিনি নারী বা শিশু অথবা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ না হন এবং তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার কারণে ন্যায়বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট না হন।

(২) কোন অপরাধের তদন্ত সমাপ্তির পর তদন্ত প্রতিবেদন বা সেই সূত্রে প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে যদি ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমত, আপীল আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি উক্ত অপরাধের সহিত জড়িত নহেন বলিয়া বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল বা আপীল আদালত সংশ্লিষ্ট তথ্য ও কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তির আদেশ দিতে পারিবে।

বিচার পদ্ধতি

১৬। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার কেবলমাত্র ধারা ২৩ এর অধীন গঠিত এসিড অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারযোগ্য হইবে।

(২) ট্রাইব্যুনালে কোন মামলার শুনানী শুরু হইলে উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি কর্মদিবসে একটানা চলিবে।

(৩) ট্রাইব্যুনাল বিচারের জন্য মামলার নথি প্রাপ্তির তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে বিচারকার্য সমাপ্ত করিবে।

(৪) কোন মামলার বিচারকার্য শেষ না করিয়া যদি কোন ট্রাইব্যুনালের বিচারক বদলী হইয়া যান, তাহা হইলে তিনি বিচারকার্যের যেই পর্যায়ে মামলাটি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই পর্যায় হইতে তাহার স্থলাভিষিক্ত বিচারক বিচার করিবেন এবং তাহার পূর্ববর্তী বিচারক যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে যদি বিচারক কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনরায় গ্রহণ করা অপরিহার্য বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে এমন যে কোন সাক্ষীকে তলব করিয়া পুনরায় তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৫) ধারা ৪, ৫ ও ৬ এর অধীন কোন অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে, কোন আবেদনের প্রেক্ষিতে, ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করিলে অপরাধের শিকার কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন সাক্ষীর জবানবন্দী রুদ্ধদ্বার কক্ষে গ্রহণ করিতে পারিবে।

অভিযুক্ত শিশুর বিচার পদ্ধতি

১৭। কোন শিশু এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে তাহার ক্ষেত্রে Children Act, 1974 (Act XXXIX of 1974) এর বিধানাবলী যতদূর সম্ভব অনুসরণ করিতে হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার

১৮। (১) যদি ট্রাইব্যুনালের এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে,-

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার গ্রেফতার বা তাহাকে বিচারের জন্য সোপর্দকরণ এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছে বা আত্মগোপণ করিয়াছে; এবং

(খ) তাহার আশু গ্রেফতারের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল অন্ততঃ দুইটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত সময়, যাহা পনের দিনের বেশী হইবে না, এর মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির হইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল তাহার অনুপস্থিতিতে বিচার সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(২) যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি ট্রাইব্যুনালে হাজির হইবার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার পর বা তাহাকে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক জামিনে মুক্তি দেওয়ার পর পলাতক হন, তাহা হইলে তাহার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না, এবং সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তাহার বিচার সম্পন্ন করিতে পারিবে।

ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যে কোন স্থানে জবানবন্দি গ্রহণের ক্ষমতা

১৯। (১) এই আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধের তদন্তকারী কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা তদন্তকারী অন্য কোন ব্যক্তি কিংবা অকুস্থলে কোন আসামীকে ধৃত করার সময় কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি মনে করেন যে, ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল বা ঘটনাটি নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন এমন কোন ব্যক্তির জবানবন্দি অপরাধের ত্বড়িৎ বিচারের স্বার্থে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অবিলম্বে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিবার জন্য লিখিতভাবে বা অন্য কোনভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে বা অন্য কোন যথাযথ স্থানে উক্ত ব্যক্তির জবানবন্দি গ্রহণ করিবেন এবং উক্তরূপে গৃহীত জবানবন্দি তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত সামিল করিয়া ট্রাইব্যুনালে দাখিল করিবার নিমিত্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা বা ব্যক্তির নিকট সরাসরি প্রেরণ করিবেন।

(৩) যদি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধের জন্য অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির বিচার কোন ট্রাইব্যুনালে শুরু হয় এবং দেখা যায় যে, উপ-ধারা (২) এর অধীন জবানবন্দি প্রদানকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নহে বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত জবানবন্দি মামলার সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শুধু উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না।

রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক, ইত্যাদির সাক্ষ্য

২০। সরকার কর্তৃক নিয়োজিত কোন চিকিৎসক, রাসায়নিক পরীক্ষক, সহকারী রাসায়নিক পরীক্ষক, রক্ত পরীক্ষক, হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ, আংগুলাংক বিশারদ অথবা আগ্নেয়াস্ত্র বিশারদকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে কোন বিষয়ে পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করিয়া প্রতিবেদন প্রদান করিবার পর বিচারকালে, তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ প্রয়োজন, কিন্তু তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বা তিনি সাক্ষ্য দিতে অক্ষম বা তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয় বা তাহাকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করিবার চেষ্টা এইরূপ বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধার ব্যাপার হইবে

Dhaka University Institutional Repository

যাহা পরিস্থিতি অনুসারে কাম্য হইবে না তাহা হইলে তাহার স্বাক্ষরযুক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট এই আইনের অধীন বিচারকালে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া ট্রাইব্যুনাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিবে না।

সাক্ষীর উপস্থিতি

২১। (১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারের জন্য সাক্ষীর সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সাক্ষীর সর্বশেষ বসবাসের ঠিকানা যে থানায় অবস্থিত, সেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত সাক্ষীকে উক্ত ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত করিবার দায়িত্ব উক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার থাকিবে।
(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও সাক্ষীর সমনের একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সাক্ষীকে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা পুলিশ সুপার বা, ক্ষেত্রমত, পুলিশ কমিশনারকে প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সমেত নিবন্ধিত ডাকযোগে প্রেরণ করা যাইবে।
(৩) এই ধারার অধীন কোন সমন বা ওয়ারেন্ট কার্যকর করিতে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃত গাফিলতি করিলে ট্রাইব্যুনাল উহাকে অদক্ষতা হিসাবে চিহ্নিত করিয়া সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ, ইত্যাদি

২২। (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।
(২) ট্রাইব্যুনাল একটি দায়রা আদালত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন যে-কোন অপরাধ বা তদনুসারে অন্য কোন অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।
(৩) ট্রাইব্যুনালে অভিযোগকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবেন।

এসিড অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল

২৩। (১) এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের জন্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে এবং এইরূপে গঠিত ট্রাইব্যুনাল এসিড অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল নামে অভিহিত হইবে।
(২) যেই ক্ষেত্রে একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় সেই ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে প্রত্যেক ট্রাইব্যুনালের স্থানীয় অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করিতে হইবে।
(৩) একজন বিচারক সমন্বয়ে ট্রাইব্যুনাল গঠিত হইবে এবং সরকার জেলা জজ বা দায়রা জজগণের মধ্য হইতে উক্ত ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিবে।
(৪) সরকার, প্রয়োজনবোধে, কোন জেলা জজ বা দায়রা জজকে তাহার দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিযুক্ত করিতে পারিবে।
(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জেলা জজ বা দায়রা জজ অর্থে অতিরিক্ত জেলা জজ বা, ক্ষেত্রমত অতিরিক্ত দায়রা জজও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি

২৪। (১) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্ন নহেন এমন কোন পুলিশ কের্মকর্তা বা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) যদি কোন ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত রিপোর্ট ব্যতিরেকে কোন অভিযোগের ভিত্তিতে সরাসরি অপরাধটি বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন রিপোর্টে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগ বা তত্সম্পর্কে কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ না থাকা সত্ত্বেও, ট্রাইব্যুনাল যথাযথ এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে করিলে, কারণ উল্লেখপূর্বক উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বা উহার কোন অংশ যে ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ারাধীন এলাকায় সংঘটিত হয় সেই ট্রাইব্যুনালে অপরাধটি বিচারার্থে গ্রহণের জন্য রিপোর্ট বা অভিযোগ পেশ করা যাইবে এবং উক্ত ট্রাইব্যুনাল অপরাধটির বিচার করিবে।

অন্য আইনের অধীন সংঘটিত কতিপয় অপরাধের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের এখ্তিয়ার

২৫। যদি এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত অন্য আইনের অধীন কোন অপরাধ এমনভাবে জড়িত থাকে যে, ন্যায়বিচারের স্বার্থে উভয় অপরাধের বিচার একই সংগে বা একই মামলায় করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উক্ত অন্য অপরাধটির বিচার এই আইনের অধীন অপরাধের সহিত এই আইনের বিধান অনুসরণে একই সংগে বা একই ট্রাইব্যুনালে করা যাইবে।

আপীল

২৬। ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ, রায় বা আরোপিত দণ্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত আদেশ, রায় বা দণ্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে, হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।

মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন

২৭। এই আইনের অধীনে কোন ট্রাইব্যুনাল, মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিলে সংশ্লিষ্ট মামলার নথিপত্র অবিলম্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৭৪ এর বিধান অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত বিভাগের অনুমোদন ব্যতীত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাইবে না।

নিরাপত্তামূলক হেফাজত

২৮। এই আইনের অধীন কোন অভিযোগের তদন্ত চলাকালে কিংবা অপরাধের বিচার চলাকালে যদি ট্রাইব্যুনাল মনে করে যে, কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তামূলক হেফাজতে রাখা প্রয়োজন, তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল উক্ত ব্যক্তিকে কারাগারের বাহিরে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত স্থানে সরকারী কর্তৃপক্ষের হেফাজতে বা ট্রাইব্যুনালের বিবেচনায় যথাযথ অন্য কোন ব্যক্তি বা সংস্থার হেফাজতে রাখিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

Dhaka University Institutional Repository

মেডিক্যাল পরীক্ষা

২৯। (১) এই আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের শিকার কোন ব্যক্তির মেডিক্যাল পরীক্ষা সরকারী হাসপাতালে কিংবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে স্বীকৃত কোন বেসরকারী হাসপাতালে বা বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের শিকার কোন ব্যক্তিকে চিকিত্সার জন্য উপস্থিত করা হইলে, উক্ত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাহার মেডিক্যাল পরীক্ষা অতি দ্রুত সম্পন্ন করিবে এবং উক্ত মেডিক্যাল পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি সার্টিফিকেট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন মেডিক্যাল পরীক্ষা কিংবা সার্টিফিকেট প্রদান না করা হইলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার জন্য তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, বা ক্ষেত্রমত, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ট্রাইব্যুনাল নির্দেশ দিতে পারিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৩০। সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

এসিড নিয়ন্ত্রন আইন ২০০২

এসিডের আমদানি, উৎপাদন, পরিবহন, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ক্ষয়কারী দাহ্য পদার্থ হিসেবে এসিডের অপব্যবহার রোধ এবং এসিড দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ২০০২ সালে প্রনীত আইনটিই 'এসিড নিয়ন্ত্রন আইন-২০০২' নামে পরিচিত।[২]

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০

বিবাহে যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ নিষিদ্ধ করার জন্য ১৯৮০ সালের ৩৫নং আইন হিসেবে যৌতুক নিরোধ আইন-১৯৮০ নামে প্রনয়ন করা হয়। আইনের শুরুতেই বলা হয়েছে, 'যেহেতু বিবাহে যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ নিষিদ্ধ করিবার জন্য বিধান করা সমীচীন'।[৩] যৌতুকে সজ্ঞায় এই আইনে বলা হয়েছে, 'বিবাহে কোন এক পক্ষের পিতা মাতা কর্তৃক বা অন্য যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপর পক্ষকে বা অপর কোন ব্যক্তিকে, বিবাহকালে বা বিবাহের পূর্বে বা পরে যে কোনকালে উক্ত পক্ষগণের বিবাহে পণ হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদান করিতে সম্মত যে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বুঝায়, তবে যে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রযোজ্য সে সকল ব্যক্তির দেনমোহর বা মোহর অন্তর্ভূক্ত করে না।'

[৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১

(১৯৬১ সনের ৮নং অধ্যাদেশ)

বিবাহ এবং পারিবারিক আইন কমিশনের কতিপয় সুপারিশ কার্যকর করার জন্য ১৯৬১ সালে ৮নং অধ্যাদেশ হিসেবে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ প্রনয়ন করা হয়। বিবাহ এবং পারিবারিক আইন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার নিমিত্তেই মূলত এ অধ্যাদেশ। ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবরের ঘোষণা দ্বারা রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এই অধ্যাদেশটি জারি করেন।[৪]

মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইন ১৯৭৪

১৯৭৪ সালে মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রীকরণ সম্পর্কিত আইন একীকরণ ও সংশোধন করার জন্য একটি আইন প্রনয়ন করা হয়। যা মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইন ১৯৭৪ আইন নামে পরিচিত। বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকদের উপর যেখানেই তারা থাকুক, সেখানেই এই আইন প্রযোজ্য হবে।[৫]

উপরোল্লিখিত আইনছাড়াও নারী নির্যাতন রোধে বিভিন্ন সময় আরও কিছু আইন প্রনয়ন করা হয়েছে। সেগুলো হলো- মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৩৯, বাল্যবিবাহন নিরোধ আইন, ১৯২৯, নীতিগর্হিত কার্যকলাপ আইন ১৯২৯, ইত্যাদি।

[৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

[৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ নারী নির্যাতন রোধে বিবিধ

২০০৮ সালের ৮ আগস্ট যৌন হয়রানি রোধে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৯ সালের ১৪ মে বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ যৌন হয়রানি প্রতিরোধে একটি নির্দেশনামূলক রায় প্রদান করেন। হাইকোর্ট বিভাগের পক্ষ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়। রায়ে সচেতনতা এবং জনমত সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছিলেন হাইকোর্ট বিভাগ।[৬]

২০১০ সালের ২৫ আগস্ট আইন কমিশন থেকে 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইনের খসড়া বিষয়ক প্রতিবেদন ও প্রস্তাবিত আইনের খসড়া' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। এ প্রতিবেদনটি এখনও (২০১৪ সাল) আইন কমিশনের ওয়েবসাইটে রয়েছে। খসড়া আইনটিও আইন কমিশনের ওয়েবসাইটে রয়েছে।[৭]

এ আইনের প্রয়োজনীয় ও প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে আইন কমিশন উল্লেখ করেছে, 'প্রচলিত আইনের অপ্রতুলতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে অনাকাঙ্খিত বিভিন্ন যৌন হয়রানিমূলক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশন নং ৫৯১৬/২০০৮-এর রায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কতগুলো দিকদির্দেশনা প্রদান করেন এবং যথাযথ আইন প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত এ দিকনির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ প্রদান করেন। এভাবে সর্বোচ্চ আদালত থেকেও পৃথক আইন প্রণয়ন বিষয়ে তাগিদ আসে।' আইন কমিশনের ওয়েবসাইটে[৮] পাওয়া 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন, ২০১০ (প্রস্তাবিত খসড়া)' নামের আইনটিতে মোট ২১টি ধারা রয়েছে। এছাড়া লঘু ও গুরুতর অপরাধ আলাদাভাবে চিহ্নিত করে একটি তফসিল সংযুক্ত রয়েছে। কিন্তু এ আইনটি এখনও (২০১৪ সাল) কার্যকর হয়নি।

---

৬ একরামুল হক শামীম, '*নারীর জন্য সহায়ক আইন-আদালত*', (ঢাকা: দৈনিক সমকাল পত্রিকায় প্রকাশিত উপসম্পাদকীয়তে প্রকাশিত নিবন্ধ, ৯ এপ্রিল ২০১৪)

৭ দ্র. বাংলাদেশ সরকারের আইন কমিশনের ওয়েবসাইট, http://www.lc.gov.bd/reports/99.pdf. Last visited on 15 August, 2015

৮ দ্র. বাংলাদেশ সরকারের আইন কমিশনের ওয়েবসাইট, http://www.lc.gov.bd/reports/97.pdf. Last visited on 15 August, 2015

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ নারী নির্যাতন রোধে প্রচলিত আইনের প্রায়োগিক দিক মূল্যায়ণ

নারীর প্রতি সহিংসতা রুখতে আইনের সঠিক বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। আমাদের প্রচলিত আইনি কাঠামোর মধ্যে সহিংসতাগুলোর প্রতিকারের ব্যবস্থা রয়েছে। অপরাধভেদে নানা মাত্রার দণ্ড আরোপের বিধি উপস্থিত এসব আইনে। এত কিছুর পরও নারীর প্রতি সহিংসতা কমছে না। ঘরে-বাইরে, নানাভাবে নারী নিগৃহীত ও নির্যাতিত হচ্ছে। অভিযোগ রয়েছে, আদালতের কার্যক্রমের ধরন অনেক সময় ভুক্তভোগী নারীর জন্য দ্বিতীয়বারের মতো ভুক্তভোগী হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরি করে। বিশেষ করে ধর্ষিত নারী বিচার চাইতে গেলে তাকে যে প্রক্রিয়ার মুখোমুখি হতে হয়, তা দ্বিতীয়বারের নিগ্রহ বললে ভুল বলা হবে না। ফলে বর্তমান বিচার কাঠামো নারীর প্রতি সহিংসতার বিচারকে কতটা সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারছে, সেটি বিবেচনায় নেওয়া জরুরি। আইনের বিধানে ক্যামেরা ট্রায়ালের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু বিচার কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সম্ভবত আইন করে সম্ভব হবে না।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০-এর ১৪ ধারার মাধ্যমে সংবাদমাধ্যমে নির্যাতিত নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশের ব্যাপারে বাধানিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ১৪(১) ধারায় রয়েছে, 'এই আইনে বর্ণিত অপরাধের শিকার হইয়াছেন এইরূপ নারী বা শিশুর ব্যাপারে সংঘটিত অপরাধ বা তৎসম্পর্কিত কার্যধারার সংবাদ বা তথ্য বা নাম-ঠিকানা বা অন্যবিধ তথ্য কোনো সংবাদপত্রে বা অন্য কোনো সংবাদমাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশ বা পরিবেশন করা যাইবে যাহাতে উক্ত নারী বা শিশুর পরিচয় প্রকাশ না পায়।' এ আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে সংবাদমাধ্যমে নির্যাতিত নারী ও শিশুর পরিচয় প্রকাশ করলে শাস্তির বিধানও রয়েছে। ১৪(২) ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'উপধারা (১)-এর বিধান লঙ্ঘন করা হইলে উক্ত লঙ্ঘনের জন্য দায়ী ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে বা অনূর্ধ্ব এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।'

সত্যি কথা হলো, আইনের এ বিধানের প্রয়োগ কখনও হতে দেখা যায়নি। এর ফলে নির্যাতিতার নামসহ অন্যান্য বিস্তারিত পরিচয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ আদালতকেও সক্রিয় হতে দেখা যায়নি।

আইনের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কীভাবে তা প্রভাব রাখছে, তা নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক চলছে। কেউ কেউ বলে থাকেন, সমাজের সচেতনতা ছাড়া শুধু আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নারী নির্যাতন, সহিংসতা বন্ধ করা যাবে না। ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করতে আইন কমিশন গবেষণা চালিয়েছিল। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশে অবস্থিত কয়েকটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন ও নিষ্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয় এবং ওই ট্রাইব্যুনালে কর্মরত বিচারক, বিচারপ্রার্থী জনগণ এবং বিজ্ঞ কৌঁসুলিদের অভিমত গ্রহণ করা হয়। ২০১০ সালের ২৫ মার্চ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে আইন কমিশন এ গবেষণার ফল তুলে ধরে। এতে উল্লেখ করা হয়, 'মাঠ জরিপে দেখা যায় যে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে অনেক মামলা বিচারাধীন। প্রতি ১০০টি মামলার মধ্যে গড়ে ১০টি মামলায় সাজা হচ্ছে। বাকি ৯০ ভাগ মামলাই প্রমাণিত না হওয়ায় আসামিরা খালাস পাচ্ছে।' আইন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের গবেষণার ফল শংকা জাগায়। আইনের প্রয়োগ অর্থবহ করে তুলতে বিচার বিভাগ, আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকেই ভূমিকা রাখতে হবে। পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।[৯]

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) কর্তৃক ২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রকাশিত 'ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন (ভিএডব্লিউ) সার্ভে ২০১১' শীর্ষক সমন্বিত এই জরিপের সুপারিশে, নারী নির্যাতনকে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে উল্লেখ করে তা প্রতিরোধে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো এবং সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। নারী নির্যাতনের পক্ষে প্রচলিত বিভিন্ন নীতি-

[৯] একরামুল হক শামীম, '*নারীর জন্য সহায়ক আইন-আদালত*', প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

আচরণ পরিবর্তন ও নারী নির্যাতন আর সহ্য না করার প্রচার বাড়াতে গণমাধ্যমকেও এগিয়ে আসতে বলা হয়েছে। নারীর প্রতি সব ধরনের নির্যাতনকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা এবং নির্যাতিত নারীকে আইনি সুরক্ষা দেওয়ার সুপারিশও প্রতিবেদনে করা হয়েছে।[১০]

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের কার্যকারিতা এবং বর্তমান অবস্থা

নারীর প্রতি সহিংসতা কোনভাবেই থেমে নেই। সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে নারীর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে এত এত প্রচার-প্রচারণা এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও ধর্ষণ-নির্যাতনের হাত থেকে তাদের রক্ষা করা যাচ্ছে না। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে অনির্দিষ্টকাল বিচার চলছে দেশের আদালতগুলোয়। নারী নির্যাতনের মামলাগুলো ১৮০ দিনের মধ্যে সুরাহা করার আইনি বিধান রয়েছে। অথচ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেলের তত্ত্বাবধানে থাকা নারী ও শিশু পাচারসংক্রান্ত মামলাগুলোও নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি হয় না।

ঢাকায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে পাঁচটি। অনেক মামলা আসমূলে নিষ্পত্তি হয়, যে সব মামলায় বাদী-বিবাদীর আপস হয়নি, সেগুলোর সামান্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে। দিনের পর দিন মামলাগুলো চলছে।[১১]

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত-২০০৩)-এর ২০(৩) ধারায় বলা হয়েছে, 'বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনালে মামলা প্রাপ্তির তারিখ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে বিচারকাজ শেষ করতে হবে।'[১২]

কিন্তু আইন মেনে কাজ করছেন না নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক ও সংশ্লিষ্ট আইনজীবীরা। এতে করে আসামিরা যেমন সীমাহীন কষ্টে ভুগছেন, তেমনি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বাদীপক্ষও। দীর্ঘদিনেও মামলার সুরাহা না হওয়ায় দুই পক্ষকেই আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতে হচ্ছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে নির্ধারিত ১৮০ দিন সময়ের মধ্যে মামলা শেষ না হলে কী করতে হবে, বিধানে তা বলা নেই। তবে বিধানে আছে, কোনো মামলা নির্ধারিত সময়ে শেষ না হলে সেটা ফৌজদারি কার্যবিধিতে বিচার হবে। কিন্তু ফৌজদারি মামলায় কোনো সময়সীমা দেওয়া নেই। এমনকি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর ৪ উপধারায় বলা হয়েছে ১৮০ দিনের মধ্যে মামলার কাজ সমাপ্ত না হইলে ট্রাইব্যুনাল মামলার আসামিকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে।[১৩] নিষ্পত্তি না হওয়া আইনের এ ফাঁকে পড়েই বাদী ও বিবাদী পক্ষ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্ত প্রয়োজন।

---

১০ '*ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন (ভিএডব্লিউ) সার্ভে ২০১১*' শীর্ষক সমন্বিত জরিপ (ঢাকা: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), প্রকাশ, ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৩)

১১ জিবলুর রহমান, *আইনের বিধানে নারী নির্যাতন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা* (ঢাকা: দৈনিক আমারদেশ অনলাইন, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪)

১২ মো. আবদুল হামিদ, *নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিকার বিষয়ক আইন*, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, ধারা: ২০, উপধারা: ৩ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল- জুন, ২০১০), পৃ. ৪০

১৩ প্রাগুক্ত, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০, ধারা:২০, উপধারা: ৪

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ প্রচলিত আইন বাস্তবায়নের বাস্তবতা এবং কিছু কেস স্টাডি

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নিহার বানু ধর্ষণ ও হত্যা, সালেহা হত্যা, শিশু সোনিয়া ধর্ষণ, চাঁপা হত্যা, ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা, সীমা ধর্ষণ ও হত্যা, রিমা হত্যা, ফতোয়া দিয়ে নূরজাহান হত্যা, হেনা ধর্ষণ ও ফতোয়া দিয়ে হত্যাসহ শত শত নারী নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এসব নারী নির্যাতনের সুবিচারের জন্য দীর্ঘ চার দশক ধরে নারী আন্দোলনের কর্মী, মানবাধিকার কর্মী, আইনজ্ঞরা লড়াই করছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আংশিক সুবিচার পাওয়া গেলেও পুরোপুরি প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না এবং বন্ধ হচ্ছে না নারী নির্যাতন।

নারী নির্যাতন প্রতিকারে ডাক্তার, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু প্রায়শই এর ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন সময়ে নারী নির্যাতনের মামলাগুলোকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সে সব ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নির্যাতিত নারীর ময়নাতদন্ত রিপোর্ট প্রদানকারী ডাক্তার, সুরতহাল রিপোর্ট প্রদানকারী পুলিশ অফিসার প্রথমেই এমন একটি রিপোর্ট দেন, যা মামলাকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তদন্ত ও অভিযোগপত্র দাখিলের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, দোষী ব্যক্তি যাতে আইনের আওতায় না আসে তার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। আমাদের বিচার ব্যবস্থাও বহুলাংশেই এ রিপোর্টের ওপর নির্ভরশীল। আমরা যদি কিছু কেস স্টাডি নিয়ে পর্যালোচনা করি, তাহলে এই চিত্র আমাদের সামনে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ইয়াসমিন ধর্ষণ ও হত্যা মামলা

২৩ আগস্ট, ১৯৯৫। ইয়াসমিন ঢাকা থেকে বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশে দিনাজপুর রওনা হয়। ২৪ আগস্ট ভোরে দশ মাইল নামক স্থানে গাড়ি থেকে নামে। পুলিশের একটি ভ্যান ইয়াসমিনকে নিয়ে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে দিনাজপুরের দিকে রওনা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে তারা ইয়াসমিনকে প্রথমে ধর্ষণ এবং পরে হত্যা করে তার মৃতদেহ একটি স্কুলের সামনে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য তারা যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা নিম্নরূপ-

পুলিশের এসআই স্বপন কুমার চক্রবর্তী ঘটনাস্থলে আসেন এবং সেখানে কয়েক হাজার লোকের সামনে ইয়াসমিনের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করেন। সুরতহাল রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, 'একটি অজ্ঞাতনামা তরুণী যার বয়স আনুমানিক ১৩/১৪, দশমাইল দিনাজপুর হাইওয়ে সড়কে সম্ভবত গাড়িচাপা পড়ে তার মৃত্যু ঘটেছে।' পরদিন ২৪ আগস্ট দুপুরে ইয়াসমিনের লাশ দিনাজপুরে জেনারেল হাসপাতালে আনা হয় এবং কর্তব্যরত ডা. মো. মহসিন লাশের ময়নাতদন্ত করেন। ময়নাতদন্তকারী সত্য গোপন করে রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, 'ইয়াসমিন গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ায় নিহত হয়েছে।' এরপর আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের মাধ্যমে কোনো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে ইয়াসমিনকে দাফন করা হয়।

পরবর্তী সময়ে জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। জনগণ সংগঠিত হতে থাকে। ক্রমে গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। অগ্নিকাণ্ডের মতো জ্বলে ওঠে পুরো দিনাজপুরবাসী। বিক্ষুব্ধ জনতা কোতোয়ালি থানাসহ চারটি পুলিশ ফাঁড়ি জ্বালিয়ে দেয়। রাতের অন্ধকারে দিনাজপুর থেকে পালিয়ে যায় ডিসি, এসপি।

২৭ আগস্ট দিনাজপুরে বিদ্রোহ দমন করতে পুলিশ গুলি চালালে সাতজন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। ২৯ আগস্ট একজন ম্যাজিস্ট্রেট সেলিনা শাহাদাত ও মানবাধিকার কর্মীদের সামনে ইয়াসমিনের লাশ কবর থেকে তোলা হয়। ৩০ আগস্ট রংপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল বারী, প্রভাষক আমিরুল হোসেন চৌধুরী ও দিনাজপুর জেনারেল হাসপাতালের ডা. কামরুন্নেছার সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ড দ্বিতীয়বারের মতো ইয়াসমিনের পুনর্ময়নাতদন্ত করেন। তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়- 'In our opinion death was due to asphyxia followed by internal Haemorage as a result of thresting followed by head injury and she was raped which was antimortam and homicidal in nature.'[১৪]

[১৪] আজকের কাগজ ২৬.২.৯৭, ভোরের কাগজ ৩০.১.৯৭, ডেইলি স্টার ৩০.১.৯৭, বিচিত্রা ৩০.৮.৯৬

Dhaka University Institutional Repository

হত্যা, ফতোয়ার অপব্যবহার ও ধর্ষণের শিকার হেনা

৩০.১.২০১১ তারিখ রাতে হেনা ঘরের বাইরে বাথরুমে গেলে তার দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাই মাহাবুব (৪০) মুখে কাপড় গুঁজে পাশের পরিত্যক্ত একটি ঘরে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। হেনার চিৎকারে প্রথমে মাহাবুবের স্ত্রী ও ভাই বেরিয়ে আসে কিন্তু তারা মেয়েটিকে উদ্ধার না করে মারধর করে। চিৎকার, চেঁচামেচি শুনে এক পর্যায়ে হেনার বাবা-মা, ভাই-বোনসহ বাড়ির লোকজন এসে তাকে উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে ৩১.১.২০১১ তারিখে একটি সালিশ বৈঠক বসে। সালিশ বৈঠকে নেতৃত্ব দেয় পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি। তারা মাদ্রাসার শিক্ষক ও মসজিদের ইমাম, যারা উক্ত সালিশ বৈঠকে উপস্থিত ছিল, তাদের সাথে পরামর্শ করে ধর্ষণকারীকে ২০০ দোররা ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং ধর্ষণের শিকার হেনাকে ১০০ দোররা মারার ফতোয়া দেয়। সালিশকারকরা তাৎক্ষণিকভাবে ধর্ষকের শাস্তি অর্ধেক কমিয়ে দেয়। হেনাকে ৭০-৮০টি দোররা মারার পর সে অচেতন হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। হেনার আত্মীয়রা তাকে উদ্ধার করে নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৩১.১.২০১১ তারিখ রাতে হেনা মারা যায়। ০২.০২.২০১১ তারিখে প্রথম হেনার বিষয়টি পত্রিকায় আসে।

অসংলগ্ন সুরতহাল রিপোর্ট ও ময়নাতদন্ত

প্রথম ময়নাতদন্তে হেনার শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই বলা হয়েছে এবং সুরতহাল রিপোর্টের আলোকে রিপোর্টটি তৈরি করা হয় বলে ধর্ষণের কোনো পরীক্ষা করা হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়।

সুরতহাল রিপোর্টের এক অংশে বলা হয়েছে যে, হেনার শরীরে আঘাতের চিহ্ন ছিল না আবার আরেক অংশে বলা হয় যে, চোখের নিচে সামান্য আঘাতের চিহ্ন ছিল। তৃতীয় প্যারায় বলা হয় যে, ধর্ষকের সাথে হেনার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। যা সুরতহাল রিপোর্টে উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

খবরটি পত্রিকায় প্রকাশের পর হাইকোর্টের নির্দেশে পুনরায় ময়নাতদন্ত করা হয়। পুনঃময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে হেনার শরীরে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। উচ্চ আদালতের নির্দেশে প্রথম ময়নাতদন্তকারী চার ডাক্তারের বিরুদ্ধে পৃথক ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। মামলাগুলো এখনো চলমান রয়েছে।[১৫]

ইয়াসমিন ও হেনার ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী নির্যাতনের মামলাগুলো ডাক্তারি রিপোর্ট এবং সুরতহাল রিপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও এই রিপোর্টকে প্রায়শই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে পরিবর্তন করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়। ফলে যে রিপোর্টগুলো নারী নির্যাতনের মামলাগুলোতে একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে, তা না করে আসামিপক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাতে বিচার প্রক্রিয়া হয় ব্যাহত। পাশাপাশি এটাও দেখা যায়, ব্যাপক গণরোষের ফলে অথবা উচ্চ আদালতের নির্দেশে যখন পুনরায় ময়নাতদন্ত করা হয় বা সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করা হয়, তখন সঠিক প্রতিবেদন পাওয়া যায়, তার প্রেক্ষিতে দোষীরাও শাস্তি পায়। এর উদাহরণ ইয়াসমিন হত্যা মামলা।

সাম্প্রতিক বিশ্বে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিকারের পাশাপাশি প্রতিরোধের বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। প্রচলিত আইন, প্রশাসনের নারীর প্রতি বিরূপ দৃষ্টিভঙ্গি, নারীকে অনেক বেশি 'সংক্ষুব্ধ' করছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর কাজের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি কেস স্টাডি রেফারেন্স হিসেবে তুলে ধরা যায়। বর্তমানে প্রচলিত ডাক্তারি রিপোর্টের ফরম্যাট, গতানুগতিক শব্দ ব্যবহার এবং অদক্ষ ব্যক্তি দ্বারা মামলার তদন্ত পরিচালনা এবং সার্বিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তের পক্ষে ন্যায়বিচার পাওয়া যে কতখানি কষ্টসাধ্য সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

[১৫] প্রথম আলো ২.২.১১, যুগান্তর ১০.২.১১, ডেইলি স্টার ১০.২.১১

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি-১

মারিয়া (ছদ্মনাম), বয়স ২০ বছর, মামলার ধরন- ধর্ষণ, সূত্র: উত্তরা থানার মামলা নং- ৬৪/৯০৭, নারী ও শিশু মামলা নং- ৩৪৭/০৭। মারিয়া উত্তরার এক বাসায় কাজ করতো। একদিন রাতে কাজ শেষে বাসায় ফেরার পথে বৃষ্টি পড়তে শুরু করলে সে একটি দোকানে আশ্রয় নেয়। দোকানদার তাকে আশ্রয় দেয় এবং ভালো কাজ দেওয়ার কথা বলে বাড়ি নিয়ে যায়। কিন্তু ঐ রাতে ভাণ্ডারী নামক সেই দোকানদার জোরপূর্বক মারিয়াকে ধর্ষণ করে। মারিয়া উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'জোরপূর্বক ধর্ষণ'-এর মামলা দায়ের করে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) মারিয়াকে উক্ত মামলায় সহায়তা করে।

অথচ ডাক্তারি রিপোর্টে ধর্ষণের বিষয়টি স্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ নেই। শুধু Haemorage উল্লেখ করা হয়।

কেস স্টাডি-২

রত্না (ছদ্মনাম), বয়স ১৯ বছর এবং মনি (ছদ্মনাম), বয়স ১৬ বছর, মামলার ধরন- জোরপূর্বক যৌন কাজে বাধ্য করা, মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং-৭৯, তারিখ ২৫.২.২০০৮, নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা নং- ২৫৮/২০০৮। রত্না ও মনিকে কাজ দেয়ার কথা বলে এক মহিলা আসামির বাসায় পাঠায়। সেখানে তাদের জোরপূর্বক আটকে রেখে দেহ ব্যবসায় বাধ্য করা হয়। তাদের একজনের বাবা ফোনে মেয়ের সাথে কথা বলে আসামির বাসা শনাক্ত করেন এবং এলাকার লোকজনের সহায়তায় তাদের উদ্ধার করেন। পরবর্তী সময়ে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) তাদের আইনগত সহায়তা প্রদান করে।

রত্নার ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টে Forceful Sexual Intercourse-এর বিষয়টি নাকচ করে habituated বলা হয়েছে। মনির ক্ষেত্রে Forceful Sexual Intercourse-এর বিষয়টি উল্লেখ আছে।

কেস স্টাডি-৩

কনা (ছদ্মনাম), বয়স ২৪ বছর, মামলার ধরন- ধর্ষণ, গুলশান থানার মামলা নং- ৭৭(৬)১০। গুলশান থানাধীন সরকারি কোয়ার্টারে সপরিবারে বসবাস করেন সরকারের উচ্চপদস্থ একজন কর্মকর্তা। তার স্ত্রী অসুস্থ হওয়ায় কনা, ময়না ও হাসি খাতুনকে গৃহপরিচারিকার কাজ এবং স্ত্রীকে সেবা-যত্ন করার জন্য আয়া হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। আসামি বিভিন্ন সময়ে কনা ও ময়নাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। হাসিকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা আসামির বাড়ি থেকে বের হতে পারতো না। কনা এসব ঘটনা ফোনে তার বোনকে জানালে তার বোন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এ যোগাযোগ করেন। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ২৩.০৬.২০১০ তারিখ গুলশান থানার সহায়তায় তাদের উদ্ধার করে। পরদিন অর্থাৎ ২৪.০৬.২০১০ তারিখ কনা গুলশান থানায় মামলা দায়ের করেন। কনা ও ময়নার ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্টে 'জোরপূর্বক ধর্ষণের কোনো আলামত নাই' উল্লেখ করা হয় এবং আরো উল্লেখ করা হয় যে, 'তারা যৌন কাজে অভ্যস্ত।'

এই কেস স্টাডি থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, কনা ও ময়না বিবাহিত হওয়ায় রিপোর্টে যথারীতি উল্লেখ থাকে যে, তারা 'যৌন কাজে অভ্যস্ত'। কিন্তু এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, বিবাহিত নারী ধর্ষণের শিকার হতে পারে না। যেহেতু তারা ঐ বাসায় বন্দি অবস্থায় ছিল সেহেতু সর্বশেষ কবে তারা যৌন কাজে বাধ্য হয়েছে- এটা উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল। তাহলেই বিষয়টি স্পষ্ট হতো যে তারা আটকাবস্থায় ধর্ষণের শিকার হয়েছে কিনা।

আরেকটি বিষয় খুবই উল্লেখযোগ্য। সেটা হলো- সাধারণত দেখা যায়, মানবাধিকার সংস্থাগুলো থেকে যখন ভিকটিমসহ মামলা করতে যাওয়া হয় তখন থানা/পুলিশের পক্ষ থেকে মামলা নেয়া হয়; কিন্তু ভিকটিম একা গেলে মামলা নেয়া হয় না। উদাহরণ হিসেবে আইন ও সালিস কেন্দ্র (আসক) কয়েকটি মামলার সূত্র উল্লেখ করেছে-

১. সাভার মডেল থানার মামলা নং: ৪৬(৬)১২, তারিখ ১৮.৬.২০১২

বদলি: নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত-১, না. শি. ৭১০/১২

২. সাভার মডেল থানার মামলা নং: ১৩(৭)১১, তারিখ: ৫.৭.২০১১

Dhaka University Institutional Repository

বদলি: না. শি. নি. দমন আদালত-১, ঢাকা, না. শি. ৫/১২
৩. খিলগাঁও থানার মামলা নং: ১৩, তারিখ ১৪.১১.২০১১
বদলি: না. শি. নি. দমন আদালত-৪, ঢাকা, না. শি. ১৬৬/১২।
২০১২ সালে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) ৫৭টি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে আইনি সহায়তা প্রদান করেছে। যার মধ্যে ৩৬টি মামলাতেই ভিকটিম পক্ষ যখন নিজেরা মামলা করতে গিয়েছে থানা কর্তৃপক্ষ কোনো না কোনো অজুহাতে প্রাথমিক অবস্থায় মামলাগুলো গ্রহণ করেনি। কিন্তু পরে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর সহযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ মামলা দায়েরে সমর্থ হয়েছে। যদি শতকরা হিসাব করা যায় তবে দেখা যায়, ৬৩% মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত নারী সরাসরি থানায় গেলে মামলা গ্রহণ করা হয় না, যা খুবই উদ্বেগজনক একটি পরিস্থিতির ইঙ্গিত বহন করে। যা থেকে খুব সহজেই বোঝা যায়, অসহায় নির্যাতিত নারীর জন্য বিচার চাওয়া এবং পাওয়া কতটা কঠিন।[১৬]

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অসহযোগিতার কয়েকটি চিত্র

ফেব্রুয়ারি ২০১৩-তে একজন নির্যাতিত নারী মেডিকেল রিপোর্টসহ মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করতে গিয়েছিলেন কিন্তু থানা মামলা নেয়নি পুলিশ। এক্ষেত্রে আইন ও সালিশি কেন্দ্র (আসক) তাকে কোর্টে মামলা দায়ের করতে সহযোগিতা করছে। গৃহকর্মী নির্যাতনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়, মামলার বাদী পাওয়া যায়নি অজুহাতে মামলা নেওয়া হয় না; কিন্তু তথ্য পাওয়ার সাথে সাথেই আইন অনুযায়ী থানা মামলা নিতে পারে। এক্ষেত্রে পুলিশই বাদী হয়ে মামলা গ্রহণ করতে পারে। নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিকভাবে মামলা নেওয়ার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এ নির্দেশনার প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে না।

ধর্ষণে মামলা না নিয়ে অবহেলা, লৌহজং থানার ওসিকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ

লৌহজং থানার ওসি এবং আওয়ামী লীগ নেতা মনির হোসেনকে তলব করে হাইকোর্ট। ২০১২ সালে মুন্সীগঞ্জে ধর্ষণের ঘটনায় মামলা না হওয়ায় বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও ফরিদ আহমেদের বেঞ্চ তখন ওই আদেশ দেন।[১৭]
আদালত ওসিকে ঘটনার শিকার কিশোরীকে নিয়ে ওইদিন আদালতে নিয়ে আসতে নির্দেশ দেয়। দুই সপ্তাহের মধ্যে মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসক, জেলা পুলিশ সুপার, লৌহজং থানা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ওসিকে কারণ দর্শানের নোটিশ দেওয়া হয়।

ধর্ষণের ঘটনায় মামলা গ্রহণে থানা কর্মকর্তাদের অবহেলা

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার মাহমুদপুর ইউনিয়নের আগুয়ান্দী গ্রামে এক কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনায় বিলম্বে মামলা গ্রহণ করায় আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং উপ-পরিদর্শকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। এর আগে ২০১২ সালের ২৪ জানুয়ারি 'আড়াইহাজারে কিশোরী ধর্ষণ, ধর্ষিতার পরিবারকে হুমকি' শিরোনামে প্রথম আলো পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে হাইকোর্ট এ বিষয়ে সুয়োমোটো রুল জারি করেন।
প্রথম আলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি থেকে জানা যায়- নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার আগুয়ান্দী গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে শাহজাহানের নেতৃত্বে ৪-৫ জন যুবক ১৪ বছরের এক কিশোরীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে

---

[১৬] নীনা গোস্বামী, *নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ডাক্তার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সুশীল সমাজের ভূমিকা*- শীর্ষক প্রতিবেদন, (ঢাকা: আইন ও সালিসি কেন্দ্র বুলেটিন, প্রকাশ, মার্চ ২০১৩)

[১৭] জিএনএন প্রতিবেদন, ঢাকা : ০২ আগস্ট ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

পুকুর পাড়ে ধর্ষণ করে। পরে আশপাশের লোকজন ঐ কিশোরীকে উদ্ধার করে মুমূর্ষু অবস্থায় নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। কিন্তু ঘটনার চারদিন পরও কোনো মামলা গ্রহণ করেনি পুলিশ।

২৪ জানুয়ারি সংবাদটি হাইকোর্টের নজরে আনা হলে বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত একটি দ্বৈত বেঞ্চ সুয়োমোটো রুলের সাথে আড়াইহাজার থানার ওসি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ২৫ জানুয়ারি আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেন।[১৮]

বিচারের দীর্ঘসূত্রিতায় কমে না এসিড সন্ত্রাস

এসিড সন্ত্রাস দমনে কঠোর আইন থাকলেও নেই শতভাগ কার্যকারিতা। এ সংক্রান্ত দায়ের করা মামলাগুলো বিচারের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন এসিড সন্ত্রাসের শিকার বিচারপ্রার্থীরা। কমছে না এসিড সন্ত্রাস।

জানা যায়, এসিড সন্ত্রাসের শিকারদের শতকরা ৬৯ শতাংশ নারী ও মেয়ে শিশু। মামলা হলে বিচারের দীসূত্রিতার কারণে খুব সহজেই ফল পায় না ভুক্তভোগিরা। এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন মানবাধিকার, নারী অধিকার আন্দোলনের কর্মী, সাংবাদিক ও আইনজীবীরা। তাদের মতে, এসিড সন্ত্রাস দমনে সে আইন আছে, তা যথেষ্ট কঠোর। কিন্তু সময়মতো বিচার না হওয়ায় অপরাধীরা শাস্তি পাচ্ছে না, ফলে এ সন্ত্রাস কমছে না।

এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের (এএসএফ) তথ্য অনুযায়ী, জমিজমা সংক্রান্ত আক্রোশ মেটাতে বর্তমানে এসিডের ব্যবহার বেশি হচ্ছে। তাদের এক জরিপে ১৯৯৯ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত এসিডদগ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৯ শতাংশ শুধু জমিজমা-সংক্রান্ত কারণে দগ্ধ হয়েছেন। ১৭ শতাংশ দগ্ধ হয়েছেন প্রেম, বিয়ে বা যৌনসম্পর্কে অসম্মতি জানানোর জন্য। ১২ শতাংশ এসিড সন্ত্রাসের কারণ জানা যায়নি। যৌতুক, বৈবাহিক সম্পর্কে ঝামেলাসহ অন্যান্য কারণেও এসিড সন্ত্রাস চলছে।[১৯]

ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, জমিজমা, টাকা-পয়সা সংক্রান্ত কারণেই সবচেয়ে বেশি এসিড সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী, ১৯৯৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত তিন হাজার ১৮৪টি এসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে তিন হাজার ৫১২ জন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এদের মধ্যে দুই হাজার ৪০৫ জন নারী ও মেয়ে শিশু এবং এক হাজার ১০১ জন পুরুষ ও ছেলে শিশু। অর্থাৎ দগ্ধদের প্রায় ৬৯ শতাংশই নারী ও মেয়ে শিশু। সংগঠনটির মূল্যায়ন জরিপও বলছে, এসিডদগ্ধদের ৭০ শতাংশই নারী ও মেয়ে শিশু। চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত ৩৬টি ঘটনায় ৪৬ জন দগ্ধ হয়েছেন।

এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়র সূত্র থেকে জানা যায়, এসিড সন্ত্রাসের ঘটনায় ২০০২-২০১৪ সালে মোট এক হাজার ৮৯১টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে চার হাজার ৯২৬ জন আসামির মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে মাত্র ৫৯০ জন। আর সাজা হয়েছে মাত্র ২৯৩ জনের। পুলিশ এ যাবৎ এক হাজার ৮২৮টি মামলায় অভিযোগপত্র এবং ৭৫৩ মামলার চূড়ান্ত প্রতিবেদন দিয়েছে।

অন্যদিকে, ৫১০টি মামলায় খালাস পেয়েছে এক হাজার ৬৮৭ জন। সাজা হয়েছে, এমন মামলার সংখ্যা ১৭২টি। এসব মামলার আসামিদের ৮৮ শতাংশই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকে। মাত্র ১২ শতাংশ গ্রেপ্তার হয়। এসিড সন্ত্রাসের ঘটনায় ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১২ বছরে মাত্র ১৪ জনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। কিন্তু কার্যকর হয়নি একটিও।

গত এক বছরে (২০১৪) এসিড সন্ত্রাসের অভিযোগে বিচারাধীন ৪৪টি মামলার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র দুটি। তবে সাজা হয়নি কোনও আসামির। আর এই বিচারহীনতাই এসিড সন্ত্রাসীদের বেপরোয়া করে তোলে।

---

[১৮] জনকণ্ঠ, শুক্রবার, ১ জুন ২০১২

[১৯] এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশনের ওয়েব সাইট, http://www.acidsurvivors.org/. Visited on 9 June, 2015

Dhaka University Institutional Repository

অপরাধীরদের শাস্তি হলে অন্যরা ভয় পেতো। আর এসব মামলায় দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আসামিরা জামিন পেয়ে গেলে তারা উল্টো ভিকটিমের পরিবারকে হুমকি দেয়। ফলে এক সময় তারা আপোসে যেতে বাধ্য হয়।

একজন এসিড ভিকটিম বলেন, এসিড সন্ত্রাসের শিকার ব্যক্তিদের ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা সমাজের প্রভাবশালীরা। এছাড়া পুলিশের সঙ্গে অপরাধীদের যোগসাজশ থাকায় পুলিশ অভিযুক্ত অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে না। আবার আক্রান্ত ব্যক্তি যাদের সম্পর্কে অভিযোগ করেন, পুলিশ তাদের না ধরে অন্যদের ধরে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ভিকটিমকে ভয় দেখিয়ে মামলা করা থেকে বিরত রাখা হচ্ছে। যদিও এসিড হামলার মতো অপরাধের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড। তবে এ ধরনের সাজা কার্যকরের দৃষ্টান্ত বিরল।

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এক সেমিনারে বলেন, যে কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে পারলে সেই অপরাধ দমন করা সম্ভব। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হচ্ছে না। কেন এসিড সন্ত্রাস বাড়ছে? এর জবাবে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট গৌরাঙ্গ চন্দ্রকর বলেন, এসিডের অবাধ কেনা-বেচার জন্য এসিড সন্ত্রাসের মতো ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলছে।

কেন দিন দিন নারী ও মেয়ে শিশুরা বেশি এসিড সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে? এমন প্রশ্নের জবাবে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. ফারুক হোসেন বলেন, বখাটেদের প্রেম নিবেদন, যৌন আবেদনে অস্বীকৃতি জানানোয় এসিড সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে নারী ও শিশুরা। সরকারকে এ ব্যাপারে কী উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এসিড সন্ত্রাস দমন করতে হলে এই আইনের কিছু সংশোধন করা উচিত। এসিড সন্ত্রাস দমনের জন্য এ আইনটি দ্রুত বিচারের অধীনে আনা প্রয়োজন।

তিনি বলেন, এসিড সন্ত্রাস দমন আইন ২০০২ সালের করা একটি আইন। এ আইনে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড অথবা যাজ্জীবন সাজা। সাথে অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান। কিন্তু এসিড মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি না হওয়ায় অপরাধ বাড়ছে। তিনি আরও বলেন, দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠনের মাধ্যমে এ সংক্রান্ত বিচারগুলো করতে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

এসিড সংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি হয় না কেন, এমন প্রশ্নের জবাবে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও নারী মানবাধিকার কর্মী অ্যাডভোকেট ফাওজিয়া করিম ফিরোজ পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, বাংলাদেশের কোন আইনের মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি হয়? তিনি বলেন, 'আসলে বাংলাদেশের কোন আইনের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি হয় না।' তিনি আরও বলেন, এসিড মামলার সাক্ষীরা আদালতে আসতে ভয় পান। মামলার ভিকটিম এসিড সন্ত্রাসের শিকারের কারণে সামাজিকভাবে সংকোচ বোধ করে। অপরাধীরা সমাজের প্রভাবশালী হওয়ায় ভিকটিম ও সাক্ষীরা ভয় পায়। এমন বিভিন্ন কারণে দীর্ঘসূত্রিতার ফলে মামলাগুলোর বিচারিক কাজ বেশি দূর গড়ায় না।

মানবাধিকার সংগঠন চিলড্রেন চ্যারিটি বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল হালিম বলেন, দ্রুতবিচার ট্রাইব্যুনালে এসব মামলা নেওয়া হলে সমাজের এ ধরনের কর্মকাণ্ড অনেকাংশ কমবে। তিনি বলেন, এসিড অপরাধ দমন আইন অনুযায়ী ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে এ মামলা নিষ্পত্তি করার কথা থাকলেও তা গড়াচ্ছে বছরের পর বছর। সাক্ষীর অভাব, নিম্ন আদালতে বছরের পর বছর মামলা পড়ে থাকা, এসিড মামলার চেয়ে অন্য মামলা প্রাধান্য দেয়াসহ নানা কারণেই এসব মামলা নিষ্পত্তি হয় না।[২০]

[২০] আমিনুল ইসলাম মল্লিক, *বিচারের দীর্ঘসূত্রিতায় কমছে না এসিড সন্ত্রাস*- শীর্ষক প্রতিবেদন (ঢাকা: অনলাইন নিউজ পোর্টাল বাংলামেইল২৪ডটকম, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৫), http://www.banglamail24.com/news/2015/01/16/id/129523/. Visited on 9 June, 2015

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

- প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামের দৃষ্টিতে নারী
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নারী সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নারী নির্যাতন রোধে ইসলামী আইনের প্রায়োগিক দিক
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অনৈতিকতা রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য
- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সমাজ সংস্কার
- সপ্তম পরিচ্ছে : ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা

নারী ও পুরুষ অখণ্ড মানব সমাজের দু'টি অপরিহার্য অঙ্গ। পুরুষ মানব সমাজের একটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করলে আরেকটি অংশের প্রতিনিধিত্ব করে নারী। নারীকে উপেক্ষা করে মানবতার জন্য যে কর্মসূচী তৈরী হবে তা হবে অসম্পূর্ণ। আমরা এমন কোনো সমাজের কথা কল্পনাই করতে পারি না যা কেবল পুরুষ নিয়ে গঠিত, যেখানে নারীর প্রয়োজন অনুভূত হয় না। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি সমাজেই নারী ও পুরুষ সমানভাবে পরস্পরের মুখাপেক্ষী। তাই এর কোনোটাকে বাদ দিয়ে মানব সমাজ কোনক্রমেই পূর্ণত্ব অর্জন করতে পারে না। এ কারণেই নারী-পুরুষের সুষম উন্নয়ন সমাজ প্রগতির একটি অনিবার্য পূর্বশর্ত।

নারী সুদীর্ঘকাল ধরে নানাভাবে নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত হয়েছে এবং আজকের সভ্য সমাজেও হচ্ছে। ইসলাম একেবারে শুরু থেকেই সর্বতোভাবে নারী-নির্যাতনের বিপক্ষে সোচ্চার। তারপরও মুসলিম অধ্যুষিত আমাদের এ জনপদে নারীরা নিপীড়িত, নির্যাতিত ও অবহেলিত কেন তা রীতিমত বিস্ময়কর। সম্ভবত নারী নির্যাতন রোধে ইসলাম যে কর্মসূচী ও কর্মপন্থা দিয়েছে তা ভালোভাবে অনুধাবন এবং অনুসরণ না করাই এর সবচেয়ে বড় কারণ। এই আলোচনায় ইসলামী সমাজে নারীর অবস্থান নির্ধারণ করে নারী কীভাবে নির্যাতিত হয় এবং এর প্রতিকারে ইসলাম কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা তুলে ধরা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামের দৃষ্টিতে নারী

সমাজে নারীর অবস্থান যখন ছিল অমানবিক এবং অতি করুণ তখন থেকেই ইসলাম নারীর অধিকার ও মর্যাদা উন্নয়নের জন্য নজীরবিহীন পদক্ষেপ নিয়েছে। সে সকল পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল:

(ক) নারী সম্মানিত সৃষ্টি

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ অতীব সম্মানিত ও সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ইসলাম জন্মগতভাবে মানুষকে এ মর্যাদা দিয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

'নিশ্চই আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ঠ বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।'[১]

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর আবয়বে।'[২]

সূরা ছোয়াদের এক জায়গায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়াল বলেন, 'যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব। যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকে দেবো, তখন তোমরা তার সম্মুখে সেজদায় নত হয়ে যেও। অতঃপর সমস্ত ফেরেশতাই একযোগে সেজদায় নত হল। কিন্তু ইবলীস; সে অহংকার করল এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো। আল্লাহ বললেন হে ইবলীস, আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি, তার সম্মুখে সেজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? তুমি অহংকার করলে, না তুমি তার চেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন?'[৩]

এগুলো এবং এ ধরনের আরও বহু আয়াত সত্যিকারার্থে দুনিয়াকে মানুষের সঠিক মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করেছে। এসব আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও জন্মগত বৈশিষ্ট্যের কারণে অনেক উন্নত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই তার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকনোর কোন অবকাশ নেই। তার মহত্ব ও মর্যাদা আঘাতপ্রাপ্ত হয়- এমন কোন আচরণ তার সাথে করা যাবে না। এ নিয়ম-বিধির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণকারী ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান ও মর্যাদাকেই চ্যালেঞ্জ করে। সে এমন একটি আইনের ত্রুটি অন্বেষণে ব্যস্ত, যার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিকগুলোও সমালোচনার উর্ধ্বে।

বস্তুত মানুষ সম্পর্কে ইসলামের এ ঘোষণা পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। মানবিক সম্মান ও মর্যাদার বিচারে নারী ও পুরুষের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই। নারীকে শুধু নারী হয়ে জন্মাবার কারণে পুরুষের তুলনায় হীন ও নীচ মনে করা সম্পূর্ণ অজ্ঞতাপ্রসূত ধ্যান-ধারণা। এরূপ চিন্তাভাবনা ইসলাম স্বীকার করে না। অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে নারী হচ্ছে মহান আল্লাহ তায়ালার সম্মানিত সৃষ্টি।

(খ) ঈমান ও আমলই নারী-পুরুষের মর্যাদা নির্ণয়ের মাপকাঠি

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের সফলতা ও ব্যর্থতা সুস্থ চিন্তা ও সঠিক কর্মের সাথে সম্পৃক্ত। যে আদর্শ ও মতবাদ নারীকে শুধু নারী হওয়ার কারণে নীচু ও লাঞ্ছনার যোগ্য মনে করে, মানবতার উচ্চ আসন থেকে দূরে নিক্ষেপ করে এবং পুরুষকে শুধু পুরুষ হওয়ার কারণে উচ্চতর আসনের উপর্যুক্ত মনে করে, ইসলাম তাকে জাহেলিয়াত বলে আখ্যায়িত করেছে। ইসলাম পরিস্কার ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, মর্যাদা লাঞ্ছনা এবং মহত্ত্ব ও নীচতার মাপকাঠি হলো তাকওয়া-পরহেযগারী এবং উন্নত চরিত্র ও নৈতিকতা। এ মাপকাঠিতে যে যতটা খাঁটি প্রমাণিত হবে মহান আল্লাহর কাছে সে ততটাই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে।

---

১ আল কুরআন ১৭ : ৭০

২ আল কুরআন ৯৫ : ৪

৩ আল কুরআন ৩৫ : ৭১-৭৫

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেবো, যা তারা করত।'[৪]

আমল নির্ণয়ের মাপকাঠি সম্পর্কে সুরা আল আহযাবে মহান আল্লাহ তায়ালা আরও স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, 'নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী– তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'[৫]

মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দো'আ (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রী লোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সেসমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে; তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবিষ্ট করব জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়।'[৬]

অথ্যাৎ মানব জাতির দুটি শাখার যেটিই তার আমলনামা কর্মের পবিত্রতা দ্বারা উজ্জ্বল করবে, মর্যাদা ও সফলতা তার ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ হবে। বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টার পক্ষ থেকে তাকে প্রশ্ন করা হবে না তুমি মানুষের নারী আ পুরুষ- কোন শ্রেনী বা গোষ্ঠিটির অন্তর্ভূক্ত ছিলে? কিন্তু কেউ যদি তার জীবনগ্রন্থ দুস্কর্ম দ্বারা কালিমালিপ্ত করে তাহলে সে নারী হোক কিংবা পুরুষ হোক- সফলতা ও মর্যাদা লাভের আশা তার না করাই উচিৎ।

সুরা তাওবাহ-তে আল্লাহ তায়ালা মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে আরও সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 'তারা তাওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহের হেফাজতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে।'[৭]

(গ) পুরুষের সঙ্গে নারীরাও সভ্যতার নির্মাতা

পবিত্র কুরআনুল কারীমের বক্তব্য থেকে এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত যে, জীবনের সবরকমের তৎপরতা ও উত্থান-পতনের ক্ষেত্রে সর্বদাই নারী ও পুরুষ পরস্পরকে সহযোগিতা করেছে। উভয় মিলে জীবনের কঠিন ভার বহন করেছে এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সভ্যতা ও তমুদ্দুনের ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

কুরআন মাজীদ এ কথাও ঘোষণা করেছে যে, জীবনের সংগ্রাম-সাধনা এবং সভ্যতা সংস্কৃতি নির্মাণে উভয়ই চিরকাল পরস্পরের সহযোগী হয়েই রয়েছে। সত্যের উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা এবং তার কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য সংস্থাপন প্রচেষ্টায় নারী-পুরুষের যৌথ চেষ্টা-প্রচেষ্টার কাহিনী বিশ্ব ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

---

৪ আল কুরআন, ১৬ : ৯৭

৫ আল কুরআন, ৩৩ : ৩৫

৬ আল কুরআন, ৩ : ১৯৫

৭ আল কুরআন, ৯ : ১১২

Dhaka University Institutional Repository

এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মুনাফেক নর-নারী সবারই গতিবিধি এক রকম; শিখায় মন্দ কথা, ভাল কথা থেকে বারণ করে এবং নিজ মুঠো বন্ধ রাখে। আল্লাহকে ভুলে গেছে তারা, কাজেই তিনিও তাদের ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফেকরাই নাফরমান।'[৮]

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুকৌশলী।'[৯]

সভ্যতা ও তামাদ্দুনের ক্ষেত্রে সাধিত বিপ্লব নারী ও পুরুষের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা-সাধনার ফল। এ বাস্তবকে স্বীকার করে নেয়ার পর বিবেক-বুদ্ধি ও ন্যায়-ইনসাফের এমন কি যুক্তি অবশিষ্ট থাকে যা দ্বারা একজনকে মর্যাদা ও সম্মানের যোগ্য এবং আরেকজনকে অপমান ও লাঞ্ছনার যোগ্য মনে করা যেতে পারে? যুগে যুগে ভাঙা গড়ার ক্ষেত্রে উভয়েরই সক্রিয় ভুমিকা রয়েছে, তখন একজনকে সভ্যতা তামাদ্দুনের কর্মক্ষেত্র থেকে বহিস্কার করে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া কি বোকামী নয়? দুনিয়ার কোনো মানুষ কি নিজের দেহের একটি অংশকে অচল ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেয়ার পরও জীবন সংগ্রামে তার ভূমিকা পালন করতে সক্ষম?

(ঘ) নারী সম্পর্কে ভুল দৃষ্টিভঙ্গির অপনোদন

ইসলাম আগমনের পূর্বে গোটা দুনিয়ায় নারী জাতিকে একটি অকল্যাণকর তথা সভ্যতা এবং সংস্কৃতি ও তমুদ্দুনের জন্য অপ্রয়োজনীয় উপাদান মনে করে কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত করেছিল। তাকে অধঃপতনের এমন এক অন্ধকার গুহায় নিক্ষেপ করেছিল যেখান থেকে তার উন্নতি ও ক্রমবিকাশের আশা করা ছিল বাতুলতা মাত্র। দুনিয়ার এ আচরণের বিরুদ্ধে ইসলামই সর্বপ্রথম উচ্চ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বললো যে, গতিশীল জীবন নারী ও পুরুষের উভয়ের মুখাপেক্ষী। নারীকে এ জন্য সৃষ্টি করা হয় নি যে, সে ধাক্কা খেতে থাকবে এবং তাকে জীবনের রাজপথ থেকে তুলে কাঁটার মত দূরে নিক্ষেপ করা হবে।

কারণ পুরুষকে সৃষ্টি করার যেমন একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে তেমনি নারীকে সৃষ্টিরও একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে। মানুষের এ দু'টো শ্রেণী দিয়ে আল্লাহ অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ করেছেন, 'নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে রাজত্ব আল্লাহ তাআলারই। তিনি যা ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা-সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন। অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশালী।'[১০]

নারীদের প্রতি কোমল ব্যবহারের গুরুত্ব প্রকাশ করছে কুরআনের নিম্নোক্ত নির্দেশ, 'হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা তোমাদের জন্যে হালাল নয় এবং তাদেরকে আটকে রেখো না যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছ তার কিয়দংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে। নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে তোমরা হয়তো এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।'[১১]

ইসলাম নারী জাতিকে লাঞ্ছনা ও অমর্যাদাকর অবস্থান থেকে দ্রুততার সাথে উঠিয়ে এনে এমনই অধিকার ও মর্যাদা দান করেছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে কথা বলতে এবং প্রাণ খুলে মেলামেশা করতেও ভয় পেতাম। এ ভেবে যে,

---

[৮] আল কুরআন, ৯ : ৬৭

[৯] আল কুরআন, ৯ : ৭১

[১০] আল কুরআন, ৯ : ৪৯-৫০

[১১] আল কুরআন, ৪ : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সম্পর্কে কোনো আয়াত যেন নাযিল না হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আমরা প্রাণ খুলে তাদের সাথে মিশতে শুরু করলাম।'[১২]

তখনকার সমাজে এ নির্যাতিত শ্রেণীটির বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত ছিল না। পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে যে, না, তারাও জীবিত থাকবে এবং যে ব্যক্তিই তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে, মহান আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে।

'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হল?'[১৩]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে, আর যে তাকে জীবন্ত কবরস্থ করেনি কিংবা তার সাথে লাঞ্ছনাকর আচরণ করেনি এবং পুত্র সন্তানকে তার উপর অগ্রাধিকার দেয়নি, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।'[১৪]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যার তিনটি কন্যা সন্তান কিংবা তিনটি বোন থাকে, সে যদি তাদের সাথে সবসময় সদয় ব্যবহার করে, অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১৫]

হযরত আয়েশা রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 'আল্লাহ যদি কাউকে কন্যা সন্তানের মাধ্যমে কোনরকম পরীক্ষায় ফেলে থাকেন, আর সে যদি ধৈয্য ধারণ করে এবং তাদের প্রতি সদয় আচরণ করে, তাহলে ওইসব কন্যা সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার কারণ হবে।'[১৬]

অন্য একটি হাদীসে এ ব্যাপারে এসেছে, 'হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা তার দুটি মেয়েকে সাথে নিয়ে কিছু (খয়রাত) চাওয়ার জন্যে আমার কাছে আসলেন। আমার কাছে সে একটি খেজুর ভিন্ন আর কিছুই পেলো না। আমি খেজুরটি ওকে দিয়ে দিলাম। সে তার থেকে একটু খেয়ে দুটির মাঝে ভাগ করে দিলেন। অতঃপর উঠে দঁড়াল এবং বেরিয়ে চলে গেলো। পরে নবী (স.) আগমণ করলেন। আমি এ কথা তার নিকট বললাম। তখন তিনি বললেন, যে লোক এ মেয়েদেরকে কিছু দান কওে এবং তাদের প্রতি ইহসান ও করুণা করে, সেই ব্যাক্তির জন্য তারা জাহান্নামের আগুণ হতে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়।'[১৭]

অন্য একটি হাদীসে নবী করিম (স.) বলেছেন, 'আমি কি তোমাকে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ সাদকার কথা বলবো না? তোমার যে কন্যাকে (বিধবা হওয়ার কিংবা তালাক দেয়ার কারণে) তোমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তুমি ছাড়া তার দায়িত্ব গ্রহণকারী বা উপার্জণকারী আর কেউ নাই।[১৮]

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন: যে ব্যক্তি দুটি কন্যা সন্তানকে প্রতিপালনকরে বড় করলো সে এবং আমি এভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবো। নবী (স.) তাঁর মধ্যমা ও শাহাদাতের অঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করে একথা বললেন। তিনি আরো বললেন: দুটি পথ এমন আছে যা দিয়ে দুনিয়াতেই অতি দ্রুত আযাব আসে। তাহলো, যুলুম ও সীমালঙ্ঘণ এবং অবাধ্যতা।[১৯]

---

[১২] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং- ৫১৮৭

[১৩] আল কুরআন, ৮১ : ৮, ৯

[১৪] ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬১২, হাদীস নং- ৫০৫৬

[১৫] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- জুন, ১৯৯২), খ. ৪, পৃ. ৩৬৬, হাদীস নং- ১৯১৮

[১৬] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৪১-৪৪২, হাদীস নং- ৫৫৬০। ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০৩), খ. ৭, পৃ. ১৪৩, হাদীস নং- ৬৪৫৪। ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল: আগস্ট, ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ. ৩৭২

[১৭] ইমাম বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৪১-৪২, হাদীস নং- ৫৫৬০। ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭১, হাদীস নং- ১৮৬৪

[১৮] ইমাম ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৭৯, হাদীস নং- ৩৬৬৭

[১৯] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭০, হাদীস নং- ১৮৬৩। ইমাম হাকেম, *মুসতাদরাকে হাকেম*, খ. ৪, পৃ. ১৭৭। তবে তিরমিযীর বর্ণনায় 'বাবানে মুআজজালানে' কথাটি নেই।

Dhaka University Institutional Repository

এ হাদীসের শেষ বাক্যটিতে নবী (স.) একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অথ্যাৎ জুলুম-নির্যাতনের সীমা এমনিতেই খুব স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ করে যুলুমের যে তীর নিজের কলিজার টুকরাকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হয় তা মযলুমের বক্ষ ভেদ করার পুর্বেই যালেমের জীবনকাল নিঃশেষ করে দেয়।

সমগ্র বিশ্ব নারী জাতিকে অপরাধের সাক্ষাৎ পাপ ও গোনাহ মনে করত। কিন্তু পাপ ও অশ্লীলতায় ভরা বিশ্বের মানুষকে সরল-সঠিক পথ দেখিয়েছেন যিনি, সেই মহামানব রাসুল (স.) বলেন, 'দুনিয়ার বস্তু নিচয়ের মধ্যে আমি ভালোবাসি নারী এবং সুগন্ধি আর আমার চক্ষু শীতলকারী হলো নামায।'[২০]

অর্থ্যাৎ নারীর প্রতি ঘৃণা পোষণ এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি উদাসীনতা আল্লাহভীতির প্রমান নয়। আল্লাহভীতির অর্থ হলো, আল্লাহুর সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করা, তার প্রতি রজু হওয়া এবং তাকে ভয় করা। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং ভালোবাসা ও প্রেম-প্রীতির আচরণ করার পাশাপাশি আল্লাহরও প্রিয় পাত্র হওয়া যায়। বরং, তার সন্তুষ্টি লাভের এটিই সঠিক পন্থা। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন শুধু এটা যেন, দুনিয়াটাই মানুষের সমস্ত চেষ্টা-সাধনার কেন্দ্রবিন্দু ও লক্ষ্যস্থলে পরিণত না হয়।

একসময় নবী করিম (স.) এর স্ত্রীগণ উটের পিঠে সফর করেছিলেন। নবী (স.) উষ্ট্রচালককে বললেন, 'কাঁচগুলোকে একটু দেখে-শুনে যত্নের সাথে নিয়ে যাও।'[২১]

হযরত ফাতেমা (রা.) সম্পর্কে তিনি বলেন, 'হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা.) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আমার মেয়ে আমারই রক্ত মাংস। যা তার সন্দেহ-সংশয় ও অশান্তির কারণ হয় তা আমারও সন্দেহ-সংশয় ও অশান্তির কারণ হয়। আর যা তাকে কষ্ট দেয় তা আমাকের কষ্ট দেয়।'[২২] হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসও প্রায় অনুরূপ। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ফাতিমা আমারই অঙ্গ। তাকে যা কষ্ট দেয়, তা আমাকেও কষ্ট দেয়।'[২৩]

হযরত আয়েশা (রা.)কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে নবী (স.) কাকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন: ফাতেমাকে।[২৪]

একবার নবী (স.)কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার প্রিয়তম মানুষটি কে? তিনি বললেন, আয়েশা।[২৫] এ দুটি উক্তিই যথাস্থানে সঠিক। স্ত্রীদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রা.) এবং সন্তানদের মধ্যে হযরত ফাতেমা (রা.) ছিলেন নবী (স.) এর অতীব প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

নারীদের সম্পর্কে এসকল হাদীস যেসব শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছে, তা মানুষের চিন্তা ও কর্মে এমন একটি বিপ্লব আনলো যে, যারা এক সময় একটি নিষ্পাপ শিশুকে জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধা করতো না এবং এ নিষ্ঠুর আচরণ করতে গিয়ে যাদের ললাটে এক বিন্দু ঘাম পর্যন্ত দেখা দিতো না তারাই ঐসব শিশুর প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণকে নিজেদের জীবনের পুঁজি মনে করতে লাগলো। আপন শিশু-সন্তান যাদের কোলে নিরাপত্তা পেতো না তারাই অন্যের সন্তানের রক্ষক এবং তত্ত্বাবধায়ক হয়ে গেলো। আর যারা নারীর সাথে স্নেহ ভালোবাসার আচরণ করতে জানতো না তারাই নিজেদের জীবন সন্ধ্যায় এ নির্যাতিত মানব শ্রেনীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতো।

---

[২০] ইমাম নাসায়ী, *সুনানু নাসায়ী শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- জুন ২০০৪), খ. ৪, পৃ. ১৭৯, হাদীস নং- ৩৯৪৩ (নাসায়ী শরীফের পরবর্তী হাদীসটিও অনুরূপ)।

[২১] ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৩), খ. ৬, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং- ৫৮৩২

[২২] ইমাম বুখারি, *সহীহ বুখারী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ. ৫৬৮, হাদীস নং- ৩৪৮৪। ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৩১, হাদীস নং- ৬০৮৬

[২৩] ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৪৩১, হাদীস নং- ৬০৮৬

[২৪] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: জুন, ১৯৯৭), খ. ৬, পৃ. ৩৭৫, হাদীস নং- ৩৮৭৪

[২৫] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ৩৮০, হাদীস নং- ৩৮৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ওহুদ যুদ্ধের সময় হযরত জাবের (রা.)-এর পিতা তাকে বললেন: বেটা হয়তো এ যুদ্ধে আমাকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। জীবনের এ শেষ মুহূর্তে আমি তোমাকে আমার কন্যাদের ব্যাপারে কল্যাণকামিতার অছিয়ত করছি।[২৬]

সুতরাং হযরত জাবের (রা.) একজন যুবক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার বোনদের দেখাশোনার জন্য একজন বিধবাকে নিজের জন্য পছন্দ করলেন। নবী (স.) যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, সে একজন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলো না কেন? জবাবে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার পিতা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন এবং নয়টি কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। অথ্যাৎ আমার নয়টি বোন আছে, তাদের দেখা-শোনার প্রয়োজন আছে মনে করে আমি একজন অনভিজ্ঞ কুমারি মেয়েকে বিয়ে করা পছন্দ করি নাই। তাই এমন একজন নারীকে পছন্দ করেছি, যে তার চুল চিরুণী করে দিতে এবং দেখাশোনা করতে পারবে! নবী (স.) বললেন, তুমি ঠিকই করেছো।'

সহীহ বুখরী, সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ ও অন্যান হাদীস গ্রন্থের বর্ণনানুসারে হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদাতের পর তিনজন তাঁর মেয়ের অভিভাবকত্বের দাবিদার হলেন। একদিকে হযরত আলী (রা.) দাবি করলেন যে, সে আমার চাচাতো বোন। তাই তাতে প্রতিপালনের জন্য আমার দাবি অগ্রগণ্য।

অন্যদিকে হযরত জাফর (রা.) দাবি করলেন, আমি আলী (রা.) এর চেয়ে তার লালন-পালনের অধিক হকদার। কেননা সে যে আমার চাচাত বোন শুধু তাই নয়, অধিকন্তু আমার স্ত্রী তার খালা। এজন্য দুটি কারণে তার লালন-পালনের দায়িত্ব ও সুযোগ আমার হওয়া উচিৎ।

তৃতীয়ত: হযরত জায়েদ (রা.) দাবি করে বসলেন যে, সে আমার ভাইয়ের (হযরত জায়েদ ছিলেন আনসার এবং হযরত হামযা রা. ছিলেন মুহাজির। নবী (স.) তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধণ কায়েম করে দিয়েছিলেন) মেয়ে। তাই ভ্রাতৃ কন্যার প্রতিপালনের অধিকার চাচার চেয়ে আর কার বেশী থাকতে পারে।[২৭]

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত এসব শিক্ষা থেকে আমরা নারী জাতি সম্পর্কে ইসলাম মানুষের মধ্যে যে মেজাজ, আবেগ ও সহানুভূতি সঞ্চার করতে চেয়েছে তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি।

(ঙ) মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা

ইসলাম সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কেবলমাত্র উৎসাহব্যঞ্জক উপদেশ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, নারী ও পুরুষ উভয়ের অধিকার আইনের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও প্রতিষ্ঠিত করেছে। সে আইন সর্বদিক দিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলাম নারীর শিক্ষা অর্জনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধান করেছে। ইসলামী শরীআতের সীমার মধ্যে থেকে অর্থনৈতিক ব্যাপারে শ্রম-সাধনা করার অনুমতি রয়েছে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যেই।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর পরামর্শের মর্যাদা

ইসলামী সমাজে লাভ-ক্ষতি ও ভালোমন্দের ব্যাপারে মুসলিম নারী নিজের মতামত পেশ করতে পারে। সমাজের ভাঙা-গড়া এবং সংস্কার ও ধ্বংসের সাথে নারীরাও গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সমাজের ক্ষতি তার নিজের ক্ষতি এবং সমাজের কল্যাণ তার নিজের কল্যাণ। সে যদি সমাজকে কল্যাণের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখতে সাহায্য করে, তাহলে সে অবশ্যই সমাজকে অকল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়ার বিরোধীতা করবে। এটি তার প্রকৃতিগত অধিকার। ইসলামী শরীআত এ অধিকারকে স্বীকৃতি দান করে এবং জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে তা ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত হোক তাকে তার আবেগ উপলব্ধি, মতামত ও ধ্যান ধারনা এবং পছন্দ ও অপছন্দের বিষয় প্রকাশের অনুমতি

---

[২৬] ইমাম হাকেম, *মুসতাদরেকে হাকেম*, খ. ৪, পৃ. ২০৩

[২৭] শাওকানি, *নাইলুল আওতার*, খ. ৭, পৃ. ১৩৭, দ্র. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫১

Dhaka University Institutional Repository

দেয়। মতামত প্রকাশের এ স্বাধীনতা তার আপন সীমার মধ্যে কথা-বক্তৃতা, বিবৃতি ও লেখা যে ভাবেই হোক না কেন শরীআত তার ওপর কোন প্রকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে না।

যে সব বিষয় তার একান্তই ব্যক্তিগত, যেমন- বিয়ে, খোলা, তালাক ইত্যাদি বিষয়ে শরীআত পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছে, ঐসব ক্ষেত্রে কেউই তার ওপর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না। এসব বিষয়ে যে পদক্ষেপই গ্রহণ করা হবে তা তার সম্মতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে করা হবে। নবী (স.) বলেছেন, 'বিবাহিত নারীদের বিয়ে (বিধবা অথবা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর) তার পরামর্শ না নেয়া পর্যন্ত দেয়া যাবে না। আর অনুমতি না নিয়ে কুমারী মেয়েদের বিয়ে দেয়া যাবে না। (সাহাবারা) জিজ্ঞেস বরলেন, হে আল্লাহর রাসুল (স.) তার অনুমতি কী করে নেবো? তিনি উত্তর দিলেন, তার চুপ করে থাকা।[২৮]

অপর এক হাদীসে এসেছে, 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ইয়াতীম যুবতীর বিবাহের ব্যাপারে তার নিজের মত গ্রহণ করতে হবে। সে যদি চুপ থাকে তবে, এটাই তার সম্মতি বলে গণ্য হবে। সে যদি সরাসরি অস্বীকার করে, তবে এটাই তার অসম্মতি বলে গণ্য হবে। সে যদি সরাসরি অস্বীকার করে, তবে তার ওপর জোর খাটানো যাবে না।'[২৯]

নারীর পরামর্শ নেয়ার ব্যাপারে আরও অগ্রসর হয়ে নবী (স.) নির্দেশ দিয়েছেন, 'নারীদের সাথে তাদের কন্যাদের ব্যাপারে পরামর্শ করো।[৩০] এ হাদীস থেকে জানা যায়, জীবনের যেসব দিক ও বিভাগ সম্পর্কে নারীর অভিজ্ঞতা আছে এবং যার লাভ ও ক্ষতি সম্পর্কে সে বেশি অভিজ্ঞ সেসব বিষয়ে তার ধ্যান-ধারনা ও চিন্তা ভাবনা বিশেষ মনযোগ ও গুরুত্ব লাভ করে থাকে। তাই সে সব বিষয়ে নারীর মতামত ও পরামর্শ দ্বারা উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক মনযোগী হতে হবে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের একটি সাধারণ কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ বর্ণনা করেছেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদের সাথে পরামর্শ করতেন। কোনো কোনো সময় মেয়েরা এমন মতামত পেশ করতো যা তিনি গ্রহণ করতেন।[৩১]

পরামর্শ গ্রহণের এ বিষয়টি জীবনের কোন একটি বা কয়েকটি দিকের সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং তার সম্পর্ক সকল বিষয় ও দিকের সাথে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিভিন্ন স্থানে তার প্রমান পাওয়া যায়।

যেসব শর্তের ভিত্তিতে কুরাইশ ও মুসলমানদের মধ্যে হুদায়বিয়ার সন্ধি হয়েছিল প্রথম প্রথম অধিকাংশ মুসলামান তাতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। এসব শর্তের মধ্যে একটি ছিল মুসলমানরা এ বছর উমরাহ না করেই ফিরে যাবেন। এ শর্তের কারণে রাসুলুল্লাহ (স.) হুদায়বিয়াতেই মুসলমানদেরকে ইহরাম খুলে কুরবানী করার আদেশ দিলেন। কিন্তু সে সময় সাহাবাদের আবেগ এতটা পরিবর্তিত হয়েছিল যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মেনে নিতে দেখা গেল না। তিনি হযরত উম্মে সালমাহ (রা.)-এর কাছে আফসোস করে ঘটনাটি উল্লেখ করলে হযরত উম্মে সালমাহ (রা.) সাহাবাদের সে সময়ের আবেগ ও মানসিকতা বিবেচনা করে অত্যন্ত বুদ্ধিমতির মত পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারও সাথে কথা-বার্তা বলবেন না; বরং যে সব আনুষ্ঠানিকতা পালন করা দরকার অন্যদের আগে নিজে করুন। তারপর দেখবেন সবাই তা না করে থাকতে পারবে না। সুতরাং, তাঁকে এসব করতে দেখে তৎক্ষণাৎ সবাই তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করলো।[৩২] এভাবেই হযরত উম্মে সালমাহ (রা.)-এর সঠিক ও যথাযথ পরামর্শ মুহূর্তের মধ্যে এ নাজুক পরিস্থিতির অবসান ঘটাল। বর্তমান যে পদ্ধতিতে জানাযা পড়া হয়

---

২৮ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৩, হাদীস নং- ৪৭৫৭

২৯ ইমাম তিরমিযী, *জাতে আত তিরমিযী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশকাল: নভেম্বর, ১৯৯৬), খ. ২, পৃ. ২৮৮, হাদীস নং- ১০৪৫

৩০ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, আগস্ট ২০০৬), খ. ৩, পৃ. ১৩৮

৩১ ইবনে কুতাইবা, উয়ুনুল আখবার, খ. ১, পৃ. ২৭

৩২ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৫১, হাদীস নং- ২৫৩০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রথম দিকে তা মুসলমানদের মধ্যে চালু ছিল না। হযরত আসমা বিনতে উমাইস হাবশায় খৃষ্টানদের মধ্যে এ নিয়ম দেখেছিলেন। তিনি এর পরামর্শ দিলে তা গৃহীত হয়।[৩৩]

রাসুলুল্লাহ (স.)-এর পর খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মপদ্ধতিও তাঁর আদর্শের অনুসরণ করেছে। ইবনে সিরীন হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, 'উপস্থিত সমস্যা সম্পর্কে উমর (জ্ঞানী লোকদের সাথে) পরামর্শ করতেন। এমনকি (সেসব বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারিণী) মেয়েদের সাথেও পরামর্শ করতেন। তাদের মতামতে কল্যাণকর কোন দিক থাকলে বা কোনো উত্তম বিষয় দেখলে তা গ্রহণ করতেন।[৩৪]

নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা

১৯৭৬ সালের ৩ থেকে ১২ এপ্রিল লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামে নারী সম্পর্কিত অধিবেশনে দু'জন নওমুসলিম মহিলা, একজন ইংরেজ এবং অপরজন জার্মান, যে ভাষণ দান করেন, তার ওপর ভিত্তি করে Woman in Islam গ্রন্থটি সংকলন করেছে ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যাট (বিআইআইটি)। এই গ্রন্থটিতেই বি আইশা লেমু'র ভাষণ থেকে রচনা করা হয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী। এ অধ্যায়েরই একটি পরিচ্ছেদ- নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা।

বি আইশা লেমু তার প্রদত্ত ভাষণের এ অংশে নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, 'নারীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও বেহেশত অর্জনের আত্মা তাদের আছে কি না, সে সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাসমূহের নিরসনের জন্য আমি সুস্পষ্ট স্বাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে চাই। কুরআন বিশদভাবে বলেছে, যে সব পুরুষ ও নারী ইসলামের নীতি মেনে চলবেন, তাঁরা তাদের প্রচেষ্টার জন্য সমান পুরষ্কার লাভ করবেন। 'নিশ্চই মুসলমান পুরুষ ও মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈয্যশীল পুরুষ ও ধৈয্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকরকারী পুরুষ ও আল্লাহর অধিক যিকরকারী নারী– তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরষ্কার।[৩৫]

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন, 'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন তান করবো এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেবো, যা তারা করতো।[৩৬]

এখানে ইসলামের পাঁচটি রুকন- ঈমান, সালাত, সিয়াম, যাকাত ও হজ্জ পালন নারীদের জন্য যেমন, পুরুষের জন্যও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের পুরষ্কারের কোন তারতম্য করা হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সেই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত, যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সবকিছুর খবর রাখেন।[৩৭]

এখানে উল্লেখ করা যায়– ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক ছিলেন একজন নারী– রাবিয়া আল আদাবিয়া।[৩৮]

---

৩৩ তাবাকাতে ইবনে সা'দ, খ. ৮, পৃ. ২০৬

৩৪ বায়হাকী, *আস সুনানুল কুবরা*, খ. ১০, পৃ. ১১৩

৩৫ আল কুরআন, ৩৩ : ৩৫

৩৬ আল কুরআন, ১৬ :৯৭

৩৭ আল কুরআন, ৪৯ : ১৩

৩৮ বি আইশা লেমু ও ফাতিমা হিরেন, অনু: ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, *ইসলামের দৃষ্টিতে নারী* (ঢাকা : বিআইআইটি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬), পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা

একই ভাষণের একই নিবন্ধে নারীর বুদ্ধিবৃত্তিক মর্যাদা অংশে বি, আইশা লেমু বলেন, 'প্রশ্নাতীতভাবে ইসলাম ধর্মীয় মর্যাদায় নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখন দেখা যাক বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাটি কেমন? নবীজী (স.) বলেন, 'জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য এবং দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর।' মুসলমানদেও জন্য জ্ঞানকে ধর্মীয় এবং জাগতিক- এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়নি। নবীজীর (স.) বাণীর আধুনিক মর্মার্থ হোল, 'নারী হোন আর পুরুষ হোন, তাকে সাধ্যানুসারে জ্ঞান অর্জণ করতে হবে। তবে তাঁকে আল কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তায়ালার বাণী স্মরণে রাখতে হবে, 'জ্ঞানীরাই সত্যিকারভাবে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেন।'[৩৯]

অতএব ইসলামে পুরুষ ও নারীর জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা উপলব্দি ও শিক্ষা দানের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান আহরনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারী যিনি সৃষ্টি সম্বন্ধে যতবেশি চিন্তা-ভাবনা করেন, মহান সৃষ্টিকর্তা ও পালনকারী আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে তিনি ততবেশি সচেতন।

ইসলামের ইতিহাসে অন্যতম সুবিখ্যাত নারী হচ্ছেন নবীজীপত্নী হযরত আইশা (রা.)। তিনি প্রধানত যে কারণে স্মরনীয়, তা হচ্ছে তার মেধা ও বিশিষ্ট স্মৃতিশক্তি। এসব গুণের জন্য তিনি হাদীসের অন্যতম নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে সমাদৃত। এক হাজারেরও বেশি হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁকে হাদীসের অন্যতম শিক্ষিকা হিসেবে সমাদৃত করা হয়।

সাধারণভাবে প্রারম্ভিক মধ্যযুগে মুসলিম বিশ্বে নারীর শিক্ষালাভের উপর বাধা ছিল না। বরং, তার ধর্ম তাকে উৎসাহ দিত। এর ফলে ধর্মীয় মনীষী, লেখক, কবি, চিকিৎসক, শিক্ষক হিসেবে অনেক নারী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এরূপ একজন নারী হলেন, হযরত আলী (রা.)-এর বংশের নাফিসা। তিনি হাদীসের এতবড় পণ্ডিত ছিলেন যে, আল ফসতাত শিক্ষা কেন্দ্রে হাজির হয়েছিলেন সে সময়েল যশ্বশীর্ষের ইমাম আল-শাফি। আর একজন নারী হলেন শাইখা-শুদা। যিনি বাগদাদের বিশাল শ্রোতৃমন্ডলীর সম্মুখে সাহিত্য, অলংকারশাস্ত্র ও কবিতা সম্পর্কে প্রকাশ্যে ভাষণ দান করতেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথমসারির একজন মনীষী।

মুসলিম সমাজে শিক্ষক, লেখক ও কবি হিসেবে শ্রদ্ধাভাজন সুশিক্ষিতা নারীর আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে যে কোন ক্ষেত্রে শিক্ষা লাভের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনের জন্য এবং সমাজ কল্যাণে নারীর শিক্ষালব্দ জ্ঞান ও পেশাগত প্রশিক্ষণকে কাজে লাগাতে সবাই উৎসাহ দিতেন। অবশ্য এ ব্যাপারে কিছু কিছু নৈতিক অনুশাসনও ছিল।[৪০]

অলীক কল্পনা ও পলায়নী প্রবৃত্তি

কিছু কিছু অমুসলিম এমনও প্রশ্ন করেছেন, 'ইসলামে নারীর ভুমিকা আছে বলে আপনি বিশ্বাস করেন? মুসলিম নারী ইবাদত করতে পারেন? অথবা মক্কা শরীফে যেতে পারেন? এবং বেহেশত শুধু পুরুষের জন্য, তাই নয় কি?

এ ধরনের পূর্ব ধারনায়, মুসলিম নারী আধ্যাত্মিকভাবে এক অ-ব্যক্তি : ছায়ার জগতে তাঁর বাস। তিনি অত্যাচারিত ও নিপীড়িত। এ অবস্থা থেকে মৃত্যুতে তিনি এক আত্মাহীন অবস্তুতে রূপান্তরিত হন। অতীতে খৃস্টান মিশনারীগণ এরূপ ধারণা পোষণ করতেন। তাঁদের অনেকে এগুলি সত্য বলে বিশ্বাস করতেন। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্যের মন মানসে বিনোদন মাধ্যম আর এক ধরনের চিত্র পরিবেশন করে থাকে। এ হোল মুসলিম নারীকে আরব্য রজনীর

---

[৩৯] আল কুরআন, ৩৫ : ২৮

[৪০] বি আইশা লেমু ও ফাতিমা হিরেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

Dhaka University Institutional Repository

হারেমের একজন হিসেবে চিত্রিত করার হলিউডি সংস্করণ। এখানে নারী তা প্রভূ-সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণকারিনী। স্বল্পবস্ত্র পরিহিতা। বিহঙ্গবুদ্ধি, যুবতী রমনীকুলের একজন।

পাশ্চাত্যের কল্পনাবৃত্তিতে এহেন চিত্রকল্পগুলি খুবই আবেদনময়। প্রথমত: হিংস্র ও ঈর্ষান্বিত স্বামীর ভয়ে এই নরী বিপন্না। সাধু জর্জের জন্য অপেক্ষমনা, যে সাধু ড্রাগনকে হত্যা করে তাকে উদ্ধার করবেন। দ্বিতীয়ত : চোখ ধাঁধাঁনো রেশমীবস্ত্র ও অলংকার পরে এ কৃতদাসকন্যা তার প্রভূও ভোগ-সুখের জন্য প্রতীক্ষায়রত। পাশ্চাত্যে এমন কোন পুরুষ বা রমনী আচেন কী যিনি এ দুটির যে কোন একটি ভুমিকায় কোন না কোন সময়ে নিজেকে কল্পনা করেন নাই!

এভাবেই সন্দেহাতীতভাবে এই অলিক কল্পনা এতদিন চলে এসেছে। আমরা বিশ্বাস করতে চাই, এ ধরনের রমনী আছেন, যাতে আমরা তাঁদের নিয়ে আকাশ-কুসুম কল্পনা করতে পারি। অথবা প্রকাশ্যে আমরা নারীমুক্তি নীতির পরিপন্থী এই পরিস্থিতির নিন্দা করি।

এ হোল অলীক কল্পনা। এ ধারণা পোষণ করা হল একটি সহজ পলায়ন প্রবৃত্তি। আজ আমরা এখানে ইসলামের দৃষ্টিতে নারী সম্বন্ধে আলোচনা করবো। আমরা জানতে চাইব, একজন মুসলিম নারীর ভূমিকা কী ধরনের হতে পারে? এ ক্ষেত্রে কল্পনার রূপকথা আর হলিউডের বাছাই করা শ্রেষ্ঠতম নিবেদন কোন সরবরাহ সূত্র হতে পারে না। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো সূত্র হচ্ছে ইসলামের নথিপত্র, কুরআন এবং হাদীস। অথ্যাৎ নবীজী হযরত মোহাম্মদ (স.) এর লিপিবদ্ধ বানী ও কর্ম।[৪১]

[৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নারী সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে, যখন সভ্য ও অসভ্য নির্বিশেষে বিশ্বেরসকল অঞ্চলে সকল সমাজে নারীর জীবন ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন আরব উপদ্বীপের মরুময় পার্বত্য উপত্যকায় অবস্থিত মক্কা নগরী থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ দিয়ে সেই ঐশী বানী ঘোষিত হলো, যা নরীকে দিল সর্বকালের সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ সম্মানজনক অবস্থান, যা তাকে দিল সকল অধিকার ও মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে। যা তাকে অতীতের সকল লাঞ্ছণা-গঞ্জনা ও অপমান থেকে সর্বতোভাবে মুক্তি দিল, যা তার পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য ও মানবসূলভ অধিকারের নিশ্চয়তা দিল। যা তাকে পাশবিক যৌন লালসার শিকার হওয়া থেকে চিরদিনের জন্য নিস্কৃতি দিল এবং সমাজের উন্নয়নে, নিরাপত্তা বিধানে ও ঐক্যসংহতি রক্ষায় তাকে সক্রিয় ভূমিকা রাখার সুযোগ দিল।

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মুখ দিয়ে ইসলাম নারী সম্পর্কে যে সংস্কারমূলক নীতিমালা ঘোষণা করলো, তার সার সংক্ষেপ নিম্নে বর্ণনা করছি-

প্রথম: মনুষত্বের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের পরিপূর্ণ সাম্যের কথা এবং সব রকমের ভেদাভেদ ও বৈষম্য প্রত্যাখ্যানের কথা ঘোষণা করা হলো। আল কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বললেন, 'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর। যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।'[৪২]

আর রাসূল (স.) ঘোষণা করলেন, 'নারীগণ পুরুষদেরই সহদোরা।'[৪৩]

দ্বিতীয়: পূর্ববর্তী ধর্মমতের অনুসারীরা নারীকে যে একটা অভিশাপস্বরূপ এবং সকল পাপের উৎস ও সমাজের গলগ্রহরূপে চিহ্নিত চিহ্নিত করতো, সেই মানসিকতাকে ইসলাম প্রতিহত করলো! অন্যান্য ধর্মমতের ন্যায় ইসলাম আদম (আঃ) এর জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার শাস্তির জন্য এককভাবে হাওয়াকে দায়ী করেনি, বরং উভয়কে সমানভাবে দায়ী করেছে। আদম (আঃ) এর ঘটনা বর্ণনাকালে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্থলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদেরকে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে এবং লাভ সংগ্রহ করতে হবে।'[৪৪]

আদম ও হাওয়া সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতঃপর শয়তান উভয়কে প্ররোচিত করলো, যাতে তাদের অঙ্গ, যা তাদের কাছে গোপন ছিল, তাদের সামনে প্রকাশ করে দেয়। সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তা তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেননি; তবে তা এ কারণে যে, তোমরা না আবার ফেরেশতা হয়ে যাও- কিংবা হয়ে যাও চিরকাল বসবাসকারী।'[৪৫]

তাওবার ব্যাপারেও তাদের উভয়কে সমভাবে অংশীদার করেছে। আল্লাহ তায়াল নিজেই বলেন, 'তারা উভয়ে বললো, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করেন, তবে আমরা অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবো।'[৪৬]

---

৪২ আল কুরআন, ৪ : ১

৪৩ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ডিসেম্বর: ১৯৯০), খ. ১, পৃ. ১৫৪, হাদীস নং- ২৩৬

৪৪ আল কুরআন, ২ : ৩৬

৪৫ আল কুরআন, ৭ : ২০

৪৬ আল কুরআন, ৭ : ২৩

Dhaka University Institutional Repository

এমনকি আল কোরআনে কোন কোন স্থানে এই পাপটির জন্য এককভাবে শুধুই আদম (আঃ) কে দায়ী করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে অন্যত্র বলেছেন, 'আদম তার পালনকর্তার অবাধ্যতা করল, ফলে সে পথভ্রান্ত হয়ে গেলো।[৪৭]

তৃতীয়: পুরুষের মত নারী যদি সৎকর্মশীলা হয় তবে সে জান্নাতে যেতে পারবে এবং তার ধর্মপালন ও ইবাদত করার পূর্ণ যোগ্যতা ও অধিকার রয়েছে বলে ঘোষণা করা হল। পক্ষান্তরে সে অসৎকর্মশীলা হলে জাহান্নামে যাবে। 'যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।'[৪৮]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলন, 'অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দোয়া (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক।'[৪৯]

আল কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াতে নারী ও পুরুষের সমমর্যাদার ওপর জোর দিয়ে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ, বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ, রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারী নারী– তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'[৫০]

চতুর্থ: ইসলাম নারীকে অপয়া এবং অশুভ মনে করা ও মেয়ে সন্তান ভুমিষ্ঠ হলে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত হওয়ার মানসিকতাকে প্রতিহত করেছে। এ মানসকিতা শুধু যে তৎকালীন আরব সমাজে ছিল তা নয়, বরং আজও বহু জাতির মধ্যে বিরাজমান।

এ জঘন্য অভ্যাসের নিন্দা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন তাদেরকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফায়সালা খুবই নিকৃষ্ট।[৫১]

পঞ্চম: ইসলাম মেয়ে সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলার ঘৃণ্য প্রথাকে নিষিদ্ধ করে এবং এর বিরুদ্ধে চরম ধিক্কার ও নিন্দাবাদ উচ্চারণ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে। কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হল।'[৫২]

আল্লাহ তায়ালা অন্য এক আয়াতে বলেন, 'নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যারা নিজ সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কোন প্রমাণছাড়াই হত্যা করেছে।'[৫৩]

ষষ্ঠ: ইসলাম নারীকে সম্মান করতে এবং মর্যাদা দিতে নির্দেশ দিয়েছে মেয়ে হিসেবেও, স্ত্রী হিসেবেও এবং মা হিসাবেও। মেয়ে হিসেবে তাকে কিভাবে মর্যাদা দিতে হবে তা শিক্ষা দিয়েছে, তার নমুনা নিম্নের হাদীসটিতে পাওয়া যাবে: 'যে ব্যক্তির কোন কন্যা সন্তান থাকে এবং তাকে সে উত্তম বিদ্যা ও উত্তম আচরণ শেখায়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।'

---

৪৭ আল কুরআন, ২০ : ১২১
৪৮ আল কুরআন, ১৬ : ৯৭
৪৯ আল কুরআন, ৩ : ১৯৫
৫০ আল কুরআন, ৩৩ : ৩৫
৫১ আল কুরআন, ১৬ : ৫৮-৫৯
৫২ আল কুরআন, ৮১: ৮-৯
৫৩ আল কুরআন, ৬: ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে স্ত্রী হিসেবেও মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেমন: 'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।'[৫৪]

উত্তম স্ত্রী সম্পর্কে রাসুল (স.) এর হাদীস, 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলে করিম (স.) এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন মেয়ে উত্তম? জবাবে রাসুল (স.) বলেন, যে মেয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে দেবে। যখন সে তার দিকে তাকাবে, অনুসরণ ও আদেশ পালন করবে, যখন সে তাকে কোন কাজের হুকুম করবে এবং তার স্ত্রীকে নিজের ব্যবহারে এবং তার নিজের ধন-মালের ব্যাপারে, সে যা অপছন্দ করে তাতে সে স্বামীর বিরুদ্ধতা করবে না।'[৫৫]

নারীকে মা হিসেবে মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারেও বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং তার স্তন্য ছাড়তে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি। যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ন কর, আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের অন্যতম।[৫৬]

হাদীসে এসেছে, 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার হক পাওয়ার অধিকার কার সবচেয়ে বেশি? রাসুল (স.) বললেন, তোমার মার। লোকটি আবারও জিজ্ঞাসা করলো, এরপর কার? রাসুল (স.) বললেন, তোমার মার। লোকটি আবারও জিজ্ঞাসা করলো, এরপর কার? রাসুল (স.) বললেন, তোমার মার। লোকটি আবারও জিজ্ঞাসা করলো, এরপর কার? রাসুল (স.) বললেন, তোমার বাবার।[৫৭]

আর এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, আমি জিহাদে যেতে চাই। রাসুল (স.) বললেন, 'তোমার মা কি বেঁচে আছেন? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে সব সময় তার পায়ের কাছে থাক। কেননা ওখানেই জান্নাত রয়েছে।'[৫৮]

জামে আত তিরমিযীতে হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি নবী (স.) এর নিকট এসে তাঁর কাছে জিহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন। তিনি (স.) বললেন, তোমার পিতা-মাতা কী জীবিত আছেন? সে বলল, 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন, তুমি তাদের সেবায় জিহাদ কর।'[৫৯]

সপ্তম: নারীকে শিক্ষাদানে ইসলাম প্রবলভাবে উৎসাহ দিয়েছে। এ ব্যাপারে একটি হাদীসে রাসুল (স.) বলেন, 'জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর ওপর ফরজ।'

---

৫৪ আল কুরআন, ৩০ : ২১

৫৫ ইমাম নাসায়ী, অনু: মাওলানা রিজাউল করিম ইসলামাবাদী, *সুনানু নাসায়ী শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, জুন- ২০০৩), খ. ৩, পৃ. ৪৭৬, হাদীস নং- ৩২৩৪

৫৬ আল কুরআন, ৪৬ : ১৫

৫৭ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩১, হাদীস নং ৫৫৩৯। ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৮৫, হাদীস নং- ৬২৬৯ (মুসলিম শরীফের পরবর্তী ৬২৭০ নম্বর হাদীসটিও প্রায় অনুরূপভাবে বর্ণিত)।

৫৮ ইমাম বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩৬, হাদীস নং- ৫৫৪৫

৫৯ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৪২, হাদীস নং- ১৬১৭

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম: ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারের অংশীদার করেছে, তা সে মাতা, স্ত্রী অথবা কন্যা যাই হোক না কেন, এমনকি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ও সে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে।

নবম: স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের জন্য সমান অধিকার বিধিবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত করেছে এবং পুরুষকে পরিবার প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত করলেও তাকে স্বেচ্ছাচারী বা অত্যাচারী হবার অনুমতি দেয়নি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়মানুযায়ী। তার নারীদের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন, পারক্রমশালী, বিজ্ঞ।[৬০]

দশম: তালাকের সমস্যাকে এমনভাবে বিধিবদ্ধ করেছে, যাতে স্বামী কোনরকমের স্বেচ্ছাচারমূলক বা অত্যাচারমূলক আচরণ করতে না পারে। এ জন্য তালাকের সীমা নির্ধারণ করেছে এভাবে যে, তা সর্বোচ্চ তিনটির বেশি হতে পারবে না। তাছাড়া তালাক কার্যকর করার জন্য সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আর এরপর একটা ইদ্দতের মেয়াদ নির্দিষ্ট করেছে যা স্বামী-স্ত্রী উভয়কে পরস্পরের প্রতি সমঝোতায় প্রত্যাবর্তণ করার সুযোগ এনে দেয়।

একাদশ: ইসলাম স্ত্রীর সংখ্যা সীমিত করে চারে নামিয়ে এনেছে। অথচ সমকালীন আরবে ও অন্যান্য দেশে এ ব্যাপারে কোন সীমা সংখ্যার বালাই ছিল না।

দ্বাদশ: নারীকে প্রাপ্তবয়স্কা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত স্বীয় অভিভাবকদের কর্তৃত্বে ন্যাস্ত করেছে এবং এই অভিভাবকসূলভ কর্তৃত্ব কেবল তার রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষা-দীক্ষা, তদারকী ও তার কোন সম্পদ থাকলে তা তত্বাবধান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। অভিভাবকত্বের নামে তার দন্ডমুণ্ডের মালিক হতে বা তার ওপর স্বেচ্ছাচারমূলক শাসন চালাতে ইসলাম কাউকে অনুমতি দেয় না। আর বয়োঃপ্রাপ্তির পর আর্থিক দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে তাকে পুরোপুরিভাবে পুরুষের সমান অধিকার ও কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামী ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ণ করলে, কেউ ক্রয়-বিক্রয়, দান, ওয়াকফ, বন্ধক, ইজারা, শরিকী ব্যাবসা ইত্যাদির যাবতীয় আর্থিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে পুরুষ ও নারীর ক্ষমতায় ও অধিকারে আদৌ কোন পার্থক্য খুঁজে পাবে না।

উল্লেখিত **১২**টি মূলনীতি থেকে আমরা জানতে পারি যে, ইসলাম জীবনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে নারীকে ঠিক সেই মর্যাদা দান করেছে, যা তার জন্য সম্পূর্ণরূপে উপর্যুক্ত ও মানানসই। সেই তিনটি ক্ষেত্র হলো–

১. মানবিক ক্ষেত্র: এ ক্ষেত্রে সে নারীকে পুরুষের ন্যায় পুর্ণ মানবিক মর্যাদা ও অধিকার ও তার মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দান করেছে। অথচ, অতীতের অধিকাংশ সভ্য জাতি হয় এ ব্যাপারে সন্দিগ্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল কিংবা এটা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

২. সামাজিক ক্ষেত্র: ইসলাম নারীর সামনে শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছে এবং তার জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মানজনক অবস্থান নির্ধারণ করেছে। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে তার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তার বয়স যত বাড়ে, তার সম্মানও তত বৃদ্ধি পায়। শিশু থেকে স্ত্রী এবং স্ত্রী থেকে মায়ে পরিণত হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে বিশেষতঃ বার্ধক্যে তার জন্য বাড়তি প্রীতি, ভালোবাসা, সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে।

৩. আইনগত ক্ষেত্র: বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে ইসলাম নারীকে তার সকল কর্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ আর্থিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দান করেছে। পিতা, স্বামী বা পরিবার প্রদানের কোনো কর্তৃত্ব তার ওপর চাপিয়ে দেয়নি।

---

[৬০] আল কুরআন, ২ : ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য

ফ্রান্সের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী আলেক্সিজ ক্যারেল পুরুষ ও নারীর মধ্যকার স্বভাবগত ও মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্য ও বিভিন্নতা পর্যায়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'নারী ও পুরুষের মধ্যকার স্বভাবগত পার্থক্য প্রমাণকারী মৌলিক সত্যকে উপেক্ষা করার কারণে নারী স্বাধীনতার আন্দোলনকারীরা দাবি করেছে যে, নারী ও পুরুষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পূর্ণভাবে অভিন্ন ও সমান হতে হবে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এ দুয়ের মধ্যে সীমাহীন পার্থক্য বিদ্যমান। নারী দেহের প্রতিটি কোষের ওপর তার নারীত্বেও চিহ্ন অংকিত রয়েছে। তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কেও একই সত্য, বিশেষকরে তার স্নায়ু মণ্ডলী সম্পর্কে। নারীদের কর্তব্য তাদের স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী নিজেদের ঝোঁক-প্রবণতার রূপায়ন। পুরুষদের অবদান অনেক বেশি। এ কারণে তাদের নিজেদের বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের ব্যাপারে কোনরূপ উন্নাসিকতা প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে অনুচিত।[৬১]

ইসলামে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তবে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, মানবতা, যোগ্যতা ও মর্যাদার ব্যাপারে ইসলাম মানুষে মানুষে ও নরনারীতে যে সাম্যের সৃষ্টি করেছে, তার সাথে এই পার্থক্যের কোন সম্পর্ক নেই। বরং, ইসলাম এ পার্থক্যগুলো অনুমোদন করেছে শুধু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজনের তাগিদে। ইসলামে এই পার্থক্যগুলো কোথায় কোথায় অনুমোদন করা হয়েছে তার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে

কারো পাওনা বা অধিকার নিরুপনের জন্য যে সাক্ষ্য দেয়া হয়, তার ক্ষেত্রে ইসলাম দু'জন সত্যভাষী পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীর সাক্ষ্যের ব্যবস্থা করেছে। ঋণ দানের বিধান সংক্রান্ত আয়াতে আল্লাহ এ বিষয়টি নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন, 'দু'জন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর- যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়।'[৬২]

পাশ্চাত্য সমাজ কিংবা ইসলাম বিরোধীদের পক্ষ থেকে এই একটি বিষয়ে বেশ আপত্তি তোলা হয়। নারীবাদীরা তো আরও সোচ্চার এ বিষয়ে। তাদের বক্তব্যের পক্ষে এই আয়াতের দলীলই উপস্থাপন করা হয় এবং বলা হয় ইসলাম নারীকে সমান অধিকার প্রদান করেনি। পুরুষের চেয়ে কম মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। একজন পুরুষের সাথে সাক্ষী হিসেবে দু'জন স্ত্রী লোকের শর্ত আরোপের কারণ, তার সম্মান ও মর্যাদাকে খাটো করে দেখা নয়। বরং এর কারণটি সম্মান ও মর্যাদার সাথে একেবারেই সম্পর্কহীন।

কিন্তু মূল বিষয় হলো: মানবতা, মর্যাদা এবং যোগ্যতার সাথে এই পার্থক্যের কোন সম্পর্ক নেই। নারী মানুষ হিসেবে পুরুষের মতই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং পুরুষের মতই অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব বহনের যোগ্যতাসম্পন্ন। ইসলাম অর্থনৈতিক ব্যাপারে অধিকার ও কর্তৃত্ব দান করেছে, তথাপি তার ওপর বিশেষ সামাজিক দায়িত্বও অর্পণ করেছে। তা হলো পরিবারের তত্ত্বাবধান। এটা এমন এক গুরুদায়িত্ব যে এটা পালনের জন্য নারীই সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। সুতরাং, পরিবার তত্বাবধানেই নারীকে অধিকাংশ সময় গৃহে কাটাতে হয়। বহির্জগত সম্পর্কে তার জানা, বোঝা কিংবা অনুধাবন করার পরিধি পুরুষের তুলনায় অনেক কম হওয়াটা স্বাভাবিক।

মানুষের অধিকার, প্রাপ্য এবং সামাজিক ন্যায়-নীতির স্বার্থে বিচার ব্যবস্থার বিষয়গুলো এমন যে- এসব বিষয়ে স্বাক্ষীর স্থিতি ও দৃঢ়তা অত্যাবশ্যক এবং সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্য প্রমাণ করতে বিচারকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা জরুরী। এ কারণেই ইসলাম মহিলা স্বাক্ষীর ক্ষেত্রে দু'জন স্বাক্ষী রাখার বিধান দিয়েছে। বিষয়টি আল

---

৬১ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহীম : *নারী* (ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, পঞ্চম প্রকাশ, মে ১৯৯৮), পৃ. ১৫

৬২ আল কুরআন, ২ : ২৮২

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনেই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, 'যাতে একজন স্ত্রী লোক ভুলে গেলে অপর স্ত্রী লোক তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।'

ইসলামে ফৌজদারী দণ্ডবিধির যাবতীয় দণ্ড বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকলেই যে বাতিল হয়ে যায় সেটা সর্বসম্মত ব্যাপার। হত্যাকাণ্ডের ন্যায় লোমহর্ষক অপরাধ সংগঠনের সময় নারীর যে মানসিক অবস্থা হওয়ার কথা, তাতে অপরাধের সঠিক বিবরণ দেয়ার মত দৃঢ়তা দেখানো তার পক্ষে সম্ভব কি না সেটাই সন্দেহজনক। এ সন্দেহের কারণেই তার স্বাক্ষ্য অনেকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। নারীর এই মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখেই বহু সংখ্যক ফিকহশাস্ত্র বিশারদ অপরাধের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য আদৌ গ্রহণ করা যাবে না বলেও রায় দিয়েছেন।

সুতরাং, প্রশ্নটা সম্মান ও অসম্মানের নয় এবং যোগ্যতা কিংবা অযোগ্যতার নয়। বরং প্রশ্নটা হচ্ছে আইন বা বিধির প্রযোজ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার এবং সে সম্পর্কে বিচার ফায়সালায় সতর্কতা অবলম্বনের। অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক মোআমেলাতে নারীর উপস্থিতি কিংবা অংশগ্রহণ বিরল ঘটনা। ফলে তার কাছ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বনের জন্যই এই ব্যবস্থা। যে কোন ন্যায়সঙ্গত আইন প্রনয়নের জন্য এ নিশ্চয়তা অর্জন করা জরুরী।

২. উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে

নারীকে উত্তরাধিকার দিয়ে ইসলামই নারীর মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। অথচ তৎকালীন জাহেলি আরব এবং বহু সংখ্যক প্রাচীন জাতি নারীর উত্তরাধিকার স্বীকার করতো না। এমনকি বর্তমান যুগেও কোন কোন জাতি স্ত্রীর উত্তরাধিকার স্বীকার করে না। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইসলামের বিধিতে নারীর অংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমে হয়ে থাকে। যথা-

ক) কখনও নারীর অংশ পুরুষের অংশের সমান, যেমন: একই মায়ের উদরে জন্মগ্রহণকারী বৈপিত্রেয় বোনের সাথে যখন আর কেউ থাকে না এবং অনুরূপ বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সাথে যখন আর কেউ থাকে না, তখন এই ভাই ও বোন উত্তরাধিকারের এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। আর যখন একাধিক বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন থাকবে, তখন তারা এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে অংশীদার হবে এবং ভাই পাবে বোনের দ্বিগুণ।

খ) কখনও নারীর অংশ হবে পুরুষের সমান বা তার চেয়ে কম। যেমন, মৃত ব্যক্তি যদি একাধিক পুত্র-কন্যাসহ পিতা-মাতা রেখে যায়, তবে উক্ত পিতা-মাতা মৃত সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে। অতঃপর পরিত্যক্ত সম্পত্তির যে কয়টি অংশ অবশিষ্ট থাকবে তা পাবে পিতা। আর যে ব্যক্তি এক কন্যা, এক স্ত্রী ও পিতা-মাতা রেখে মারা যাবে, তার সম্পত্তির অর্ধেক পাবে কন্যা। সম্পত্তিকে মোট ২৪ ভাগে ভাগ করে ১২ ভাগ কন্যাকে দিয়ে বাকি তিন স্ত্রীকে, চার ভাগ মাতাকে এবং ৫ ভাগ পিতাকে দেওয়া হবে।

গ) সাধারণভাবে ও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নারী পাবে পুরুষের অর্ধেক। এর কারণ, এই নয় যে- ইসলাম নারীকে পুরুষের চাইতে অপূর্ণ মানুষ মনে করে অথবা নারীকে পুরুষের ন্যায় সম্মানার্হ মনে করে না।

ইসলামী বিধি ব্যবস্থায় পুরুষের ওপর যে ধরনের ও যতখানি আর্থিক দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়, নারীর উপর তেমন ন্যস্ত করা হয় না। পুরুষই স্ত্রীকে মোহরানা দিয়ে থাকে এবং দম্পত্তির বাসস্থান বাবদ এবং স্ত্রী ও সন্তানদের খোরপোশ বাবদ যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করে থাখে।

পক্ষান্তরে নারী মোহরানা গ্রহণ করে। সে ধনী হলেও নিজের জন্য ও নিজের সন্তানদের জন্য নিজের এক কপর্দকও ব্যায় করতে বাধ্য নয়। এ কারণেই উত্তরাধিকারে তার অংশ পুরুষের চেয়ে কম হওয়াটা ন্যয় সঙ্গত। ইসলাম নারীকে সকল সাংসারিক দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি তো দিয়েছেই, উপরন্তু খোদ নারীকেও পুরুষের ওপর,

Dhaka University Institutional Repository

অতিরিক্ত দায় হিসেবে চাপিয়ে দিয়েছে এবং তারপর স্ত্রীকে পুরুষের অর্ধেক মীরাস দিয়েছে। এটা যে নারীর প্রতি ইসলামের অতিবড় উদারতা ও বদান্যতা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৩. নারী হত্যার জরিমানা বা দিয়াতের ক্ষেত্রে

যে নারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে নয় বরং ভুলবশত খুন করা হয়েছে, বা যে নারীর হত্যাকারী প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ না হওয়ায় কিসাস বা প্রানদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়েছে, তার জন্য শরীয়ত অর্থদণ্ড তথা দিয়াতের ব্যাবস্থা করেছে। এই দিয়াত হচ্ছে- একই পন্থায় নিহত পুরুষের দিয়াতের অর্ধেক। যেহেতু ইসলাম মানবিক ব্যপারে, কর্মের যোগ্যতায় ও সামাজিক মর্যাদায় নরনারীর সমতা নিশ্চিত করেছে, তাই দিয়াতের ক্ষেত্রে এই ব্যবধানটা দেখে খটকা লাগতে পারে।

যে সব ক্ষেত্রে ইসলাম নর-নারীর সাম্য নিশ্চিত করেছে, তার সাথে আলোচ্য ব্যবধানের কোন সম্পর্ক নেই। এ বিষয়টির সম্পর্ক হচ্ছে নারী বা পুরুষের নিহত হওয়ার দরুন সংশ্লিষ্ট পরিবারের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয় তার সাথে। ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে এ পার্থক্য নেই। হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি নারী বা পুরুষ যাই হোক না কেন, হত্যাকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য। এর কারণ এই যে, মৃত্যুদণ্ডের বেলায় ইসলাম প্রানের বদলে প্রান নীতি অনুসরণ করে থাকে। আর নারী ও পুরুষ মানুষ হিসেবে সমান। উভয়ের প্রান বা জীবনের মূল্য সমান।

কিন্তু বা অনুরূপ হত্যাকাণ্ডে আর্থিক ক্ষতিপূরণ, কারাদণ্ড বা অনুরূপ কোন শাস্তির বিধান রয়েছে। আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। ক্ষতিপূরণ দেয়ার বেলায় ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করতে হয়। যে সন্তানদের পিতা এবং যে স্ত্রীর স্বামী অনিচ্ছাজনিত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়, তারা যে তাদের ভরণ-পোষণকারী থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু, যে সন্তানদের মাতা এবং যে স্বামীর স্ত্রী অনিচ্ছাজনিত হত্যাকাণ্ডে মারা যায়, তারা একটা মানসিক ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হয়ে থাকে, যা টাকা পয়সা দিয়ে পূরণ করা যায় না।

একজন মানুষ হিসেবে নিহত ব্যক্তির মূল্য কতখানি, দিয়াত দ্বারা তা নিরূপণ করা হয় না। বরং ঐ ব্যক্তিকে হারিয়ে তার পরিবার কতখানি আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হলো, সেটির মূল্যায়ন করা হয়। সুতরাং, যে ব্যক্তি কর্মজীবীও আবার নিজ পরিবারের ভরন-পোষণের দায়-দায়িত্বও বহন করে, তার সাথে ঐ ব্যক্তির ব্যবধান রয়েছে, যে কর্মজীবীও নয় এবং কারও ভরণ-পোষণের দায়িত্বও বহন করে না।

তবে যে সকল সমাজে নারীকে নিজের ভরণ-পোষণের জন্য জীবিকা উপার্জনের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না দেয়ার দর্শন চালু রয়েছে এবং কার্যত নারী তার পরিবার ও সন্তানদের ভরণ-পোষণে অবদান রাখে, সেই সমাজে এরূপ কোন কর্মজীবী নারী যখন খুন হবে, তখন ন্যায়-বিচারের দাবী অনুযায়ী তার দিয়াত নিহত পুরুষের দিয়াতের সমান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে রেফারেন্স হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেন, 'একজন মুসলমান নিহত হওয়ার পরিবর্তে দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর কাছে অধিকতর সহজ কাজ।'[৬৩]

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন বান্দাদের মধ্যে সর্বপ্রথম খুনের বিচার করা হবে।'[৬৪]

আবুল হাকাম আল বাজালি (র.) বলন, 'আমি আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা.) কে বর্ণনা করতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, আসমান-জমীনের সমস্ত বাসিন্দা যদি, একজন মু'মিনের হত্যায় অংশীদার থাকলেও আল্লাহ সবাইকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।'[৬৫]

---

৬৩ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ, ৫০, হাদীস নং- ১৩৩৪

৬৪ প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : নারী নির্যাতন রোধে ইসলামী আইনের প্রায়োগিক দিক

পবিত্র কোরআনে নারীর প্রতি অত্যন্ত সম্মান দেখানো হয়েছে এবং ইসলামে নারীদের নির্যাতন করার কোনো সুযোগ নেই। নারী নির্যাতনকারীকে ঘৃণ্য অপরাধী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যে সব কারণে নারীরা সমাজে নির্যাতিত হয়, সে সব থেকে বিরত থাকতে মুসলমানদের আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন।

নারী নির্যাতনের মূলে রয়েছে মানুষের সম্প্রীতি মানুষের মমত্ববোধ, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার অভাব এবং নারীর সম্পদের মোহ ও লালসা তাদের অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অথচ এসব লোভনীয় জাগতিক উপকরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততী, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।'[৬৬]

এ হাদীসের শেষ বাক্যটিতে নবী (স.) একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার প্রতি ইংগিত করেছেন। অর্থ্যাৎ যুলুম-নির্যাতনের সময় সীমা এমনিতেই খুব স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষ করে যুলুমের যে তীর নিজের কলিজার টুকরাকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হয় তা মযলুমের বক্ষ ভেদ করার পূর্বেই যালেমের জীবন কাল নিঃশেষ করে দেয়।

ইসলামের বৈবাহিক রীতি অনুযায়ী দু'জন আল্লাহভীরু নারী ও পুরুষ পরস্পরকে পছন্দ করে যে নীড় বাঁধে, সে সুখের ঘরে একে-অপরের প্রতি কোনোক্রমেই শত্রু ভাবাপন্ন ও নির্যাতনকারী হতে পারে না। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামের জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। নারী-পুরুষের সুন্দর শান্তিময় জীবন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, 'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়মানুযায়ী (সুন্দর ও মধুময় আচরণ স্ত্রীদেরও প্রাপ্য)।'[৬৭]

সামাজিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় ও বিজাতীয় অপসংস্কৃতির প্রভাব, সুস্থ বিনোদনের অভাব কিংবা অন্যান্য কারণে সমাজে বখাটে যুবকদের সংখ্যা বাড়ছে, তা সমাজের অভিভাবকদের যেমন খুঁজে বের করতে হবে, তেমনি নারী নির্যাতন প্রতিরোধের আন্দোলনেও শামিল হতে হবে। দেশে নারী নির্যাতনবিরোধী কঠোর আইন আছে, কিন্তু এর যথাযথ প্রয়োগের অভাবে সহিংসতা বন্ধ হচ্ছে না। তাই নারী নির্যাতনের শিকার হওয়ার আগেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম, খতিব ও ধর্মীয় নেতাদের সচেতনতা সৃষ্টির গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে।

সমাজে এমন এক সচেতনতার বিকাশ প্রয়োজন, যাতে আইনের ভয়ে নয়, বরং দায়িত্ব ও কর্তব্যের আহ্বানে সমাজে পুরুষ সদস্যরা নারীর প্রতি সুন্দর এবং মর্যাদাবোধসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবে। সেই সঙ্গে মা-বোনদেরও নিজ নিজ মানবিক মর্যাদা এবং অধিকার ও কর্তব্যের প্রতি সজাগ থাকা উচিত। পুরুষ নারীর প্রতিপক্ষ নয়, নারী পুরুষের প্রতিপক্ষ নয়; বরং দুয়ে মিলেই সমাজ। এ সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির লালন এবং নৈতিকতার বিকাশের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের বীজমন্ত্র।

নারীর সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিধানগুলোকে তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। নৈতিক প্রশিক্ষণ, সামাজিক সংস্কার ও ইসলামী আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

নৈতিক প্রশিক্ষণ

যত প্রতিবাদ, প্রতিরোধই করা হোক, কিংবা যত শক্ত আইনই প্রয়োগ করা হোক না,মানুষের মন-মানসিকতায় যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তণ না আসবে ততক্ষণ নারী নির্যাতন বন্ধের কোন প্রচেষ্টাই সফল হবে না। ইসলাম ব্যক্তির ও

---

[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১, হাদীস নং- ১৩৩৮

[৬৬] আল কুরআন, ৩ : ১৪

[৬৭] আল কুরআন, ২ : ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের সংশোধন এবং মন-মানসিকতার গঠনকে অন্য সব কিছুর ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। ইসলামের আবির্ভাবের প্রথম ১৩ বছর মুসলিমদের ওপর কোন ইসলামী আইন আরোপ করা হয়নি। এ সময়টা ছিল ইমান আনা এবং মুসলিমদের প্রকৃত মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার সময়।

এই দীর্ঘ সময়ের প্রশিক্ষণের ফলে তৈরী হওয়া খাঁটি মুসলিমরাই পরবর্তীতে মদিনা রাষ্ট্রের গঠন এবং এই রাষ্ট্রকে শক্তিশালি করে তুলতে সহায়তা করেছে। মদীনা রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর যখন এ মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামী আইন বাস্তবায়নে সার্বিকভাবে প্রস্তুত, তখনই তাদের ওপর ইসলামী আইন প্রয়োগ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ পশু-পাখি কিংবা অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় যা খুশি তাই করে বেড়াতে পারে না। বরং সৃষ্টিগতভাবেই সে ফেরেশতাসূলব উচ্চ নৈতিকতার অধিকারী। কিন্তু ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারনা ও বিকৃত শিক্ষা তাকে অধঃপতন ও নীচুতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসা ও পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে সবার আগে মানুষের নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী ও পুরুষের প্রত্যেকে তার নিজের মর্যাদা, অবস্থান ও দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। আশা করা যায়, এর দ্বারা মানুষের মানসিকতায় পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হবে।

মর্যাদার অনুভূতি

মানুষ সৃষ্টার সেরা সৃষ্টি। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই এমন যে, পাপকাজ তার স্বভাবজাত নয়। বরং, ন্যায় ও ভালো কাজই তার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। মানুষের মহত্ত্ব ও মর্যাদা অন্যায় কাজে নয়, বরং কল্যাণকর ও ভালো কাজে। এ কারণেই মানুষ অন্যায় কিছু করলে বিবেকের অনুশোচনায় ভোগে।

মানুষের আত্মমর্যাদাবোধই প্রশংসনীয় ও মর্যাদাকর কাজের সাথে জড়িত। সৎ স্বভাব ও ন্যায় কাজের দ্বারাই তার ব্যক্তিত্বের লালন হয়। তার মধ্যে যদি এই মৌলিক গুণটি না থাকে, তাহরে সারা দুনিয়ার কাছে সে গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হবে। এ অনুভুতি একজন মানুষকে সৎ আচরণ ও ভালো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অনুভুতি প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তারা যখন কোন মন্দ কাজ করে, তখন বলে: আমরা বাপ-দাদাকে এমনি করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছেন। আল্লাহ মন্দ কাজের আদেশ দেন না। এমন কথা আল্লাহর প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জান না।[৬৮]

বিবেকের আহ্বান

আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য তৈরী করে দিয়েছেন, যা সবরকম অন্যায়ের ব্যাপারে ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করে। এ অনুভুতি মানুষকে অনেক রকম পাপকাজ থেকে বিরত রাখে। তাকে সর্বদা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পাপ কর্মের কালিমা মানুষের মর্যাদা ও মহত্বের অনুভুতি ভুলুণ্ঠনকারী এবং মহান আল্লাহ তাকে যে সুউচ্চ পদ-মর্যাদা দান করেছেন তার পরিপন্থি।

কিন্তু বিবেকের এ আহ্বানে যদি কর্তপাত না করা হয়, তবে তা দুর্বল হয়ে পড়ে। ইসলাম তার শিক্ষার মাধ্যমে বিবেককে আরো শক্তিশালী করে তোলে, যাতে তা মন্দ ও অকল্যান প্রবেশের সে সব রাস্তাও পাহারা দেয়, যেখানে আইনের ভয়, বদনামের আশংকা এবং সামাজিক চাপ পাহারাদারী করতে অক্ষম।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন, তোমরা ধারণা, অনুমান থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখো। কেননা তা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। কারো দোষ খুঁজে বেড়িওনা, গোয়েন্দাগিরি করো

[৬৮] আল কুরআন, ৭ : ২৮

Dhaka University Institutional Repository

না, একে অন্যের প্রতি হিংসা করো না, বিদ্বেষ ও শত্রুভাব রেখো না, বিচ্ছেদ ভাব দেখিও না। বরং তোমরা সবাই এক আল্লাহর বান্দাহ হয়ে ভাই ভাই বনে যাও।'[৬৯]

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা একে অন্যেও প্রতি বিদ্বেষভাব রাখবে না, পরস্পর হিংসা করবে না, বিচ্ছেদ ভাবাপন্ন হবে না, বরং সবাই এক আল্লাহর বান্দাহ হয়ে ভাই ভাই বনে যাও। একজন মুসলমানের পক্ষে তার (মুসলমান) ভাই হতে (বিরাগবশত) বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনদিনের বেশি সালাম-কালাম বন্ধ রাখা জায়েজ নাই।'[৭০]

নাওয়াস ইবনে সামআ বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী (স.) এর কাছে নেককাজ ও গোনাহর তাৎপর্য জানতে চাইল। নবী (স.) তাকে জবাব দিলেন- 'নেকী হচ্ছে উত্তম চরিত্র আর গোনাহ হচ্ছে তাই যা, তোমার মনে দ্বিধা ও সংকোচের সৃষ্টি করে এবং মানুষ সে সম্পর্কে অবহিত হোক তা তুমি পছন্দ করো না।'[৭১]

রাসুল (স.)-এর মহামূল্যবান এই বানী অনেকগুলো গভীর তাৎপর্য উন্মুক্ত করে তুলেছে। নেকীর কাজ তাই যাতে নৈতিক চরিত্রের সৌন্দর্য ও মাধুর্য এবং কর্মে পবিত্রতার দীপ্তি ফুটে উঠেছে। কিন্তু গোনাহ এ সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব থেকে বঞ্চিত। মন্দ ও অকল্যানের বৈশিষ্ট্য হলো, তা সব সময় হৃদয়-মন ও বিবেকের কাঁটা হয়ে থাকে। তা অপরাধীকে কখনও মনের সজীবতা প্রফুল্লতা নিয়ে জনসমক্ষে আসতে দেয় না। কিন্তু একজন সৎ মানুষের হৃদয়-মন-বিবেকের এ দংশন ও টানাপোড়েন থেকে মুক্ত থাকে। নিজের কাজের জন্য তাকে অনুতাপ ও অনুশোচনা করতে হয় না। বরং সে খুশী ও নিশ্চিত থাকে এই ভেবে যে, অতীত জীবনে সে তাই করেছে যা তার করা উচিত ছিল।

এ প্রসঙ্গেই রাসুল (স.) এর আরও একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়- 'তোমার ভালো কাজ যদি তোমাকে আনন্দিত করে এবং মন্দ কাজ অসন্তুষ্ট করে তাহলে তুমি ঈমানদার।'[৭২]

বিবেকের এ অনুভুতি জাগ্রত থাকলে পুরুষ-নারীর মর্যাদা ও অধিকার হরণ করতে পারে না। নির্যাতন তো দুরের কথা।

লজ্জাবোধের লালন

মর্যাদাবোধ যখন জেগে ওঠে এবং বিবেকের শক্তি জীবন্ত থাকে তখন মানুষ তার মর্যাদার তুলনায় নীচু কোন কাজ করতে লজ্জা ও অপমানবোধ করে। এ বোধ ও অনুভুতি যদি নিস্তেজ হয়ে পড়ে তবে মানুষকে গোনাহর হাত থেকে রক্ষাকারী সমস্ত শক্তিই দুর্বল হয়ে পড়ে।

একজন লজ্জাশীল মানুষের নিজের পক্ষে গোনায় লিপ্ত হওয়া তো দুরের কথা, অন্য কারও অন্যায় কিংবা গোনাহের কাজও সে দেখতে পারে না। এমনকি গোনাহ কিংবা অপরাধের কল্পনাও একজন আল্লাহভীরু ব্যক্তির মাথা লজ্জায় অবনত করে দিতে পারে। প্রত্যেক যুগে ভাল কাজের দিকে আহ্বানকারী প্রত্যেক আল্লাহর বান্দা এ সত্যটি বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

হযরত আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.) বলেছেন, 'অতীত যুগের নবীদের শিক্ষার যে অংশটুকু মানুষের কাছে পৌঁছেছে তার মধ্যে একথাও আছে যে, যদি তোমার লজ্জা-শরম না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তাই করো।'[৭৩]

লজ্জা হলো ঈমানের একটি শাখা। এ ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট এসেছে, 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা রয়েছে। এরমধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হলো,

---

৬৯ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৬৮, হাদীস নং- ৫৬২৯

৭০ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৬৯, হাদীস নং- ৫৬৩০

৭১ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, জিহাদ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ: মাজায়ে ফিল বাররে ওয়াল ইছমে।

৭২ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, কিতাবুল আদব, অনুচ্ছেদ: 'ইযা লাম তাসতাহয়ী ফাসনা' মা শি'তা।

৭৩ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারি* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ, ২০০৬), খ. ৫, পৃ. ৪৪৫

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহছাড়া আর কোন ইলাহ নেই'- এ বাক্য; সাধারণ শাখা হলো- কষ্টদায়ক কোনো জিনিসকে পথ থেকে সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা-শরমও ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী ও মুসলিম)।[৭৪]

অন্য একটি হাদীসে লজ্জাশীলতা সম্পর্কে এসেছে এভাবে, 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। আর লজ্জা-শরম হলো ঈমানের একটি শাখা।'[৭৫]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেছেন, ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। অথবা ষাটটিরও কিছু বেশি।এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে, আল্লাহ ব্যতীত ইলাহ নেই- এ কথা স্বীকার করা। আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা হল ঈমানের বিশিষ্ট একটি শাখা।'[৭৬]

লজ্জা-শরম ও আত্মমর্যাদাবোধের শিক্ষা সবসময়ই নবুওয়াতের শিক্ষার সাথে অঙ্গীভূত হয়েছে কেন এক সময় নবী (স.) তার কারণ বর্ণনা করেছেন। একবার হযরত সা'দ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসুল! কেউ যদি দেখে যে, কোনো এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করেছে তাহলে তার আত্মমর্যাদাবোধ কি তাকে কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক চারজন সাক্ষী তালাশ করে আনার অনুমতি দেবে? আল্লাহ না করুন! আমার ক্ষেত্রে এরূপ অসহনীয় ঘটনা ঘটলে আমি প্রথমে সে বদমাশকে সেখানেই হত্যা করবো। আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এ বক্তব্য শুনে নবী (স.) উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা সা'দের মর্যাদবোধ দেখে বিস্মিত হচ্ছো? আল্লাহর শপথ, আমি তার চেয়ে অধিক মর্যাদাবোধ সম্পন্ন। আল্লাহ তাঁর এ মর্যাদাবোধের কারণে গোপন ও প্রকাশ্য সবরকম অশ্লীলতা ও লজ্জাহীনতা হারাম ঘোষণা করেছেন।'[৭৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'নবী (স.) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মসম্ভ্রমবোধশালী নয় এবং এ কারণেই তিনি সব রকমের খারাপ কাজ (যেমন অবৈধ যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি) হারাম ঘোষণা করেছেন এবং আল্লাহ ব্যতীত কেউ নিজ প্রশংসা বেশি পছন্দ করেন না।'[৭৮]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেন, হে মুহাম্মদের উম্মতেরা (অনুসারীরা), আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নাই। সুতরাং, তিনি হারাম করে দিয়েছেন, যেন তার কোন বান্দা অথবা বান্দী অবৈথ যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত না হয়। হে মুহাম্মদের উম্মতেরা! যা আমি জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে খুব কম হাসতে এবং বেশি বেশি কাঁদতে।'[৭৯]

দুনিয়ার সর্বাধিক আল্লাহভীরু ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে- 'নবী (স.) পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল ছিলেন। লজ্জাহীনতার কোন ব্যাপার ঘটলে তিনি মুখে কখনও তার উল্লেখ পর্যন্ত করতেন না। বরং তাঁর চেহারায় অনীহা ও অপছন্দের অভিব্যক্তি ফুটে উঠতো যা আমরা বুঝতে পারতাম।[৮০]

বর্তমান সমাজের এতবেশি অবক্ষয়ের কারণ এ লজ্জাহীনতা। লজ্জাহীনতা অশালীনতার চর্চা বৃদ্ধি করে। যার ফলশ্রুতিতে পথে-ঘাটে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে।

---

৭৪ আল্লামা ওলিউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতীব আল উমারী আত তাবরিযী, অনু: মাওলানা, এ বি এম এ খালেকুজ্জামান মজুমদার, *মিশকাত শরীফ* (ঢাকা: মুরাদ পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল, নভেম্বর, ২০০০),খ. ১, পৃ. ৩৭

৭৫ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, জুন- ১৯৯২), খ. ১, পৃ. ১১০, হাদীস নং- ৫৯

৭৬ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ১১১, হাদীস নং- ৬০

৭৭ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৭), খ. ৬, পৃ. ৪৭৪, হাদীস নং- ৬৮৯৯। ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল- সেপ্টেম্বর, ১৯৯২), খ. ৫, পৃ. ২৮৯, হাদীস নং- ৩৬২১

৭৮ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯১, হাদীস নং- ৪৮৩৭

৭৯ ইমাম বুখারি, সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯১, হাদীস নং- ৪৮৩৮

৮০ ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৩), খ. ৬, পৃ. ৩২৭, হাদীস নং- ৫৮২৫

Dhaka University Institutional Repository

আখিরাতের জবাবদিহীতার ভয়

আখিরাতের জবাবদিহীতার ভয় মানুষের মনে এ ধারণার সৃষ্টি করে যে, তার কোন কাজ-কর্মই সে মহান সত্ত্বার দৃষ্টির আড়াল হতে পারে না, এমনকি তা যত গভীর ও নিশ্চিদ্র অন্ধকারেই করা হোক না কেন, মানুষের মনের ইচ্ছা পর্যন্ত তিনি সম্যকভাবে অবগত এবং এমন একদিন অবশ্যই আসবে যে দিন মানুষের প্রত্যেকটি সূক্ষ সূক্ষ কাজের হিসাব সর্বসম্মুখে প্রকাশ করা হবে।

ইসলাম এ দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, এ বিশ্বজাহানে এমন একটি মহান সত্তা আছেন যাঁর দৃষ্টি থেকে কোনো মানুষের কাজকর্মের কোন অংশই আড়াল হতে পারে না। দিবালোকে সংঘটিত কাজকর্ম যেমন আড়াল হতে পারে না তেমনি রাতের গভীর অন্ধকারে সংঘটিত কাজ-কর্মও আড়াল হতে পারে না। পাহাড়ের মতো বিরাট বিরাট ঘটনা থেকে শুরু করে মনের গভীরের ইচ্ছা অনুভূতি পর্যন্ত তিনি সমানভাবে পরিজ্ঞাত এবং এমন একটি দিন অবশ্যই আসবে যখন সমস্ত মানুষের সামনে তার সব কাজকর্মের দফতর খুলে ধরা হবে। সর্বজ্ঞ ও সুক্ষদর্শী সত্তার সামনে তাকে প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে। এ বিশ্বাস মানুষকে সে সব কাজ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করে যা তাকে লাঞ্ছিত ও খাটো করে।

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, কাল দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এবং তাদের প্রভু ও মালিকের সামনে তার জীবনের সমস্ত কাজকর্ম পড়ে শুনানো হবে এবং তার জীবনের দোষ-ত্রুটি ও কলুষ কালিমা প্রকাশ করে দেওয়া হবে তাহলে তার চেয়ে সতর্ক ও পবিত্র জীবনের অধিকারী আর কে হতে পারে? এ বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করার জন্য কুরআন মাজিদের বিভিন্ন স্থানে এমন ভঙ্গিতে কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যাতে যালেমদের সীমাহীন আফসোস এবং চরম অপমান ও লাঞ্ছনার চিত্র ফুটে ওঠে। এর সাথে সাথে কুরআন মাজিদ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে সৎলোকদের শুভ পরিনামের কথা উল্লেখ করে যাতে মানুষের দৃষ্ঠিতে গোনাহ ঘৃণিত ও নেককাজ প্রিয় হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জল, সহাস্য, প্রফুল্ল এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধুলি ধুসরিত। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে। তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।[৮১]

আখিরাতের জবাবদিহিতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা আরও অনেক জায়গায় বিভিন্নভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশি। তার তাদের মুখমণ্ডলকে আবৃত করবে না মলিনতা কিংবা অপমান। তারাই হল জান্নাতবাসী, এতেই তারা বসবাস করতে থাকবে অনন্তকাল। আর যারা সঞ্চয় করেছে অকল্যাণ- অসৎ কর্মের বদলায় সে পরিমাণ অপমান তাদের চেহারাকে আবৃত করে ফেলবে। কেউ নেই তাদের বাঁচাতে পারে আল্লাহর হাত থেকে। তাদের মুখমণ্ডল যেন ঢেকে দেওয়া হয়েছে আঁধার রাতের টুকরো দিয়ে। এরা হল দোযখবাসী। এরা এতেই থাকবে অনন্তকাল।[৮২]

একজন ঈমানদারের ঈমানের ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর সত্তা এবং প্রতিদান বা কিয়ামত দিবসের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। তার জীবনের সব কাজকর্ম এ কেন্দ্রবিন্দুর চতুর্দিকে আবর্তিত হয়। মন ও মগজের মধ্যে এ আকীদা-বিশ্বাস দৃঢ়মূল হওয়ার পর গোনাহর কল্পনা করা পর্যন্ত তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গোনাহ তার কাছে আর আনন্দের কারণ থাকে না। বরং এ কারণে মন সংকোচ অনুভব করতে থাকে।

এখানে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর একটি ঘটনা প্রনিধানযোগ্য। হযরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষ। মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে সবচেয়ে সুন্দর চেহারা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ইউসুফ (আঃ) এর সৌন্দর্য দেখে মিশরের সুন্দরীরা এক কথায় দিওয়ানা। তারা নানাভাবে ইউসুফ (আঃ)কে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। অনৈতিক পন্থায়ও তাকে পাওয়ার চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) ছিলেন আল্লাহর ভয়ে ভীত। অবস্থা এতটা নাজুক হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর কাছে হাত তুলে দু'আ করা ছাড়া কোন উপায়

---

[৮১] আল কুরআন, ৮০ : ৩৮-৪২

[৮২] আল কুরআন ১০ : ২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

ছিল না। আল্লাহর কাছে তিনি দু'আ করতে থাকেন যেন, চরম বিপদের সময়ও তার পা মজবুত রাখেন। সেই দোয়ার বিষয়টিই আল্লাহ তায়াল সুরা ইউসুফ-এ সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, 'ইউসুফ বলল: হে পালনকর্তা, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব।'[৮৩]

ঘটনার বাস্তবতা আর ইউসুফ (আঃ) এর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিই এখানে আলোচ্য বিষয়। একদিকে যেমন প্রবৃত্তির কামনাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য শত রকমের চক্রান্ত করা হচ্ছে। হাজারো রকমের ধোঁকাবাজি ও চক্রান্তের জাল বিছানো হচ্ছে, তাকওয়া এবং পবিত্রতাকে নষ্ট করার সবরকমের চেষ্টা করা হচ্ছে, তখন অন্যদিকে রক্ত-মাংস, আবেগ-অনুভূতি, আশা-আকাঙ্খা এবং কামনা-বাসনার অধিকারী মানুষই রূপ ও সৌন্দর্যের আবেদনকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যান করছেন। কারাগারের অন্ধ-প্রকোষ্টের সহস্র বেদনাকেও তিনি অবজ্ঞা করে হাসিমুখে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি তাকওয়ার চূড়ান্তপর্যায়ে পৌঁছাতে না পারলে এমন অবস্থা হাসিমুখে বরণ করা অসম্ভব।

হযরত মারিয়াম (আঃ) এর একটি ঘটনা। একদিন তার গৃহে আকস্মাৎ এক সুঠামদেহী সুদর্শন পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। নির্জন পরিবেশে তাকে দেখা মাত্রই হযরত মারিয়াম (আঃ) ভয়ে বলে উঠলেন, 'মারইয়াম বলল: আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও।'[৮৪]

এখানে উল্লেখ্য, হযরত মারিয়াম (আঃ) এর গৃহে যে সুদর্শণ যুবকের আবির্ভাব হয়েছিল তিনি আসলে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত তার রূহ। যে মারিয়াম (আঃ) এর কাছে মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেন। এ বর্ণনাই উক্ত সূরার পূর্ববর্তী আয়াতে দেয়া হয়েছে।

আখিরাতের জবাবদীহির বিষয়টা বর্ণনা হয়েছে রাসুল (স.) এর এক হাদীসে। ওই হাদীসে রাসুল (স.) বলেন, 'যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত প্রকার মানুষকে আল্লাহ তা'আলা ছায়া দান করবেন। সেই যুবকও তাদের মধ্যে একজন, যে আল্লাহর বন্দেগীর মধ্যেই বেড়ে উঠেছে। সে ব্যক্তিও তাদের মধ্যে শামিল যাকে কোনো মর্যাদার অধিকারিনী সুন্দরী যুবতী পাপ কাজে লিপ্ত হতে আহ্বান জানায়, কিন্তু সে এ বলে তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যে, গোনাহের কাজে আমি আল্লাহকে ভয় পাই। ওই ব্যক্তি, যে কিছু দান করল এবং এত গোপনভাবে করল যে, তার ডান হাত জানতে পারল না, তার বাম হাত কী দান করেছে। এমন ব্যক্তিও তাদের একজন, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের আমলের কথা মনে হওয়ায় তার চোখে অশ্রু ঝরতে থাকে।'[৮৫]

আখিরাতের জবাবদিহীতার বিষয়টা একেবারেই স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। এখানে কারও প্রতি কোন দয়া কিংবা অনুকম্পা দেখানো হবে না। এমনকি কারও কর্মের কোন বেশ-কম করা হবে না। এ বিষয়টাই পবিত্র কুরআন শরীফে খুব সুন্দর করে বলা হয়েছে, 'অতঃপর কেউ অনু পরিমাণ সৎকর্ম তা দেখতে পাবে। এব কেউ অনুপরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।'[৮৬]

এর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কুরআন আমাদের বলে, 'অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল, স্বহাস্য ও প্রফুল্ল। এবং অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে ধূলিধূসরিত। তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে।'[৮৭]

---

৮৩ আল কুরআন, ১২ : ৩৩

৮৪ আল কুরআন, ১৯ : ১৮

৮৫ ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারি* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০০৫), খ. ২, পৃ. ১৮, হাদীস নং- ১৩৩১। ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: জুন ১৯৯১), খ. ৩, পৃ. ৪৩৫, হাদীস নং- ২২৪৮

৮৬ আল কুরআন, ৯৯ : ৭-৮

৮৭ আল কুরআন, ৮০ : ৩৮-৪১

Dhaka University Institutional Repository

আখিরাতের জবাবদিহিতার এ ভয় মানুষকে অন্যের অধিকার হরণ করা, প্রাপ্য মর্যাদা নষ্ট করা, অহেতুক হয়রানি করা কিংবা এমন অন্যান্য সব অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে, যা কোন আইন প্রয়োগ করে রোধ করা সম্ভব নয়।

গোনাহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা

মানুষের সৃষ্টিগত প্রবৃত্তি হলো, গোনাহর কাজ না করা। তথাপি, মানুষ নানা প্রলোভন ও ভুল নির্দেশনার শিকার হয়ে গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হলে তাই মানুষকে গোনাহ ও নেকি, হক ও বাতিল এবং সুন্দর ও অসুন্দর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনা রাখতে হবে।

গোনাহ আসলে কী? গোনাহ শব্দটি ফারসী। এর অর্থ: পাপ কাজ, অপরাধমূলক কাজ। অন্যায় কাজ করা। ইসলামে হালাল হারামের সীমারেখা নির্ধারণ করা আছে। এই সীমারেখা অতিক্রম করলেই কেবল গোনাহের ভাগীদার হয়ে যাবে। অপরাধের মাত্রা ভেদে এর বিভিন্ন ধরনও থাকে। ছোট গুনাহ (ছগিরা গুনাহ), বড় গুনাহ (কবিরা গুনাহ)। তবে কোন পর্যায়ে গেলে কোনটা ছগিরা হবে আর কোনটা কবিরা হবে এর কোন মাপকাঠি নেই। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ছগিরা গুনাহও কবিরা গুনাহ হয়ে যেতে পারে। তবে রাসুলুল্লাহ (স.) চারটি কবীরা গুনাহ সম্পর্কে নিজে থেকেই জনিয়ে দিয়ে তার উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন, 'হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (স.) কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যচরণ করা, মানুষ হত্যা করা এবং মিথ্যা বলা (কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত)।'[৮৮]

এছাড়া আর কোন কোন গুনাহ কবীরা (বড়) হতে পারে, তাদের পরিচয় দেয়া যেতে পারে এভাবে-

কবীরা গুনাহ বলা হয় ওই সকল বড় বড় পাপকর্ম সমূহকে যেগুলোতে নিম্নোক্ত কোন একটি বিষয় পাওয়া যাবে:

ক) যে সকল গুনাহের ব্যাপারে ইসলামে শরীয়তে জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

খ) যে সকল গুনাহের ব্যাপারে দুনিয়াতে নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগের কথা রয়েছে।

গ) যে সকল কাজে আল্লাহ তায়ালা রাগ করেন।

ঘ) যে সকল কাজে আল্লাহ তায়ালা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ফেরেশতা মণ্ডলী লানত দেন।

ঙ) যে কাজের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যে এমনটি করবে সে মুসলমানদের দলভুক্ত নয়।

চ) কিংবা যে কাজের ব্যাপারে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

ছ) যে কাজে দ্বীন নাই, ঈমান নাই ইত্যাদি বলা হয়েছে।

জ) যে ব্যাপারে বলা হয়েছে এটি মুনাফিকের আলামত বা মুনাফিকের কাজ।

ঝ) অথবা যে কাজকে আল্লাহ তায়ালার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

কবীরা গুনাহ হোক আর ছগিরা গুনাহ হোক, যে কোন ধরনের অপরাধ থেকে বেঁচে থাকতে পারলে আল্লাহর পক্ষ থেকে যেমন মর্যাদার অধিকারী হওয়া যাবে, তেমনি দুনিয়া এবং আখিরাতে সফলকাম হওয়ারও সম্ভাবনা অনেক বেশি বেড়ে যাবে। যেমন মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, 'যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় গোনাহ গুলো থেকে বেঁচে থাকতে পার। তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব।'[৮৯]

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুম'আ থেকে আরেক জুম'আ এবং এক রমজান থেকে আরেক রমজান এতদুভয়ের মাঝে সংঘটিত সমস্ত পাপরাশীর জন্য কাফফারা স্বরূপ যায় যদি কবীরা গুনাহ সমূহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।'

---

৮৮ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬২, হাদীস নং- ১১৪৫

৮৯ আল কুরআন, ৪ : ৩১

Dhaka University Institutional Repository

কেউ অপরাধ করলে কোনভাবেই তা থেকে পার পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। শরীরের যে সব অঙ্গ দিয়ে অপরাধ করে যাবে মানুষ, কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সে সব অঙ্গ সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট বানী রয়েছে। আল্লাহ তায়াল বলেন, 'যেদিন প্রকাশ করে দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু করত। সেদিন আল্লাহ তাদের সমুচিত শাস্তি পুরোপুরি দেবেনএবং তারা জানতে পারবে যে,আল্লাহই সত্য,স্পষ্ট ব্যাক্তকারী।'[৯০]

কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে শুধুমাত্র মুখই বান্দার গোনাহ'র সাক্ষ্য দেবে না, সে সঙ্গে আল্লাহর অনুমতি নিয়ে প্রত্যেক অপরাধীর অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দুনিয়ায় তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে কথা বলতে থাকবে। তখন অপরাধীদের মনে হবে, তাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ তাদের কৃতকর্মকে রেকর্ড করে রেখেছিল যা এখন আল্লাহর নির্দেশে ফাঁস করে দিচ্ছে।

মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার শরীরের সাক্ষ্য ও ভাষ্য অনুযায়ী সেদিন সঠিকভাবে প্রত্যেক অপরাধীর বিচার করা হবে। এই বিচার করতে গিয়ে আল্লাহ তার বান্দার সঙ্গে এক তিল পরিমাণ অন্যায় আচরণ করবেন না। তখন অপরাধীরা তাদের ভুল বুঝতে পারবে, তারা বুঝতে পারবে ভুল করে বা অবহেলা করে কতই না গোনাহ করেছে। যদিও সেদিন এ উপলব্ধি তাদের কোনো কাজে আসবে না।

জীবনের অন্যসব ক্ষেত্রের মত, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ন্যায় অন্যায়, সুন্দর ও অসুন্দরের দিক নির্দেশনা রয়েছে। উভয়ের কী ধরনের সম্পর্ক আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ আর কোন সম্পর্ক ঘৃণিত এবং দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যর্থতা ও ক্ষতির কারণ এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারনা থাকতে হবে।

নারী পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক পরীক্ষাস্বরূপ

নারী ও পুরুষের পারস্পরিক আকর্ষণ ও সম্পর্ক মানুষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। একদিকে আবেগের আতিশয্য তাকে সবরকম বন্ধন ছিন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে যেখান থেকে সে ন্যায়বান এবং পবিত্র কিংবা অন্যায়কারী এবং পাপাচারি হওয়ার সিদ্ধান্ত সহজেই গ্রহণ করতে পারে। অন্যদিকে আল্লাহভীতি এবং বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতির দাবী তাকে সীমারেখা মেনে চলতে বাধ্য করে। এ দ্বন্দ্ব-সংঘাত ব্যক্তির ঈমানের দাবী পরীক্ষার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। সে তার আকীদা-বিশ্বাস ও সংকল্পে কতটা পরিস্কার এবং স্বচ্ছ এভাবে তার একটা পরীক্ষা ও হয়ে যায়।

নবী (স.) এর পক্ষ থেকে এ বিষয়টি এভাবে এসেছে যে, 'হযরত উসমান ইবনে যায়েদ (রা.) নবী (স.)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন, 'নবী (স.) বলেছেন, আমার পরে পুরুষদের জন্য স্ত্রী লোকের চেয়ে ক্ষতিকর আর কোন ফিতনা বাকী রইল না।'[৯১]

অন্য একটি ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, 'প্রত্যহ ভোরে দু'জন ফেরেশতা এ মর্মে ঘোষণা করে যে, পুরুষদের জন্য মেয়েরা এবং মেয়েদের জন্য পুরুষরা ধ্বংসাত্মক।'[৯২]

---

৯০ আল কুরআন, ২৪ : ২৪-২৫

৯১ ইমাম বুখারী, সহীহ বুখারি, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৪, হাদীস নং- ৪৭২৩

৯২ ইমাম ইবনে মাজা, *সুনান ইবনে মাজাহ*, আবওয়াবুল ফিতান, অনুচ্ছেদ: ফিতনাতুন নিসা ও ইমাম হাকেম, মুসতাদরেক, খ. ২, পৃ. ১৫৯ (এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারী খারেজা ইবনে মুসআবকে অধিকাংশ মুহাদ্দিস দুর্বল ও অবিশ্বাসযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন তবে মুহাদ্দিস ইবনে আবী হাতেমের সিদ্ধান্ত এতো কঠোর নয় ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া হাদীসটির সনদের একটি বর্ণনা পরম্পরার সমালোচনা করেছেন এবং অন্যগুলোকে বিশুদ্ধ মনে করেছেন এখানে উল্লিখিত হাদীসটি পরিত্যক্ত সনদে বর্ণিত নয় দ্রষ্টব্য, তাহযীবুত তাহযীব, খ. ৩য়, পৃ. ৭৬ থেকে ৭৮)

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্রতার পুরস্কার

পাপ-পূন্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে যে ব্যক্তি পবিত্রতাকে বর্জন করে না এবং আবেগ উত্তেজনার অযৌক্তিক ও বিবেক বর্জিত দাবি যা সরল ও সত্য পথ থেকে ফিরাতে পারে না, তার জন্য কামিয়াবী অপেক্ষা করছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়াল ইরশাদ করেন, 'এবং যারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ্ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যাতিত, তাকে হত্যা করে না এবং ব্যাভিচার করে না। যারা এ কাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।'[৯৩]

রাসুলুল্লাহ (স.) অন্য একটি হাদীসে বলেছেন, 'হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন: এ পৃথিবী একটি মিষ্টি ও তরতাজা বস্তু। আল্লাহ তোমাদের এ স্বাদ ও গন্ধময় পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করতে যাচ্ছেন। অতএব তোমরা দুনিয়ার বৈচিত্রের মোহ থেকে দুরে থাকো এবং নারীদের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকো। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি বনী ইসরাঈলদের সর্বপ্রথম পরীক্ষা হয়েছিল নারীদের মধ্যেমে।[৯৪]

রাসূলুল্লাহ (স.) এর এই পবিত্র হাদীসটি এ শিক্ষাই দিচ্ছে যে, বিশেষ করে যারা হয় পবিত্রতার রক্ষক, যাদের ফেরেশতার ন্যায় নিষ্কলুষ জীবন পবিত্রতার মানদণ্ড বলে বিবেচিত। কিন্তু যে জাতির জীবন এ মহামূল্যবান বস্তু থেকে মুক্ত তাকে আল্লাহ তায়ালা এ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করেন। দেখে উপদেশ গ্রহণ করার মত চক্ষু থাকলে অতীত জাতিসমূহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে যে, প্রবৃত্তি পূজার কারণে কিভাবে তাদেরকে খিলাফতের পদ মর্যাদা থেকে অপসারণ করা হয়েছে।

ব্যাভিচারের পরিনাম

প্রশ্ন হলো মানুষ ব্যাবিচারে লিপ্ত হয় কেন? দুটি কারণ হতে পারে। একটি হতে পারে– মানুষ এর মধ্যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করে। এতে তার আবেগ উত্তেজনা ও কামনা-বাসনা তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করে। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে, সে ব্যক্তি পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন-যাপন করতে পারে না, তাই বাধ্য হয়েই হয়তো ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়। এখানে প্রশ্ন হলো, কিভাবে বাধ্য হয়? মূলতঃ পরিবেশ বা সমাজ এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে কারণে কোন ব্যক্তিকে ব্যাভিচারে বাধ্য করে। কিংবা ভ্রান্ত কোন ধ্যান-ধারনা অথবা আকিদা-বিশ্বাসের কারণেও সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে এই দুটি কার্যকারণ বন্ধ করা না গেলে হয়তো পবিত্রতার ক্ষেত্রও নিরাপদ হবে না।

ব্যভিচার ও তার বিষময় ফলাফল থেকে বাঁচতে হলে দুটি জিনিস অত্যন্ত জরুরি। প্রথমত, মানুষের চোখে গোনাহের বৈচিত্র ও নতুনত্ব ফিকে এবং আকর্ষণীয় হওয়া। দ্বিতীয়ত, তার সামনে সঠিক পথ খোলা থাকা। যাতে সে আবেগ উত্তেজনার মোকাবিলায় নিরস্ত্র হয়ে না পড়ে। আর সঠিক পথগুলোতে এতোটা আকর্ষণ ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যে, ব্যক্তি মাত্রই অবৈধ পথের দিকে তাকানোর প্রয়োজন হবে না।

মূলতঃ ইসলামের শ্বাশত বিধানই পারে ব্যাভিচারের সর্বগ্রাসীরূপ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে। ইসলাম ব্যাভিচার কিংবা গোনাহের কাজকে আকর্ষণহীন করার জন্য এমন একটি জীবনের ধারণা পেশ করেছে যে তা এ জীবনের চেয়ে অধিক বৈচিত্র্যময় ও অনেক বেশী আকর্ষনীয়। যিনিই এই জীবনের অভ্যন্তরে প্রভেশ করবেন, তিনিই উপলব্দি করবেন, যে এই জীবনের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-সামগ্রী প্রচুর ও অফুরন্ত।

---

[৯৩] আল কুরআন, ২৫ : ৬৮

[৯৪] সহীহ আল মুসলিম; *ইবনে মাজা*, আবওয়াবুল ফিতান। তবে ফা-ইন্না আউয়াল ফিতনাতা... থেকে শেষ অংশটুকু উল্লেখ নেই।

Dhaka University Institutional Repository

বৈধ সম্পর্ক সৃষ্টির কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়

যে সব উপায় ও পন্থা বিয়ের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হতে পারে বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থান করে, সেসব উপায় ও পন্থা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে অবিবাহিতের পর্যায়ে রাখে তা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছে।
মূলতঃ ইসলামী শরীআত খুব সূক্ষ ও গভীর দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে বিয়েকে একটি সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত করেছে। এ প্রেক্ষাপটে এসেই বৈধ সম্পর্ক সৃষ্টির কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়াস চালাচ্ছি–

এক: প্রেম-ভালবাসার বৈধ সীমা

যে অবস্থা পুরুষকে নারীর জন্য আনন্দ ও খুশীর কারণ এবং নারীকে পুরুষের জন্য হৃদয় মনের প্রশান্তির কারণ বানায় তা প্রেম ও ভালোবাসা ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না। কোনো নারী ও পুরুষের মধ্যে যদি স্বাভাবিকভাবে মিল মহব্বত ও ভালোবাসা গড়ে ওঠে তাহলে শরীআত তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ দেয়। এ ব্যাপারে একটি হাদীস, 'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, পরস্পরকে ভালোবাসে এমন দু'জন নারী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের চেয়ে উত্তম কিছু আর নেই।'[৯৫]
উপরোল্লিখিত হাদীসটি আমাদের সামনে দুটো দিক তুলে ধরে। একটি হলো– স্বাভাবিকভাবেই যদি কোথাও ভালোবাসার কারণসমূহ পাওয়া যায় তাহলে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা উচিৎ। যাতে ভালোবাসার এই কারণ ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর না হয়ে কল্যাণপ্রসূ এবং সুফলদায়ক হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়টি হলো– মন-মেজাজের ঐক্য ও সাদৃশ্য সম্ভ্রম ও পবিত্রতা রক্ষায় অনেক সহায়ক হয়। কারণ, বৈধ উপায় উপকরণের প্রতি মানুষের যতো অধিক আকর্ষণ থাকবে, অবৈধ উপায়-উপকরণের প্রতি আকর্ষণ ততোটাই হ্রাস পাবে।

দুই: বয়সের সমতা

বৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে মনের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য শরীআত বয়সের সমতাকেও গুরুত্ব প্রদান করে। কারণ, বয়সের ব্যবধান বেশি হলে পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বিপথগামিতা রোধ করার মতো আকর্ষণ থাকে না।
নীম্নে বর্ণিত দুটি ঘটনা এ মনস্তাত্ত্বিক সত্যের প্রতিই ইংগিত করছে। হযরত জাবের (রা.) তার যৌবনকালে এক বিধবাকে বিয়ে করলে নবী (স.) তাকে বললেন, 'তুমি কোন কুমারি মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে সে তোমার সাথে আর তুমি তার সাথে খেলতে ও হাসি-তামাশা করতে পারতে।'[৯৬]
রাসূল (স.) এর এভাবে বলার কারণ হতে পারে, একজন বিধবা, যার আবেগ-উত্তেজনা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে পড়েছে যে, সে একজন যুবকের হৃদয় মনে যে আবেগ উত্তেজনার অগ্নিশিখা প্রজ্জলিত তা, বরদাশত করতে অক্ষম।
হযরত আবু বকর (রা.) ও উমর (রা.) হযরত ফাতেমা (রা.) কে বিয়ে করার জন্য নবী (স.) এর কাছে আবেদন জানালে তিনি তাদের প্রস্তাব এই বলে ফিরিয়ে দেন যে, ফাতেমা এখনও ছোট। কিন্তু হযরত আলী (রা.) আবেদন জানালে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং হযরত ফাতেমা (রা.) কে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে নবী (স.) নিজেই হযরত আলীর (রা.) সাথে ফাতেমাকে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।
এ ঘটনা সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী (র.) তার সংকলিত হাদীসগ্রন্থ সুনানে নাসায়ীতে অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনা করেছেন এই বলে, 'নারী কর্তৃক সমবয়স্ক পুরুষকে বিয়ে করা।'- এর অর্থ এটিই উত্তম ও উপযুক্ত ব্যবস্থা।

---

[৯৫] ইমাম ইবনে মাজা, *সুনান ইবনে মাজা* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশকাল- আগস্ট ২০০১), খ. ২, পৃ. ৩৫৬, হাদীস নং- ১৮৪৭
[৯৬] ইমাম বুখারি, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৭০, হাদীস নং- ৪৯৬৭

Dhaka University Institutional Repository

তিনঃ সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে দেখার অনুমতি

শরীআত বেগানা নারীকে দেখার অনুমতি অনুমতি পর্যন্ত দেয়। যাতে এ সম্পর্কের প্রতি ব্যক্তির মনের আগ্রহ আকর্ষণ ও উৎসাহ পবিত্র জীবন যাপনের সহায়ক হতে পারবে কি না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে একটি হাদীস। 'মুগিরা ইবনে শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক মহিলাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে নবী (স.) তাকে বললেন, তাকে দেখ। কারণ, দেখাটা উভয়ের মধ্যে মিল মহব্বত সৃষ্টির উত্তম উপায়।'[৯৭]

আরেকটি হাদীসে বিষয়টা সম্পর্কে আরও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, 'হযরত আয়েশা (রা:) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসুল (স.) আমাকে বলেছেন; আমি স্বপ্নের মধ্যে তোমাকে দেখেছি। জনৈক ফেরেশতা রেশমি চাদর জড়িয়ে তোমাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করেন এবং আমাকে বলে, এ হচ্ছে আপনার স্ত্রী। আমি তোমার মুখমন্ডল থেকে চাদর সরিয়ে দেখি যে তুমি। তখন আমি বললাম, যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তা অবশ্যই ঘটবে।'[৯৮]

রাসুলুল্লাহ (স.) এর বানী 'দেখাটা উভয়ের উভয়ের মধ্যে মিল মহব্বত সৃষ্টির উত্তম উপায়'– দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, শরীআত স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে প্রেম ও ভালোবাসার অত্যন্ত মজবুত সম্পর্ক কামনা করে এবং তাতে আঘাত লাগার মতো কোন জটিলতা যেন সৃষ্টি না হয় তাও চায়। কারণ, দাম্পত্য জীবনে মতবিরোধ ও ঘৃণা সৃষ্টি হলে সতীত্ব ও পবিত্রতার পরিপন্থী শক্তি সহজেই আক্রমণ করতে পারে। সুতরাং, যেসব ক্ষেত্রে স্বামীর দুশ্চরিত্রের কারণে স্ত্রী তার সাথে দাম্পত্য জীবন যাপন করতে আগ্রহী হতো না, নবী (স.) সেসব বিয়ে বতিল করে দিতেন।

চারঃ নারীর সাজ-গোজের অনুমতি

বৈধভাবে আগ্রহ ও আকর্ষণকে বৃদ্ধি করার জন্য ইসলাম দাম্পত্য জীবনে নারীর রূপচর্চা ও সাজগোজকে উত্তম ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস থেকে জানা যায়, নারীরা স্বামীর উদ্দেশ্যে রূপ ও সৌন্দর্য চর্চা করতো। একটি ঘটনা থেকে তার প্রমান পাওয়া যায়। একবার হযরত আয়েশা (রা.) উসমান ইবনে মাযউন (রা.)-এর স্ত্রীকে দেখলেন তার শরীরে সাজগোজ ও সৌন্দর্য চর্চার কোনো চিহ্ন নেই। অথচ তখনকার দিনে স্বামীর উপস্থিতিতে মেয়েরা সাধারণত সাজসজ্জা করতো। এ অবস্থা দেখে হযরত আয়েশা (রা.) তখনই তাকে জিজ্ঞেস করলেন: উসমান কি কোথাও সফরে গিয়েছেন?'[৯৯]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানী (র.) বলেন, 'খিযাব তথা সাজসজ্জা না করার কারণে আশ্চর্যান্বিত হয়ে হযরত 'আয়েশা'র তাকে জিজ্ঞেস করা থেকে প্রকাশ পায় যে, যেসব মেয়েদের স্বামী বর্তমান, স্বামীর জন্য তাদের সাজ-সজ্জা ও রূপচর্চা করা অতি পছন্দনীয় ব্যাপার।'[১০০]

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন, দূরের সফর থেকে ফিরে এসে কারো হঠাৎ বাড়ীতে গিয়ে হাজির হওয়া উচিৎ নয়। কেননা, তাতে সে স্ত্রীকে এমন অবিন্যস্ত ও অপছন্দনীয় অবস্থায় দেখে ফেলার সম্ভাবনা থাকে যা তার অপছন্দ ও ঘৃণার উদ্রেক করতে পারে।'[১০১]

হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) অন্য একটি হাদীসে বর্ণনা করেন, 'এক যুদ্ধ থেকে ফিরে আমরা বাড়ীতে যেতে উদ্যত হলে রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, 'এখন বিরত থাকো এবং রাতের বেলা নিজ নিজ বাড়ীতে প্রবেশ

---

৯৭ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩৭১, হাদীস নং- ১০৮৭

৯৮ ইমাম বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৭, হদীস নং- ৪৭৪৭

৯৯ মুসনাদে আহমাদ, খ. ৬, পৃ. ১০৬

১০০ শাওকানি, নাইলুল আওতার, খ. ৬, পৃ. ৩৪৪

১০১ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৫, হাদীস নং- ৪৮৬২। ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৩), খ. ৪, পৃ. ৩৪৭, হাদীস নং- ৩৫০৫

Dhaka University Institutional Repository

করো। যাতে যে নারী কেশ বিন্যাস করেনি, সে কেশ বিন্যাস করে নিতে পারে এবং যার স্বামী অনুপস্থিত ছিল, সে গোসল করে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়ার সুযোগ পায়।[১০২]

পাঁচঃ স্ত্রীর আবেগের মর্যাদা

ইসলাম পুরুষের আবেগ-অনুভূতির প্রতি যেমন লক্ষ্য রেখেছে, তেমনি নারীর আবেগ অনুভূতির প্রতি মর্যাদা দানের শিক্ষাও দিয়েছে। ইসলাম বিভিন্ন উপায় ও পন্থায় এ সত্য তুলে ধরেছে যে, নারী শুধু ভোগের উপাচার এবং যৌন কামনা পরিতৃপ্ত করার কোনো যন্ত্র কিংবা অনুভূতিহীন কোনো মাংসপিণ্ড নয়। বরং, তার হৃদয় মন সূক্ষ্মতম আবেগ-অনুভূতির আবাসস্থল যা অনুরূপ সূক্ষ্ম কাজকর্মের দাবী করে।

আচার-আচরণের অসামঞ্জস্যতা ও কঠোরতা তার আবেগ অনুভূতির স্বচ্ছ কাঁচকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারে। এরপর সে একটি পাথরে পরিণত রূপান্তরিত হবে যা ভাঙা যায় না; কিন্তু তা ছেঁটে কেটে আংটির মূল্যবান পাথর বানানো যায় না যে, পাথরের চাকচিক্য দৃষ্টি ও মনকে আকৃষ্ট করতে পারে এবং গোনাহর মনলোভা দৃশ্যকে আকর্ষণহীন করে দেয়।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, 'মহিলারা হচ্ছে পাঁজরের হাঁড়। যদি তোমরা তাকে সোজা করতে চাও, তাহলে ভেঙে যাবে। সুতরাং, যদি তা থেকে ফায়দা লাভ করতে চাও তাহলে তার এ বাঁকা থাকা অবস্থাতেই তা লাভ করতে হবে।'[১০৩]

অপর একটি হাদীসে এসেছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যামাআ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'স্ত্রীকে ক্রীতদাসীর মতো মারপিট করা এবং দিনের শেষে আবার তার সাথে সহবাস করার মতো আচরণ যেন তোমাদের কেউ না করে।'[১০৪]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমার স্ত্রীর রুচি ও পরিতৃপ্তির জন্য আমি নিজে সাজগোজ করে থাকা পছন্দ করি। ঠিক যেমন আমি চাই সেও আমার জন্য সাজসজ্জা করে সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে থাকুক।'

অথচ আমাদের আজকের সমাজে খুব কম সংখ্যক পুরুষই এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। স্ত্রীর ও যে কোন আবেগ, অনুভূতি, পছন্দ-অপছন্দ, চাওয়া-পাওয়া থাকতে পারে, তা তারা কখনও চিন্তাই করেন না। কিংবা বুঝলেও ব্যবসা, পদোন্নতি ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে তারা এতই ব্যস্ত থাকেন যে স্ত্রীর আবেগগুলো দেখার সময় পান না। এর ফলে অনেক নারীই নিজে আবেগের পরিতৃপ্তির জন্য নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। এর পরিনামে নির্যাতন, সংসার ভাঙন, হত্যার মত ভয়াবহ ঘটনা ঘটে।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক আদায়

ইসলামী শরীয়াত স্বামী স্ত্রীর কাছে জোরালো দাবি জানায় যে, তারা যেন এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করে এবং এমন কোন আচরণ বা নীতি গ্রহণ না করে যা সতীত্ব ও সম্ভ্রমহানীর কারণ হতে পারে।

স্ত্রীর কাছে স্বামীর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো, যখনই সে স্ত্রীকে চাইবে, তখনই যেন কাছে পাওয়া যায়। দাম্পত্য সুখ ও শান্তি বজায় রাখার জন্য এ বিষয়টা খুবই জরুরী। এ বিষয়ে রাসূল (স.) এর স্পষ্ট হাদীস। 'হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান জানালে স্ত্রী যদি

---

[১০২] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১০৬, হাদীস নং- ৪৮৬৪

[১০৩] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৭০, হাদীস নং- ৪৮০৩। ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৪৯, হাদীস নং- ৩৫০৮ (মুসলিম শরীফে পরবর্তী ৩৫১০, ৩৫১১ নং হাদীসও প্রায় অনুরূপ)।

[১০৪] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮৬, হাদীস নং- ৪৮২২

Dhaka University Institutional Repository

তাতে সাড়া না দেয় আর কারণে সে যদি সারা রাত তার প্রতি রাগান্বিত থাকে, তাহলে ফেরেশতারা ভোর পর্যন্ত সে স্ত্রীকে লা'নত করতে থাকে।'[১০৫]

এমনকি আরও কঠোর ভাষায় বলা হয়েছে, স্ত্রী স্বামীর বিছানা ব্যতিত অন্য কোন বিছানায়ও রাত যাপন করতে পারবে না। এ ব্যাপারে হাদীসেও নির্দেশনা এসেছে, 'হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন, যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর শয্যা ছেড়ে অন্যত্র রাত্রি যাপন করে, যতক্ষণ সে স্বামীর শয্যায় ফিরে না আসে, ততক্ষণ ফেরেশতারা তার ওপর লা'নত পাঠাতে থাকে।'[১০৬]

এমনকি স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে নফল রোজা রাখতেও নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, স্বামীর উপস্থিতিতে কোন নারী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতিত নফল রোজা রাখবে না।'[১০৭] হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, 'যখন স্বামী উপস্থিত থাকবে, তখন স্বামীর অনুমতি ব্যতিত কান স্ত্রী (নফল) রোজাও রাখবে না এবং কোন স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতিত কাউকে তার গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি কোন স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ব্যতিত কাউকে তার গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। যদি কোন স্ত্রী স্বামীর নির্দেশ ছাড়া তার সম্পদ (কোন দাতব্য কাজে) ব্যায় করে। তাহলে স্বামী তার অর্ধেক সওয়াব পাবে।'[১০৮] অন্য এক হাদীসে নবী (স.) বলেছেন, 'কেউ যদি স্ত্রীকে সহবাসের জন্য আহ্বান জানায়, আর স্ত্রী যদি সেই সময় খাবার পাকাতেও ব্যস্ত থাকে তবুও সে তৎক্ষনাৎ স্বামীর ডাকে সাড়া দিবে।'[১০৯]

ইসলাম নারীর কাছেই শুধু এ দাবি করে না। বরং নারীর আবেগকে পরিতৃপ্ত করার জন্য পুরুষকেও নির্দেশ দেয়। অন্যথা সে একটি বড় অধিকার আদায় না করার অপরাধে অপরাধী হবে। আবদুর রহমান আল জাযরী বলেন, 'চারটি ফিকহী মাযহাবের আইনই পুরুষের জন্য এ বিষয়টি আবশ্যকীয় করে দেয় যে, সে তার সাধ্যানুসারে নারীকে পবিত্র রাখবে। অনুরূপভাবে এ বিষয়টি নারীর জন্য আবশ্যকীয় ঘোষণা করেছে যে, স্বামী যদি তার কাছে পরিতৃপ্তি লাভ করতে চায় তাহলে সে কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়া তা প্রত্যাখ্যান করবে না।'[১১০]

হযরত উমর (রা.) এক ভাষনে বলেছিলেন, 'এসব নারীদের লজ্জাস্থানকে সুরক্ষিত রাখো।' অর্থ্যাৎ পুরুষদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো, তারা নিজের স্ত্রীর সতীত্ব ও পবিত্রতা রক্ষার ব্যবস্থা করবে এবং তাকে পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে বাঁচাবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'স্বামী স্ত্রীর সাথে অতি উত্তম পন্থায় মিলিত হবে। এটা স্ত্রীর সর্বাপেক্ষা বড় অধিকার। এমন কি ভরণ পোষণের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।'[১১১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন থেকে আমরা জানতে পারি, তিনি তার পবিত্র স্ত্রীগণের সাথে এমন সব বিষয়েও আগ্রহ দেখিয়েছেন, যা তাকওয়া, পরহেজগারী সম্পর্কে সাধারণ ধারণার পরিপন্থি বলে মনে হওয়াটাই বেশি সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্কে সজীবতা আসে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

নবী (স.) একবার হযরত আয়েশা (রা.)-কে এগারজন মহিলা সম্পর্কে এক মজার কাহিনী শুনালেন। এগারজন মহিলার অধিকাংশই তাদের যার যার স্বামীর সমালোচনা ও নিন্দাবাদ করেছিল। কিন্তু একাদশতমা মহিলা (উম্মে যারা) তার স্বামী সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমি আমার স্বামী আবু যারা'র (যারার পিতা) আর কী প্রশংসা করবো। সে অলংকার দিয়ে আমার কান দুটি ঢেকে দিয়েছে এবং আমার চিকন বাহু দু'খানা মাংসল বানিয়ে দিয়েছে।

---

[১০৫] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮১, হাদীস নং- ৪৮১১। ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০৮, হাদীস নং- ৩৪০৩। ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৬, হাদীস নং- ২১৩৮

[১০৬] ইমাম বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮১, হাদীস নং- ৪৮১২

[১০৭] ইমাম বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮১, হাদীস নং- ৪৮১০

[১০৮] ইমাম বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮১, হাদীস নং- ৪৮১৩

[১০৯] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪৩, হাদীস নং- ১১৬১

[১১০] আল ফিকাহ আলাল মাযাহিবিল আরবায়া, খ. ৪, পৃ. ৪

[১১১] ফাতওয়াবে ইবনে তাইমিয়া, খ. ১, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

মোটকথা আমাকে সুখী এবং আনন্দিত করার এতো উপকরণ সে দিয়েছে যে আনন্দ ও খুশীতে আমার জীবন কেটে যাচ্ছে। আমার সুখের কথা আর কী বলবো? আমি বকরী পালক পরিবারে (নীচু মর্যাদা সম্পন্ন) কষ্টকর জীবন-যাপন করছিলাম। সে আমাকে ঘোড়া, উট ও ক্ষেত–খামারের অধিকারীদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমি তার সাথে খোলামেলাভাবে আলাপ করি। কিন্তু সে কখনও আমার কোন কথায় বাধা দেয়নি। আমি নির্ভয়ে সকাল পর্যন্ত আরাম করি এবং সুস্বাদু খাবার ও পানীয় তৃপ্তিসহ খাই ও পান করি। এ কাহিনী বলার তিনি হযরত আয়েশা (রা.) কে বললেন, 'আয়েশা! আমি তোমার জন্য আবু যারার মতো।[১১২]

একবার হযরত আয়েশা (রা.) নিজের সম্পর্কে নবী (স.) এর কাছে একটি সুন্দর উপমা পেশ করলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! মনে করুন আপনি এমন একটি উপত্যকায় গিয়ে অবতরণ করলেন, যেখানে এমন একটি গাছ যার অংশ বিশেষ পূর্বেই খাওয়া হয়ে গেছে। অতঃপর আপনি এমন বৃক্ষ পেলেন যার কিছুই খাওয়া হয়নি। এর মধ্যে কোন বৃক্ষের তলে আপনি উট চরাবেন? নবী (স.) উত্তরে বললেন, যে বৃক্ষের কিছুই খাওয়া হয়নি, সেখানেই আমার উট চরাবো।[১১৩] এ কথার দ্বারা হযরত আয়েশার উদ্দেশ্য ছিল, রাসুল (স.) তিনি ব্যতিত আর কোন রমনীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। নবী (স.) এর পবিত্র স্ত্রীগনের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়েশাই (রা.) ছিলেন কুমারী এবং আর সবাই ছিলেন বিধবা। আলোচ্য হাদীসে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, বাক্যালাংকারপূর্ণ এ উপমা অনুপম হাসি, তামাশা ও সুক্ষ্ম রূচিবোধের খুব সুন্দর উদাহরণ।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, 'এক সফরে আমি এবং নবী (স.) দৌড়ের পাল্লা দিয়েছিলাম। আমি হালকা-পাতলা থাকার কারণে বিজয়ী হয়েছিলাম। এর কিছু দিন পরে আমাদের মধ্যে আবার দৌড়ের পাল্লা হলে আমি পেছনে পড়ে রইলাম। কারণ, আমি তখন বেশ মোটা-সোটা হয়ে গিয়েছিলাম। এভাবে আমি পরাজিত হলে নবী (স.) বললেন, আমি পূর্বের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলাম।[১১৪]

সহীহ হাদীস গ্রন্থসমূহের আরেকটি বর্ণনা হলো, 'কোনো এক ঈদে হাবশীরা খেলাধূলা দেখাচ্ছিল। রাসুলুল্লাহ (স.) নিজে হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি খেলাধুলা দেখবে? অথবা হযরত আয়েশা (রা.) নিজেই খেলা দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি তাঁকে তার পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) এর কৌতুহল মিটে গেলে তিনি বললেন, ঠিক আছে এখন তাহলে যাও।[১১৫]

অন্য এক হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, গোশতওয়ালা হাড্ডি কিছুটা খেয়ে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তা দিতাম। তিনি সেটা ঠিক সে জায়গা থেকে খেতেন, যেখান থেকে আমি পরিত্যাগ করেছিলাম। অনুরূপ কোন জিনিস পান করে আমি তাঁর দিকে এগিয়ে দিতাম। তিনি ঠিক সে জায়গায় পবিত্র মুখ লাগিয়ে পান করতেন, যেখানে আমি মুখ লাগিয়ে পান করেছিলাম।[১১৬]

আলোচ্য ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়, ইসলাম কোন দাম্পত্য সম্পর্ককে কোন বাধ্য-বাধকতার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চায় না। বরং, তাতে একটা বৈচিত্র ও সৌন্দর্যময়তা সৃষ্টি করে যে, তা নিজেই আলাদা একটি স্বাদ ও আনন্দের দুনিয়ায় রূপান্তরিত হয় এবং এমন কোন যৌন আবেদনই নেই, দাম্পত্য বন্ধনের সীমার মধ্যে যার ব্যবস্থা ইসলাম করেনি।

---

[১১২] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫ (ইষৎ সংক্ষেপ আকারে হাদীসটি উপস্থাপিত), পৃ.৭৪-৭৫, হাদীস নং- ৪৮০৭। এছাড়াও এই হাদীসটি ইমাম মুসলিম; নাসায়ী এবং আরো অনেক মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন কোনো কোনো বর্ণনা থেকে জানা যায়, নবী (সঃ) পুরো ঘটনা শুনেছিলেন আবার কোনো কোনো বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায় যে, নবী (সঃ) শুধু শেষ অংশটুকু শুনেছিলেন হাফেজ ইবনে হাজার র.-এর ব্যাখ্যা অনুসারে নবী (স.) নিজে এই পুরো ঘটনা বলেছিলেন। ইবনে হাজার আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খ. ৯, পৃ. ২০৩

[১১৩] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৫, হাদীস নং- ৪৭০৪

[১১৪] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমদ*, খ. ৬, পৃ. ৩৯। ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবু দাউদ*, কিতাবুল জিহাদ, অনুচ্ছেদ: ফিস সাবাকি আলার রাজুল।

[১১৫] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৪তম প্রকাশ, অক্টোবর- ২০০৭), খ. ১, পৃ. ৪০২, হাদীস নং- ৮৯৬

[১১৬] সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : অনৈতিকতা রোধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাসমূহ

শরীআত ব্যক্তিকে এমন কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহন করতে নির্দেশ দেয়, যা গোনাহের পথকে সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর করে দেয় এবং যা কার্যকরী করে মানুষ যৌন কলুষতা থেকে নিরাপদ দুরত্বে অবস্থান করতে পারে। এ ব্যাপারে কুরআন আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি দান করেছে। তা হলো: 'আর ব্যাভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।'[১১৭]

কুরআন শুধু ব্যাভিচারে লিপ্ত না হওয়ারই নির্দেশ দেয় না, বরং সে সব অবস্থা থেকেও দুরে অবস্থানের নির্দেশ দেয়। যা বাহ্যিকভাবে যতো নির্দোষ এবং ক্ষতিহীনই মনে হোক না কেন, পরিনামে এ কু-কর্মে লিপ্ত করে দেয়।

মানুষ কোন সীমারেখার মধ্যে থেকে তার আকংখা ও আবেগ-অনুভুতিকে পরিতৃপ্ত করতে পারে এবং কোন অবস্থা থেকে তার ধ্বংসের সীমারেখা শুরু হয়, ইসলাম অতি সূক্ষভাবে তা দেখিয়ে দেয়। তাই মানবতার জন্য ধ্বংসাত্মক কাজকর্মকেই কেবল সে নিষিদ্ধ করেনি, বরং সেসব পথেও সে বাধা সৃষ্টি করেছে যা ধ্বংসের সূচনা ঘটায় এবং সে পথে গমনকারী জঘন্য পরিণামের মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা পায় না।

রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, '... চোখের যিনা হল কুদৃষ্টি, আর যবানের যিনা হল খারাপ কথা বলা। নফস খারাপ কাজের আকাংখা করে ও কামনা করে, আর গুপ্তাঙ্গ তা বাস্তবায়িত করে বা তা থেকে বিরত থাকে।'[১১৮]

এ হাদীসের বক্তব্য অনুসারে গোনাহর কাজে উৎসাহ দানকারী কাজও গোনাহের সমপর্যায়ভূক্ত। এ জন্যই যিনা ও ব্যাভিচারের প্রাথমিক পদক্ষেপসমূহকেও সে যিনা বলেই গণ্য করে।

দৃষ্টি অবনত রাখা

আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। সৌন্দর্যপ্রিয়তার এ প্রবনতা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণকর ও উপকারী হতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সীমারেখা অতিক্রম না করে। কুরআন মাজিদের ঘোষণা হলো, 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে।'[১১৯]

এ কথাটিই নবী (স.) ভিন্ন একটি ভঙ্গিতে পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'হে আলী! প্রথমবার তাকানোর পর দ্বিতীয়বার আর তাকাবে না। কারণ, প্রথম (হঠাৎ) দৃষ্টিপাত তোমার। কিন্তু দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করার কোন অধিকার তোমার নেই।'[১২০]

অর্থ্যাৎ প্রথমটি আকস্মাৎ বা হঠাৎ পতিত হওয়া দৃষ্টি। তাই তা ক্ষমার যোগ্য; কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা মোটেই বৈধ নয়। কারণ, এটাই শয়তানের তীর। এর দ্বারাই সে মর্যাদা ও নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করে ছাড়ে।

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি নবী (স.)কে জিজ্ঞেস করলাম: যদি কোন বেগানা নারীর ওপর দৃষ্টি পড়ে তাহলে কী করতে হবে। নবী (স.) বললেন, তখনই দৃষ্টি সরিয়ে নাও।'[১২১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, 'কেউ যদি তার মা, বোন ও মেয়ের দিকে বেগানা নারীর দিকে তাকানোর মতো কামাতুর দৃষ্টিতে তাকায় তাহলে তা হারাম এ কথা সবাই জানে।[১২২]

---

১১৭ আল কুরআন, ১৭ : ৩২

১১৮ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ: ১৫৯, হাদীস নং : ২১৪৯

১১৯ আল কুরআন, ২৪ : ৩০-৩১

১২০ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৮, হাদীস নং- ২১৪৬

১২১ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৫৮, হাদীস নং- ২১৪৫

১২২ ইমাম তাকিউদ্দিন আহমত ইবনে তাইমিয়া, *ফাতওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়াহ*, খ. ১, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

শ্রবণ শক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা

ইসলাম তার অনুসারীদের পরিস্কারভাবে বলে দেয় যে, পৃথিবীর গুলবাগিচায় সে যে কোন সুন্দর গান দ্বারা নিজের শ্রবণ আকাংখাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে। তবে তা যেন চরিত্র বিধ্বংসী ও অশ্লীল না হয়। শুধু গানই নয়, যে সব কথা কিংবা শব্দ একজন মানুষকে বিপথে পরিচালিত করার আশংকা রাখে, তার বেলায়ও একই কথা প্রজোয্য।

গান নিষিদ্ধ হওয়ার মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যায় এখানে হাফেজ ইবনে জুযীর (র.) বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে। 'জানা থাকা দরকার যে, গান শোনার দুটি ক্ষতিকর দিক আছে। প্রথমটি হলো, গান মানুষকে আল্লাহর মহত্বের চিন্তা ও অধিকারসমূহ আদায় করা থেকে গাফেল করে দেয়। গানের দ্বিতীয় ক্ষতিকর দিক হলো তা মানুষকে পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট করে। আর সমস্ত বস্তুগত আকাঙ্খার শীর্ষে অবস্থান করছে যৌন ইচ্ছা। কিন্তু নিত্য নতুন সম্পর্ক ছাড়া যৌন আকাঙ্খা পুরোপুরি পরিতৃপ্ত হওয়া সম্ভব নয়। এটা জানা কথা যে, বৈধ সীমার মধ্যে এ ধরনের নিত্য নতুন সম্পর্ক সৃষ্টির আদৌ কোন অবকাশ নেই। অতএব গান এভাবে মানুষকে ব্যাভিচারে উৎসাহিত করে। সুতরাং, গান ও ব্যাভিচারের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। গান মনের তৃপ্তি আর ব্যভিচার প্রবৃত্তির আকাঙ্খার তৃপ্তি। এ জন্য হাদীসে আছে, মানুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত করার ব্যাপারে গান যাদুর মতো কার্যকরী।'[১২৩]

অশ্লীল এবং অবৈধ জিনিস শ্রবণে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে এই হাদীসে, 'রাসুল (স.) বলেছেন, কানের যিনা হলো (যৌন উদ্দীপক) কথা-বার্তা শ্রবণ করা।'[১২৪]

বাক সংযম

আমাদের মুখ থেকে যে সব কথা বের হয় তা শুন্যে মিলিয়ে যায় না। বরং আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারনার ওপর প্রতিফলিত হয়। বাকশক্তির এ প্রভাব শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির প্রভাবের চেয়েও বেশি ব্যাপকতা ও গভীরতা রাখে।

রাসুলুল্লাহ (স.) এর ভিবিন্ন হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা এসেছে। উকবা ইবনে আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (স.) নাজাত কিসে নিহিত? তিনি বললেন, তুমি তোমার যবানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবে।'[১২৫]

'হযরত সাহল ইবনে সা'দ রাসালুল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আমাকে তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হিফাজতের নিশ্চয়তা দিতে পারবে, আমি তাকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।'[১২৬]

অন্য আরেকটি ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তিকে জিহবা এবং লজ্জাস্থানের অনিষ্ট ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবেন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[১২৭] এ ব্যাপারে আরও স্পষ্ট করেছেন নিম্নোক্ত হাদী রাসুল (স.), মুখের যিনা হলো অশোভন উক্তি।'[১২৮]

পোশাকের গুরুত্ব

পোশাক পরিধানের দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে। এক, স্পর্শকাতর ও গোপনীয় অঙ্গসমূহ আবৃত করে রাখা। দুই, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। কিন্তু অশালীন ও সংক্ষিপ্ত পোষাক এ যুগের এক ফিতনা, যা মানুষের আবেগ ও অনুভুতির জগতে

---

১২৩ নাকদুল ইলম ওয়াল উলামা, পৃ. ২৩৭। দ্রষ্টব্য: সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৯

১২৪ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, হাদীস নং- ২১৫১

১২৫ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, জুন ১৯৯২), খ. ৪, পৃ. ৬৫৩, হাদীস নং- ২৪০৯

১২৬ ইমাম বুখারী, *সহিহ বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৪২, হাদীস নং- ৬০২৪। ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৫৩, হাদীস নং- ২৪১১

১২৭ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৬৫৩, হাদীস নং- ২৪১২

১২৮ ইমাম আবু দাউদ, সুনান আবি দাউদ, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৯, হাদীস নং- ২১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে। এ ধরনের পোষাক এখন আধুনিকতা ও প্রগতির পরিচায়ক। অথচ পোশাকের এ অবস্থাই নারী-পুরুষের নৈতিক অধঃপতন ও নারী নির্যাতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী।

ইসলাম নারী ও পুরুষের সতরের সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং তা মেনে চলতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (স.) এর হাদীস- 'হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি, যে নারী তার স্বামীর ঘরছাড়া অন্য কোন ঘরে পরিধেয় বস্ত্র খোলে, সে তার ও তার রবের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে।'[১২৯]

আরেকটি হাদীসে রাসুল (স.) বলেছেন, 'নারীর আপাদমস্তক পূর্নাবয়বই হচ্ছে গোপন করার জিনিস। এ কারণে সে যখন ঘরের বাইরে যায়, তখন শয়তান তার সঙ্গী হয় পিছু নেয় (তিরমিযী)।[১৩০]

নির্জনে সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ

সতীত্ব ও পবিত্রতা হিফাজতের পথে আরো একটি পর্যায় আসে খিয়ানতের দৃষ্টিতে দেখা, যৌন উত্তেজক সঙ্গীত, অশ্লীল বাক্যালাপ এবং উলঙ্গপনা থেকেও ভয়ানক। সেটি হলো নারী-পুরুষের নির্জনে সাক্ষাৎ। যখন উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিক পর্দা বা আড়ালও থাকে না। এরূপ পরিস্থিতিতে এমন কোন বাহ্যিক চাপ থাকে না, যা মানুষকে আবেগ-উত্তেজনার কাছে পরাভূত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

মানুষের এ দুর্বলতার কথা বিবেচনা করে বেগানা নারী পুরুষের নির্জনে দেখা-সাক্ষাৎ ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। 'হযরত জাবের (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) বলেছেন, যেসব মেয়েদের সাথে মুহরেম পুরুষ নেই, তাদের কাছে যেও না। কারণ, মানুষের শরীরে রক্ত যেমন চলাচল করে, শয়তানও তেমনি মানুষের শরীরের সাথে মিশে যেতে পারে। (কখন যে সে মানুষকে গোনাহর চোরাবালিতে আটকে ফেলবে তা কেউ জানে না।) [১৩১]

সহীহ মুসলিমে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (স.) কে ভাষণ দিতে শুনেছি, সাথে মাহরাম পুরুষ না থাকা অবস্থায়, কোন পুরুষ লোক যাতে কোন মহিলার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ না করে। কোন স্ত্রী লোক যেন সাথে কোন মাহরাম পুরুষছাড়া একাকী সফর না করে।'[১৩২]

অন্যত্র আরও কঠোর ভাষায় রাসুল (স.) বলেছেন, 'আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোন ব্যক্তি যেন এমন মেয়েলোকের সাথে গোপনে মিলিত না হয়, যার সাথে তার আপন মুহাররাম কোন পুরুষ নেই। কেননা গোপনে মিলিত এমন দু'জন স্ত্রী-পুরুষের সাথে তৃতীয় হিসেবে উপস্থিত থাকে।'[১৩৩]

ঠিক এ কারণেই স্বতী-স্বাধী স্ত্রী হওয়ার অপরিহার্য গুণ সম্পর্কে নবী করীম (স.) বলেছেন, 'স্বামীর ঘরে তার অনুমতিছাড়া কোন লোকই প্রবেশ করতে দেবে না।'[১৩৪]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন, স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে স্বামীর পছন্দ নয়- এমন পুরুষ বা স্ত্রী লোককে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না। কেননা এতে করে খারাপ ধারনার সৃষ্টি হতে পারে এর ফলে স্বামীর মনে আত্মমর্যাদাবোধ তীব্র হয়ে উঠে দাম্পত্য সম্পর্ককেই চিন্ন করে দিতে পারে (আমাদাতুল কারী)।[১৩৫]

---

[১২৯] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *মুসনাদে আহমাদ*, খ. ৬, পৃ. ৪১

[১৩০] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর-১৯৮৩, ২২তম প্রকাশ, মার্চ: ২০১২), পৃ. ২৮৫

[১৩১] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৯৭), খ. ২, পৃ. ৩৩৩, হাদীস নং- ১১১০

[১৩২] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮, হাদীস নং- ৩১৩৮

[১৩৩] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৬, হাদীস নং- ৪৮৪৯। ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৫১, হাদীস নং- ১১৭২

[১৩৪] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮১, হাদীস নং- ৪৮১৩

[১৩৫] মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে অধিকতর কঠোর বাণী ঘোষিত হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসে। রাসুলে কারীম (স.) বলেছেন, 'যে পুরুষ লোক স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন মেয়ে লোকের শয্যায় বসবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তার উপর (তার শাস্তির জন্য) একটি বিষধর অজগর নিযুক্ত করে দেবেন।' [১৩৬]

আল্লামা আহমাদুল বান্না এসব হাদীসের আলোকে লিখেছেন, এ পর্যায়ে সমস্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীর কাছে কোন একজন পুরুষের প্রবেশ করা এবং ভিন্ন-গায়রে মুহাররাম মেয়ে লোকের সাথে গোপনে মিলিত হওয়া সম্পূর্ণ হারাম এবং এ ব্যাপারে সকল ইসলামবীদ সম্পূর্ণ একমত (বুলুগুল আমানি)।[১৩৭]

সূরা আল আহযাবের ৫৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম শাওকানি লিখেছেন, 'এ আয়াতের প্রত্যেক মু'মিন ব্যক্তির জন্যে একটি নীতি শিক্ষা দেয় এবং গায়রে মুহাররাম মেয়েলোকদের সাথে গোপনে মিলিত হওয়া এবং পর্দার অন্তরাল ছাড়াই পরস্পরের কথা-বার্তা বলা সম্পর্কে স্পষ্ট ভীতি প্রদর্শণ করা হয়েছে। (ফাতহুল কাদীর)।[১৩৮]

---

[১৩৬] মুসনাদে আহমদ, প্রাগুক্ত।

[১৩৭] মাওলানা আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

[১৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

মানুষের শারিরীক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সুখ শান্তির বেশির ভাগই নির্ভর করে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির ওপর। তাই সুন্দর ও আদর্শ দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলা প্রত্যেক মুমিনেরই দায়িত্ব। বৈবাহিক বন্ধনের মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয়। এ জীবনে তারা একজনের ওপর আরেকজন কিছুটা অধিকার লাভ করে। একজনের প্রতি আরেকজনের উপর অর্পিত হয় কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনকে সুখী সমৃদ্ধশালী করার জন্য তাদের দু'জনই দু'জনের ওপর সে অধিকার লাভ করবে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তাদের প্রত্যেককে দান করেছেন। তাদের উভয়কে উভয়ের প্রতি সে দায়িত্ব ও কর্তব্য পূর্ণভাবে পালন করতে হবে যা ইসলামী শরীআত তাদের উপর অর্পণ করেছে। সর্বোপরি তাদের উভয়ের প্রতি উভয়ের থাকতে হবে নিষ্কলুষ আন্তরিকতা, সুনিবিড় প্রেম ও ভালোবাসা এবং আবেগ উদ্দীপ্ত সহযোগিতা ও সহমর্মিতা।

ইসলামের আবির্ভাব নারীদের মর্যাদার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন সৃষ্টি করে। ইসলাম তাদের মর্যাদাকে পুরুষের সমান্তরালে নিয়ে আসে। তা তার সকল নৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং তার জীবনের প্রতিটি বিষয় পছন্দমত নির্বাচন করার স্বাধীনতা প্রদান করে। এটি তাকে সমাজে সকল মর্যাদা ও সম্মানের প্রতিমূর্তিতে পরিণত করে এবং তাকে সব ধরনের শোষণ থেকে নিরাপত্তা প্রদান করে।

কুরআন মাজীদ বারংবার নারী ও পুরুষকে পৃথক সত্তা হিসেবে উল্লেখ করেছে, যা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মৌলিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারী সমান।

পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, ঈমানদার পুরুষ, ঈমানদার নারী, অনুগত পুরুষ, অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ, ধৈর্য্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ, বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ, দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ, রোজা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিকরকারী পুরুষ, আল্লাহর অধিক যিকরকারী নারী, তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'[১৩৯]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-যাপন করে। এদেরই ওপর আল্লাহ তাআলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, সু কৌশলী।[১৪০]

স্বামী এবং স্ত্রীর পারস্পরিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনে কতিপয় মূলনীত অবলম্বন করা খুবই জরুরী। নিম্নে এসকল মূলনীতিগুলোই আলোচনার প্রয়াস চালাচ্ছি-

১. স্বামী-স্ত্রীর চিরস্থায়ী সম্পর্ক

আল্লাহ ও তার রাসুলের বিধান মোতাবেক যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা কোন প্রকার ঠুনকো অস্থায়ী সম্পর্ক নয়। বরং এ এক চিরস্থায়ী শাশ্বত সম্পর্ক। এ সম্পর্ক দুনিয়ার জীবনকে ছাড়িয়ে আখিরাতের জীবনেও স্থায়ী হয়। বস্তুত পক্ষে, ঈমান ও আমলের দিক থেকে স্বামী-স্ত্রী উভয় যদি প্রকৃত মুসলমান হতে পারে তবে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একত্রে জান্নাতে বসবাসেরও সৌভাগ্য দান করবেন। জান্নাতে ঈমানদার লোকদের যেসব নিয়ামত প্রদান করা হবে সেগুলোর বিবরণ দিতে গিয়ে কুরআন মাজীদের একস্থানে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ

[১৩৯] আল কুরআন, ৩৩ : ৩৫

[১৪০] আল কুরআন, ৯ : ৭১

Dhaka University Institutional Repository

করেন, 'আমি জান্নাতী রমনীগনকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী, কামিনী, সম-বয়স্কা।'[১৪১]

২. দাম্পত্য জীবনে প্রেম-প্রীতি ভালবাসা

আল্লাহ তায়ালা মানুষের মধ্যে যে জৈবিক কামনা-বাসনা দান করেছেন, তা চরিতার্থ করার মানবোচিত পন্থা হচ্ছে বিয়ে। কিন্তু বিয়ে মানব জীবনে কেবল যৌন আকাঙ্খা চরিতার্থ করার সম্পর্কই নয়, বরং এটাকে মানুষের জন্যে তার বিরাট এক নিয়ামত, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ক বানিয়ে দিয়েছেন। এ সম্পর্কের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে শান্তি, আরাম ও আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ সংক্রান্ত কুরআনের বাণীর প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, আন্তরিকতা, হৃদ্যতা এবং শান্তি ও আনন্দকে বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তি নির্ধারণ করেছে।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেন, 'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।'[১৪২]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে আরেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, 'তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটিমাত্র সত্ত্বা থেকে; আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া; যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারো।'[১৪৩]

অন্যত্র স্বামী-স্ত্রীর একজনকে আরেকজনের পোষাক ও আচ্ছাদন বলে বর্ননা করেছেন মহান আল্লাহ তায়ালা, 'তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।'[১৪৪]

অথ্যাৎ, পোষাক যেমন মানুষের শরীরের সাথে মিশে থাকে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও এরকম মিলে-মিশে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকার সম্পর্ক। পোষাক যেমন মানুষের দেহকে বাইরের অনিষ্ট থেকে হেফাজত করে, স্বামী স্ত্রীও পরস্পরের জন্যে তাই। তারাও পরস্পরকে হেফাজত ও সংরক্ষণ করে।

রাসুল (স.) যেমন তার স্ত্রীদের অত্যধিক ভালোবাসতেন তেমনি তিনি তাঁর সাহাবায়ে কেরামকেও দাম্পত্য জীবনে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য তাকীদ করতেন। নব দম্পত্তির জন্য তিনি এভাবে দোয়া করতেন, 'হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যখন বিবাহ করত, নবী (স.) তখন তার জন এই দোয়া করতেন: বারাকাল্লাহু ওয়া বারাক আলাইকা, ওয়া জামায়া বাইনাকুমা বিল খাইরি (আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে বরকত দিন। তোমাদের দুজনের দাম্পত্য জীবনে রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন আর তোমাদের মধ্যে কল্যাণের সম্পর্ক দান করুন)।'[১৪৫]

৩. স্বামীর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব

ইসলামী জীবন বিধান দাম্পত্য জীবনের যে নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে তাতে পুরুষকে কর্তা ও পরিচালকের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কুরআন মাজীদে ঘোষণা করা হয়েছে, 'পুরুষেরা নারীর ওপর কতৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সেমতে

---

১৪১ আল কুরআন, ৫৬ : ৩৫-৩৭

১৪২ আল কুরআন, ৩০ : ২১

১৪৩ আল কুরআন, ৭ : ১৮৯

১৪৪ আল কুরআন, ২ : ১৮৭

১৪৫ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৭৫, হাদীস নং- ১০২৯

Dhaka University Institutional Repository

নেককার স্ত্রীলোকগত হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তারালেও তার হেফাজত করে।'[১৪৬]

পবিত্র কুরআনুল কারীমে অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের ওপর নিয়মানুযায়ী।'[১৪৭]

এই দুটি আয়াত থেকেই পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, স্বামী হচ্ছে স্ত্রীর অভিভাবক, কর্তা, পরিচালক এবং দায়িত্বশীল। ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর ওপর মর্যাদা ও কর্তৃত্ব প্রদানের সাথে সাথে হুঁশিয়ারও করে দিয়েছেন যে, সে যদি যথার্থভাবে আল্লাহ ও রাসুলের বিধান অনুযায়ী তার কর্তৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে না পারে, তবে তাকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহী করতে হবে। রাসূল (স.)-এর হাদীসেই সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেওয়া আছে এ ব্যাপারে। 'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন অভিভাবক এবং নিজ অধিনস্ত লোকদের ব্যাপারে দায়ী। শাসক একজন অভিভাবক এবং (কোন) এক ব্যক্তি তার পরিবারের লোকদের অভিভাবক (ও দায়িত্বশীল)। একজন মহিলা তার স্বামীর গৃহের অভিভাবক (রক্ষক) এবং সে শিশুদের রক্ষক। এ ব্যাপারে তোমাদের প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং নিজ অধিনস্ত লোকদের ব্যাপারে প্রত্যেককেই জবাবদিহী করতে হবে।'[১৪৮]

ইসলাম স্ত্রীর ওপর স্বামীকে যে মর্যাদা ও কর্তৃত্ব দান করেছেন সে সম্পর্কে শাহ অলিউল্লাহ দেহলবী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগায় লিখেছেন, 'স্ত্রীর উপর স্বামীকে কর্তা ও পরিচালক নিযুক্ত করাটা অবশ্য জরুরী কাজ। আর এ প্রাধান্যটা একটা প্রকৃতিগত ব্যপার বটে। কারণ পুরুষ অধিক জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন। শাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজে অধিকতর দক্ষ। সাহায্য সহযোগিতার কাজে দৃঢ়তাসম্পন্ন। অর্থ সম্পদ সংরক্ষণ ও অশ্লীল কাজ প্রতিরোধে সে অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। তাছাড়া পুরুষ স্ত্রীর খোরপোষের দায়িত্ব গ্রহণ করে বলেও কর্তৃত্বশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়।'[১৪৯]

৪. স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার

স্ত্রীর ওপর স্বামীর বহুবিধ অধিকারের কথা কুরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। স্ত্রীর ওপর যে স্বামীর কত বড় অধিকার রয়েছে তা একটি হাদীস থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'আমি যদি কাউকে অপর কোন ব্যক্তিকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্য।'[১৫০]

স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার সমূহের মধ্যে দুটি অধিকার মৌলিক

ক. গোপন বিষয়সমূহের হিফাজত

স্ত্রীর ওপর স্বামীর একটি মৌলিক অধিকার হচ্ছে, সে স্বামীর গোপন বিষয়সমূহ হিফাজত করবে, যাবতীয় গোপনীয়তা রক্ষা করবে। স্বামীর যাবতীয় আমানত রক্ষা করবে। স্বামীর কোন গোপনীয়তা কখনও প্রকাশ করবে না। স্বামীর সম্মানহানী করবে না। স্বামীর জন্য অমর্যাদাকর হবে এমন কোন কথা কোথাও বলবে না। কোনো অবস্থাতেই স্বামীর কোন আমানতের খিয়ানত করবে না। স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার নিজেকে

---

১৪৬ আল কুরআন, ৪ : ৩৪

১৪৭ আল কুরআন, ২ : ২২৮

১৪৮ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮৪, হাদীস নং- ৪৮১৮

১৪৯ আবদুস শহীদ নাসিম, *ইসলামে পারিবারিক জীবন* (ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, প্রকাশকাল: ১৯৮৬, ১০ম মুদ্রণ: জুন ২০০৩), পৃ. ৪৮

১৫০ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ১৯৯৬), খ. ২, পৃ. ৩২৬, হাদীস নং- ১০৯৭। ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৫, হাদীস নং- ২১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণ হিফাজত করবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নেককার স্ত্রীলোকগন হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে।'[১৫১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসুল (স.) এর অন্য একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়, 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলে করিম (স.) এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন মেয়ে উত্তম? জবাবে রাসুল (স.) বলেন, যে মেয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট করে দেবে। যখন সে তার দিকে তাকাবে, অনুসরণ ও আদেশ পালন করবে, যখন সে তাকে কোন কাজের হুকুম করবে এবং তার স্ত্রীকে নিজের ব্যবহারে এবং তার নিজের ধন-মালের ব্যাপারে, সে যা অপছন্দ করে তাতে সে স্বামীর বিরুদ্ধতা করবে না।'[১৫২]

অন্য আরেকটি হাদীসে রাসুল (স.) উত্তম চরিত্রের নারীর গুণ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনকরেছেন খুব সুন্দর ভাষায়। হযরত আবু আমামাতা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল বলেন, 'মুমিনের তাকওয়ার পক্ষে অধিক কল্যাণকর ও কল্যাণলাভের উৎস হচ্ছে সচ্চরিত্রবতী এমন একজন স্ত্রী যাকে সে কোন কাজের আদেশ করলে সে তা মানবে, তার দিকে সে তাকাইলে, সে তাকে সন্তুষ্ট করে দেবে, সে যদি তার উপর কোন কীড়া-কছম দেয়, তবে সে তাকে কছমমুক্ত বানাবে। সে যদি স্ত্রী হতে দুরে চলে যায়, তবে সে নিজ সত্তার ও স্বামীর অর্থসম্পদের ব্যাপারে স্বামীর কল্যাণামী হয়।'[১৫৩]

এছাড়া স্বামীর দাম্পত্য জীবনের কোনো গোপন কথাও স্ত্রী কোনো অবস্থাতেই কারও নিকট প্রকাশ করতে পারবে না। এ ব্যাপারেও রাসুলুল্লাহ (স.) এর স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, আল্লাহর নিকট কিয়ামতের দিন মান-মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি হবে সে পুরুষ, যে স্ত্রীর সাথে মিলন ও সঙ্গম করে এবং স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে সঙ্গম সুখ লাভ করে। অতঃপর এর গোপন কথা প্রকাশ ও প্রচার করে দেয়।[১৫৪]

খ . আনুগত্য ও খেদমত লাভের অধিকার

স্বামীর আরেকটি অধিকার হচ্ছে, স্ত্রী স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য ও খেদমত করবে। সে হবে পূর্ণ স্বামীগত প্রান। তার আচার-আচরণ হবে কোমল ও বিনয়ী, কথা-বার্তায় হবে সে নম্র-ভদ্র, স্বামীর নির্দেশ পালনে থাকবে সদা প্রস্তুত এবং স্বামীর খেদমতে থাকবে সদা পাগলপারা। মোটকথা বিনয়, আনুগত্য ও স্বামীর খেদমত হবে তার ভূষণ। স্বামীর এ অধিকারটি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'নেককার স্ত্রীলোকগত হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তারালেও তার হেফাজত করে।'[১৫৫]

এ ব্যাপারে রাসুল (স.) এর হাদীসও বিদৃত হয়েছে। 'হযরত আব হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, স্বামীর উপস্থিতিতে তার সম্মতি ব্যতীত স্ত্রী রমজান মাসের রোজাছাড়া একদিনও রোজা রাখবে না।'[১৫৬]

এ ব্যাপারে আরও একটি হাদীস, 'হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) মহিলাদেরকে তাদের স্বামীদের সম্মতি ব্যতীত রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন।'[১৫৭]

---

১৫১ আল কুরআন, ৪ : ৩৪

১৫২ ইমাম নাসায়ী, *সুনানু নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৬, হাদীস নং- ৩২৩৪

১৫৩ ইমাম ইবনে মাজা, *সুনান ইবনে মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬১, হাদীস নং- ১৮৫৭

১৫৪ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৩), খ. ৪, পৃ. ৩০৯, হাদীস নং- ৩৪০৭

১৫৫ আল কুরআন, ৪ : ৩৪

১৫৬ ইমাম ইবনে মাজা, *সুনান ইবনে মাজা* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ: ২০০১), খ. ২, পৃ. ৩১৫, হাদীস নং- ১৭৬১

১৫৭ প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৭৬২

Dhaka University Institutional Repository

সতী পূন্যবতী নারীদের গুণাবলীর বর্ণনা এসেছে রাসুল (স.)-এর নিম্নোক্ত হাদীস থেকে, 'স্বামী যখনই কোন-কাজের আদেশ করে সে সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করে।' অন্য একটি হাদীসে রাসুল (স.) আরও সুস্পষ্ট ভাষায় গুণাবলীগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। 'হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, নারী যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমজান মাসের রোজা রাখে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে আর স্বামীর আনুগত্য করে, তবে অবশ্যই জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করতে পারবে (আবু নয়ীম, হুলিয়াতুল আবরার)।'[১৫৮] আরও একটি হাদীসে রাসুল (স.) এ ব্যাপারে বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, 'দুনিয়াটাই জীবন-উপকরণ। আর দুনিয়ার সর্বোত্তন জীবন-উপকরণ হচ্ছে নেককার, সচ্চরিত্রবান স্ত্রী।'[১৫৯]

গ. স্বামীর অবাধ্য হবে না স্ত্রী

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে মধুর। দু'জনের এই মধুর সম্পর্কেই গড়ে উঠবে একটি সুন্দর পরিবার। এই সুন্দর এবং সুখী পরিবার গড়ে তোলার জন্য ইসলাম নানাভাবে তাগিদ দিয়েছে। দিয়েছে নির্দেশনা। রাসুল (স.) পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকার বিষয়টা বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। নজর রেখেছেন যেন, কোন প্রকারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন ধরনের বিরোধ বা মনোমালিন্য তৈরী না হয়। যেসব কারণে এই সমস্যাটা তৈরী হতে পারে, তার মধ্যে অন্যতম স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হওয়া। এ ব্যাপারে রাসুল (স.) এর কাছ থেকে স্পষ্ট হাদীস এসেছে। সহীহ বুখারীতেই সেই হাদীস বিধৃত হয়েছে এভাবে, 'হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (স.) ইরশাদ করেন, আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের অধিকাংশই স্ত্রী লোক। (কারণ) তারা কুফরী করে। জিজ্ঞাসা করা হল, তারা আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে? তিনি বললেন, তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারও প্রতি ইহসান করতে থাক, এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, আমি কখনও তোমার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পাইনি।'[১৬০]

কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে, স্বামীর অবাধ্য হয়ে স্ত্রী স্বামীর বিছানা পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছে। এ বিষয়টা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে রাসুল (স.) এর হাদীসে। এ ব্যাপারে রাসুল (স.) এর হাদীস, 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, কসম সেই সত্ত্বার, যার হাতে আমার জীবন। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে যখন বিছানায় আহ্বান করে; কিন্তু সে তা অস্বীকার করে, নিঃসন্দেহে যে পর্যন্ত সে তার স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আসমানবাসী তার ওপর অসন্তুষ্ট থাকে।'[১৬১]

অন্য একটি হাদীসে রাসুল (স.) আরও কঠোর বানী উচ্চারণ করেছেন। 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, স্বামী যখন স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে এবং সে না আসে। তখন তার স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত্রি যাপন করে, সে স্ত্রীর প্রতি ফিরিশতাগণ ভোর না হওয়া পর্যন্ত লা'নত করতে থাকে।'[১৬২]

---

১৫৮ মাওলানা আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৬৫

১৫৯ ইমাম নাসায়ী, *সুনানু নাসাই*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৭৬, হাদীস নং- ৩২৩৫। ইমাম ইবনে, *ইবনে মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬০, হাদীস নং- ১৮৫৭

১৬০ ইমাম বুখারি, *সহীহ বুখারী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৮৯, চতুর্থ সংস্করণ, এপ্রিল ২০০২), খ. ১, পৃ. ২৭, হাদীস নং- ২৮

১৬১ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩০৯, হাদীস নং- ৩৪০৫

১৬২ প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৩৪০৬

Dhaka University Institutional Repository

৫. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে ইসলাম স্ত্রীকে অভিভাবক ও পরিচালক বানিয়ে দেয়। সুতরাং অভিভাবক পরিচালক ও কর্তা হিবে স্ত্রীর উপর স্বামীর যেমন মর্যাদা, অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে, তেমনি তাকে অভিভাবকত্ব প্রদানকারিনীর প্রতি রয়েছে তার অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। যেমন-

ক. মোহর পরিশোধ করা

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী তার মোহর পরিশোধ করে দেয়া। মোহর হচ্ছে বিয়ের অন্যতম শর্ত। মোহর ছাড়া বিয়েই হয় না। মোহরের মাধ্যমেই স্বামীর জন্য স্ত্রী সহবাস হালাল হয়। মোহর পরিশোধ না করলে কিংবা অন্তত পরিশোধের নিয়্যাত না থাকলে স্ত্রী সহবাস দ্বারা কোনো ব্যক্তি কেবল যিনা ব্যভিচারের কাজই করে থাকে। ইসলাম মোহর পরিশোধ করাকে স্বামীর জন্যে ফরজ করে দিয়েছে এবং তা স্ত্রীর সন্তুষ্টি অনুযায়ী পরিশোধ করা স্বামীর কর্তব্য করে দিয়েছে।

স্ত্রীদের মোহর পরিশোধ করার জন্য আল্লাহ তায়ালাই পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন, 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশি হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।'[১৬৩]

মোহর হচ্ছে মূলতঃ স্ত্রীর সঙ্গে মিলনের পারিশ্রমিক। তার যৌনাঙ্গে স্বত্ত লাভ করার জন্য কিছু মূল অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে পুরুষকে এবং সেই মূল্যের মালিক হবে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট সেই নারীই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ঘোষণা দিয়েছেন এভাবে, '...একেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য– ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, রহস্যবীদ।'[১৬৪]

মোহরানা আদায় করার বিষয়ে রাসুলও (স.) স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) রাসুলুল্লাহ (স.) এর কাছে এমন অবস্থায় আসলেন যে, তার সঙ্গে সুফরার (হলুদ বর্ণের সুগন্ধি বিশেষ) চিহ্ন। রাসুল (স.) তাকে এ চিহ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এর উত্তরে নবী (স.)কে বললেন, সে জনৈকা আনসারি মহিলাকে বিবাহ করেছে। নবী (স.) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কী পরিমান মোহরানা দিয়েছ? সে বলল, তাকে খেজুরের আঁটির সমপরিমান ওজনের স্বর্ণ দিয়েছি। নবী (স.) বললেন, তাহলে অলীমার ব্যবস্থা কর। যদিও তা একটিমাত্র বকরী দিয়েই হোক।'[১৬৫]

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য, আকদের সময় মোহরানা নির্দিষ্ট করা না হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বেও যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে তাদেরকে কিছু খরচ দেবে। আর সামর্থ্যবানদের জন তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী এবং কম সামর্থ্যবানদের জন্য তাদের সাধ্য অনুযায়ী।'[১৬৬]

---

[১৬৩] আল কুরআন সূরা নিসা: ৪

[১৬৪] আল কুরআন সূরা নিসা: ২৪

[১৬৫] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫. পৃ. ৫৯, হাদীস নং- ৪৭৭৩

[১৬৬] আল কুরআন ২ : ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

খ. ভরণ পোষণের দায়িত্ব

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব। ইসলাম যেসব কারণে স্ত্রীর উপর স্বামীকে মর্যাদাবান করেছে তন্মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পুরুষেরা নারীর ওপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।'[১৬৭]

এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য, মোহর আর ভরণ-পোষণ কিন্তু এক জিনিষ নয়। স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষনের দায়িত্ব পালন দ্বারা মোহর পরিশোধের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায় না। মোহর ও ভরণ পোষণ উভয়টিই স্বামীর প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব। উভয় দায়িত্ব পালন করাই স্বামীর জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য। এর একটি দায়িত্ব পালনের দ্বারা আরেকটি দায়িত্ব পালন থেকে স্বামী কখনো মুক্ত হতে পারে না।

ভরণ পোষণের ব্যাপারে ইসলামের নীতি হচ্ছে স্বামী তার সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ যোগাবে। সামর্থ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালা কারো উপর চাপিয়ে দেন না। আবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যাপারে কাপণ্য করা স্বামীর জন্যে জায়েয নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন, 'বিত্তশালী ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে। যে ব্যক্তি সীমিত পরিমাণে রিযিকপ্রাপ্ত, সে আল্লাহ যা দিয়েছে, তদপেক্ষা বেশি ব্যয় করার আদেশ কাউকে করে না। আল্লাহ কষ্টের পর সুখ দেবেন।'[১৬৮]

গ. সদ্ব্যবহার

স্বামীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য কাজ হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। বস্তুত, সদ্ব্যবহার পাওয়া স্বামীর উপর স্ত্রীর একটি বিশেষ অধিকারও বটে। বৈবাহিক সম্পর্কটাই হচ্ছে, প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার সম্পর্ক। আর প্রেম-প্রীতির অনিবার্য দাবীই হলো দয়া-সহনুভুতি ও সদাচার। স্বামী স্ত্রীকে প্রান ঢেলে ভালবাসবে। মধুর আচরনে মুগ্ধ করে তুলবে তার হৃদয় ও মনকে। চমৎকার সান্নিধ্যে স্ত্রীকে করে তুলবে স্বামীগতপ্রাণ। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সদ্ব্যবহারই পারে পারিবারিকভাবে নারী নির্যাতনের মাত্রা অন্ততঃ ৯০ শতাংশ কমিয়ে দিতে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর।'[১৬৯]

রাসুলে করীম (স.) এ ব্যাপারে বলেছেন, 'হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, তোমাদের উত্তম ব্যক্তি সে, যে লোক উত্তম ও অধিক কল্যাণ সাধক তার পরিবারবর্গের জন্য। আর আমি তোমাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে আমার পরিবারবর্গের জন্য অধিক কল্যাণকামী ও মঙ্গলসাধক।'[১৭০]

ঘ. স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ

যদি কোন ঈমানদার ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকে, তবে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা। কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, যতোই চেষ্টা করুক মানুষ স্ত্রীদের সাথে পূর্ণ ইনসাফ

---

[১৬৭] আল কুরআন, ৪ : ৩৪

[১৬৮] আল কুরআন, ৬৫ : ৭

[১৬৯] আর কুরআন, ৪ : ১৯

[১৭০] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪৪, হাদীস নং- ১১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারবে না, স্ত্রীদের সঙ্গে মেপে মেপে তুলাদণ্ডে সমান আচরণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে প্রত্যেক স্ত্রীর প্রতিই আন্তরিকতা থাকতে হবে এবং কোন একজনের প্রতি এমনভাবে ঝুঁকে পড়া যাবে না, যাতে অন্যরা ঝুলে থাকে। এ ব্যাপারে পবিত্র কালামে হাকীমে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা কখনও নারীদের সমান রাখতে পারবে না, যদিও এর আকাংখী হও। অতএব সম্পূর্ণ ঝুঁকেও পড়ো না যে, একজনকে ফেলে রাখ দোদুল্যমান অবস্থায়। যদি সংশোধন কর এবং খোদাভীরু হও, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।'[১৭১]

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল (স.)-এর সুন্নত হচ্ছে এই যে, যদি কেউ কোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করে (এবং পূর্ব থেকেই তার ঘরে বিধবা স্ত্রী থাকে) তাহলে তাকে কুমারী স্ত্রীর কাছে সাতদিন রাত যাপন করতে হবে (এবং কেউ যদি কোন বিধবা মহিলাকে বিয়ে করে, তাহলে) তার সাথে তিনদিন থাকে।'[১৭২]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে (অধিকাারসমূহ) বন্টন করতেন। আর সে সঙ্গে এই বলে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমার বন্টন তো এই, সেই সব জিনিসে, যার মালিক আমি। কাজেই তুমি আমাকে তিরস্কৃত করিও না সেই জিনিসে, যার মালিক তুমি, আমি নই।'[১৭৩]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলে কারীম (স.) বলেছেন, যার দুইজন স্ত্রী রয়েছে, সে যদি তাদের একজনের প্রতি অন্যজনের তুলনায় অধিক ঝুঁকিয়া পড়ে, তাহলে কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় উত্থিত হবে যে, তার দেহের একটি পাশ নীচের দিকে ঝুঁকে পড়া অবস্থায় থাকবে।'[১৭৪]

এতটুকু ইনসাফও যদি স্ত্রীদের মধ্যে কায়েম করার আশঙ্কা থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে একজন মাত্র স্ত্রী রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন, 'আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই (বিয়ে কর)। অথবা তোমাদের অধিকারভূক্ত দাসীদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।'[১৭৫]

ইমাম ইবনে কোদামা আল মাকদেসী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ মিনহাজুল ক্বাসেদীন-এ কুরআন ও হাদীসের আলোকে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর নিম্নোক্ত কর্তব্যসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৭৬]

১. অলীমা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে। কারণ এটা সুন্নাত। এ ব্যাপারে রাসুল (স.)ও তার সাহাবীদের উৎসাহ দিতেন। নিজেও অলীমার ব্যবস্থা করেছিলেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী কারীম (স.) তাঁর কোন স্ত্রীকে বিয়ে করার সময়, যয়নবের বিয়ের সময়ের অলীমার ভোজের মত করে ভোজের ব্যবস্থা করেননি। আর সেই ভোজ ছিল, একটিমাত্র ছাগল বা মেষের (গোস্তের) ভোজ।'[১৭৭]

---

১৭১ আল কুরআন ৪ : ১২৯

১৭২ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৮৯, হাদীস নং- ৪৮৩০

১৭৩ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৬), খ. ৩, পৃ. ৪২৩, হাদীস নং- ১১৪১। ইমাম নাসায়ী, *সুনানু নাসায়ী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: জুন, ২০০৪), খ. ৪, পৃ. ১৮০, হাদীস নং- ৩৯৪৭। ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করন, আগস্ট ২০০৬), খ. ৩, পৃ. ১৫৩, হাদীস নং- ২১৩৯

১৭৪ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৩, হাদীস নং- ২১৩০। ইমাম নাসায়ী, *সুনানু নাসায়ী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ১৮০, হাদীস নং- ৩৯৪৬। ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪২৩, হাদীস নং- ১১৪২

১৭৫ আল কুরআন, ৪ : ৩

১৭৬ আবদুস শহীদ নাসিম, *ইসলামে পারিবারিক জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১৭৭ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬৫, হাদীস নং- ৪৭৮৭

Dhaka University Institutional Repository

হযরত বুরাইদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন– হযরত আলী (রা.) যখন ফাতিমা (রা.) কে বিবাহ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন নবী কারীম (স.) বলেছিলেন, বিবাহে অলীমা করা একান্ত আবশ্যক (মুসনাদে আহমদ)।[১৭৮]

২. স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করবে। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।
৩. স্ত্রীর সাথে হাসিখুশি এবং আনন্দদায়ক আচরণ করবে। আনন্দদায়ক খেলা-ধুলা করবে। নবী করীম (স.) হযরত আশেয়া (রা.)-এর দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন।
৪. লজ্জাশীলতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।
৫. সন্দেহজনক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকবে। অর্থ্যাৎ এমন কোন কথা বলবে না ও এমন কোন কাজ করবে না যাতে পারস্পরিক সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে।
৬. ভরণ পোষণের ব্যপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে।
৭. স্ত্রীকে দীনি শিক্ষা দান করবে। যেমন পবিত্রতার বিধান, নামায-রোজা ও অন্যান্য যাবতীয় ইবাদতের নিয়ম-কানুন।
৮. একাধিক স্ত্রী হলে তাদের সঙ্গে ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করবে।
৯. স্ত্রীর মধ্যে অবাধ্যতা ও ঔদ্ধত্য দেখা দিলে প্রথমে তাদেরকে বুঝাবে ও নসীহত করবে। তাতে ঠিক না হলে বিছানা পৃথক করে দেবে। এভাবে করলেই ভালো হয় যে, তার দিকে পিছু দিয়ে শোবে এবং তিনদিন কথা-বার্তা বলবে না। এতেও যদি সংশোধন না হয় তবে প্রহার করবে। মুখমণ্ডলে প্রহার করবে না। শরীরে ক্ষত সৃষ্টি করবে না।
১০. উত্তম পন্থায় সহবাস করবে। বিসমিল্লাহ পড়ে আরম্ভ করবে। কেবলামুখী হবে না। হায়েজ-নেফাস অবস্থায় সহবাস করবে না।

৬. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্ত্রীর প্রতি যেমন স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, তেমনি স্বামীর প্রতিও রয়েছে স্ত্রীর বহুবিধ দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর যেহেতু স্বামীকে আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীর ওপর মর্যাদাবান করেছেন, স্ত্রীর ভরণ পোষনের দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করেছেন, সর্বোপরি স্ত্রীর উপর তাকে কর্তৃত্বশালী করেছেন, সে জন্যে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অনেক বেশি দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকা স্বাভাবিক। স্ত্রীর নিকট আল্লাহ ও রাসুলের পরেই স্বামীর মর্যাদা। রাসুলে কারীম (স.) এতদুর পর্যন্ত বলেছেন, 'আমি যদি কাউকে অপর কোন ব্যক্তিকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে অবশ্যই স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম স্বামীকে সিজদা করার জন্য।'[১৭৯] মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এবং খাঁটি নারীদের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'নেককার স্ত্রীলোকগন হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাজতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাজত করে।'[১৮০]

অর্থ্যাৎ স্বামীর আনুগত্য এবং বিনয়ই হবে সালেহ নারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। একজন সালেহ নারী কখনও স্বামীর প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে পারে না। পারে না স্বামীর অবাধ্য হতে। আনুগত্য এবং বিনয়ই হরো তার ভূষণ।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দ্বিতীয় দায়িত্ব হলো, স্বামীর অনুপস্থিতিতে তার অধিকার রক্ষা করা। এর দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো স্বামীর অনুপস্থিতিতেও সে তার নিজেকে সর্বপ্রকার অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে হিফাজত করবে। তার দেহ মন তার নিকট স্বামীর আমানত। সুতরাং, দেহমনের চৌহদ্দিতে ভিন্ন পুরুষের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে কখনও এ

---

[১৭৮] মাওলানা আবদুর রহীম, *হাদীস শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩১

[১৭৯] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৫), খ. ৩, পৃ. ৪৪২, হাদীস নং- ১১৬০

[180] আল কুরআন ৪ : ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

আমানতের খিয়ানত করবে না। কোনো ঈমানদার খোদাভীরু নারী এটি কল্পনাও করতে পারে না। এর দ্বিতীয় দিকটি হলো, স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে স্বামীর অর্থসম্পদের সংরক্ষক, আমানতদার। এতে স্বামীর ইচ্ছার বিপরীত কোনো প্রকার খেয়ানত করবে না।

স্বামীর খেদমত করা স্ত্রীর আরেকটি কর্তব্য কাজ। স্বামীর সন্তুষ্টি বিধান স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আর স্বামীর সন্তুষ্টির জন্যে তার খেদমত করা জরুরী। অবশ্য স্বামীর খেদমত করাকে ইসলাম স্ত্রীর জন্য ফরজ করে দেয়নি এবং খেদমত দাবী করার অধিকারও স্বামীর নেই। কিন্তু উভয়ের যে নিঃস্বার্থ সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলা গড়ে দিয়েছেন এবং স্ত্রীর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব যেভাবে পুরুষের ওপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন, তাতে স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীর ওপর স্বামীর খেদমত করা কর্তব্য হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর পুরুষের যেমন স্ত্রীদের ওপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষের ওপর নিয়মানুযায়ী। আর নারীদের ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।'[১৮১]

স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে রাসূল (স.) এর একটি বিখ্যাত হাদীস এখানে উল্লেখযোগ্য। রাসুল (স.) বলেছেন, 'আল্লাহর প্রতি ঈমানদার নারীর পক্ষে তার স্বামীর ঘরে এমন ব্যক্তিকে আসবার অনুমতি দেয়া বৈধ নয়; যাকে তার স্বামী পছন্দ করে না। স্বামীর অনুমতিছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া তার জন্য বৈধ নয়। এ ব্যাপারে কারো কথা মানাও তার উচিত নয়। স্বামীর শয্যা থেকে দূরে থাকাও তার জন্যে বৈধ নয়। স্বামী অত্যাচারী হলে সাধ্যমত তাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করবে। এ খেদমত স্বামী গ্রহণ করলে তো ভালোই। আল্লাহ তার ওযর কবুল করে নেবেন। আর তার সত্যপন্থী হওয়াটা প্রকাশ করে দেবেন। আর এতে যদি স্বামী সন্তুষ্ট না হয়, তবে আল্লাহর নিকট তার অক্ষমতার ওযর পৌঁছে যাবে।'

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এসব দায়িত্ব এবং কর্তব্য ইসলাম যেভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে সেগুলো যদি যথাযতভাবে পালন করা হয় এবং মানা হয় তাহলে নিশ্চিত, একটি সমাজ থেকে নারী নির্যাতন নামক ব্যধির মুলোৎপাটন হতে খুব বেশি সময় লাগবে। কারণ, পারিবারিক নির্যাতনের শেকড়ই যেখান থেকে উপড়ানো হয়ে যাবে, সেখানে ভিন্ন কোনভাবে নারী নির্যাতনের শঙ্কাও কমে যাবে অনেকাংশে। পরিবার থেকে এভাবে ব্যক্তি যদি নীতি-নৈতিকতা আর ইসলামী অনুশাসনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে পরিবারের বাইরে নারী নির্যাতনের অন্যান্য যেসব কারণ ও ধরণ রয়েছে সেগুলোতেও অংশ নেবে না। ইসলামের এসব অনুশাসন প্রতিষ্ঠা, জানা এবং মানার ফলে একটা প্রক্রিয়া এবং পরিক্রমার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে পারিবারিক, সামাজিক, সামষ্টিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে যেসব নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে তা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হবে।

[১৮১] আল কুরআন, ২ : ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সমাজ সংস্কার

ব্যক্তির গঠন প্রশিক্ষণের সাথে সাথে ইসলাম সমাজ সংস্কারের জন্য কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে, যা মানুষকে পবিত্র ও নিরাপদ জীবন-যাপনে সহায়তা করে।

পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজে ব্যাভিচার নিষিদ্ধ। কিন্তু ধ্যান-ধারনা, শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থায় সর্বত্র ব্যাভিচার সংঘটিত হওয়ার উপকরণ দ্বারা পূর্ণ। বর্তমান সাহিত্য-সংস্কৃতির এমন কোন অঙ্গন বাদ নেই যেখানে অবাধ ও অবৈধ যৌন সম্পর্কের উস্কানি নেই। অশ্লীল সাহিত্য, অশালীন পোশাক নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অনৈতিকতায় ভরপুর আকাশ সংস্কৃতি, পর্নো উপাদানে ভরা ইন্টারনেট জগত, মাদকের সহজলভ্যতা ইত্যাদি সহায়ক উপকরণ মানুষের পবিত্র ও সৎ জীবন-যাপনের অন্তরায়। গুনাহে লিপ্ত হওয়ার এত সুযোগ ও হাতছানি থাকার পর অন্যায়-অপকর্ম, ব্যাভিচার, নারী নির্যাতন বন্ধে আইন প্রনয়ন এবং জনগনকে তা মানতে বাধ্য করা, 'চোরকে চুরি করতে বলা আর গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলার'ই নামান্তর।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো, আইন দেওয়ার আগে এমন এক পরিবেশ তৈরী করা, যেখানে সে আইন চালু করা এবং আইন মান্য করা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব। ইসলাম ব্যাভিচারকে হারাম ঘোষণা করা এবং সতীত্ব ও পবিত্রতার দাবী করার সাথে সাথে এমন পরিবেশও সৃষ্টি করে যে পরিবেশে গোনাহের বিষবৃক্ষ চিরতরে উৎপাটন সম্ভব। যেখানে পবিত্র ও সচ্চরিত্রবান থাকা অধিকতর সহজ এবং ব্যাভিচারী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকা অধিকতর কঠিন।

ইসলামী সমাজেও কিছু মৌলিক দাবি আছে যা পূরণ করা তার প্রত্যে অনুসারীরই কর্তব্য। কুরআন মাজীদ এসব দাবীকে বিভিন্ন স্থানে তুলে ধরেছে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে নবী, ঈমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবী করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের আনুগত্য গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।[১৮২]

এখানে উল্লেখ্য, এসব হুকুম-আহকাম নারীদের সম্পর্কিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, তখন মাত্রই মদীনায় ইসলামী সমাজ নির্মানের কাজ চলছিল। ওই সময়ই কুরাইশদের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি। যার শর্ত অনুসারে, ইসলামী রাষ্ট্র কুরাইশদের অনুমতিছাড়া তাদের কোন পুরুষকে আশ্রয় দিতে পারবে না। এরই প্রেক্ষিতে নারীদের আশ্রয় দানের জন্য মদীনা উন্মুক্ত হয়ে যায়। ওই সময়ই নারীদের জন্য কিছু আহকাম নির্ধারণ করা হয় যেগুলো অনুসরণ করলেই নারীরা মদীনা রাষ্ট্রে আশ্রয় লাভ করতো। তবে, এছাড়া এই হুকুমগুলো পুরুষদের জন্যও সার্বজনীন। এসব আহকামের ক্ষেত্রে পুরুষরাও এর গণ্ডির বাইরে যেতে পারে না।

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (স.) যেভাবে মেয়েদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, আমাদের কাছ থেকেও ঠিক তেমনি ওয়াদা নিয়েছিলেন। অথ্যাৎ, আমরা যেন আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক না করি, চুরি না করি, যিনা না করি, আমাদের সন্তানদের হত্যা না করি এবং একজন অন্যজনের ওপর অপবাদ আরোপ না করি।'[১৮৩]

সমাজই ব্যক্তির তৎপরতার ক্ষেত্র সরবরাহ করে এবং ব্যক্তি তার সমস্ত চেষ্টা-সাধনাকে নিজের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য। সে এর বাইরে পা রাখতে চাইলে সমাজের শক্তিসমূহ তার সাথে সহযোগিতা করতে শুধু অস্বীকৃতিই জানায় না বরং এ পথে তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে সমাজ যে রূপ ধ্যান-ধারনা ও আবেগ-অনুভূতির ধারক ও বাহক হবে অনুরূপ চরিত্রই সেখানে সৃষ্টি হবে। একটি পবিত্র পরিবেশ অপবিত্র ও নোংরা আচার-আচরণ এবং অভ্যাস-সমূহকে নিজ দেহে স্থান দিতে পারে না।

---

[১৮২] আল কুরআন, ৬০ : ১২

[১৮৩] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল হুদুদ, বাব-আল হুদুদ কাফফারাতুল লি আহলিহা।

Dhaka University Institutional Repository

আবার পাপ-পঙ্কিলতায় ভরা কোন সমাজ কোনো চরিত্রবান লোককে বরদাশত করতে পারে না। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, '...এবং আমি লুতকে প্রেরণ করেছি। যখন সে স্বীয় সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি অশ্লীল কাজ করছ, যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বের কেউ করেনি। তোমরা তো কামবশতঃ পুরুষের কাছে গমন কর, নারীদের ছেড়ে। বরং, তোমরা সীমা অতিক্রম করেছ। তাঁর সম্প্রদায় এ ছাড়া কোন উত্তর দিল না যে, বের করে দাও এদেরকে শহর থেকে। এরা খুব সাধু থাকতে চায়।'[১৮৪]

সুতরাং একটি ন্যায়ভিত্তিক এবং নৈতিকতাপূর্ণ বসবাস উপযোগি সমাজ বিনির্মানের জন্য প্রবৃত্তি পূজা এবং ব্যাভিচারকে চিরতরে নির্বাসনে পাঠানোর পরিবেশ তৈরী করতে হবে। বর্তমানে অপরাধের পৃষ্ঠপোষক যে সমাজ কাঠামো রয়েছে তার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে এবং এমন পরিবেশ তৈরী করতে হবে যেখানে পবিত্রতা ও সতীত্ব সমৃদ্ধি লাভ করতে পারে।

বর্তমান সময়ে পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য সমাজেই অবস্থা এমন হয়েছে যে, প্রত্যেকটি সমাজ-ব্যবস্থাতেই তাহযীব-তামাদ্দুনের কোন অঙ্গনই আর এমন নেই যেখানে যৌনতা ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা জেঁকে বসেনি। অশ্লীল সাহিত্য, উলঙ্গ ছবি, স্বল্প বসনা নারী, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, যৌন উত্তেজনাকর নৃত্যগীতের আসর এসব মানুষের পবিত্র জীবনকে করে তুলছে কলুষিত এবং সমাজকে করে তুলেছে নীতি–নৈতিকতাহীন। এসব সমাজে নারীর সতীত্ব এবং পবিত্রতার দাবী করাই যেন একটি অপরাধ।

নারী নির্যাতন বন্ধ করতে হলে তাই এমন কিছু সামাজিক সংস্কার সাধন করতে হবে যা নারীকে নির্যাতন তো দুরের কথা উল্টো সম্মান করতে সেখাবে। নারীর প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করবে। আর এমন একটি সমাজ কাঠামো তৈরী করার জন্য অবশ্যই তিনটি শর্ত মানতে হবে। যেমন চিন্তা ও মতবাদ বা আদর্শিক শক্তি, সামাজিক অনুভূতির শক্তি এবং আইনের শক্তি। এই তিনটি শর্ত বাস্তবায়নের জন্য ইসলামই সঠিক পন্থা অবলম্বন করে থাকে। কিভাবে? নিম্নে এ বিষয়টিই বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াশ চালাচ্ছি।

আদর্শিক প্রেরণা

মানুষের কিছু স্বভাবধর্ম আছে। এর সাথে আনুষ্ঠানিক ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক ততটা নেই। একজন মানুষ যে ধর্মই পালন করুক তার মৌলিক কিছু মানবিক গুণ থাকা সভ্যতার জন্য খুবই জরুরি। যেমন সৎচিন্তা, সত্যবাদিতা, দয়া, মানবিকতা, ক্ষমা, ঔদার্য, স্নেহ, ভালোবাসা। পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ একটি সর্বজনীন বিধান। এর সাথে কোন ধর্মেরই দ্বিমত নেই। তেমনি ওয়াদা দিলে সেটা রক্ষা করা। অঙ্গীকার পূরণ করা। আর্ত মানবতার সেবা, মা-শিশু ও নারীর প্রতি বিশেষ নমনীয় আচরণ। রুগী, বিপন্ন, বয়স্ক নাগরিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে সর্বাবস্থায় মানবিক ব্যবহার। একজন মানুষ যদি এ ধরনের চিন্তা, অভ্যাস, চরিত্র ও আচরণ রপ্ত করতে না পারে তাহলে তার ধার্মিক বা ধর্মানুসারী হওয়া পূর্ণ অর্থবহ হয় না। সে জন্য মহানবী (স.) বলেছেন, 'যার মধ্যে বিশ্বস্ততা ও আমানতদারি নেই তার ঈমানও নেই। আর যার মধ্যে অঙ্গীকার রক্ষার প্রবণতা নেই সে ধার্মিক হতে পারে না।'

অন্য এক হাদীসে রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন, সে ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান নয়, যার হাত (আচরণ ও কর্ম) ও মুখ (কথা ও ইংগিত) থেকে অন্যরা নিরাপদ নয়।[১৮৫]

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল (স.) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পর হিংসা করো না। বিদ্বেষ করবে না এবং পরস্পর পশ্চাতে শত্রুতা করবে না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই

[১৮৪] আল কুরআন, ৭ : ৮০-৮২

[১৮৫] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারি*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০৫, হাদীস নং- ৫৫৮২

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে থাক। আর কোন মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে তার ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি কথা-বার্তা পরিত্যাগ করা হালাল নয়।'[১৮৬]

ইসলামের মিশন হচ্ছে মানুষের হৃদয়-মন ও জীবনে সততা, নিষ্ঠা, ঈমান ও ইনসানিয়াতের আদর্শ বাস্তবায়ন। মানুষের ইহ ও পরকালীন জীবনকে সফল ও সুখময় করে তোলা। এতে আগ্রহ, উদ্দীপনা, ত্যাগ ও ভালোবাসা আছে তবে শঠতা, মিথ্যা, চালাকি ও প্রতারণা নেই। এটাই ইসলামের শক্তি

শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে ইসলাম এমন মতবাদ পেশ করে যা মানুষের সংকল্প ও কাজের ওপর রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা, সপ্তাহে সাতদিন-প্রতিদিনই প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় কর্তৃত্ব করে। জীবনের এমন একটি মুহূর্তও নাই যখন তার কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়ে।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারিমে মহান আল্লাহ তায়াল বলেন, 'তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গোনাহ পরিত্যাগ কর। নিশ্চয় যারা গোনাহ করছে, তারা অতি সত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে।'[১৮৭]

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আপনি বলে দিন: আমার পালনকর্তা কেবলমাত্র অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন- যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার, আল্লাহর সাথে এমন বস্তুকে অংশীদার করা, তিনি যার কোন সনদ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর প্রতি এমন কথা আরোপ করা যা তোমরা জান না।'[১৮৮]

গোনাহ ও অশ্লীলতার প্রকাশ যে রঙে এবং যে ঢঙেই ঘটুক না কেন তার বৈধতার কোন সনদ ইসলামের পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে না। কারণ, ইসলাম যেভাবে ব্যক্তির প্রশিক্ষণ এবং সমাজের বিনির্মাণ ও পুনর্গঠন চায় তাতে অপরাধ সংঘটনের কোন অবকাশ নেই। ইসলাম এমন কোন সমাজ তৈরী করতে চায় না যেখানে মানুষ আর মানুষ থাকবে না। মানুষ হয়ে যাবে পশুর চেয়েও নীচ-হীন এবং যেখানে যৌনতার অবাধ বিচরণ ঘটবে। বরং ইসলাম মানুষের এমন একটি জনপদ গড়ে তুলতে চায় যা হবে মানবতা, শিষ্টাচার ও নৈতিক চরিত্রের লালন ক্ষেত্র। ইসলাম এমন একটি সমাজ, এমনভাবে গড়ে তোলে যেখানে প্রতিটি মানুষ কর্মের পবিত্রতা এবং উত্তম চরিত্রের প্রতীক হয়ে ওঠে। তাদের প্রতিটি কাজকর্ম, আচার-আচরণে সমাজে সমৃদ্ধি ও অনুভূতি পরিচ্ছন্নতা লাভ করে। আর এ মহৎ চরিত্রের কারণে সমাজ সতীত্ব ও পবিত্রতার রক্ষকে পরিণত হয়।

'সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (রা.) তার পিতা বুরায়দা (রা.) থেকে বনর্ণা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে বাড়ীতে অবস্থান করে তাদের কাছে মুজাহিদদের স্ত্রী মায়ের মত সম্মানিতা। যুদ্ধে না গিয়ে যে মুজাহিদদের স্ত্রী ও পরিবার পরিজনের মধ্যে অবস্থান করে খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করে কিয়ামতের দিন সেই বিশ্বাস ভঙ্গকারীকে উক্ত মুজাহিদের সামনে দাঁড় করানো হবে। আর সে যতটা ইচ্ছা তার নেক কাজ নিয়ে নেবে। চিন্তা করে দেখো, সে সময় উক্ত অপরাধীর অবস্থা কেমন হবে?'[১৮৯]

অন্য এক হাদীসে এ ব্যাপারে আরও একটি বর্ণনা এসেছে। 'যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে কোন জিহাদকারীকে যুদ্ধ সরঞ্জামে সজ্জিত করে দিল সে যেন আল্লাহর পথে জিহাদ করলো। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদকারীর পরিবার-পরিজনের উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান করলো, সেও আল্লাহর পথে জিহাদ করলো।[১৯০]

---

[১৮৬] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৯৬, হাদীস নং- ৬২৯৫

[১৮৭] আল কুরআন, ৬ : ১২০

[১৮৮] আল কুরআন, ৭ : ৩৩

[১৮৯] ইমাম মুসলিম, সহীহ *মুসলিম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৪, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০৩), খ. ৫, পৃ. ৩৬১, হাদীস নং- ৪৭৫৫। ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ২৯৭, হাদীস নং- ২৪৮৮

[১৯০] ইমাম বুখারী, *সহীহ আল বুখারী*, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ ২০০৬), খ. ৩, পৃ. ১০৬, হাদীস নং- ২৬৩৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম এমন একটি জনপদ গড়ে তুলতে চায় যা হবে মানবতার শিষ্টাচার ও নৈতিক চরিত্রের লালনক্ষেত্র। মানুষকে মনুষ্যত্বসম্পন্ন হিসেবে মানবিক করে গড়ে তোলে, যাতে সমাজ নৈতিকতা ও পবিত্রতার রক্ষকে পরিণত হয়।

নৈতিক চরিত্রের লক্ষ্য ও মর্যাদা

পবিত্রতা আল্লাহভীতি ও সচ্চরিত্রের মতো উন্নত গুণাবলী শুধু মাত্র দায়ীদের কিংবা বক্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তার মধ্যে আইন ও রাজনীতির শক্তি সৃষ্টি হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নৈতিক গুণাবলীকে নিজের সম্ভ্রম ও মর্যদার পুঁজি মনে করবে। আর সমাজে মর্যাদা ও গৌরবের সাথে থাকার জন্য ব্যক্তি ওগুলোকে নিজের জান, মাল এবং বংশ ও গোত্রের মতো হিফাজত করবে।

ইসলামী সমাজ ব্যক্তির পবিত্রতার আবেগ অনুভূতিকে অভ্যস্ত মর্যাদা দান করে এবং তাকে এতো গুরুত্ব দেয় যে, ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) লিখেছেন: 'যদি কোন ব্যক্তিকে জোর পূর্বক চরিত্রহীনতার কাজ করতে বলা হয়, তাহলে আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা তার জন্য জরুরী। এতে যদি সে বিরত হয় তাহলে ভালো। আর হত্যা ছাড়া তাকে প্রতিহত করা না যায়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সমস্ত ফকীহদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হলো তাকে হত্যা করার অধিকারও সে ব্যক্তির আছে।'[১৯১]

ইসলাম ব্যক্তির এ পবিত্র আবেগ তার স্বাভাবিক অধিকার বলে মনে করে। এর অবমাননা কোন অবস্থাতেই বরদাশত করা যেতে পারে না। আর তাকে আহত করার যে কোন প্রচেষ্টা ইসলামী সমাজের দৃষ্টিতে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ কারণে ইসলামী সমাজ কাউকে অন্যের সম্ভ্রমহানি করার ও তার নিষ্কলুষ চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করার অধিকার দেয় না। কারণ, অপবাদ আরোপকারী সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চরিত্রের ওপর শুধু হামলা করে না, বরং সমাজে তার সম্মানজনক অবস্থানকেও বিপন্ন।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালার নির্দেশনা হলো, 'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ স্বাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের স্বাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না'ফরমান।'[১৯২]

ব্যভিচারীকে হেয় করা

ইসলাম যে সমাজ নির্মাণ করতে চায় সেখানে একজন সচ্চরিত্রবান মানুষ এবং একজ ব্যাভিচারির মাঝে বিশাল পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়। পবিত্র কুরআন এবং হাদীসে এ ব্যাপারে অনেকগুলো সুস্পষ্ট বিধান বলে দেওয়া হয়েছে। ইসলামী সমাজে একদিকে কোন চরিত্রবান মানুষের প্রতি অপবাদ আরোপকে আইনগত অপরাধ বলে গণ্য করে যাতে সে সম্মান ও মর্যদার সাথে জীবন যাপন করতে পারে। অন্যদিকে সে কোনো ব্যাভিচারীকে এমন সামাজিক মর্যাদা দিতে প্রস্তুত নয়, যা একজন সচ্চরিত্রবান মানুষের প্রাপ্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতা যে সমাজ নির্মাণ করেছে তার দৃষ্টিতে নৈতিক মূল্যবোধহীন মানুষেরই কদর বেশি। নৈতিকতার কোন মর্যাদা নাই সেখানে। এ কারণে সমাজে একজন মানুষ চরিত্রহীন, গুণ্ডা এবং বখাটে হয়েও সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতে পারে। এ অবস্থায় সমাজ থেকেই পরোক্ষভাবে একজন মানুষ নৈতিকতাহীন একটি চরিত্র গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকে।

---

[১৯১] মুখতারাতুন ইলমিয়া, পৃ. ১৭৩; ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারি*, প্রাগুক্ত, কিতাবুল মুহারিবীন, অনুচ্ছেদ: ইযা যানাতিল আমাত্ত্ব

[১৯২] আল কুরআন, ২৪ : ৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম এমন একটি সমাজ কায়েম করতে চায়, ব্যভিচারী ও চরিত্রহীন মানুষের যেখানে কোন স্থানই থাকবে না। বরং, সমাজের চোখে তার মান-ইজ্জত হ্রাস পাবে। শরীফ ও মর্যাদাবান লোকেরা তার সান্নিধ্য থেকে দুরে অবস্থান করবে। পরিণামে সে তার নিজের মতো নিকৃষ্ট মানুষগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হবে।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালার বাণী, 'ব্যাভিচারী পুরুষ কেবল ব্যাভিচারিনী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যাভিচারিনীকে কেবল ব্যাভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে। এবং এদেরকে মু'মিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।'[১৯৩]

রাসুল (স.) ও এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিয়েছেন, 'হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (স.) থেকে শুনেছি যে, অবিবাহিত যুবক ও যুবতি যদি যেনা করে তাদের সম্বন্ধে তিনি একশো চাবুক মারা এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করার নির্দেশ করতেন। ইবনে শিহাব বলেন, উরওয়াহ ইবনে যুবাইর আমাকে বলেছেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব (এমন ঘটনায়) দেশান্তর করেছেন। অতঃপর এ সুন্নত (নিয়ম) সর্বদা এভাবেই চলে আসছে।'[১৯৪]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী (স.) অবিবাহিত যুবক ও যুবতির যেনা করার জন্য তাদেও ওপর শাস্তি প্রয়োগস্বরূপ এক বছরের জন্য দেশান্তর করার নির্দেশ করেছেন।'[১৯৫]

অবিবাহিতদের বিবাহের ব্যবস্থা করা

পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ তায়ালা নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে- তা এক কথায় অতুলনীয়। নারীদের সম্মানিত করা এবং পৃথিবীতে যেন তারা আশ্রয়হীন হয়ে না পড়ে তার সুন্দর ব্যবস্থা যে আল্লাহ তায়ালা করে দিয়েছেন সে বর্ণনা এসেঠে পবিত্র কুরআনুল কারীমে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পৃতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।'[১৯৬]

পুরুষ আর নারীকে যে একই মর্যাদায় আসীন করেছেন মহান আল্লাহ তায়ালা সে ঘোষণাও দিয়েছেন। একে অপরের জোড়া বানিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে শান্তি ও সম্প্রীতি আহরনের বিষয়টিও জানিয়ে দিয়েছেন মহান আল্লাহ তায়ালা। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তিনিই সে সত্ত্বা যিনি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছেন একটিমাত্র সত্ত্বা থেকে; আর তার থেকেই তৈরী করেছেন তার জোড়া; যাতে তার কাছে স্বস্তি পেতে পারে।'[১৯৭]

সমাজের প্রকৃত দায়িত্ব হলো, লোকদের সৎপথে নিয়ে আসা এবং পাপ পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত ব্যক্তিদের সৎ ও পবিত্র জীবন যাপনে অভ্যস্ত করা। যাতে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি পবিত্র ও রুচিশীল জীবনের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে এবং উন্নত নৈতিক জীবন যাপনে আগ্রহী ব্যক্তি যেন দিশহারা হয়ে না পড়ে, বরং তাকওয়া ও সৎকর্মশীল গোটা একটা কাফেলাই যেন তার সহযাত্রী হয়।

আপনি কোন খান্দান বা গোষ্ঠির সাথে সংশ্লিষ্ট হলে তাদের প্রতি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধু এটুকু নয় যে, তারা অভুক্ত হলে খাদ্য দেবেন, বস্ত্রহীন হলে বস্ত্র সরবারহ করবেন এবং গৃহহীন হলে বাসগৃহের ব্যবস্থা করবেন। বরং

---

[১৯৩] আল কুরআন, ২৪ : ৩

[১৯৪] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০৩, হাদীস নং- ৬৩৫৮

[১৯৫] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ২০৩, হাদীস নং- ৬৩৫৯

[১৯৬] আল কুরআন, ৩০ : ২১

[১৯৭] আল কুরআন, ৭ : ১৮৯

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরকে নৈতিক অধপতন থেকে রক্ষা করা, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যধির প্রতিকার এবং তাদের রূহানী চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করাও আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

এ স্বাভাবিক অধিকারকে কুরআন মাজীদ নিম্নোক্ত ভাষায় স্মরণ করিয়ে দেয়, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্ম পরায়ণ, তাদেরও।'[১৯৮]

এই নির্দেশটি যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, এই আয়াতের উৎকৃষ্ট দাবী হচ্ছে, ইসলামী সমাজে কেউ কুমার জীবন যাপন করতে পারবে না। যাতে প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্য তাকে অবৈধ পথ ও পন্থা খুঁজতে না হয়। ইসলামী সমাজে সব শ্রেনীর মানুষই সাধারণভাবে এই নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত।

বিখ্যাত তাবেয়ী আহনাফ (র.) বলেন, তিনটি বিষয় এমন যাতে, দেরী করা যায় না। বিষয়গুলো কি সে সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমলে সালেহ করা, মৃতকে দাফন করা এবং কোনো অবিবাহিতা যুবতী মেয়ের উপযুক্ত সম্বন্ধ জুটলে বিয়ে দিয়ে দেওয়া।

তিনি বলতেন: কোনো অবিবাহিতা যুবতী মেয়ের জন্য সমমর্যাদার কোনো পুরুষের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসলে তা প্রত্যাখ্যান করাকে গৃহের মধ্যে বিষধর সাপ থাকার চেয়েও অধিক অপছন্দনীয় বলে আমি মনে করি।

শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) তার আত্মীয় স্বজনদের বলতেন, আমার বিয়ের ব্যবস্থা করো। কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অছিয়ত করেছেন, আমি যেন অবিবাহিত থেকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ না করি।[১৯৯]

মুজাহিদ (রঃ) বলতেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তার দাসদের বিয়ে করার প্রস্তাব পেশ করতেন এবং বলতেন: তোমাদের মধ্য থেকে যে বিয়ে করতে ইচ্ছুক আমি তার বিয়ে দিতে প্রস্তুত। (মনে রেখ) অবিবাহিত জীবন যাপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর ব্যভিচারের জঘন্যতা এতোই গুরুতর যে, ব্যভিচারী ব্যক্তি যে মুহূর্তে ব্যভিচার করে আল্লাহ তায়ালা তার গলদেশ থেকে ঈমানের মালা ছিনিয়ে নেন। তিনি চাইলে পুনরায় তা তার গলায় পরিয়ে দেন এবং না চাইলে পরিয়ে দেন না।'[২০০]

ইমাম নখয়ী (রঃ) বলেন, সালফগণ তাদের ক্রীতদাসদের বিয়ে করতে বাধ্য করতেন। তারা বিয়ে করতে প্রস্তুত না হলে, তাদেরকে গৃহবন্দী করতেন।'[২০১] যাতে তারা সমাজে বিপর্যয়ের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।

ইসলামী সমাজে পবিত্র ও নিষ্কলুষ জীবন যাপনে সাহায্য করা শুধু ব্যক্তির একার দায়িত্ব নয়, বরং এটি রাষ্ট্রের কর্তব্য হিসেবেও পরিগণিত। নবী (স.) বলেন, 'যার (নারীর) কোনো অভিভাবক নেই, সমসাময়িক শাসন-কর্তৃত্ব (রাষ্ট্র ও সরকার) তার অভিভাবক।'[২০২]

নবী (স.) হযরত আলী (রা.) কে তিনটি বিষয় মনে রাখার আদেশ দিয়েছিলেন। সময় মতো নামায আদায় করতে, কেউ মৃত্যু বরণ করলে দাফন-কাফনে দেরী না করতে এবং উপযুক্ত সম্বন্ধ জুটলে অবিবাহিতাকে অবিলম্বে বিয়ে দিতে।

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রা.) কুফার গভর্ণর যায়েদ ইবনে আবদুর রহমানের একখানা পত্রের জবাবে লিখেছিলেন: তুমি লিখেছো সৈন্যদের বেতন দেয়ার পরও তোমার কাছে অর্থ উদ্বৃত আছে। অতএব বাস্তব প্রয়োজনে যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছে, উদ্বৃত এ অর্থ দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করো। আর যারা মোহরানা পরিশোধে অক্ষম তাদের মোহরানা আদায় করে দাও।[২০৩]

---

১৯৮ আল কুরআন, ২৪: ৩২

১৯৯ আল্লামা আবু বকর আহমাদ বিন আলী জাসসাস, অনু: মাও: মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *আহকামুল কুরআন* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী), খ. ২, পৃ. ১০৪

২০০ আল মুহাল্লা লি ইবনে হাযম, খ. ১১, পৃ. ১২১

২০১ ইমাম আবু আবদুল্লাহ আল কুরতুবী, তাফসীরে কুরতুবী, খ. ১২, পৃ. ২৪১

২০২ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৩৪, হাদীস নং- ২০৭৯

২০৩ সীরাতে উমর ইনবে আবদুল আযীয, আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হাকাম, মৃত্যু ২১৪ হিজরী

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের উদ্দেশ্য

ব্যভিচারের দ্বিতীয় কারণ ও উৎস ধ্বংস করার জন্য ইসলাম বৈধ পন্থাগুলোকে একেবারেই সহজসাধ্য করে দিয়েছে। তা অবলম্বন করার জন্য ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে চরমভাবে উৎসাহিত করে, যাতে ব্যক্তি নিজেকে গোনাহের কাজে জড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের উদ্দেশ্য এ নয় যে, বাড়ীতে একজন রক্ষিতা থাকবে। বরং ইসলাম বিয়েকে উন্নত নৈতিক চরিত্র এবং পবিত্রতা সংরক্ষনের উপায় বলে মনে করে।

মানব জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য পরিবারের ভূমিকা এবং অপরিহার্যতা প্রশ্নাতীত। পরিবারই হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রথম সিঁড়ি। পারিবারিক বন্ধনই একজন মানুষকে পূর্নাঙ্গ 'মানুষ' হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে। যাবতীয় অন্যায়-অনাচার, ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকার জন্য প্রাথমিক এবং নৈতিক শিক্ষা ও দায়িত্ববোধটা তৈরী হয় পরিবার থেকেই।

একই সঙ্গে চারিত্রিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুশতা রক্ষার জন্যও বিবাহ করা ফরজ। এ ব্যাপারে রাসুল (স.) বলেছেন, 'হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেন, তিনজন লোকের সাহায্য করার দায়িত্ব আল্লাহ নিজের ওপর গ্রহণ করেছেন। সে তিনজন হলো: (১) যে ক্রীতদাস মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে চুক্তিনামা লিখে দিয়েছে ও প্রতিশ্রুত পরিমাণ অর্থ আদায় করে দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে; (২) বিবাহকারী– যে চারিত্রিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা রক্ষা করতে ইচ্ছুক এবং (৩) আল্লাহর পথে জিহাদকারী।[২০৪]

কিন্তু পরিবার কিভাবে গঠিত হবে? বলাই বাহুল্য যে, বিয়ের মাধ্যমেই একটি পরিবারের গোড়া পত্তন হয়। বিয়ের দ্বারাই রচিত হয় পরিবার। আল্লাহ তায়ালা নারী-পুরুষের মধ্যে যে পারস্পরিক আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তাদের একের সাথে অপরের মিলনের যে উদগ্র বাসনা তৈরী করে দিয়েছেন, তারা তা কিভাবে চরিতার্থ করবে? তাদের একজনকে আরেকজনের ওপর যে নির্ভরশীল প্রবৃত্তি দান করা হয়েছে তারা তা কিভাবে কার্যকর করবে? তাদের পরস্পরের প্রতি যে প্রেম-ভালবাসা ও হৃদ্যতা দান করা হয়েছে, সেটা বাস্তবায়নের সঠিক ও স্থায়ী পন্থাই বা কী? আর মানব বংশের সুস্থ ও সুষ্ঠু বিস্তার ও বিকাশ লাভই বা কোন পন্থায় হতে পারে? এসব প্রশ্নের জবাব একটাই। আর তা হলো 'বিয়ে'। বিয়েই হলো এসব বিষয়ে খোদা প্রদত্ত বিধান।

বিয়ে ছাড়া যৌন সম্পর্ক স্থাপনই ব্যভিচার। আর এ বিষয়টা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বিয়ে হলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এমন এক বিধান, যেটা দিয়ে একজন নারী ও একজন পুরুষের মধ্যে এমন এক বন্ধন ও সম্পর্ক স্থাপন যার কারণে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণ হালাল হয়ে যায়। বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যই আল্লাহ তায়ালা পুরুষের সঙ্গে নারীকেও সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, 'আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পৃতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।'[২০৫]

বিয়ে করা রাসুল (স.) এর সুন্নত। বিয়ে না করার অর্থ, রাসুল (স.) এর উম্মত থেকে নিজের নাম কেটে নেওয়া। এ বিষয়টাই এসেছে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত এক হাদীসে, 'হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, 'বিয়ে করা আমার রীতি (সুন্নত) ও স্থায়ী কর্মপন্থা। অতএব যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নাত ও রীতি অনুযায়ী আমল করবে না সে আমার উম্মাহর অন্তর্ভূক্ত নয়।'[২০৬]

---

[২০৪] ইমাম নাসায়ী, *সুনানু নাসায়ী শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, জুন ২০০৩), খ. ৩, পৃ. ৪৬৯, হাদীস নং- ৩২২১

[২০৫] আল কুরআন, ৩০ : ২১

[২০৬] ইমাম ইবনে মাজা, *সুনান ইবনে মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫৬, হাদীস নং- ১৮৪৬

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও পুরুষের মাঝে বন্ধনের 'বিয়ে' নামক যে ব্যবস্থা আল্লাহ দান করেছেন তা মানুষের জন্য এ বিরাট নিয়ামত। বিয়ের মাধ্যমে অসংখ্য উপকারীতা এবং কল্যাণ আল্লাহ তায়ালা মানব জীবনে রেখে দিয়েছেন।

১. নারী পুরুষের সম্পর্ককে বিধিবদ্ধ করা

নারী ও পুরুষের যৌন কামনা চরিতার্থ করার পন্থাকে বিধিবদ্ধ করা এবং যৌন উশৃঙ্খলা থেকে তাদের পবিত্র রাখা। এ বিষয়টিকেই পবিত্র কুরআনুল কারিমে খুব সুন্দর ভাষায় পেশ করা হয়েছে, 'তোমাদের জন্যে হালাল সতী-সাধ্বী মুসলমান নারী এবং তাদের সতী-সাধ্বী নারী, যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তোমাদের পূর্বে, যখন তোমরা তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর, তাদেরকে স্ত্রী করার জন্যে, কামবাসনা চরিতার্থ করার জন্যে কিংবা গুপ্ত প্রেমে লিপ্ত হওয়ার জন্যে নয়।'[২০৭]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, '...এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য- ব্যভিচারের জন্যে নয়। অনন্তর তাদের মধ্য থেকে তোমরা যাকে ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোন গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ ও রহস্যবিদ।'[২০৮]

সূরা নাহল-এ আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পয়দা করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবন-যাপন দান করেছেন।'[২০৯]

২. নারী-পুরুষের ভালবাসা ও সম্পর্ককে পূত-পবিত্র করা

নারী ও পুরুষের প্রাকৃতিক প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা ও হৃদ্যতার দাবীকে পূত পবিত্র পন্থায় পূর্ণ করা এবং তার ফিতরাতের এসব দাবীকে বিকশিত করা ও পূর্ণতা দান করা। সূরা বাকারায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।'[২১০]

পবিত্র কোরআনে অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন, 'আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলমান নারীকে বিয়ে করার সামথ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভূক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদেরকে বিয়ে করবে। আল্লাহ তোমাদের ঈমান সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞাত রয়েছেন। তোমরা পরস্পর এক; অতএব, তাদেরকে তাদের মালিকের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে মোহরানা প্রদান কর এমতাবস্থায় যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে– ব্যাভিচারিনী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারী হবে না। অতঃপত যখন তারা বিবাহ বন্ধনে এসে যায়, তখন যদি কোন অশ্লীল কাজ করে, তবে তাদেরকে স্বাধীন নারীদের অর্ধেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ ব্যবস্থা তাদের জন্যে, তোমাদের মধ্যে যারা ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে ভয় করে, আর যদি সবর কর, তবে তা তোমাদের জন্যে উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।[২১১]

উপরোক্ত আয়াতদুটিতে 'ইহসান' ও 'ইসফাহ' শব্দ দুটি দ্বারা কুরআন মাজীদে বিয়ের লক্ষ্য স্পষ্টরূপে তুলে ধরেছে। শব্দটি দ্বারা ঢেকে ফেলে দেয়া বা প্রবাহিত করার অর্থও বোঝায়।' অবাধ যৌন সম্ভোগ প্রবাহিত পানির ন্যায়। যার সামনে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। এ কারণে জুয়ার যে তীরে কোন কিছু লাভ করা যায় না এবং প্রতিযোগিতায় যার কোন মূল্য নেই তাকে আস সাফীহ বা বেকার তীর বলে।

---

[২০৭] আল কুরআন, ৫ : ৫

[২০৮] আল কুরআন, ৪ : ২৪

[২০৯] আল কুরআন, ১৬ : ৭২

[২১০] আল কুরআন, ২ : ১৮৭

[২১১] আল কুরআন, ৪ : ২৫

Dhaka University Institutional Repository

এ সংক্রান্ত কুরআনের দলীল প্রমান নিম্নে উদ্বৃত করা হলো:-
ইসলামী শরীআত ব্যাভিচার নিষিদ্ধ এবং বিবাহ বৈধ করার মাধ্যমে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। প্রথমটি হলো, ব্যক্তি যেন তার যৌন চাহিদা পূরনের জন্য লাগামহীন এবং স্বেচ্ছাচারী না হয়, বরং সীমারেখা মেনে চলে। দ্বিতীয়টি হলো সতীত্ব ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য এ বাধ্যবাধকতা যেন উপকারী ও কার্যকরী হয়। কুরআন বিয়ে বুঝাতে দ্বিতীয় যে শব্দটি ব্যাবহার করেছে তা হলো হিসন। হিসন শব্দের অর্থ হলো সুরক্ষিত দুর্গ, উত্তম জাতের ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাধি। এসব অর্থ ইংগিত দেয় যে, বিবাহের মাধ্যমে ব্যক্তি হারাম পথসমূহ থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। সে এমন সব হাতিয়ারে সুসজ্জিত হয়ে যায়, যার মাধ্যমে যৌন উম্মাদনামূলক সবরকম অবাঞ্ছিত আক্রমণকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। নবী (স.) এ বিষয়টিই খুব সুন্দর করে নিম্নোক্ত ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন।
রাসূল (স.) বলেন, 'তোমাদের কারো কাছে যদি কোন নারী পছন্দনীয় বলে মনে হয় এবং তাতে তার মন প্রভাবিত হয়, তাহলে তার উচিৎ নিজের স্ত্রীর কাছে যাওয়া এবং তার সাথে মিলিত হওয়া। এভাবে তার মনের কামনা-বাসনা তৃপ্ত ও প্রশমিত হবে।'[২১২]
নারী-পুরুষের পারস্পরিক ভালবাসা স্থাপনের জন্য যে বিবাহের বিকল্প নেই সেটাই অপর একটি হাদীসে এসেছে এভাবে, 'হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, দু'জনের পারস্পরিক ভালবাসা স্থাপনের জন্য বিবাহের বিকল্প নেই।' [২১৩]

৩. বংশ বিস্তার

বিয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বংশ বিস্তার। আল্লাহ তায়ালা পূত-পবিত্র সম্পর্কের মধ্য দিয়ে পৃথিবী শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে মানুষের বৃদ্ধি ঘটাতে চান। আর এর একমাত্র মাধ্যম বিয়ে। বিয়ে ছাড়া সন্তান জন্মদান কোনভাবেই বৈধ নয় এবং এভাবে যে সব সন্তান পৃথিবীতে আসে তারাও পবিত্র নয়। সাম্য, ন্যায়, নীতি-নৈতিকতাপূর্ণ একটি সমাজ গঠনের সবচেয়ে পূর্বশর্ত হলো বিয়ে। এর মাধ্যমে সুন্দর একটি বংশের বিস্তার লাভ করবে।
আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বংশ বিস্তারের বিষয়ে ঘোষণা করেন, 'তিনি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন। কোন কিছুই তার অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখন।'[২১৪]
সূরা নিসার শুরুতেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন মহান আল্লাহ তায়ালা। তিনি বলেন, 'হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।'[২১৫]

৪. পরিবার গঠন

বিয়ের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো পরিবার গঠন। একটি সমাজ এবং রাষ্ট্রের কাঠামো তৈরী হয় পরিবার দিয়ে। একটি সুষ্ঠু এবং সুন্দর পরিবার একটি সুন্দর রাষ্ট্রের পূর্বশর্ত। আর এমন একটি পরিবার গঠন হয়ে থাকে শুধুমাত্র

---

[২১২] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, জুন ২০০৩), খ. ৪, পৃ. ২৫৯, হাদীস নং- ৩২৭৫ (হযরত জাবির রা:-এর বর্ণনায় মুসলিম শরীফে অনুরূপ পরপর তিনটি হাদীস রয়েছে)। ইমাম তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪২, হাদীস নং- ১১৫৯

[২১৩] ইমাম ইবনে মাজা, *সুনান ইবনে মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৫৬, হাদীস নং- ১৮৪৭

[২১৪] আল কুরআন, ৪২ : ১১

[২১৫] আল কুরআন, ৪ : ১

Dhaka University Institutional Repository

বিবাহের মাধ্যে। পাশ্চাত্যে পরিবার প্রথার কোন বালাই নেই। বিয়ের আগেই দেখা যাচ্ছে কয়েকজন সন্তান-সন্ততি হয়ে যাচ্ছে। এতে করে কিন্তু ঠুনকোভাবে গড়া পরিবারগুলো অহরহ ভেঙে যাচ্ছে। তখন অসহায় হয়ে পড়ে তাদের সন্তানরা। অসহায় হয়ে পড়ে নারীরা। এতে করে সমাজে বিশৃঙ্খলা যেমন বাড়ছে, তেমনি অনাচারও বেড়ে যাচ্ছে বহুগুণ।

অতএব বিয়ের মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবার গঠন করার জন্য বিয়ে সবচেয়ে বড় পূর্বশর্ত। একই সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে শান্তিপূর্ণ সমাজ নির্মানই এর সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর; যাতে নিয়মিত আছে পাষাণ হৃদয়, কঠোরভাব ফেরেশতাগণ।'[২১৬]

আল্লাহ তায়ালা আরেক জায়গায় ঘোষণা দিয়েছেন, 'এবং যারা বলে হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা দান কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শস্বরূপ দান কর।'[২১৭]

আল্লাহ তায়ালা তার নবী এবং রাসূলদের মাধ্যমেও যে পরিবার গঠনে মানুষকে উৎাহ দিয়েছেন, সে ব্যাপারটাই কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করেছেন এভাবে- 'আপনার পূর্বে আমি রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে পত্নী এবং সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। কোন রাসুলের এমন কোন সাধ্য ছিল না যে, আল্লাহর নির্দেশছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করে।'[২১৮]

একাধিক বিয়ের অনুমতি

ইসলামী সমাজ পুরুষকে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অধিকার দেয়। ফূর্তিবাজির জন্য এ অধিকার দেওয়া হয় না। বরং দেওয়া হয় এ জন্য যে, কোন কোন সময় পূরুষ তার যৌন চাহিদা ও আকাঙ্খা পূরণের বৈধ ক্ষেত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। কিন্তু শরীআত প্রদত্ত এসব অধিকার ভোগের জন্য জরুরী হলো পুরুষ তার সাধ্য অনুসারে স্ত্রীদের মধ্যে ইনসাফ ও সাম্য প্রতিষ্ঠার নির্দেশের অনুগত থাকবে।

এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদের ঘোষণা হচ্ছে, 'তবে সে সব মেয়েদের মধ্য থেকে, যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়-সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই; অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসিদেরকে; এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা।'[২১৯]

আল্লামা ইবনে ইলহাম হানাফী এ আয়াতের আইনগত দিকক সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন এভাবে- 'এ থেকে জানা গেল যে, চার স্ত্রী একটি শর্তাধীনে হালাল। আর তা হলো বেইনসাফীর আশংকা না থাকা। এ আশংকা বর্তমান থাকলে একের অধিক বিয়ে করা নিষিদ্ধ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে ইনসাফ করা আবশ্যক।'[২২০]

আল্লামা বদরুদ্দিন কাশানী বলেন, 'স্বামীর যদি দু'জন স্বাধীন কিংবা দু'জন ক্রীতদাসী স্ত্রী থাকে তাহলে খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, রাত্রি যাপন এবং আচার-আচরণের ব্যাপারে তাদের উভয়ের মধ্যে ইনসাফ করা তার জন্য ওয়াজিব।'

---

[২১৬] আল কুরআন, ৬৬ : ৬

[২১৭] আল কুরআন, ২৫ : ৭৪

[২১৮] আল কুরআন, ১৩ : ৩৮

[২১৯] আল কুরআন ৪ : ৩

[২২০] ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

নারীর দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার

যদি বৈধতা অথবা তালাক বা খোলা নারীকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাহলে অবিলম্বে পুনর্বিবাহ দিতে সমাজকে তাগিদ দেয় ও উৎসাহিত করে। তাই নবী (স.) ও তাঁর চার খলীফার যুগে অতি সহজেই মেয়েদের দ্বিতীয় বিয়ে হয়ে যেতো।

আতেকা ইবনে যায়েদের বিয়ে হয়েছিল হযরত আবু বকর (রা.) এর পুত্র আবদুল্লাহর সাথে। বিশেষ কিছু কারণে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে তালাক দেয়ার জন্য আবদুল্লাহকে পরামর্শ দেন। পিতার পরামর্শ অনুসারে আবদুল্লাহ তার স্ত্রীকে তালাক দিলেন বটে; কিন্তু এ কাজের জন্য তার যথেষ্ট মনস্তাপ ও দুঃখ ছিল। কারণ, তিনি আতেকাকে খুবই ভালবাসতেন। আবদুল্লাহর আগ্রহ দেখে হযরত আবু বকর (রা.) তাকে পুনরায় বিয়ে করার অনুমতি দিলে তিনি আতেকাকে পুনরায় বিয়ে করলেন। তায়েফের যুদ্ধে আবদুল্লাহ শহীদ হলেন। কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত যায়েদ ইবনে খাত্তাব আতেকাকে বিয়ে করেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হলে হযরত উমর (রা.) এবং এরপর হযরত যুবায়ের (রা.)এর সাথে তার বিয়ে হয়। হযরত যুবায়ের (রা.) এর শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.) তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু আতেকা নিজেই তা অস্বীকার করেন।

সুহায়লা বিনতে সুহাইলের বিয়ে হয়েছিল পর পর চারজন অথ্যাৎ হযরত আবু হুযাইফা (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওফ (রা.), আবদুল্লাহ ইবনুল আসওয়াদ (রা.) এবং সামাখ ইবনে সাঈদের সাথে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কন্যা জামিলার বিয়ে হয়েছিল হযরত হানযালার সাথে। তিনি উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করলে সাবেত ইবনে কায়েস তাকে বিয়ে করেন। সাবেত (রা.) এর ইন্তিকালের পর মালেক ইবনে দুখশাম এবং সর্বশেষ হাবীব ইবনে লিয়াফ তাকে বিয়ে করেন।

আসমা বিনতে উমায়েসের প্রথম বিয়ে হয়েছিল হযরত আলী (রা.) এর ভাই হযরত জাফরের সাথে। তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত আবু বকর (রা.), তাঁর পরে হযরত আলী (রা.) তাকে বিয়ে করেন।

হযরত আলী (রা.) এর কন্যা উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয় হযরত উমর (রা.) এর সাথে। হযরত উমর (রা.) শহীদ হলে, আওন ইবনে জাফরের সাথে তার বিয়ে হয়। আওনের মৃত্যুর পর তার ভাই আবদুল্লাহ তাকে বিয়ে করেন।[২২১]

রাসুলুল্লাহ (স.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারীর দ্বিতীয় বিবাহ দূষনীয় বা অপছন্দনীয় হওয়ার কোনো ধারনাই ছিল না, যেমনটি হিন্দু ধর্ম এবং অন্য কিছু ধর্মে বিধান রয়েছে। এ কারণে সে যুগে একের অধিকবার বিয়ে হয়েছে ব্যাপকভাবে।'[২২২]

বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে বিয়ের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পবিত্র জীবন-যাপনে সাহায্য করা। এ উদ্দেশ্য কেবল তখনই অর্জিত হতে পারে যখন স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের যৌন চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। এ কারণে ইসলাম স্বামী-স্ত্রীকে অধিকার দিয়েছে, উভয়ের কোন একজনের যৌন দাবি পূরণ করার যোগ্যতা না থাকলে সে যেন দাম্পত্য বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেয়।

হযরত উমর (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং আরও কিছু সংখ্যক সাহাবা ও তাবেয়ীর মতে শুধু যৌন অক্ষমতার কারণেই নয়, বরং কুষ্ঠ, অন্ধত্ব এবং মানসিক রোগও এমন ত্রুটি হিসেবে গণ্য, যে কারণে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর

---

[২২১] দ্র. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩-২৯৪

[২২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

Dhaka University Institutional Repository

বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার রয়েছে।'[২২৩] হানাফীদের মতে স্বামীর যদি কুষ্ঠ বা অনুরূপ কোন রোগ জনিত ত্রুটি থাকলে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার রাখে।

বিবাহ বিচ্ছেদের অধিনার নারীর যেমন রয়েছে, তেমনি পুরুষেরও রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে কখনও কখনও অভিভাবকের নির্দেশও প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন, আমার এক স্ত্রী ছিল যাকে আমি ভালোবাসতাম। কিন্তু, আমার পিতা ওমর তাকে অপছন্দ করতেন। তিনি আমাকে বললেন তাকে তালাক দিতে। কিন্তু আমি তা প্রত্যাখান করি। ওমর রা. রাসূলুল্লাহ (স.) এর কাছে গেলেন এবং এ বিষয়টি তাকে অবহিত করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (স.) আমাকে ডাকলেন এবং তাকে তালাক দিয়ে দিতে বললেন।[২২৪]

উল্লেখ্য যে, ইসলামে বিয়ে ও তালাক প্রদানের অধিকারী কেবল স্বামী। এমনকি যদি পিতামাতা তাদের ছেলের স্ত্রীদের পছন্দ নাও করেন তবুও তারা ছেলের বউকে তালাক দিতে বাধ্য করতে পারেন না। তবে যেহেতু ওমর রা. ছিলেন একজন বড় ন্যায়বান সাহাবি, তাই রাসূলুল্লাহ (স.) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. কে তার পিতার ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাতে বলেছেন।

বৈধ সম্পর্কের মর্যাদা

মানুষের যে সব সম্পর্ক পবিত্র ও সুখী জীবন-যাপনে সাহায্য করে, ইসলাম তাকে দৃঢ়তর করার এবং যথাসাধ্য আঁকড়ে ধরার শিক্ষা দেয়। বিয়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ চুক্তি ও অঙ্গীকার। যতদিন ইচ্ছা ফূর্তি করা হবে, যখন ইচ্ছা ছিন্ন করা হবে, এ জন্য এ চুক্তি সম্পাদন করা হয় না। বিয়ের বন্ধন যদি এতোই গুরুত্বহীন হয়, তবে বিয়ে এবং ব্যভিচারের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। যে ব্যক্তি প্রতিদিন নতুন বিয়ে, নতুন সম্পর্কের প্রয়োজন অনুভব করে, আর সে যৌন ক্ষুধা নিবারনের জন্য ভিন্ন (অবৈধ) কোন পন্থা অবলম্বন করে, তাহলে তার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

শুধুমাত্র মনের খায়েশ মিটানোর জন্য যখন-তখন এ সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে এ জন্য এ চুক্তি সম্পাদন করা হয় না। নবী (স.) বলেছেন, 'যে সব মহিলা অকারণে স্বামীর কাছে তালাক প্রার্থনা করে, তারাই মোনাফেক।'[২২৫]

মহানবী (স.) অন্য এক হাদীসে বলেন, 'প্রকৃত কোনো কারণ ছাড়া যে মহিলা তার স্বামীর কাছে তালাক চায়, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি পর্যন্ত হারাম।'[২২৬]

এ সম্পর্কে রাসুল (স.) আরও বলেন, 'আল্লাহর দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহ হলো, সেই ব্যক্তির গোনাহ, যে কোন নারীকে বিয়ে করে এবং নিজের প্রয়োজন পুরণ করার পর তাকে তালাক দিয়ে দেয় এবং তার মোহরানাও পরিশোধ করে না।'[২২৭]

পরকীয়া সম্পর্ক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ

বৈধ সীমার মধ্যে থেকে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন শুধু ব্যক্তির জন্যই জরুরী নয়, সমাজও সে জন্য বাধ্য। শরীআত সম্মত একটি সম্পর্ককে সমাজ মায়ের মতই সম্মানিত বলে ঘোষণা করে। আইনের অস্ত্র যতক্ষণ না এ সম্পর্ক কেটে ফেলে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ মর্যাদা নষ্ট করার অধিকার কারও নেই। কুরআন মাজীদ ঘোষণা

---

[২২৩] ইমাম বায়হাকি, আস সুনানুল কুবরা, খ. ৭, পৃ. ২১৪-২১৫

[২২৪] ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬০৯, হাদীস নং- ৫০৪৮ (বর্ণিত আছে, এরপর তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন)।

[২২৫] ইমাম নাসায়ী, *সুনানে নাসায়ী*, প্রাগুক্ত, কিতাবুত তালাক, বাবু মা জায়া ফিল খোলা

[২২৬] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৬), খ. ৩, পৃ. ৮৭২, হাদীস নং- ১১৮৯

[২২৭] ইমাম হাকেম, *মুসতাদরেকে হাকেম*, খ. ২, পৃ. ১৮২

Dhaka University Institutional Repository

করে, 'বিবাহিতা নারীরা তোমাদের জন্য হারাম।' এ নিষেধাজ্ঞা নস্যাৎকারী যে কোন প্রচেষ্টা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিন্দনীয়।

নবী (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন নারীকে তার স্বামীর বিরুদ্ধে কিংবা কোন দাসকে তার মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে, সে আমার দলভুক্ত নয়।'[২২৮]

ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, 'কেউ কারও স্ত্রীকে নিজে বিয়ে করার জন্য কিংবা অন্য কারও সাথে বিয়ে দেওয়ার জন্য যদি তার স্বামীকে হত্যা করে, আর এ ষড়যন্ত্রে উক্ত নারী অংশীদার থাক বা না থাক উভয় অবস্থায় ইসলামের নীতিমালার দাবি হলো ওই ব্যক্তিকে উক্ত নারীর সাথে বিয়ে থেকে বঞ্চিত করতে হবে।'[২২৯]

যৌতুক সম্পর্কে ইসলামের বিধান

ইসলামের দৃষ্টিতে যৌতুক একটি অবৈধ ও ঘৃণিত প্রথা। কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্য মোহরানা ব্যতীত বরপক্ষের চুক্তিবদ্ধ দাবি অনুযায়ী কন্যাপক্ষ উপহার সামগ্রী যা প্রদান করেন তা-ই যৌতুক। ইসলামে শর্তারোপ করে যৌতুক গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ। শরীআতের বিধানে বিবাহের শর্ত হিসেবে যৌতুক আদায় করা শুধু নাজায়েজই নয়; বরং সুস্পষ্ট জুলুম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

ইসলামের বিধান অনুসারে মানুষের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো অমানবিকতার অবকাশ রাখার সুযোগ নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'কারও সম্পদ হালাল হয় না, যতক্ষণ না যে সন্তুষ্টচিত্তে তা প্রদান করে।' যৌতুক প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা হলো তা অবৈধভাবে বা অনির্ধারিত পথে অর্জন করা চলবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমরা অন্যায়ভাবে একেঅপরের সম্পদ ভোগ করো না।'[২৩০]

অন্যায়ভাবে বা যা ন্যায্যপ্রাপ্য নয়, তা কোনোভাবেই গ্রহণ বা দাবি করা যাবে না। যদি তা জোরপূর্বক আদায় করা হয় তবে তা কত বড় অন্যায় এবং তার শাস্তি যে কী ভয়াবহ হতে পারে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।'[২৩১]

শরিয়তের দৃষ্টিতে মোহর প্রদান স্বামীর অন্যতম দায়িত্ব এবং তা স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এভাবে বিবাহের মাধ্যমে নারী তথা স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার স্বামীকেই বহন করতে হয়। সুতরাং বিবাহসংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনে পুরুষের কোনোভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ নেই। আর যৌতুকের দাবিতে জোর-জবরদস্তি করা শুধু অর্থনৈতিক শোষণ নয়, বরং তা দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত অপরাধও বটে। তাই এর থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুমিন মুসলমানের জন্য একান্ত আবশ্যক।

যৌতুকের বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (স.) বাণী প্রদান করেছেন, 'যে ব্যক্তি সম্মান লাভের জন্য কোন নারীকে বিবাহ করে আল্লাহ তার লাঞ্ছনা বৃদ্ধি করে দেন। যে তাকে সম্পদ লাভের আশায় বিবাহ করে আল্লাহ তার দরিদ্রতা বৃদ্ধি করে দেন। আর যে তাকে বংশ গৌরব লাভের আশায় বিবাহ করে আল্লাহ তার অমর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর যে তাকে দৃষ্টি অবনত রাখতে পুণ্য অথবা অশ্লীলতা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য বিবাহ করে অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিবাহ করে, আল্লাহ তাকে ওই স্ত্রীর মাধ্যমে বরকত দান করবেন এবং স্ত্রীর জন্যও তাকে বরকতময় করে দেবেন।'

---

[২২৮] ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩ , পৃ. ১৭০, হাদীস নং- ২১৭২

[২২৯] ইকামাতীদ দালিল আল ইহতালিল তাহলিল, আল মাতবু মা আল ফাতওয়া, পৃ. ১৪৭-১৪৮

[২৩০] আল কুরআন, ২ : ১৮৮

[২৩১] আল কুরআন, ৪ : ৩০

Dhaka University Institutional Repository

নারীর সার্বিক নিরাপত্তা বিধান

ইসলাম নারীর সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করেছে। রাস্তায়, কর্মস্থলে ও যত্রতত্র নারীদেরকে হয়রানি করা তো দূরের কথা বরং ইসলাম নারীদের সৌন্দর্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'মুমিনদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গে হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে।'[২৩২]

ইসলামের স্বর্ণযুগে দেখা যায়, নারীরা সুদূর বাগদাদ থেকে মক্কা নগরীতে একাকী গমন করলেও তাদেরকে কেউ উত্যক্ত করত না। কেননা এরকম নিরাপত্তাই ইসলামী সমাজে প্রত্যাশিত। যারা নারীদের নিরাপত্তার জন্য হুমকী, ইসলাম তাদেরকে তা'যীরমূলক শাস্তি দেওয়ার পথ খোলা রেখেছে। আর কেউ যেন নারীকে হয়রানি না করে বরং বোনের দৃষ্টিতে দেখে সেজন্যে পুরুষকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নারীরা পুরুষদের সহযোগী।'[২৩৩]

শুধু তাই নয় ইসলামে নারীকে ধর্ষণ করা কিংবা করার চেষ্টা করা ও নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ; যাতে খারাপ চিত্তের পুরুষগণ এসব অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত থাকে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ, 'যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, যারা ইহকালে ও পরকালে ধীকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি। যেদিন প্রকাশ করে দেবে, তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা, যা কিছু তারা করত।'[২৩৪]

মায়ের মর্যাদা

পৃথিবীতে সবচেয়ে মধুর শব্দটি হচ্ছে 'মা'। জগৎ সংসারের শত দুঃখ-কষ্টের মাঝে যে মানুষটির একটু সান্ত্বনা আর স্নেহ-ভালবাসা আমাদের সমস্ত বেদনা দূর করে দেয় সেই মানুষটিই হলেন 'মা'। মায়ের চেয়ে আপনজন পৃথিবীতে আর কেউ নেই। দুঃখে-কষ্টে, সংকটে-উত্থানে যে মানুষটি স্নেহের পরশ বিছিয়ে দেন তিনি হচ্ছেন আমাদের সবচেয়ে আপনজন 'মা'। প্রত্যেকটি মানুষ পৃথিবীতে আসা এবং বেড়ে উঠার পেছনে প্রধান ভূমিকা মায়ের।

সন্তানের জন্ম ও বেড়ে ওঠার পেছনে মা-বাবার উভয়ের হাত রয়েছে-একথা অনস্বীকার্য। তবে এটি সর্বজনস্বীকৃত যে, এক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকাই প্রধান। মা হচ্ছেন সন্তানের সুখ-দুঃখের অনন্ত সাথী। মা সন্তানের সুখে সুখী হন, আবার সন্তানের দুঃখে দুঃখী হন। নিজের সমস্ত স্বাদ-আহ্লাদ, আনন্দ বেদনা বিলিয়ে দেন সন্তানের সুখ-শান্তির জন্য। তার হৃদয়ের প্রবহমান প্রতিটি রক্ত কণিকায় রয়েছে সন্তানের জন্য ভালোবাসা। মা তার সন্তানকে তিলে তিলে গড়ে তোলেন। সন্তানকে ঘিরেই মায়ের স্বপ্নের ডাল-পালা বিস্তার করতে থাকে। পৃথিবীতে একমাত্র মায়ের ভালবাসা ও দানই নিঃস্বার্থ ও বিনিময়হীন। মায়ের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় আমরা দেখতে পাই বসুন্ধরার এই বিচিত্র সৌন্দর্যের সমারোহ। মায়ের কাছেই আমরা গ্রহণ করি জীবনের প্রথম পাঠ।

মা আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। মায়ের তুলনা অন্য কারো সঙ্গে চলে না। মা হচ্ছেন জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। অথচ, এই মায়ের সাথেই অনেকে অসদাচরণ করে থাকেন। মা'কে কষ্ট দিয়ে থাকেন। মায়ের যত্ন নেয় না। মা বৃদ্ধ অবস্থায় পৌঁছে গেলে তার প্রতি অবহেলা-অবজ্ঞা প্রদর্শণ করে। এ কারণেই মহান আল্লাহ তায়ালা মা'বাবার প্রতি অসদাচরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাইলে মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এভাবে- 'তোমার পালনকর্তা আদেশ করছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও

---

[২৩২] আল কুরআন, ২৪ : ৩০

[২৩৩] ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ডিসেম্বর: ১৯৯০), খ. ১, পৃ. ১৫৪, হাদীস নং- ২৩৬

[২৩৪] আল কুরআন, ২৪ : ২৩-২৪

Dhaka University Institutional Repository

এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তাদের কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্ধশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে 'উহ্' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা।'[২৩৫]

মাতাপিতার জন্য আল্লাহ দোয়া করার পদ্ধতিও শিখিয়ে দিয়েছেন, 'তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল: হে আমার পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।'[২৩৬]

পবিত্র কোরআনের অন্ততঃ পনের জায়গায় পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যের কথা বলা হয়েছে। সুরা লোকমানের ১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি কেননা তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো দু'বছর হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।'[২৩৭]

মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার এবং এর জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনার বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা আরও উল্লেখ করেছেন, 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও স্তন্য ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে এরূপ ভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার নেয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি।'[২৩৮]

অন্যদিকে রাসূল (স.) মায়ের মর্যাদা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেস্ত।' মাতা-পিতার উভয়ের মর্যাদা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'মা-বাবার সন্তুষ্টির ওপর আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মা-বাবার অসন্তুষ্টির ওপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি নির্ভর করে।' পিতা-মাতার সাথে অসৎ আচরণের পরিণাম সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ কী তা কি আমি তোমাদের জানাব? তা হচ্ছে- আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা ও পিতা-মাতার সঙ্গে অসদাচরণ।' এ প্রসঙ্গে আমিরুল মোমেনীন হযরত আলী (আঃ) বলেছেন, 'পিতামাতাকে অসম্মান করা বড় ধরণের পাপ।'

পিতামাতা দুজনই সন্তানের কাছে মর্যাদাবান হলেও ইসলামে মায়ের মর্যাদা পিতার চেয়েও বেশী দেওয়া হয়েছে। কারণ সন্তানকে লালনপালন করার ক্ষেত্রে মা-ই বেশী ভূমিকা পালন করে থাকেন। রাসূল (স.) বাবাকে দেখেনইনি। আবার খুব ছোট বয়সে হয়েছে মাতৃহারা। এ কারণে বাবার স্নেহ ও মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত নবী (স.) বিষয়টা বেশ উপলব্দি করতেন। তিনি তাঁর দুধমাতা হালিমাকে মায়ের মতোই ভালোবাসতেন, সম্মান করতেন। এ সম্পর্কে এখন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, 'রাসূল (স.) একদিন তাঁর সাহাবীদের সাথে আলাপ করছিলেন। এমন সময় এক বৃদ্ধা সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। নবীজি বৃদ্ধাকে দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর গায়ের চাদরটি মাটিয়ে বিছিয়ে তাকে বসতে দিলেন। তারপর অত্যন্ত দরদ দিয়ে বৃদ্ধার সাথে কথাবার্তা বললেন। বৃদ্ধা চলে গেলে সাহাবীরা বিস্মিত হয়ে নবীজিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে এই মহিলা যার জন্য আপনার এতো দরদ, এতো আন্তরিকতা?' নবীজি উত্তরে বললেন, তিনি আমার দুধমাতা হালিমা।'[২৩৯]

---

[২৩৫] আল কুরআন, ১৭ : ২৩

[২৩৬] আল কুরআন, ১৭ : ২৪

[২৩৭] আল কুরআন, ৩১: ১৪

[২৩৮] আল কুরআন, ৪৬ : ১৫

[২৩৯] ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬১১, হাদীস নং- ৫০৫৪

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায় ও সমতার ধর্ম ইসলাম মায়ের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইসলাম মাকে অনেক উচ্চাসনে স্থান দিয়েছে। ইসলামের ঘোষণা হচ্ছে 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত।' মায়ের সেবা শুশ্রুষার দ্বারা জান্নাতের হকদার হওয়া যায়। বাবার তুলনায় ইসলাম মায়ের অধিকার অধিক ঘোষণা করেছে। যেমন- মা-বাবা একইসঙ্গে সন্তানের কাছে পানি চাইল। এক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে আগে মায়ের হাতে পানি তুলে দাও। অতঃপর বাবাকে পানি পান করাও। কারণ, সন্তানের প্রতি মায়ের যে ত্যাগ ও তিতিক্ষা তা দুনিয়ার আর কারো সঙ্গে তুলনা করা চলে না। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসুল (স.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ- আমার সদ্ব্যবহারের সব চেয়ে বড় হকদার কে? রাসুল (স.) বললেন, তোমার মা। সে বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে আবার বলল তারপর কে? তিনি বললেন তোমার মা। সে বলল তারপর কে? চতুর্থবার বললেন, তোমার পিতা। তারপর তোমার নিকটে অতঃপর যে তোমার নিকটে।'[২৪০] এ হাদিসে গর্ভধারণ, দুধ পান ও লালন-পালনের কষ্ট সহ্যের জন্য মায়ের মর্যাদা ৩ গুণ বেশি বলে নবী (সা.) মায়ের কথা ৩ বার বলেছেন। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে, অপর এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি হুজুর (স.)-এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসুলুল্লাহ (স.)- আমি জিহাদে যাওয়ার আশা করছি সে বিষয়ে আপনার পরামর্শ চাই। এতে হুজুর (স.) বললেন, তোমার কি মা আছেন? লোকটি উত্তরে বললেন, হ্যা। তখন হুজুর (স.) বললেন, যাও এখন তুমি মায়ের খেদমত করবে।[২৪১]

মা জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মা সন্তানের জন্য জান্নাতের সহজ পথ। যে সন্তান মায়ের সান্নিধ্য গ্রহণ করার পাশাপাশি মাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তারাই সাফল্যের সন্ধান পেয়েছে। সন্তানের কামিয়াবি নিহিত আছে মায়ের দোয়া ও সন্তুষ্টির মধ্যে। এজন্য প্রত্যেকের উচিত 'মা' নামক মহানিয়ামতের যথার্থ মূল্যায়ন করা। রাসূল (সা.) আক্ষেপ করে বলেছেন 'যে ব্যক্তি মা-বাবাকে পেল, অথচ এদেরকে সন্তুষ্ট করে জান্নাতের মালিক হতে পারল না, সে ব্যক্তি বড়ই দুর্ভাগা!' অন্য হাদীসে রাসূল (সা.) বলেন, 'বাবা-মায়ের দিকে যত ভালোবাসা ভরা দৃষ্টি যাবে ততবারই হজ্বের সওয়াব পাওয়া যাবে।'

প্রতিটি সন্তানেরই উচিৎ মাকে শ্রদ্ধা করা। তাদের স্বপ্ন পূরণ করা, যাদের মা-বাবা বেঁচে নেই তাদের কবরে শান্তি কামনা করা। মা-বাবাকে কোনভাবেই কষ্টা দেওয়া যাবে না, তাদের দিকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলা যাবে না। তাদের আদেশ-নিষেধ অমান্য করা যাবে না। তবে শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রছাড়া। যদি মা-বাবা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে ভিন্ন কোন কিছু নির্দেশ দেয়- তাদের কথা শোনা যাবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পিতা-মাতা যদি তোমাকে-আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তুমি তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে।'[২৪২] এই আয়াতে পিতা-মাতার আনুগত্য না করার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে তাদের প্রতি সদাচরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সামষ্টিক অনুভূতি

ইসলাম ব্যক্তির মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করে যে, তুমি সমাজের নির্মাতা। তোমার কাজ শুধু নিজের একার চরিত্র নির্মাণ নয়, বরং অন্যের সংস্কার এবং সংশোধনও তোমার দায়িত্ব। তোমার নিজের পরিবেশে তুমি শুধু নৈতিকতার অধিকারী হয়েই থাকবে না, বরং নৈতিক চরিত্রের শিক্ষকও হবে তুমি। শুধু নিজের চরিত্র ও কর্ম উন্নত করাই নয়, অন্যদেরও হীন চরিত্র এবং কর্ম থেকে রক্ষা করাও তোমার কাজ।

---

[২৪০] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩১, হাদীস নং- ৫৫৩৯। ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৮৫, হাদীস নং- ৬২৬৯ (মুসলিম শরীফের পরবর্তী ৬২৭০ নম্বর হাদীসটিও প্রায় অনুরূপভাবে বর্ণিত)।

[২৪১] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৩২, হাদীস নং- ৫৫৩৯। ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ৮৬, হাদীস নং- ৬২৭৩

[২৪২] আল কুরআন, ৩১ : ১৫

Dhaka University Institutional Repository

নবী (স.) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'শুনে রাখ, তোমরা প্রত্যেকেই রাখাল বা প্রহরী। আর প্রত্যেককেই তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইমাম বা নেতা যিনি শাসন করেন, সাধারণ মানুষকে তাকেও তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। একজন পুরুষ তার বাড়ির লোকদের রাখাল বা প্রহরী। তাকে তার অধীন লোকদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘরের লোকদের এবং তার সন্তানদের রাখাল বা প্রহরী। তাকে তার অধীন লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। দাস তার মুনিবের সম্পদের পাহারাদার। তাকেও ওই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হবে। তাই যেনে রাখ তোমরা সবাই রাখাল বা প্রহরী। আর সবাইকে তার অধীনদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে।'[২৪৩]

সামাজিক চাপ বেশ কঠিন। সমাজ যদি নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের অনুমতি না দেয়, তাহলে কেউই তা করতে সাহস পায় না। কিন্তু সমাজের সামগ্রিক পরিবেশ যদি খারাপ হয়, তাহলে চারিদিক থেকে পাপ-পঙ্কিলতার সয়লাব ঘিরে ধরে এবং নৈতিকতা ও সুকৃতির উৎসসমূহ শুকিয়ে যেতে থাকে।

ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য হলো, ইসলাম সমাজের নৈতিক অনুভূতি এতোটা জগ্রত করে যে, কোনো নগণ্য অনৈতিকতাকেও সে বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়।

জনৈকা মহিলা বেশ করে আতর ও সুগন্ধি লাগিয়ে রাস্তা দিয়ে চলছিলো। এমতাবস্থায় হযরত আবু হুরাইরা (রা.) তাকে দেখে ফেললেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি মসজিদ থেকে আসছো? সে বললো, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন: মসজিদে যাওয়ার জন্যই কি তুমি এ সুগন্ধি ব্যবহার করেছিলে? মহিলা ইতিবাচক জবাব দিল। হযরত আবু হুরাইরা (রা.) তাকে ধমক দিয়ে বললেন, আমি আমার প্রিয় আবুল কাসেম (স.)কে বলতে শুনেছি, যে নারী সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদে যায়, আল্লাহ তায়ালা তার নামায কবুল করেন না, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে গুরুত্ব সহকারে জানাবাতের গোসলের মতো গোসল না করবে।'[২৪৪]

যে সব লোকের সাথে মানুষের সামাজিক এবং রক্তের সম্পর্ক বর্তমান সে সব লোকের নৈতিক পাহারাদারী তাদের কর্তব্যের অন্তর্গত বলে ইসলাম মনে করে। এ সম্পর্কে যতো গভীর এবং মজবুত হয় মানুষের দায়িত্বও ততো বেড়ে যায়। এ কারণে কোনো আপন জনের সম্ভ্রমহানি করা ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের দুষ্কর্মের জঘন্য উদাহরণ। কোনো কোনো ফকীহর মতে এ ধরনের ব্যক্তির শাস্তি হত্যার চেয়ে লঘু নয়।[২৪৫]

প্রতিবেশীর স্ত্রীর সতীত্বহানিরও এ একই পরিণাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (স.)কে জিজ্ঞেস করলো: হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গোনাহ কি? তিনি বললন: সবচেয়ে বড় গোনাহ হলো, আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা। অথচ তিনি একাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বললো- এরপর কোন গোনাহটি বড়? তিনি বললেন: এরপর সবচেয়ে বড় গোনাহ হলো রুজীতে শরীক হবে (আর তোমাকে অভূক্ত থাকতে) এ ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা। সে আবার জিজ্ঞেস করলো: এরপর আর কোন গোনাহটি সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন: প্রতিবেশির স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।'[২৪৬]

অন্য একটি হাদীসে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, 'হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, যিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন এবং আকাবার রাতের একজন প্রতিনিধি ছিলেন, তার থেকে বর্ণিত, একবার একদল সাহাবী রাসুল (স.) এর আশপাশে বসে ছিলেন। এমন সময় তিনি বললেন, তোমরা এ বিষয়ে আমার নিকট বাইয়াত গ্রহণ কর যে, তোমরা কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করবে না। চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না,

---

২৪৩ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারি* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ, ২০০৭), খ. ৬, পৃ. ৩৪৫, হাদীস নং- ৬৬৩৯

২৪৪ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৬১, হাদীস নং- ৪১৬২

২৪৫ যাদুল মা'আদ, খ. ৩, পৃ. ২৭২

২৪৬ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪০০, হাদীস নং- ৫৫৬৬

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কাউকেও মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং কোন ন্যায় কাজে আমার আদেশ অমান্য করবে না। তোমাদের যে কেউ এই ওয়াদা পালন করবে, সে আল্লাহর নিকট পুরস্কার পাবে।'[২৪৭]
ব্যভিচার সর্বাবস্থায় একটি অপরাধ। শুধু অপরাধ নয়, একটি জঘন্য অপরাধ। কিন্তু যে ব্যক্তির উচিৎ ব্যভিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বাপেক্ষা নিরাপদ আশ্রয় হওয়া এমন ব্যক্তি যদি নিজেই এ কাজে লিপ্ত হয় তাহলে এ অপরাধের জঘন্যতা অনেকগুণে বেড়ে যায়।
একবার নবী (স.) সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন: ব্যভিচার সম্পর্কে তোমাদের ধারনা কি? সাহাবাগণ জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যভিচার হারাম করেছেন। তাই তা কিয়ামত পর্যন্ত হারামই থাকবে। নবী (স.) বললেন, প্রতিবেশী স্ত্রীর সতীত্ব বিনাশ করার চেয়ে দশজন নারীর সতীত্ব বিনাশ করা তুলনামূলকভাবে হালকা গোনাহ।'[২৪৮]

[২৪৭] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৪তম প্রকাশ, ২০০৭), খ. ১, পৃ. ৩৮, হাদীস নং- ১৭
[২৪৮] মুসনাদে আহমদ, খ. 6, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ : ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন

ব্যক্তি পর্যায়ে নৈতিক প্রশিক্ষণের এবং সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে যে এমন একটি প্রেক্ষাপট তৈরী করা সম্ভব হয়, যেখানে সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োগ সম্ভব হয়। নারী নির্যাতনের কারণ যেমন আল্লাহর বিধানের প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা তেমনি এর প্রতিবিধান হচ্ছে আল্লাহর আইনের দিকে ফিরে আসা। আর সে বিধান মানব জাতি পেয়েছে বিভিন্ন নবী-রাসুলদের মাধ্যমে। যার পরিসমাপ্তি ঘটেছে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর মাধ্যমে।

আল্লাহর রাসুলরা দেখিয়েছেন মানবতার মুক্তি ও কল্যাণের পথ। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমস্ত নবী-রাসূলগণ স্ব স্ব জাতিকে তাদের বড় বড় দোষ-ত্রুটি থেকে বেঁচে থেকে জীবনে সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল লাভের একটাই মাত্র পথ দেখিয়েছেন। আল কুরআনের ভাষায় আর তা হলো, 'হে আমার জাতির জনগণ তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর। তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই।' এটা প্রমাণিত সত্য যে মানবতার কল্যান ও মুক্তির এটাই একমাত্র উপায়।

রাসুল (স.) এর আবির্ভাবের সময় সামাজিক পরিস্থিতি এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে যার তুলনা পৃথিবীর আর কোন সময়ের সঙ্গে চলে না। অজ্ঞতার যুগ বলে অভিহিত করা হতো ওই সময়কে। অন্যায়-অনাচার-অত্যাচার আর জুলুম নিপীড়নের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল তখনকার সময়টি। সকল শ্রেনীর মানুষ, বিশেষ করে নারী সমাজ মুক্তির জন্য হাহাকার করছিল। নিরুপায় মানুষ দিশেহারা হয়ে মুক্তির পথ খুঁজছিল।

মানবতা ও মনুষ্যত্ব এই চরম বিপর্যয়ের মুখে যাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে এবং রাসূল (স.) এর নেতৃত্বে সেই ধ্বসে যাওয়া সমাজই দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগে পরিণত হয়। যে সমাজে স্থাপিত হয়েছিল শান্তি ও কল্যাণ। নারী সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষ তাদের অধিকার ফিরে পেয়েছিল।

রাসূল (স.) যে সমাজে আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে সমাজে নারীর কোন সামাজিক মূল্য তো ছিলই না, এমনকি কোন মানবিক মূল্য পর্যন্ত তখন নারীকে দেওয়া হতো না। বর্তমান সময়ের চেয়েও তখনকার সময়টা নারীর জন্য ছিল অনেক বেশি ভয়াবহ। সেই সমাজটাকেই রাসূলুল্লাহ (স.) বদলে দিয়েছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন নারীর জন্য নিরাপদ এবং সম্মানযোগ্য আবাসস্থল হিসেবে। নারীরা পেয়েছিল পৃথিবীর সকল স্থান এবং সকল কালের চেয়ে সর্বাধিক মর্যাদা এবং নিরাপত্তা। কিভাবে?

আল্লাহ প্রদত্ত আইনের বাস্তবায়নেই সম্ভব হয়েছে এই অসাধ্য সাধন। আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এবং রাসূল (স.) প্রদর্শিত আইনের বাস্তবায়নই শুধুমাত্র মানুষকে কল্যানের পথ দেখাতে সক্ষম। রাসূল (স.) এবং তাঁর পরবর্তী খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এটা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত হয়েছে। সেই সমাজে একজন সুন্দরী যুবতী নারী টাকা-পয়সা, স্বর্ণ-অলংকার নিয়ে নির্বিঘ্নে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে রাতের অন্ধকারেও চলাফেরা করতে পারতো। এক আল্লাহছাড়া আর কোন কিছুর ভয় তার মনে জাগ্রত হওয়ারও অবকাশ ছিল না।

আল্লাহর দেয়া এবং রাসূল (স.) এর দেখানো সেই আদর্শ এবং পথের বাস্তবায়ণ করা গেলে এখনও সম্ভব, এই সমাজে একইভাবে এমন একটি পরিবেশ কায়েম করা, যেটা হবে নারীদের জন্য শুধু নিরপাদ বাসস্থানই নয়, হবে সর্বোচ্চ মর্যাদারও। এ আদর্শ বাস্তবায়নে হয়তো কঠোর সংগ্রাম করতে হতে পারে। মুখোমুখি হওয়া লাগতে পারে কঠোর বিরোধীতার। এমনকি বিরোধীদের সঙ্গে জীবনপন সংগ্রাম করাও লাগতে পারে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সতর্কবাণীও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যারা এই আদর্শ বাস্তবায়নে জুলুম-নির্যাতনের শিকার হবে তাদেরকে স্বান্তনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা জানিয়ে দিয়েছেন, 'তোমাদের কী এই ধারনা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে! অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য! তোমরা শুনে নাও, আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটবর্তী।[২৪৯]
নারী নির্যাতন এবং তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলাম কতকগুলো বিধিমালা প্রনয়ন করেছে। এর মধ্যে মানব জাতির কল্যাণের লক্ষ্যে রয়েছে বেশ কিছু বিধি-নিষেধ এবং সতর্কতামূলক আলোচনা। আলোচনার এ পর্যায়ে এসে আমরা দেখানোর চেষ্টা করবো, আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো ইসলামী আইন কিভাবে নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় ভুমিকা পালন করে।

পুরুষের জন্য যেসব নারী স্থায়ীভাবে হারাম

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বংশ পরম্পরায় মানব প্রজন্মকে দুনিয়ায় টিকিয়ে রেখে দুনিয়াকে আবাদ রাখার জন্য বিবাহ বন্ধনকে বৈধ করেছেন। এটাকে আল্লাহ তাআলার একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও সিস্টেম। এ ছাড়া বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন গঠন করা নবীদেরও সুন্নত।
নবী ও রাসূলদের এ সুন্নত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: 'আপনার পূর্বে আমি অনেক রসুল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। কোন রাসুলের এমন সাধ্য ছিল না যে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করে। প্রত্যেকটি ওয়াদা লিখিত আছে।'[২৫০]
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের আদর্শ। দুনিয়ার জীবনে আমরা কোন কাজ কিভাবে করব রাসুল (স.) সেটি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। বিয়ে কিংবা নারী-পুরুষের বৈধ সম্পর্কের এই বিষয়টি সম্পর্কেও সুন্দরভাবে হাদীস শরীফে এসেছে-
হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (স.) এর স্ত্রীদের বাড়ীতে তিনজন লোক আসল। তারা রাসুল (স.) এর ইবাদাত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল-তার ইবাদাত কেমন ছিল? তারা রাসুল (স.) এর ইবাদাত সম্পর্কে তাদেরকে জানালে তারা সেটাকে খুবই কম মনে করলেন। তারা বললেন: কোথায় নবী (মর্যাদার দিক থেকে) আর কোথায় আমরা? কারণ, আল্লাহ তাআলা নবীজী রাসুল (স.) এর পুর্ব ও পরবর্তী সব গুনাহ ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন। তাদের একজন বলল: আমি এখন থেকে সর্বদা সারারাত নামাজ পড়ব। দ্বিতীয়জন বলল: আমি এখন থেকে আজীবন (সাওমে দাহর) রোজা রাখতে থাকব। রোজা ভাঙ্গবো না। তৃতীয়জন বলল: আমি নারী সংগ থেকে দূরে থাকব আজীবন, বিবাহ করব না কখনো। অতঃপর রাসুল রাসুল (স.) তাদের কাছে এসে বললেন: তোমরা এমন সব কথা বলছিলে! জেনে রাখ! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের থেকে আল্লাহকে অনেক বেশী ভয় করি। এতদসত্ত্বেও আমি রোজা রাখি আবার রোজা ছেড়ে দিই, নামাজ পড়ি, ঘুমাই এবং বিবাহ করি। যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে আমার উম্মত নয়।[২৫১]
কেন বিবাহ করতে হবে, এর উপকারীতা কী কিংবা বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকলে কী করতে হবে এ ব্যাপারেও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন রাসুল (স.), 'হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যকার যে সামর্থ্যবান সে যেন বিবাহ করে। কেননা, তা তার দৃষ্টি নিম্নগামী রাখতে ও লজ্জাস্থানকে হেফাজত করতে সহায়ক হবে। আর যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না, সে যেন (তার পরিবর্তে) রোজা রাখে। কেননা, তা (রোজা) তার জন্য ঢালস্বরূপ (অনেক অপরাধ হতে রক্ষা করে)।[২৫২]

---

২৪৯ আল কুরআন ২ : ২১৪
২৫০ আল কুরআন, ১৩ : ৩৮
২৫১ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯, হাদীস নং- ৮৬৯০
২৫২ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২১, হাদীস নং- ৪৬৯৩। ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৩), খ. ৪, পৃ. ২৫৫, হাদীস নং- ৩২৬৪

Dhaka University Institutional Repository

জন্মের পর মানুষ সর্বপ্রথম তার মা-বাবা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে পরিচিত হয়। এরা তাকে পরম মমতায় আদর-যত্নে লালন-পালন করে। এ পরিবেশ তার একান্ত আপন পরিবেশ যা তার নিঃস্বার্থ সেবক। তার দুঃখ-বেদনার ভাগীদার এবং জীবনের সমস্ত পর্যায়ে তার সত্যিকার সহযোগী। এ অনুভুতি এ পরিবেশকে একটি পবিত্র মর্যাদা দিয়েছে।

এটা মানুষের একান্ত আপন পরিবেশ। এ পরিবেশের মধ্যেই সে লালিত-পালিত হয়ে ওঠে। এর একটি বড় উপকার হলো, মানুষ রাতদিন যে গণ্ডির মধ্যে অবস্থান ও জীবন-যাপন করে তা অনেকটা অকল্যাণের স্পর্শ থেকে নিরাপদ রয়েছে। অন্যথায় ব্যাপক মেলা-মেশার কারণে এ গণ্ডির মধ্যে নানা অনাচারের সৃষ্টি এবং পথ হারানোর সম্ভাবনা বিদ্যমান। ইসলাম এ পবিত্রতাকে আরও দৃঢ় করেছে। জন্মগতভাব যে সব মানুষ একে অপরের নিকটবর্তী, ইসলাম আইনগতভাবে তাদের পরস্পরের মধ্যে যৌন সম্পর্ক হারাম করে দিয়েছে। নারী-পুরুষের বৈধ সম্পর্কের সীমাই হলো বিয়ে। এই সীমা মানব ইতিহাসের আদিকাল থেকেই নির্ধারিত। ইসলাম এই সীমাকে আরও পরিমার্জিত ও সুন্দর করে উপস্থাপন করেছে। নির্ধারিত করে দিয়েছে কাদের বিয়ে করা যাবে, কাদের বিয়ে করা যাবে না। কোন নারীরা পুরুষের জন্য পবিত্র এবং সর্বোচ্চ সম্মানের। পবিত্র কুরআনুল কারীমে এ বিষয়টি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগিনি কন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্য পান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছো সে স্ত্রীদের কন্যা-যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করো থাকো, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু।'[২৫৩]

যে সমস্ত মহিলাদেরকে বিবাহ করা হারাম, অথ্যাৎ যে সব নারী পুরুষের জন্য হারাম তাদেরকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ নারী

তারা তিন শ্রেণীর

ক.বংশগত কারণে নিষিদ্ধঃ তারা হচ্ছেন-

১. মাতা
২. দাদী
৩. নানী
৪. নিজের মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে যত নিচেই যাক না কেন।
৫. আপন বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোন।
৬. নিজের ফুফু, পিতা, মাতা, দাদা, দাদী, নানা ও নানীর ফুফু।
৭. নিজের খালা, পিতা, মাতা, দাদা, দাদী, নানা ও নানীর খালা।
৮. আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় ভাই ও তাদের অধঃতন ছেলেদের কন্যা।
৯. আপন বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোন ও তাদের অধঃতন মেয়েদের কন্যা।

[২৫৩] আল কুরআন, ৪ : ২৩

Dhaka University Institutional Repository

খ. দুগ্ধ সম্বন্ধীয় কারণে নিষিদ্ধ

বংশগত কারণে যাদেরকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ দুগ্ধ সম্বন্ধের কারণেও তারা নিষিদ্ধ। রাসূল (স.) বলেছেন, 'বংশীয় সম্পর্কের কারণে যারা যারা হারাম, দুধ সম্পর্কের কারণেও তারা তারা হারাম।'[২৫৪]

গ. বৈবাহিক সম্বন্ধের কারণে নিষিদ্ধঃ

১. পিতা, দাদা ও নানা (যতই উপরে যাক না কেন) যাদেরকে বিবাহ করেছেন।

২. কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হোক বা না হোক উক্ত পুরুষের পুত্র-পৌত্র বা প্রপৌত্রের সাথে মহিলার বিবাহ নিষিদ্ধ।

৩. কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হোক বা না হোক উক্ত পুরুষের পিতা-দাদা বা নানার সাথে মহিলার বিবাহ নিষিদ্ধ।

৪. শাশুড়ী। কোন নারীর সাথে বিবাহ হলেই তার মাতা ও দাদী বা নানী হারাম হয়ে যাবে। দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হোক বা না হোক।

৫. স্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপিত হলেই তার কন্যা, তার পুত্রের কন্যা ইত্যাদি হারাম হয়ে যাবে।

সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ নারী

সাময়িক কারণে কখনো কখনো মহিলাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হয়ে থাকে। উক্ত কারণ দূর হয়ে গেলে তাকে বিবাহ করা বৈধ হবে। যেমন–

১. কোন নারীকে বিবাহ করলেই তার আপন বোন, ফুফু, খালাকে বিবাহ করা হারাম গণ্য হবে। তবে, তাকে যখন তালাক দিয়ে দেবে কিংবা, স্বামী মারা যাবে এবং সে ইদ্দত শেষ করবে, তখন তাকে সে বিবাহ করতে পারবে।

২. যে নারী অন্যের বিবাহাধীনে ছিল। তাকে স্বামী তালাক দিয়েছে কিংবা মারা গেছে এবং সে ইদ্দত পালন করছে; এমতাবস্থায় তাকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। ইদ্দত শেষ হয়ে গেলেই বিবাহ করতে পারবে।

অনেকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন যে, খালাতো, মামাতো, ফুফাতো বা চাচাতো বোনকে বিবাহ করা যাবে কিনা? এর উত্তর হচ্ছে- আসলে আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত আয়াতে যাদের সাথে বিবাহ করা নিষিদ্ধ সকলের কথাই বলে দিয়েছেন। খালাতো, মামাতো, ফুফাতো বা চাচাতো বোন তাদের মধ্যকার কেউ নন। অতএব, তাদেরকে বিবাহ করা বৈধ।

ইসলামে বিভিন্ন কারণে আরও কিছু নারীকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, এরা হলেন-

১. মুশরিক ও কাফির নারী। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'আর তোমরা মুশরেক নারীদেরকে বিয়ে করো না। যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে।'[২৫৫] আবার আল্লাহ তায়ালা একই আয়াতে এটাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মু'মিন নারী কোন মুশরেক পুরুষকে বিয়ে করতে পারবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এবং তোমরা (নারীরা) কোনো মুশরেকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে।'[২৫৬]

অন্য এক আয়াতে কাফির নারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না।'[২৫৭]

---

২৫৪ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫, হাদীস নং- ৪৭২৬। ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩২৩, হাদীস নং- ৩৪৩৮

২৫৫ আল কুরআন, ২ : ২২১

২৫৬ আল কুরআন, ২ : ২২১

২৫৭ আল কুরআন, ৬০ : ১০

Dhaka University Institutional Repository

২. ব্যভিচারে অভ্যস্ত নারীকে কোন মু'মিন বিয়ে করতে পারেনা এবং ব্যভিচারী পুরুষকেও কোনো মু'মিন নারী বিয়ে করতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারীণী নারী অথবা মুশরিকা নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারীনীকে কেবল ব্যভিচারী অথবা মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে এবং এদেরকে মুমিনদের জন্য হারাম করা হয়েছে।'[২৫৮]
৩. একত্রে চারজনের অধিক, অথ্যাৎ পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করাও হারাম। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতীম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভালো লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন, চারটি পর্যন্ত।'[২৫৯] এ আয়াতাংশ দ্বারা প্রমাণিত চারটির অধিক স্ত্রী একসঙ্গে রাখা যাবে না।
৪. সাময়িক উপভোগের জন্য ছেড়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে কোন নারীকে বিয়ে করাও ইসলাম হারাম করে দিয়েছে।

পরিবারে নারীর অধিকার

নারী অধিকার বিষয়টি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বেশ আলোচিত বিষয়। নারী তার অধিকার এবং অবস্থানের ক্ষেত্রে ছিল অনেক পিছিয়ে। বর্তমান সময়ে বহু সমাজে নারীরা বহু রকম সমস্যার শিকার এমনকি নির্যাতনের শিকার। সে জন্যই মূলতঃ একটি পরিবারে নারীর মৌলিক অধিকার সম্পর্কে ইসলাম কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে সে বিষয়ে খানিকটা আলোকপাত করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

বিয়ে এবং পরিবার গঠন মানব সভ্যতার একটি জরুরি প্রয়োজন। পরিবারের ছত্রছায়ায় নারী-পুরুষ এবং সন্তানেরা উন্নয়ন ও পূর্ণতায় পৌঁছে। আসলে পরিবার হচ্ছে মানব উন্নয়নের সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম। কেননা সমাজকে একটা জীবন্ত কাঠামোর সাথে তুলনা করা যায়, যার বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে, নারী-পুরুষ হচ্ছে এই সমাজ কাঠামোর মূল অঙ্গ। এদের সবারই যেমন নিজ নিজ দায়িত্ব রয়েছে তেমনি সামষ্টিক কিছু দায়-দায়িত্বও রয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক কাঠামো আইনের উর্ধ্বে উঠে প্রেম ভালোবাসা এবং ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল। কেননা এ ক্ষেত্রে দুটি মানব-মানবী তাদের জীবনের সর্বোত্তম বছর বা সময়গুলো একে অপরের খুব কাছে থেকে ঘনিষ্টতার মধ্য দিয়ে কাটায়। ইসলামের শিক্ষা হলো পরিবারের সদস্যরা নৈতিক গুণাবলির এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাবে যাতে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অধিকার সম্পর্কে আন্তরিক ও সচেতন হয়।

ইসলামের অধিকার আইনে পরিবারের ভরণ-পোষণ বা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে পুরুষের ওপর। নারী যেহেতু পরিবারের এই গুরুত্বপূর্ণ ঝামেলা থেকে দায়িত্বমুক্ত, সেজন্যে সাংসারিক ঘরকন্না এবং সন্তান-সন্ততিকে লালন-পালন করা,তাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ইত্যাদি বর্তায় নারীর ওপর। বিয়ের আকদের পর নারী পুরুষের কাছ থেকে সম্পদের অধিকার লাভ করে, অর্থাৎ পুরুষ তার মালামাল এবং অর্থ-সম্পদের একটা অংশ তার স্ত্রীকে দেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি দেয়, যাকে বলা হয় মোহরানা। অবশ্য মোহরানা পুরুষের সামর্থের ভিত্তিতে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা নিসার ৪ নম্বর আয়াতে পুরুষদেরকে মোহরানা পরিশোধের দায়িত্ব দিয়ে বলেছেন, 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও খুশীমনে। তারা যদি খুশী হয়ে তা থেকে অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দ্যে ভোগ কর।'[২৬০]

---

[২৫৮] আল কুরআন, ২৪ : ৩
[২৫৯] আল কুরআন, ৪ : ৩
[২৬০] আল কুরআন ৪ : ৪

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে মোহরানা নারীর প্রতি পুরুষের সততার প্রমাণ। নারী-পুরুষের সমান অধিকার এবং মোহরানা বাতিল করা সংক্রান্ত বিতর্কের জবাবে বলা যায়, মোহরানার বিধান মূলতঃ প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা আরো প্রমাণ করে যে, প্রেম পুরুষের পক্ষ থেকে শুরু হয় আর নারী তার প্রেমে সাড়া দেয়। নারীর সম্মানে পুরুষ তাকে একটি উপহার প্রদান করে। সেজন্যে মোহরানার বিধান নারী-পুরুষের সমান অধিকারের নামে বাতিল করা বা রহিত করা উচিত নয়।

ইসলামের আবির্ভাবের আগে মোহরানা ছিল নারী কেনা-বেচার মূল্য। জাহেলিয়াতের যুগে নারীদের কোনো মূল্যই ছিল না। আবার যে মোহরানাটা পুরোপুরিই ছিল নারীর প্রাপ্য তা বাবা এবং ভাইয়ের অধিকারে দেওয়া হতো। ইসলাম জাহেলি এই বিশ্বাসকে বাতিল করে দিয়ে মোহরানাকে নারীর অধিকার বলে ঘোষণা করে বলেছে, পুরুষের পক্ষ থেকে তা আন্তরিকভাবে নারীকে প্রদান করতে হবে। পরিবারে নারীর ভরণ-পোষণও তার প্রাপ্য অধিকার। আজকের সমাজে নারীর ভরণ পোষণ বলতে মৌলিক প্রয়োজন যেমন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসাসহ নারীর জীবনযাপনের জন্যে অন্যান্য বস্তু; স্ত্রীর এসব মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা স্বামীর অবশ্য কর্তব্য।

আজকাল ফ্যামিনিস্টরা এবং বহু পশ্চিমা মতবাদ নারীকে প্রদেয় মোহরানা এবং ভরণ-পোষণকে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের সাথে বৈষম্যের সমার্থক বলে মনে করে। অথচ মোহরানা এবং ভরণ-পোষণের বিধানটি নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের ভূমিকাগত তারতম্যের কারণেই দেওয়া হয়েছে। প্রজন্ম উৎপাদন এবং অন্তসত্ত্বার বোঝা বহনের দায়িত্বটি প্রাকৃতিকভাবেই নারীর কাঁধে অর্পিত হয়েছে।

সন্তান ধারণ এবং শিশুকে দুধ খাওয়ানোর মতো কঠিন দায়িত্ব যেহেতু নারীর ওপর অর্পিত হয়েছে, সে জন্যে তার ভরণ-পোষণ প্রাপ্তির অধিকারটি যথার্থ এবং উপযুক্ত। শারীরিক শক্তি-সামর্থের পার্থক্য থাকার কারণেই নারীর পক্ষে অর্থনৈতিক কঠিন কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া পুরুষের মতো সম্ভব নয়। পুরুষ ভারি কাজগুলো করার সামর্থ্য বেশি রাখে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নারীদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব পুরুষের ওপর অর্পন করেছেন, আবার পুরুষকে তার আত্মিক দিক থেকে নারীর মুখাপেক্ষী করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্ত্রী এবং মায়ের ভূমিকা পালন করার জন্যে নারীর নিরাপত্তা এবং প্রশান্তির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যদি একজন নারী শক্ত কাজ করে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে তাহলে স্বামী-সন্তানের ব্যাপারে করণীয় দায়িত্বগুলো পালন করতে পারবে না। নারীকে যেহেতু প্রফুল্ল থাকতে হয় তাই তার প্রশান্তির প্রয়োজনীয়তা পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিধানটাই এমন যে, নারী-পুরুষের মাঝে স্বাভাবিকভাবেই কিছু তারতম্য রেখে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এজন্যে ইসলামের বিধান হলো পরিবারের জন্যে কিংবা নিজের জন্যে নারী কাজ করতে বাধ্য নয় বরং নারীর ভরণ-পোষণ নিশ্চিত করার ভার পুরুষের ওপর বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। নারীর দেহ ও মনকে প্রশান্ত রাখার স্বার্থে ইসলাম কাজ করাকে তাদের জন্যে অভিষ্ট্য করে দেয়নি, তবে তাদের মেধা বিকাশ এবং সামাজিক চাহিদা নিশ্চিত করার স্বার্থে চাকুরি করা অগ্রাহ্য নয়।

পাশ্চাত্যে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রশ্নে নারীর বাইরে চাকুরি করাটা একটি মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। এক্ষেত্রে তারা নারী-পুরুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যের বিষয়টি বিবেচনা করছে না। ফলে নারীর মানসিক অশান্তি এবং পরিবার কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার ঘটনা পাশ্চাত্যে এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

পশ্চিমা বিশ্ব অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অজুহাতে নারীকে অর্থনৈতিক কঠিন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করেছে এবং তাকে পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত করেছে। আর নারীও নিজেকে পুরুষের সমান অধিকার অর্জনের জন্যে মাতৃত্ব এবং স্ত্রীর দায়িত্ব থেকে দূরে সরে গেছে। কিন্তু তারা নিজেদের যথার্থ অবস্থান অর্জন করতে পারেনি। ইসলামের দৃষ্টিতে মা এবং স্বামী হিসেবে পরিবারে একজন নারীর অবস্থান খুবই মূল্যবান। তবে এর পাশাপাশি সমাজেও একজন নারী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

গোপন সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

ইসলাম নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে দেয় এ শর্তে যে, এ সম্পর্কের ফল হিসেবে যে সব দায় দায়িত্ব পালন অনিবার্য হয়ে ওঠে তা পালন করার প্রতিশ্রুতি সে দেবে। এ জন্য যা প্রয়োজন তা হলো, প্রকাশ্যে সমাজের চোখের সামনে এ সম্পর্কের গোড়াপত্তন হতে হবে। যাতে এ দায়-দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সমাজ ব্যক্তির সাহায্যে এগিয়ে আসে। আর ব্যক্তি যদি তা পালন করতে অবহেলা করে বা পাশ কাটিয়ে যেতে চায়, তাহলে তাকে জবাবদিহির জন্য পাকড়াও করতে হবে।

ব্যক্তি এ সম্পর্ককে গোপন রাখতে চায় এ জন্য যে, যাতে সমাজের পক্ষ থেকে কোনো চাপ তার ওপর না আসে এবং পরিবেশের সৃষ্ট বন্ধন থেকে সে মুক্ত থাকতে পারে। কারণ, এ বন্ধন ও বাধ্যবাদকতাই তার বিপথগামিতার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর সে যে কোন প্রান্তরে পথ হারিয়ে নিরুদ্দেশ হতে পারে এ সম্পর্ক ও পরিণাম যে ভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করে ফেলতে পারে।

ইসলাম মানুষকে এ বন্ধনহীনতা থেকে রক্ষা করার জন্য এ সম্পর্ক গোপন না রেখে বরং প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে বাধ্য করে। একবার হযরত উমর (রা.) এর কাছে একটি বিয়ে সম্পর্কে আলোচনা হলো। এ বিয়ের সাক্ষী ছিল মাত্র একজন নারী ও একজন পুরুষ। হযরত উমর (রা.) বললেন, 'এটি গোপন বিয়ে। আমি তা বৈধ করে দিতে পারি না। এ বিষয়ে নবী (স.) কিংবা হযরত আবু বকর (রা.) এর কোন নজীর যদি আমার সামনে থাকতো, তাহলে আমি এ সম্পর্ককে ব্যাভিচার বলে গণ্য করে রজম করতাম।'[২৬১]

গোপন সম্পর্কের কারণে বাড়ছে নানা ধরনের সাইবার অপরাধও। প্রেম, বিয়ে এমনকি ধর্ষণের দৃশ্য মোবাইল ফোনে ধারণ করে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে যৌন নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে। প্রযুক্তির অপব্যবহারে বিধ্বস্ত হচ্ছে অনেকের ক্যারিয়ার। ক্ষুন্ন হচ্ছে সামাজিক মর্যাদা। ছোট হয়ে আসছে নারীর পৃথিবী। অথচ অশ্লীলতার প্রসার রোধে ইসলাম কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা পছন্দ করে যে ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের বেদনাদায়ক শাস্তি।'[২৬২]

হাদীস শরিফে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিবসে তার দোষ গোপন করবেন।'[২৬৩] উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, নারী নির্যাতনের মৌলিক কারণগুলোর ব্যাপারে ইসলাম খুবই কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাই নারী নির্যাতন রোধে ধর্মীয় অনুশাসনেই রয়েছে সমাধান।

বন্ধুত্বের নামে অবাধ মেলামেশা নিষিদ্ধ

বর্তমান সমাজে ছেলে-মেয়ের বন্ধুত্ব একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। যারা এ সম্পর্কে বিশ্বাস করে না তাদেরকে গোঁড়া কিংবা প্রগতির অন্তরায় মনে করা হয়। অথচ বন্ধুত্বের নামে ছেলে-মেয়ের অবাধ মেলামেশা অধিকাংশ সময়ই অনৈতিক সম্পর্কের জন্ম দেয়। সংঘটিত হয় নানারকম অপ্রীতিকর ঘটনা। যা প্রায়ই খুন-যখম পর্যন্ত গড়ায়। ইসলামে এ ধরনের কোন সম্পর্কের অনুমতি নেই। গায়রে মোহরেম পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে কথা বলা, অপ্রয়োজনীয় আলাপ, ইত্যাদি যেখানে নিষিদ্ধ সেখানে ছেলে-মেয়ের বন্ধুত্বের তো প্রশ্নই আসে না।

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষনীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কু বাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথা-বার্তা বলবে।'[২৬৪]

---

২৬১ ইমাম মালেক, *মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক*, কিতাবুন নিকাহ, বাবু জামেউ মা লা ইয়াযুয।

২৬২ আল কুরআন, ২৪ : ১৯

২৬৩ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৩৭৪

২৬৪ আল কুরআন, ৩৩ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

বেশ্যাবৃত্তি পেশার ওপর নিষেধাজ্ঞা

আরবের জাহেলী সভ্যতায় ব্যাভিচারের নিয়মিত আখড়া প্রতিষ্ঠিত ছিল। সে সময় দাসীরা স্বেচ্ছায় কিংবা মালিকদের চাপে বেশ্যাবৃত্তি করতো। আর বর্তমানে বেশ্যাবৃত্তি পেশা ভালোভাবেই প্রতিষ্ঠিত। উপার্জনের এ লাঞ্ছনাকর পথ কুরআন মাজীদ একেবারেই নিষেধ করে দিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায়, তাদেরকে ব্যাভিচারে বাধ্য করো না। যদি কেহ তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[২৬৫]

হযরত আবু মাসউদ আনসারী বলেন, 'রাসুল (স.) কুকুরের মূল্য এবং ব্যভিচারিনীর ব্যভিচার দ্বারা উপার্জিত অর্থ এবং গনকের গণনা দ্বারা উপার্জিত অর্থ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।'[২৬৬]

এ বিষয়ে আরেকটি হাদীস। হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী (স.)কে বলতে শুনেছি যে, কুকুরের মূল্য নিকৃষ্ট, ব্যভিচারিনীর ব্যভিচারের আয় নিকৃষ্ট এবং রক্তমোক্ষণকারীর উপার্জণ নিকৃষ্ট।'[২৬৭]

হযরত আবু মাসউদ আর আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস (কিংবা একই হাদীস) জামে আত তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে। ওই হাদীসটিতে যোগ করা হয়েছে, 'গনক ঠাকুরের ভেট' অংশটি। হাদীসটির ভাষা এরূপ, 'হযরত আবু মাসউদ আর আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) কুকুরের বিক্রয়মূল্য, ব্যাভিচারিনীর উপার্জন এবং গনক ঠাকুরের সম্মানী নিষিদ্ধ করেছেন।'[২৬৮]

ইসলাম ব্যভিচার, দেহব্যবসা, নগ্নতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা ও দেহপ্রদর্শনীকে নিষিদ্ধ করেছে। আল্লাহ বলেন, 'আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।'[২৬৯]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না। প্রকাশ্য কিংবা অপ্রকাশ্য।'[২৭০]

অতএব ইসলামে বেশ্যাবৃত্তির কোনো স্থান নেই এবং নারীদেরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহারেরও কোনো বিধান নেই। বরং এ সবই ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। ইসলামের এ অনুশাসন মেনে চললে এগুলোর কারণে নারী যে নির্যাতন ও অবমাননার মুখোমুখি হয় সে পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। অন্য একটি হাদীসে এসেছে, 'ব্যভিচারীনীর আয় অপবিত্র এবং নোংরা।'[২৭১]

অবাধ মেলামেশার ওপর নিষেধাজ্ঞা

বর্তমান সমাজে ঘরের গৃহিনী থেকে শুরু করে বাজারের দোকানদার, কলকারখানার শ্রমিক, স্কুল-কলেজের ছাত্র, অফিসের কেরানি সকলের সামনেই পাপের অজস্র উপকরণ বিদ্যমান। এ সভ্যতা আমাদের সামনে নারী-পরুষের একত্রে মেলা-মেশা ও কাজ-কর্ম করার ব্যাপক সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে। এর ফলে সমাজের সর্বত্র ব্যাভিচার, যৌন আগ্রাসন, অত্যাচার, নারী নির্যাতন ইত্যাদি বেড়ে গিয়েছে।

---

[২৬৫] আল কুরআন, ২৪ : ৩৩

[২৬৬] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৪, পৃ. ৪৯৮, হাদীস নং- ৩৮৬৪

[২৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯, হাদীস নং- ৩৮৬৭

[২৬৮] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪১৫, হাদীস নং- ১১৩৪

[২৬৯] আল কুরআন, ১৭ : ৩২

[২৭০] আল কুরআন, ৬ : ১৫১

[২৭১] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৫), খ. ৩, পৃ. ৫৫৩, হাদীস নং- ১২৭৮

Dhaka University Institutional Repository

নারী ও পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা বন্ধ না করলে এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। ইসলাম সব সময় নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা করেছে। কোন সময় নারী ও পুরুষকে একই গণ্ডির মধ্যে কাজ করতে হলেও ইসলাম তাদেরকে পরস্পর মেলামেশা থেকে দুরে রাখতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয়।

একবার নবী করিম (স.) নারী ও পুরুষের পরস্পরের সাথে মিশে যেতে দেখে নারীদের বললেন, 'পিছনে চলে যাও। রাস্তার মাঝখানে দিয়ে চলার কোন অধিকার তোমাদের নেই। তোমাদের রাস্তার একপাশ দিয়ে চলা উচিৎ।'[২৭২]

ইমাম নববী (রঃ) বলেন, 'বিভিন্ন হাদীসের ওপর ভিত্তি করে আলেমগণ বলেছেন, নারীকে তখনই কেবল মসজিদের যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে যখন সে, 'সুগন্ধি ব্যবহার করবে না, সেজে-গুজে বের হবে না, পায়ে ঝংকার সৃষ্টিকারী মালা পরবে না, জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করবে না, পুরুষদের মধ্যে মিশে যাবে না, যুবতী হবে না, বা ফিতনা সৃষ্টিকারী অনুরূপ কোন অবস্থা থাকবে না এবং যাতায়াতের পথে ফিতনা ফাসাদ বা অনুরূপ কোন অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পরিস্থিতি থাকবে না।'[২৭৩] 'যখন আমরা বলি, নারীর ঘর থেকে বের হওয়া জায়েজ, তখন কয়েকটি শর্ত থাকে। সেজেগুজে বের হবে না। এমন অবস্থায় বের হবে, যা পুরুষদেরকে চেয়ে দেখতে বা আকৃষ্ট হতে উৎসাহিত না করে।'[২৭৪]

নারী যখন প্রয়োজনে ঘর থেকে পর্দার সাথে বের হয় এবং প্রয়োজনে পুরুষের সামনে যায় তখনও যেন নারী বা পুরুষ শয়তানের ধোকায় বিপদের সম্মুখীন না হয় সে জন্য রাসুলুল্লা (স.)-এর হাদীস, 'হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, সাবধান! তোমরা মহিলাদের সাথে অবাধে দেখা-সাক্ষাৎ করবে না। আনসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল (স.) দেবর সম্পর্কে আপনার কী মত? তিনি (রাসুল স.) বলেন, সে তো সাক্ষাৎ মৃত্যু।'[২৭৫]

আরেক বর্ণনায় এসেছে, 'মাহরাম পুরুষ ছাড়া যেন কোনো নারী কোনো পুরুষের সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে।'[২৭৬] অন্য এক হাদীসে এসেছে, 'হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন- স্বামী অনুপস্থিত স্ত্রীর কাছে তোমরা প্রবেশ করো না। কেননা শয়তান তোমাদের রক্ত স্রোতে চলমান রয়েছে। আমরা বললাম, আপনার মধ্যেও? তিনি বললেন, আমার মধ্যেও। তবে আল্লাহ তায়ালা আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। যার ফলে, সে অনুগত হয়ে গেছে।'[২৭৭]

অশ্লীলতার প্রচার অবৈধ

যে সমাজে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ পবিত্রতার ধারনার সাথে একেবারেই অপরিচিত, যেখানে রেডিও, সংবাদপত্র ও সাময়িকি সমূহ ব্যাভিচারের প্রচারকারী হয়ে বসে আছে। এবং যেখানে সাহিত্য ও শিল্পের নামে পাপের প্রসার ঘটানো হচ্ছে, সে সমাজে মানুষ নফস ও প্রবৃত্তির গোলামি থেকে রক্ষা পাবে, তা কি করে সম্ভব?

---

২৭২ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৬৬৫, হাদীস নং- ৫১৮২

২৭৩ মাওলানা নোমান আহমদ, *নিয়ামুল মুনইম শরহে মুসলিম*, (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, জানুয়ারি, ২০০০), খ. ১, পৃ. ১৮৩

২৭৪ ইমাম শাওকানি, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৩য়, পৃ. ৩৩৬

২৭৫ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৬, হাদীস নং- ৪৮৪৯। ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৩২, হাদীস নং- ১১০৯ (তিরমিযী শরীফে উক্ত হাদীসের সঙ্গে আরও কিছু অংশ যোগ করা হয়েছে এভাবে, 'স্ত্রী লোকদের সাথে অবাধে মেলামেশা করার খারাপ পরিণতি সম্পর্কে মহানবী (সঃ)-এর অনুরূপ আরও হাদীস রয়েছে তিনি বলেন, 'একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোকের সাথে একাকী অবস্থান করলে শয়তান তাদের সাথে তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে যোগ দেয় 'হামউ' শব্দের অর্থ, স্বামীর ভাই। তিনি (রাসুল সঃ) দেবরকেও ভাবীর সাথে একাকী অবস্থান করতে নিষেধ করেছেন)।

২৭৬ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর, ১৯৯২), খ. ৫, পৃ. ৮, হাদীস নং- ৩১৩৮

২৭৭ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৫২, হাদীস নং- ১১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

গোনাহ ও অশ্লীলতার প্রচার কথা ও লেখনির মাধ্যমে হোক কিংবা শিল্পের নমুনা এবং সভ্যতার পূরাকীর্তির মাধ্যমে হোক, তার প্রকাশ করা জন সমাবেশ হোক বা ব্যক্তিগত মেলামেশার পর্যায়ের হোক অতি বড় ঘৃণ্য এক অপরাধ, যা কোনভাবেই বরদাশত করা যাবে না।

এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যাভিচার প্রসার লাভ করুক। তাদের জন্য ইহকাল এবং পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (এর যৌক্তিকতা) আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।'[২৭৮]

কেউ কেউ বৈধ যৌন সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থা এমন সূক্ষ্ম ও সুন্দর ভঙ্গিতে বর্ণনা করে যে, শ্রবনকারীর পাশবিক স্পৃহা জেগে ওঠে। নবী (স.) এ কাজ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টকম স্থান হবে সে ব্যক্তির যে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং সে গোপন কথা বলে বেড়ায়।'[২৭৯]

ইসলামে ধর্ষণের কঠোর শাস্তি

ধর্ষণ একটি সামাজিক ব্যাধি। বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন মানুষের লাগামহীন পাশবিক বহিঃপ্রকাশই এই ব্যাধি সৃষ্টির মূল কারন। এ পৃথিবীতে এমন কোন ভূখন্ড নেই যেখানে কম-বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে না। বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে ধর্ষণ প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই অপকর্ম বৃদ্ধির মূল কারণ– অপরাধীদের শাস্তির বিধান যথাযথভাবে কার্যকর না করা। পশ্চিমা দেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্ষণের উপযুক্ত বিচার না থাকায় সেখানে এই অপরাধ কমাতে পারেনি, বরং আরো ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, ধর্ষণের শাস্তিস্বরূপ ধর্ষকের সাথে ধর্ষিতার বিয়ে দিয়ে দেয়া হচ্ছে। আবার কোথায় ও উভয়কেই শাস্তি দেয়া হচ্ছে– যা ইসলামে নিষিদ্ধ এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন।

ইসলাম ধর্ষণকে ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেনি। কারণ ইসলামে ধর্ষণ ভিন্ন কোনো অপরাধ নয়। বরং বিবাহবহির্ভূত যে কোনো যৌন সঙ্গমই ইসলামে অপরাধ। যাকে 'যিনা' শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে। যিনা সুস্পষ্ট হারাম এবং শিরক ও হত্যার পর বৃহত্তম অপরাধ। আল-কুরআনে এসেছে: 'এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের এবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুন হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুন্য দ্বারা পরিবর্তত করে এবং দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[২৮০]

ব্যভিচারের নিকটবর্তীও হওয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেন, 'আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল ও মন্দ কাজ।'[২৮১]

যিনার শাস্তি

ইসলামে যিনার শাস্তি ব্যক্তিভেদে একটু ভিন্ন। যিনাকারী যদি বিবাহিত হয়, তাহলে তাকে প্রকাশ্যে পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। আর যদি অবিবাহিত হয়, তাহলে তাকে প্রকাশ্যে একশত বেত্রাঘাত করা হবে। নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য একই শাস্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ব্যাভিচারিনী নারী ও ব্যাভিচারি পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে

---

২৭৮ আল কুরআন, ২৪ :১৯

২৭৯ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০০৩), খ. ৪র্থ, পৃ. ৩০৯, হাদীস নং- ৩৪০৭

২৮০ আল কুরআন, ২৫ : ৬৮-৭০

২৮১ আল কুরআন, ৭ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

একশটি করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রকি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমাদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।'[২৮২]

যিনার শাস্তি হিসেবে রাসুলও (স.) কঠোর বাণী দিয়েছেন, 'হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর যে, নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা নারীদের জন্য একটি পথ বের করে দিয়েছেন। যদি কোন অবিবাহিত পুরুষ কোন কুমারী মেয়ের সাথে ব্যভিচার করে, তবে একশত বেত্রাঘাত কর এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর কর। আর যদি কোন বিবাহিত পুরুষ কোন বিবাহিতা নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করে, তবে তাদেরকে প্রথমত একশ' বেত্রাঘাত করবে এরপর পাথর নিক্ষেপে হত্যা করবে।[২৮৩]

এই হাদীস থেকে অন্য ফকীহগণ বলেন, যিনাকারী অবিবাহিত হলে তার শাস্তি দুটো। ১. একশত বেত্রাঘাত। ২. এক বছরের জন্য দেশান্তর। আর হানাফী ফকীহগণ বলেন, এক্ষেত্রে হদ (শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি) হলো একশত বেত্রাঘাত। আর দেশান্তরের বিষয়টি ক্বাযী বা বিচারকের বিবেচনাধীন। তিনি ব্যক্তি বিশেষে তা প্রয়োগ করতে পারেন।

সহীহ মুসলিম শরীফে ব্যভিচারের শাস্তি সম্পর্কিত আরেকটি হাদীস হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু তাদের উপরে বর্ণিত হাদীসে (অবিবাহিত পুরুষ বা নারীকে বেত্রাঘাত করা হবে এবং নির্বাসন দেয়া হবে, আর বিবাহিত পুরুষ বা নারীকে প্রথম বেত্রাঘাত করা হবে, এরপর পাথর মেরে হত্যা করা হবে); কিন্তু তিনি (এক বছর এবং একশ') এই কথাটি তার হাদীসে উল্লেখ করেননি।'[২৮৪]

ধর্ষণের শাস্তি

ধর্ষণের ক্ষেত্রে একপক্ষে যিনা সংঘটিত হয়। আর অন্যপক্ষ হয় মজলুম বা নির্যাতিত। তাই মজলুমের কোনো শাস্তি নেই। কেবল জালিম বা ধর্ষকের শাস্তি হবে।

ধর্ষণের ক্ষেত্রে দুটো বিষয় সংঘটিত হয়। ১. যিনা ২. বলপ্রয়োগ/ ভীতি প্রদর্শন।

প্রথমটির জন্য পূর্বোক্ত যিনার শাস্তি পাবে। পরেরটির জন্য ফকীহদের একটি অংশ বলেন, মুহারাবার শাস্তি হবে। মুহারাবা হলো, পথে কিংবা অন্যত্র অস্ত্র দেখিয়ে বা অস্ত্র ছাড়াই ভীতি প্রদর্শন করে ডাকাতি করা। এতে কেবল সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে, আবার কেবল হত্যা করা হতে পারে। আবার দুটোই হতে পারে।

মালেকী ফকীহগণ মুহারাবার সংজ্ঞায় সম্ভ্রম লুট করার বিষয়টিও যোগ করেছেন। তবে সকল ফকীহই মুহারাবাকে পৃথিবীতে অনাচার সৃষ্টি, নিরাপত্তা বিঘ্নিতকরণ, ত্রাস সৃষ্টি ইত্যাদি অর্থে উল্লেখ করেছেন।

মুহারাবার শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ এভাবে উল্লেখ করেছেন, 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।'[২৮৫]

এখানে হত্যা করলে হত্যার শাস্তি, সম্পদ ছিনিয়ে নিলে বিপরীত দিক থেকে হাত-পা কেটে দেয়া, সম্পদ ছিনিয়ে হত্যা করলে শূলীতে চড়িয়ে হত্যা করা– এরূপ ব্যখ্যা ফকীহগণ দিয়েছেন। আবার এর চেয়ে লঘু অপরাধ হলে

---

[২৮২] আল কুরআন, ২৪ :২

[২৮৩] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, ১৯৯৪, দ্বিতীয় সংস্করণ: মে ২০০৩), খ. ৫, পৃ. ১৩৪, হাদীস নং- ৪২৬৭

[২৮৪] ইমাম মুসলিম, *সহীস মুসলিম*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৩৫, হাদীস নং- ৪২৭০

[২৮৫] আল কুরআন, ৫ : ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

দেশান্তরের শাস্তি দেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। মোটকথা, হাঙ্গামা ও ত্রাস সৃষ্টি করে করা অপরাধের শাস্তি ত্রাস ও হাঙ্গামাহীন অপরাধের শাস্তি থেকে গুরুতর।

এ আয়াত থেকে বিখ্যাত মালেকী ফকীহ ইবনুল আরাবী ধর্ষণের শাস্তিতে মুহারাবার শাস্তি প্রয়োগের মত ব্যক্ত করেছেন। উল্লেখ্য, ধর্ষক যদি বিবাহিত হয়, তাহলে এমনিতেই তাকে পাথর মেরে মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। কিন্তু সে বিবাহিত না হলে তাকে বেত্রাঘাতের পাশাপাশি বিচারক চাইলে দেশান্তর করতে পারেন। কিংবা অপরাধ গুরুতর হলে বা পুনরায় হলে অবস্থা বুঝে মুহারাবার শাস্তিও প্রদান করতে পারেন।

ইসলামে ধর্ষণ প্রমাণ করা

যিনা প্রমাণের জন্য ইসলামে দুটোর যে কোনোটি জরুরী। ১. ৪ জন স্বাক্ষী ২. ধর্ষকের স্বীকারোক্তি। তবে স্বাক্ষ্য না পাওয়া গেলে আধুনিক ডিএনএ টেস্ট, সিসি ক্যামেরা, মোবাইল ভিডিও, ধর্ষিতার বক্তব্য ইত্যাদি অনুযায়ী ধর্ষককে দ্রুত গ্রেফতার করে স্বীকার করার জন্য চাপ দেয়া হয়। স্বীকারোক্তি পেলে তার ওপর শাস্তি কার্যকর করা হবে।

ধর্ষিতার শাস্তির বিধান

ধর্ষনের ঘটনায় ধর্ষিতার শাস্তি হবে কি না এটা একটা প্রশ্ন। তবে এর উত্তর খুবই সহজ। কারণ, ধর্ষনের কাজ সংঘটিত হয় পুরুষ কর্তৃক জোরপূর্বক। এ জন্য অপরাধী ধর্ষক, ধর্ষিতা নয়। ইসলাম এই কথাটিরই সমর্থন করে। ইসলাম বলে– কাজটি যদি নারীর অমতে হয়, তাকে যদি এ কাজে বাধ্য করা হয় এবং সাক্ষী প্রমাণের ভিত্তিতে নারীর অসহায়ত্ব ও অমত সুস্পষ্ট ধরা পড়ে, তাহলে এ জন্য নারী কোনো শাস্তি পাবে না। বরং এ জন্য ধর্ষক পুরুষই শাস্তি পাবে। সে অবিবাহিত হলে তাকে এক শত বেত্রাঘাত করা হবে। আর সে বিবাহিত হলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। এ ক্ষেত্রে নারীর অব্যাহতি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'যদি কেহ তাদের ওপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদর ওপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।'[২৮৬]

ব্যভিচারের শাস্তি

যদি কেউ তার যৌন কামনার তৃপ্তির জন্য বৈধ ক্ষেত্র ও পন্থা থাকা সত্ত্বেও অবৈধ পন্থায় মজা লুটে বেড়ায় তাহলে তাকে কোন পবিত্র সমাজে জীবিত থাকার উপযুক্তই মনে করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে এরূপ নোংরা উপাদান থেকে পবিত্র করা একান্ত প্রয়োজন।

পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআয়াল ঘোষণা করেন, 'ব্যাভিচারিনী নারী ও ব্যাভিচারি পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশটি করে বেত্রাঘাত কর। আল্লাহর বিধান কার্যকর করণে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। মুসলমাদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।'[২৮৭]

এ আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হচ্ছে-

১. ইসলামে অবাধ যৌনাচারের কোনো স্থান নেই এবং অনৈতিক সম্পর্ক হারাম ও মহাপাপের কাজ।
২. সমাজে অনৈতিকতা সৃষ্টিকারীদের এমনভাবে শাস্তি দিতে হবে যাতে অন্য কেউ এ ধরনের অপকর্ম করার সাহস না পায়। আর এদের শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের দয়া দেখানো যাবে না।
৩. ব্যাভিচার আল্লাহর সঙ্গে শিরক করার মত গোনাহ, যারা ব্যাভিচার করে তাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

---

[২৮৬] আল কুরআন, ২৪ : ৩৩

[২৮৭] আল কুরআন, ২৪ : ২

Dhaka University Institutional Repository

৪. বিয়ে করার সময় পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার চরিত্র নির্মল থাকা হচ্ছে প্রধান শর্ত।

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নবী (স.) আরও কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছেন, 'এ নির্দেশ অবিবাহিত নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিবাহিত ব্যক্তি ব্যাভিচারে লিপ্ত হলে তাকে রজম বা পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

ব্যভিচারীনী নারীর ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সরাসরি নির্দেশ, 'আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারীনী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন পুরুষকে সাক্ষী হিসেবে তলব কর। অতঃপর যদি তারা সাক্ষ্য প্রদান করে সংশ্লিষ্টদেরকে গৃহে আবদ্ধ রাখ, যে পর্যন্ত মৃত্যু তাদের তুলে না নেয়, অথবা আল্লাহ তাদের জন্য অন্য কোন পথ নির্দেশ না করেন। তোমাদের মধ্য থেকে যে দু'জন সেই কুকর্মে লিপ্ত হয়, তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি উভয়ে তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে তাদের থেকে হাত গুটিয়ে নাও। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী দয়ালু।'[২৮৮]

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসুল (স.) বলেছেন, হে মুহাম্মদের উম্মতেরা (অনুসারীরা)! আল্লাহর চেয়ে বেশী আত্মমর্যাদাবোধ আর কারো নাই। সুতরাং, তিনি হারাম করে দিয়েছেন, যেন তাঁর কোন বান্দা অথবা বান্দী অবৈধ যৌন ব্যভিচারে লিপ্ত না হয়। হে মুহাম্মদের উম্মতেরা! যা আমি জানি, তা যদি তোমরা জানতে, তাহলে খুব কম হাসতে এবং বেশি বেশি কাঁদতে।'[২৮৯]

'উবাদা ইবনে সামেত (রা.) থেকে বর্ণিত নবী (স.) বলেছেন, লও! আমার নিকট থেকে এ নির্দেশটি গ্রহণ করো। আল্লাহ তা'আলা, ব্যভিচারীণী নারীদের জন্য উপায় বলে দিয়েছেন। অবিবাহিত নারী ও পুরুষ ব্যাভিচার করলে তাদেরকে একশটি বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের জন্য দেশান্তরিত করতে হবে। আর বিবাহিত নারী পুরুষ যদি ব্যাভিচার করে তাহলে উভয়কে একশটি করে বেত্রাঘাত করতে হবে এবং 'রজম' করতে হবে।'[২৯০]

আল্লাহ তায়ালা ব্যভিচার সংগঠিত হওয়ার পূর্বে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছেন মু'মিনদের জন্য। সে নিষেধাজ্ঞাই পবিত্র কুরআনুল কারীমে বিধৃত হয়েছে এভাবে, 'আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল ও মন্দ কাজ।'[২৯১]

অন্য এক আয়াতেও এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নিষেধাজ্ঞার কথা উচ্চারণ করেছেন, 'নির্লজ্জতার কাছেও যেয়ো না। প্রকাশ্য হোক কিংবা অপ্রকাশ্য।'[২৯২]

অধিকার বঞ্চিত করা যাবে না

নারীর ওপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, তেমনি পুরুষের ওপরই নারীর অধিকার রয়েছে। অধিকারের এই ভারসাম্য নীতি ইসলামই নির্ধারণ করে দিয়েছে। মূলতঃ একটি সমাজে নারী-পুরুষের অধিকারের ভারসাম্যতা না থাকলে সে সমাজে শান্তি-সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাও কোনভাবে সম্ভব নয়। বরং, এই সমতা প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত নারী নির্যাতনও কমানো অসম্ভব। কারণ, যে সমাজে নারী-পুরুষের নির্ধারিত অধিকারের ভারসাম্যের ধারনা প্রতিষ্ঠিত হয় না, সে সমাজে নারীর মর্যাদা এবং সম্মানের বিষয়টিও পুরুষের মধ্যে বোধসৃষ্টি করে না। ফলে নারী নির্যাতনও কোনভাবে কমানো সম্ভব হয় না।

---

২৮৮ আল কুরআন, ৪ : ১৫-১৬

২৮৯ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫ম, হাদীস নং- ৪৮৩, পৃ. ৯১

২৯০ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, কিতাবু হুদুদ অনুচ্ছেদ: হাদ্দিয যিনা নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন সনদে এ বিষয়ে হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং সিহাহ সিত্তার হাদীসগ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ হয়েছে এ জন্য শুধু খারেজি এবং কোন কোন মু'তাযিলা ছাড়া গোটা উম্মত 'রজম' বা পাথর মেরে হত্যা করার ব্যাপারে ইজমা বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন। শাওকানি, *নাইলুল আওতার*, খ. ৭, পৃ. ২৫৪, দ্র. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী, *ইসলামি সমাজে নারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

২৯১ আল কুরআন, ১৭ : ৩২

২৯২ আল কুরআন, ৬ : ১৫১

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং, ইসলাম নির্ধারিত অধিকারগুলো যথাযতভাবে নারীকে প্রদান করা গেলেই কেবল একটি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। নারীর মোহরানা প্রদান, ভরণ-পোষণ, সদ্ব্যবহার, ইনসাফ ভিত্তিক নীতি প্রচলন, প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দেয়া- ইত্যাদি অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হলেই কেবল শান্তিপূর্ণ পরিবার ও সমাজ গঠন সম্ভব হয়ে যায়। ইসলাম নারীকে যে অধিকার দিয়েছে আগেই তার কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সে সব অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার কোনো বৈধতা ইসলামে নেই। ইসলাম নর-নারী উভয়কে উত্তরাধিকারের অংশ নির্ধারণ করে বলেছে, 'এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।'[২৯৩]

ইসলাম নারীদেরকে দায়িত্ব অনুযায়ী কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের অর্ধেক সম্পত্তি দিলেও অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্বের পার্থক্য না থাকায় সমান সম্পত্তি দিয়েছে। যেমন পূর্বের আয়াতটিরই একাংশে বলা হয়েছে, 'বাবা-মা প্রত্যেকের জন্য রয়েছে এক ষষ্ঠাংশ।'[২৯৪]

নারীর মোহরানার অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আপনার জন্য আপনার স্ত্রীগণকে হালাল করেছি, যাদেরকে আপনি মোহরানা প্রদান করেন।'[২৯৫]

মোহরানা সম্পর্কে সূরা নিসায় আরও সুস্পষ্টরূপে আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেন, 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশিমনে।'[২৯৬] নারীদেরকে যত অধিকার আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদেরকে নির্যাতন করার এখতিয়ার কারো নেই।

অপবাদ আরোপের শাস্তি

অপবাদ নারী নির্যাতনের বিশাল একটি অনুসঙ্গ। একজন নিষ্পাপ-নিষ্কলুষ মানুষের ওপর যখন অন্যায় অপবাদ ছাপিয়ে দেয়া হয়, তখন সেটা শুধু ওই চাপিয়ে দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এটার সুদুরপ্রসারী প্রভাব উক্ত ব্যক্তির জীবনটাই বরবাদ করে দিতে পারে। আর সেই ব্যক্তি যদি কোন নারী হন, তাহলে তো কথাই নেই। কেলেঙ্কারির অন্যায় অপবাদ মাথায় নিয়ে সারাজীবন মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘোরা ছাড়া তার আর কোন উপায় থাকে না। দুর্বিসহ হয়ে ওঠে তার জীবন।

নারীকে এই দুর্বিসহ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে ইসলাম অপবাদকারীর প্রতি কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছে। দুনিয়াতে যেমন এই শাস্তি আরোপ করা হবে, তেমনি আখিরাতের তার জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হবে। দুনিয়ার শাস্তির ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা নিজেই ঘোষণা করেছেন, 'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ স্বাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান।'[২৯৭]

ব্যাভিচারী নারী ও পুরুষের শাস্তি ঘোষণা করার পর সুযোগসন্ধানী লোকেরা অন্যের দোষ-ত্রুটির খোঁজে নেমে পড়তে পারে এবং সচ্চরিত্রবান ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের দোষারোপ করতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহতায়ালা মিথ্যা অপবাদ আরোপকারীদের জন্য কঠিন শাস্তির বিধান দিয়েছেন। আল্লাহর বিধান, যারা ব্যাভিচার করার দাবি তুলবে তাদেরকে তাদের দাবির পক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। তা করতে না পারলে ওই শাস্তি অর্থাৎ ৮০টি বেত্রাঘাত উল্টো তাদের জন্য নির্ধারিত হবে। সামগ্রিকভাবে মিথ্যা অপবাদকারীর সাক্ষ্যের কোন মূল্য নেই। পরবর্তীতে এসব লোকের সাক্ষ্য কেউ গ্রহণ করবে না। অবশ্য যদি তারা তওবা করে সংশোধন হয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতেও পারেন।

---

[২৯৩] আল কুরআন, ৪ :১১
[২৯৪] আল কুরআন, ৪ : ১১
[২৯৫] আল কুরআন, ৩৩ : ৫০
[২৯৬] আল কুরআন, ৪ : ৪
[২৯৭] আল কুরআন, ২৪ : ৪

Dhaka University Institutional Repository

হাদীসে এসেছে, ইমাম জাফর সাদিক (রা.)কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়: খুনিকে শনাক্ত করার জন্য দু'জন সাক্ষী যথেষ্ট হলেও ব্যাভিচারীকে চিহ্নিত করতে চারজন সাক্ষীর বিধান রাখা হয়েছে কেন? ইমাম উত্তরে বলেন: এ বিধান এজন্য দেয়া হয়েছে যে, খুনের ঘটনায় শাস্তি হয় একজনের কাজেই দু'জন সাক্ষী যথেষ্ট। কিন্তু ব্যাভিচারের ঘটনায় শাস্তি হয় দু'জনের; কাজেই এক্ষেত্রে সাক্ষী লাগবে চারজন।

অপবাদ আরোপের পর সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য অন্য একটি আয়াতেও সাক্ষী উপস্থিত করার নির্দেশ দিয়েছেন মহান আল্লাহ তায়ালা, 'তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি। অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী।'[২৯৮]

এ আয়াতের শিক্ষণীয় দিকগুলো হলো:

১. সতী ও সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদের শাস্তি অনেক কঠিন।

২. ব্যাভিচারীর শাস্তি ১০০টি বেত্রাঘাত আর সচ্চরিত্র ব্যক্তিদের প্রতি মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তি ৮০টি বেত্রাঘাত। ফলে দেখা যাচ্ছে ব্যাভিচার ও মিথ্যা অপবাদ আরোপের অপরাধে তেমন কোনো পার্থক্য নেই।

৩. বান্দার সম্মান আল্লাহর কাছে এতবেশি গুরুত্বপূর্ণ যে, যতক্ষণ পর্যন্ত চার ব্যক্তি কারো অপকর্মের প্রমাণ হিসেবে সাক্ষী না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সম্মানহানি করার বিধান দেননি। অর্থাৎ তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীও ব্যাভিচারের গোনাহ প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট নয়। যদি চতুর্থ ব্যক্তিকে পাওয়া না যায় তাহলে ওই তিনজনকেই ৮০ঘা করে বেত্রাঘাত দিতে হবে।

আগের আয়াতে বলা হয়েছে, যদি কেউ কারো বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়ার পর চারজন পুরুষ সাক্ষী হাজির করতে না পারে তাহলে তাকে ওই অপবাদের দায়ে ৮০টি বেত্রাঘাত খেতে হবে।

অপবাদ আরোপে লি'আনের বিধান

এরপর এ আয়াতে আল্লাহ ওই আইনের একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করে বলেন: কেউ যদি তার স্ত্রীকে পর পুরুষের সঙ্গে ব্যাভিচার করতে দেখে তাহলে কাজির দরবারে তাকে চারজন সাক্ষী হাজির করতে হবে না। এমন ব্যক্তি আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে,যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তবে আমার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে।

অগত্য অপবাদ আরোপ করার মত যদি কোন পরিস্থিতি তৈরী হয়, স্ত্রীরা যদি অবাধ্য হয় কিংবা নীতি-নৈতিকতা বহির্ভূত কোন কাজ করে, কিন্তু স্বামী যদি সেই অনৈতিক কাজ নিজে দেখে, অথচ সেখানে কোন স্বাক্ষী নেই তখন কী করা হবে? এ ব্যাপারেও আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট বিধান নাযিল করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তায়লা বলেন, 'এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী। এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তবে তার ওপর আল্লাহর লা'নত।'[২৯৯]

এ ক্ষেত্রে ইসলাম নারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনেরও সুযোগ প্রদান করেছে। চারবার কসম খেয়ে যে পুরুষ কোন নারীকে দোষি সাব্যস্ত কিংবা কলঙ্কিত করে ফেলবে তা নয়। আত্মপক্ষ সমর্থণের সুযোগ নিয়ে সেই নারী নিজেকে রক্ষা করার পদক্ষেও নিতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারটিও জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে, 'এবং স্ত্রীর শাস্তি

---

[২৯৮] আল কুরআন, ২৪ : ১৩

[২৯৯] আল কুরআন, ২৪ : ৬-৭

Dhaka University Institutional Repository

রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী। এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে তার ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে।'[৩০০]

ইসলামী পরিভাষায় এ ব্যবস্থাকে বলা হয় লে'আন। স্বামী নিজে যখন লে'আন করবে, তখন স্ত্রী নিজের অপরাধ স্বীকার কিংবা অস্বীকারও করতে পারে। সেও তখন লে'আনের আশ্রয় নেয়, তাহলে তাকেও অপবাদ অস্বীকার করে তাহলে স্বামীর মতো তাকে চারবার আল্লাহর কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী, আর পঞ্চমবার বলবে, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তবে আমার উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হবে। এ অবস্থায় স্বামী অপবাদের শাস্তি থেকে এবং স্ত্রী ব্যাভিচারের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে।

তবে এ ধরণের কসম খাওয়ার ফলে এই দম্পতির সম্পর্ক চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তালাক ছাড়াই তারা পরস্পরের থেকে আলাদা হয়ে যাবে এবং ইহ জীবনে তারা আর কখনো পরস্পরের কাছে আসতে বা একে অপরকে বিয়ে করতে পারবে না। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, যেখানে কোন ধরনের সাক্ষী পাওয়া যাবে না সেখানে শুধুমাত্র আল্লাহর কসম খাওয়াই যথেষ্ট হবে এবং সেখানে নারী ও পুরুষের মধ্যে কসমের সংখ্যায় কোনো পার্থক্য থাকবে না।

উপরোক্ত আয়াতগুলো শিক্ষণীয় দিকগুলো হলো:

১. পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়ে স্বামী/স্ত্রীর সম্মান রক্ষা ও সমাজকে কলুষমুক্ত রাখার জন্য তাদের নিজেদের বক্তব্যই যথেষ্ট। এখানে তৃতীয় পক্ষের সাক্ষীর প্রয়োজন নেই।

২. মানুষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং তাদেরকে অপমানের হাত থেকে রক্ষার জন্য আল্লাহর কসম বা শপথের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৩. ইসলামী সমাজে আল্লাহর নামে কসম খাওয়ার বিষয়টিকে এতটা পবিত্র রাখা উচিত যাতে যে কেউ যখন তখন ইচ্ছা করলেই কসম খেতে না পারে।

সর্বশেষ অপবাদ আরোপের কঠোর শাস্তি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবেই আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন পবিত্র কুরআনুল কারীমে। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন 'যারা সতী-সাধ্বী, নিরীহ ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহকাল ও পরকালে ধীকৃত এবং তাদের জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি।[৩০১]

দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন নিষিদ্ধ

ইসলামই কেবল নারীর সার্বিক নিরাপত্তা বিধান করেছে। রাস্তায় কর্মস্থলে ও যত্রতত্র নারীদেরকে হয়রানি করা তো দূরের কথা বরং ইসলাম নারীদের সৌন্দয্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে, বরং অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছে। যাতে করে নারীরা বিব্রত না হয় কিংবা এ জন্য কোন ধরনের অনাচার সৃষ্টি না হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে।'[৩০২]

যারা নারীদের নিরাপত্তার জন্য হুমকী, ইসলাম তাদেরকে তা'যীরমূলক শাস্তি দেয়ার পথ খোলা রেখেছে। আর কেউ যেন নারীকে হয়রানি না করে বরং বোনের দৃষ্টিতে দেখে সেজন্যে পুরুষকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নারীরা পুরুষদের সহোদরা।'[৩০৩]

---

[৩০০] আল কুরআন, ২৪ : ৮-৯

[৩০১] আল কুরআন, ২৪ : ২৩

[৩০২] আল কুরআন, ২৪ : ৩০

[৩০৩] ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ডিসেম্বর: ১৯৯০), খ. ১, পৃ. ১৫৪, হাদীস নং- ২৩৬

Dhaka University Institutional Repository

নারীকে যে কোন ছুতোয় দৈহিকভাবে কিংবা মানসিকভাবে নির্যাতন করা শরীয়তে বৈধ নয়। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জীবনে তার কোনো স্ত্রী কিংবা কন্যার গায়ে হাত তোলেন নি।

নারীকে অপবাদ দেওয়াটাও এক প্রকারের মানসিক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। অন্যায় অপবাদের কারণে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে একজন নারী যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা তার জন্য মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। প্রাক ইসলামী সমাজে, এমনকি ইসলাম পরবর্তী কোন কোন সমাজে নারীকে অহেতুক অপবাদ দেওয়া ছিল যেন একটা নিত্য, নৈমিত্তিক ঘটনা। এ কারণেই এ বিষয়টা ইসলামে কঠোরভাবে নিষেধ করাই হয়নি শুধু, নারীর প্রতি এ ধরনের অপরাধের কঠোর শাস্তি এবং ওই নারীর সম্মান ও মর্যাদা প্রতিবিধানেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর কমপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনো তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না'ফরমান।'[৩০৪]

সুরা নিসার অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং তাদেরকে আটক রেখো না, যাতে তোমরা তাদেরকে যা প্রদান করেছো তার কিয়দাংশ নিয়ে নাও; কিন্তু তারা যদি কোন প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে। নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।'[৩০৫]

বস্তুত স্ত্রীদের সাথে মিষ্টি ও মধুর ব্যবহার করা এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে শান্তি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দান করা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যদি কেউ তার স্ত্রীকে অকারণ জ্বালা যন্ত্রণা দেয়, ক্ষতিগ্রস্থ করতে চেষ্টিত হয়, তবে সে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কারণে, আল্লাহর গযব পড়ার যোগ্য হবে। আল্লামা আলুসীর মতে, 'তার নিজের কষ্ট ও ক্ষতি হবে। এভাবে যে সে মধুর পারিবারিক জীবন যাপনের ফলে লভ্য সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে, বলে সে দ্বীনের ফায়দা হারাবে, এভাবে যে, তারও ভীবৎস কাজের প্রচার হয়ে যাওয়ার কারণে নারী সমাজ তার প্রতি বিরূপ ও বিরাগভাজন হয়ে পড়বে। (রুহুল মা'আনি)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাময়াতা (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী (স.) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন তার স্ত্রীকে ক্রীতদাসদের মারার মত না মারে। তার মারধোর করার পর দিনের শেষে যেন তার সাথে যৌন সঙ্গম না করে।'[৩০৬]

এ ব্যাপারে রাসুল (স.) এর জীবনাদর্শই আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় উদাহরণ। 'হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (স.) কখনও তাঁর কোন খাদেমকে অথবা তাঁর কোন স্ত্রীকে মারপিট করেননি এবং নিজ হাতে অপর কাউকেও প্রহার করেননি।'[৩০৭]

স্বামীদের ওপর এ বিষয়টা স্ত্রীদের অধিকারও বটে যে, স্বামীরা কখনও স্ত্রীদের গালমন্দ করবে না, মারধর করবে না। তাদের খোর-পোষের ব্যাপারেও যেন সমানাধিকার থাকে। এ বিষয়ে হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, 'হাকীম ইবনে মু'আবিয়া (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বলি ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমরা আমাদের স্ত্রীদের সাথে কোথায় কিরূপে সহবাস করবো এবং কোথায় করবো না? তিনি বলেন, তুমি তোমার ক্ষেত্রে

---

[৩০৪] আল কুরআন, ২৪ : ৪

[৩০৫] আল কুরআন ৪:১৯

[৩০৬] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ১৯৮২, ৮ম প্রকাশ: নভেম্বর, ২০০৬), খ. ৫, পৃ. ৯১, হাদীস নং- ৪৮২২। ইমাম ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৪১৪, হাদীস নং- ১৯৮৩

[৩০৭] প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

যেরূপ ইচ্ছা গমন করতে পারো। আর যখন তুমি খাবে, তখন তাকেও খেতে দেবে। আর যখন তুমি যা পরিধান করবে, তখন তাকেও তা পরিধান করাবে এবং তাকে গালমন্দ করবে না ও মারধর করবে না।'[৩০৮]

একই রা'বী থেকে অনুরূপ আরেকটি হাদীস রয়েছে এভাবে, 'হাকীম ইবনুল মু'আবিয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (স.) স্বামীদের ওপর স্ত্রীদের কী হক? তিনি বলেন, যা সে খাবে, তাকেও (স্ত্রী) খাওয়াবে। আর সে যা পরিধান করবে, তাকেও তা পরিধান করাবে। আর তার (স্ত্রীর) চেহারার উপর মারবে না এবং তাকে গালাগাল করবে না। আর তাকে ঘর থেকে বের করে দেবে না।'[৩০৯]

অন্যায়ভাবে তালাক দেওয়া যাবে না

স্বামী-স্ত্রীর অস্বস্তিকর জীবনের সুন্দর সমাধানের জন্য ইসলাম তালাকের বিধান রেখেছে। স্বামীর হাতে যদিও তালাকে প্রাথমিক অধিকার ন্যস্ত হয়েছে, কিন্তু সে অধিকার অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করাও শরীয়তে আরেকটি অন্যায় ও গোনাহরূপে বিবেচিত। মূলত বিবাহ যেমন mutual understanding এর ভিত্তিতে হয়ে থাকে তেমনি তালাকও সে রকম বোঝাপড়ার মধ্যে সম্পন্ন হওয়াই ইসলামের নির্দেশ। এজন্যই সাংসারিক অশান্তি দেখা দিলে উভয়ের মধ্যে দু'পক্ষের সালিস বসিয়ে একটি সমাধানে পৌঁছার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতিরই আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং সব কিছু অবহিত।'[৩১০]

কুরআনের স্পিরিট হচ্ছে দু'পক্ষ ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতেই একমত হয়ে তালাকের সিদ্ধান্ত নিবে। সালিসের পর করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তারপর হয় নিয়মানুযায়ী রাখবে, না হয় সহৃদয়তার সঙ্গে বর্জন করবে।'[৩১১]

রাগের মাথায় তালাকের বিধান মূলত ইসলামে সমর্থিত নয়। এজন্যই প্রায় সকল আলেম একমত যে, প্রচণ্ড রাগের মাথায় হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হয়ে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে না। এছাড়া তিন তালাক একসাথে দিলে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ ও ইবনুল কাইয়েমসহ আরো অনেক মুসলিম স্কলারের মতে এক তালাকই পতিত হবে। এ সব তথ্য জানা থাকলে তালাকের অপব্যবহার বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব।

ইসলামে যৌতুক নিষিদ্ধ

ইসলামের দৃষ্টিতে যৌতুক একটি অবৈধ ও ঘৃণিত প্রথা। কন্যাকে পাত্রস্থ করার জন্য মোহরানা ব্যতীত বরপক্ষের চুক্তিবদ্ধ দাবি অনুযায়ী কন্যাপক্ষ উপহার সামগ্রী যা প্রদান করেন তা-ই যৌতুক। ইসলামে শর্তারোপ করে যৌতুক গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে হারাম বা নিষিদ্ধ। শরিয়তের বিধানে বিবাহের শর্ত হিসেবে যৌতুক আদায় করা শুধু নাজায়েজই নয়; বরং সুস্পষ্ট জুলুম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। সমাজ জীবনে এমন অনেক নব উদ্ভূত রীতিনীতি বা আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে যা গোটা সমাজব্যবস্থার জন্যই মারাত্মক ক্ষতিকর। যৌতুক আমাদের সমাজে নতুন নয় বরং আবহমানকাল ধরে চলে আসা এক অর্থনৈতিক শোষণের হাতিয়ার। ঘৃণ্য যৌতুকপ্রথা সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল বিবাহব্যবস্থার অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কের সঙ্গে যৌতুক আদায় করার হীন মানসিকতা মানুষ হিসেবে মানবতার অবমাননা করার শামিল। ইসলামের বিধান অনুসারে মানুষের জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো অমানবিকতার অবকাশ রাখার সুযোগ নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'কারও সম্পদ হালাল হয় না, যতক্ষণ না সে সন্তুষ্টচিত্তে তা প্রদান করে।'

---

[৩০৮] ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৬, হাদীস নং- ২১৪০

[৩০৯] প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১৩৯

[৩১০] আল কুরআন, ৪ : ৩৫

[৩১১] আল কুরআন, ২ : ২২৯

Dhaka University Institutional Repository

যৌতুক প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিমালা হলো তা অবৈধভাবে বা অনির্ধারিত পথে অর্জন করা চলবে না। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না।'[৩১২]

অন্যায়ভাবে বা যা ন্যায্যপ্রাপ্য নয়, তা কোনোভাবেই গ্রহণ বা দাবি করা যাবে না। যদি তা জোরপূর্বক আদায় করা হয় তবে তা কত বড় অন্যায় এবং তার শাস্তি যে কী ভয়াবহ হতে পারে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, 'আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।'[৩১৩]

ইসলামী বিধান ও সংস্কৃতিতে বরকে উপঢৌকন দেয়ার অনুমোদন নেই। কন্যার জীবনধারা দুটো ভাগে দুজনের দায়িত্বে অর্পিত। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে, 'আর সন্তানের অধিকারী অথ্যাৎ পিতার উপর হলো সে সমস্ত নারীর খোর-পোষের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী।'[৩১৪]

আর বিয়ের সময় থেকে আজীবন স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর। বিয়ের সময় স্ত্রীকে দেনমোহর তথা উপঢৌকন দেয়ার দায়িত্বও স্বামীর। কেননা মহান আল্লাহর বাণী, 'পুরুষরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল, এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।'[৩১৫]

ধর্মীয় নীতিমালায় যৌতুকের আদৌ স্থান নেই। ইসলামে বিবাহের মধ্যে লেনদেনের যে বিধান দিয়েছে বর্তমান যৌতুকপ্রথা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বৈবাহিক বিষয়ে লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা হলো, স্বামীরাই স্ত্রীকে কিছু অর্থ-সম্পদ ফরজ তথা আবশ্যিকভাবে প্রদান করবে। বিবাহকে বৈধ করার জন্য দেনমোহর একটি অন্যতম বিধান। এটা ফরজ, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। ইসলামে বিবাহ বন্ধনে মোহরানার গুরুত্ব অত্যধিক। এটি ইসলামের আবির্ভাব থেকেই মুসলিম সমাজে কঠোরভাবে আরোপিত। মোহরানা নারীর ন্যায্য অধিকার। বিবাহ উপলক্ষে নারীকে সন্তুষ্টচিত্তে তার মোহর প্রদান করার তাগিদ দিয়ে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, 'আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহর দিয়ে দাও খুশিমনে।'[৩১৬]

শরিয়াতের দৃষ্টিতে মোহর প্রদান স্বামীর ওপর ফরজ এবং তা স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এভাবে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীর যাবতীয় ব্যয়ভার স্বামীকেই বহন করতে হয়। সুতরাং বিবাহসংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনে পুরুষের কোনোভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ নেই। আর যৌতুকের দাবিতে জোর-জবরদস্তি করা শুধু অর্থনৈতিক শোষণ নয়, বরং তা দণ্ডবিধির আওতাভুক্ত অপরাধও বটে। তাই এর থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুমিন মুসলমানের জন্য একান্ত আবশ্যক।

যৌতুক তথা ধন-সম্পদ, সম্মান ও মর্যাদা কোনো কিছুর লোভ বা মোহে আকৃষ্ট হয়ে বিবাহ করা যাবে না। মানুষের নৈতিক চরিত্র পরিশুদ্ধ রাখা, আদর্শ পরিবার ও সুশীল সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যেই বিবাহ করা উচিত। যৌতুকের বিরুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.) কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন, 'যে ব্যক্তি সম্মান লাভের জন্য কোনো নারীকে বিবাহ করে আল্লাহ তার লাঞ্ছনা বৃদ্ধি করে দেন। যে তাকে সম্পদ লাভের আশায় বিবাহ করে আল্লাহ তার দরিদ্রতা বৃদ্ধি করে দেন। আর যে তাকে বংশ গৌরব লাভের আশায় বিবাহ করে আল্লাহ তার অমর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। আর যে তাকে দৃষ্টি অবনত রাখতে পুণ্য অথবা অশ্লীলতা থেকে নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য বিবাহ করে অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য বিবাহ করে, আল্লাহ তাকে ওই স্ত্রীর মাধ্যমে বরকত দান করবেন এবং স্ত্রীর জন্যও তাকে বরকতময় করে দেবেন।'

---

৩১২ আল কুরআন, ২ : ১৮৮
৩১৩ আল কুরআন, ৪ : ৩০
৩১৪ আল কুরআন, ২ : ২৩৩
৩১৫ আল কুরআন, ৪ : ৩৪
৩১৬ আল কুরআন, ৪ : ৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিধান মতে, বিবাহে কোনো যৌতুকের শর্ত ও দাবি থাকে না, তবে যদি বিনা শর্তে বিনা দাবিতে বর-কন্যার অভিভাবক বা আত্মীয়স্বজন যদি খুশি হয়ে স্বেচ্ছায় নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী ছেলেমেয়েকে কিছু প্রদান করেন সেটা গ্রহণ আপত্তিকর নয়। এরূপ উপহার দেওয়াকে হাদিস শরিফে 'তুহফা' বা 'হাদিয়া' রূপে পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে কিরামের জীবদ্দশায় যৌতুকের লেনদেনের কোনো ঘটনা ঘটেনি। যে বিবাহে খরচ কম হয় সে বিবাহকে বরকতময় বিবাহ আখ্যায়িত করে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সর্বাপেক্ষা বরকতময় হলো ওই বিবাহ যা কম খরচে নির্বাহ করা হয়।'

জাহেলিয়াতের যুগে নারীকে বিনিময়ের বদৌলতে বিবাহ দেওয়া হতো। মূলত এ বিনিময় প্রথাই হচ্ছে যৌতুক। প্রাক-ইসলামী যুগের এ ঘৃণ্য ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে ইসলামের আগমনে পণপ্রথা নামক জঘন্য রীতির অপসারণ ঘটানো হলো। রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীর অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, 'তোমরা মোহরানার হক আদায়ের মাধ্যমে জীবন সঙ্গিনীকে হালাল কর।'

ইসলামে যৌতুক প্রদান জায়েজ তো নয়ই, উপরন্তু যৌতুক প্রদানের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে রিয়া বা লোক দেখানো ও অহংকার প্রদর্শন করা হয়ে থাকে, যা হারাম বা শরিয়তের পরিপন্থী। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাবলম্বী হয়ে বিনা যৌতুকে স্ত্রীকে গ্রহণ করলে পাবে ভাগ্যবানের মর্যাদা।

ইসলামে ইভটিজিং-এর শাস্তি এবং প্রতিকারের উপায়

ইভটিজিং একটি সামাজিক ব্যাধি ও জাতীয় কলঙ্ক। সমাজে এখন এটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। সকলেই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর প্রতিকার নিয়ে ভাবছে। আইন হচ্ছে, শাস্তি হচ্ছে, মিছিল-মানববন্ধন হচ্ছে। পত্রিকাগুলোতে কলাম, ফিচার লেখা হচ্ছে, টিভি প্রতিবেদন হচ্ছে। সকলেই চান জাতিকে এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে। কিন্তু ইভটিজিং বন্ধ তো হচ্ছেই না বরং, দিন দিন বেড়ে চলছে। তাহলে সমাজের এই জঘন্য ব্যাধি থেকে মুক্ত থাকার উপায় কি? সেটা হলো ইসলামের নির্দেশনা বাস্তবায়ন।

ইসলাম নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং এ জাতীয় সমস্যার সমাধানে আল্লাহ তাআলা নারী পুরুষ উভয়কে কিছু নির্দেশনা দিয়েছেন। যা মেনে চলা ইভটিজিং এবং সামাজিক আরো অনেক সমস্যা থেকে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় উপায়। এ সকল নির্দেশনার মূলকথা হলো, আল্লাহ পুরুষকে তার দৃষ্টি অবনত রাখতে বলেছেন এবং এমন সব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যা তার অন্তরে অন্যায়ের উদ্রেক ঘটায়। পুরুষ যদি তার দৃষ্টি অবনত রাখে তাহলে ইভটিজিংয়ের আবেদনই সৃষ্টি হয় না। তেমনি নারীকেও বলেছেন তার দৃষ্টি অবনত রাখতে, যাতে তার মনেও পুরুষকে দেখে যেন কোনো কুমন্ত্রণা না আসে এবং নারীকে আরও বলেছেন, সে যেন তার সৌন্দর্য্য ও সাজসজ্জা পর-পুরুষের সামনে প্রকাশ না করে। নারী পুরুষ উভয়েই যদি স্রষ্টার এই নির্দেশনা মেনে চলে তাহলেই পুরুষ বাঁচবে এ অন্যায় থেকে এবং পুরুষের মা-বোন নারী বাঁচবে ইভ টিজিংয়ের মত জুলুম থেকে।

ইভটিজিং যেহেতু একটি সামাজিক ব্যাধি। এটা বর্তমান সময়ে ইভটিজিং নামে ব্যাপক পরিচিতি পেলেও, ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বিষয়টির উপস্থিতি ছিলই। পুরুষ কর্তৃক নানা প্রকারে নারীকে নিগৃহ করার নানা পদ্ধতির মধ্যে ইভ টিজিংও ছিল অন্যতম প্রদান উপায়। সামাজিক এই ব্যধি প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে ইসলাম কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করেছে। যেমন-

১. দৃষ্টির হেফাজত

ইভটিজিং এর পেছনে সবচেয়ে ক্ষতিকর যে কারণ তা হল: অবাধ দৃষ্টি প্রয়োগ। ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলাম বর্ণিত দৃষ্টি সম্পর্কিত ফৌজদারী আইনের অনুশীলন জরুরী। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মুমিনদেরকে বলুন,

Dhaka University Institutional Repository

তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন।[৩১৭]

একই সঙ্গে নারীও যেন পুরুষকে দেখে আকৃষ্ট না হয় তাই তাদের ব্যাপারেও আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন, 'ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে।'[৩১৮]

এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (স.) এর হাদীস। 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, (অসংযত) দৃষ্টি হচ্ছে ইবলিসের বিষাক্ত তীরগুলো থেকে একটি তীর। যে ব্যক্তি আমাকে ভয় করে তা ত্যাগ করবে, আমি তার বদলে তাকে এমন ঈমান দান করবো, যার স্বাদ সে নিজের হৃদয়ে অনুভব করবে।[৩১৯]

দৃষ্টিশক্তির অবাধ নিয়ন্ত্রণহীনতার ফলেই ইভটিজিং ঘটছে। সুতরাং ইভটিজিং বন্ধে ইসলাম প্রদর্শিত পন্থায় দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রন করতে হবে। দৃষ্টি অবনত রাখার বিষয়ে হাদীস শরীফেও রাসুল (স.) সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, '... চোখের যিনা হল কুদৃষ্টি, আর যবানের যিনা হল খারাপ কথা বলা। নফস খারাপ কাজের আকাংখা করে ও কামনা করে, আর গুপ্তাঙ্গ তা বাস্তবায়িত করে বা তা থেকে বিরত থাকে।'[৩২০]

অর্থাৎ সকল খারাপের সূচনা হয় দৃষ্টির অপব্যবহার থেকে। কেননা দৃষ্টিই হল অন্তরের জানালা। দৃষ্টি যদি স্বচ্ছ ও পবিত্র থাকে তাহলে অন্তরও পবিত্র থাকবে। নতুবা অন্তর কলুষিত হবে। আর অন্তর যদি কলুষিত হয় তাহলে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুনাহের পথে যাওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। তাই তো দৃষ্টিকে বলা হয়েছে শয়তানের তীর।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, 'হজরত বুরাইদা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদা আলী (রা.) কে বললেন, হে আলী! পর নারীর প্রতি একবার দৃষ্টি পড়লে দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টিপাত করো না। কারণ প্রথমবার দৃষ্টিপাতের জন্য গুনাহগার না হলেও ইচ্ছাকৃতভাবে পুনরায় দৃষ্টিপাত করলে গুনাহ হবে'।[৩২১]

২. সতর ঢেকে রাস্তায় চলাচল

সতর না ঢেকে উগ্র, অর্ধ উলঙ্গ চলাচলের প্রভাবে সমাজের যুবকদের সুপ্ত যৌন আকাঙ্খা উস্কে দেয়া হয়। যার প্রভাবে ইভটিজিং এর মতো অনৈতিক কর্মকাণ্ডের উদ্ভব হয়। সুতরাং ইভটিজিং প্রতিরোধে শালীন পোশাক পরিচ্ছদেও অনুশীলন জরুরী।

মহান আল্লাহ আয়ালা বলেন, 'যে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজ-সজ্জার বস্ত্র এবং পরহেজগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।'[৩২২]

সতরের সীমারেখা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (স.) এর হাদীস, 'হযরত আমর বিন শুআইব (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি রাসূলূল্লাহ (স.) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় পুরুষের সতর হলো নাভি ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান।'[৩২৩]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন, 'ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের মথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও

---

৩১৭ আল কুরআন, ২৪ : ৩০

৩১৮ আল কুরআন, ২৪ : ৩১

৩১৯ সুলায়মান বিন আহমদ বিন আয়ুব তাবরানী, *আল-মুজামুল ওয়াসীত*, (কায়রো: দারুল হারামাইন, তা.বি), হাদীস নং- ১০৩৬২

৩২০ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ১৫৯, হাদীস নং- ২১৪৯

৩২১ ইমাম তিরমিযী, *তিরমিজি শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০২, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১৪), খ. ৫, পৃ. ১৮৭, হাদীস নং- ২৭৭৭

৩২২ আল কুরআন, ৭ : ২৬

৩২৩ সুলায়মান বিন আহমদ বিন আয়ুব তাবরানী, *আল-মুজামুল সাগীর* (বৈরুত: কুতুবুল ইসলামিয়্যা, ১৪০৫ হি.), হাদীস নং- ৩২২

Dhaka University Institutional Repository

বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতিত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারনা না করে। মুমিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[৩২৪]

আয়তে 'যা সাধারণতঃ প্রকাশমান'- এই শব্দ দ্বারা অধিকাংশ ইমামের মতে– মুখমণ্ডল, হতের তালু ও বহিরাবরণকে বোঝানো হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রা.) মুজাহিদ ও 'আতা (রা.) বলেন, 'এর অর্থ হচ্ছে চেহারা ও হাতের তালুতে ব্যবহৃত রং ও সুরমা। ইবনু উমর ও আনাস (রা.) প্রমুখ থেকেও বর্ণিত রয়েছে। ইবনু আব্বাস (রা.)-এর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এর অর্থ হলো- হাতের তালু, চেহারা ও আংটি।[৩২৫]

সর্বোপরি নারীর সতর সম্পর্কে কতিপয় আলিমের মতভেদ থাকা সত্ত্বেও পরপরুষের সামনে বিনা প্রয়োজনে চেহারা খোলা রাখা নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং প্রতিটি নারীর জন্য উচিত হবে, রাস্তায় চলাচল অথবা মাহরাম ব্যতীত অন্য কারো সামনে যেতে হলে অবশ্যই দেহ আবৃত রাখা। পর্দা সংক্রান্ত সূরা আহযাব ও সূরা নূরের সবগুলো আয়াত অধ্যয়ন করলে এবং সাহাবায়ে কিরামের আমল পর্যালোচনা করলেই বোঝা যায়, পরপুরুষের ক্ষেত্রে মহিলাদের মুখমণ্ডলও সতরের অন্তর্ভূক্ত হবে।

মহিলাদের মূখমন্ডলের গুরুত্ব সম্পর্কে মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী বলেন, 'মুখমণ্ডল হচ্ছে সুন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু এবং বিপর্যয়ের উৎস ও বিপদের ঘাঁটি।'[৩২৬] এ ব্যাপারে ইমাম কুরতুবী বলেন, 'মুখমণ্ডল হচ্ছে রূপ সৌন্দর্যের কেন্দ্রস্থল, সৃষ্টিগত সৌন্দর্য এবং নারী জীবনের মাহাত্ম্য-মাধুর্য এখানেই।"[৩২৭]

উপর্যুক্ত আলোচনার সারমর্ম হিসেবে আল্লামা মুহাম্মদ আলী আস সাবুনী (রঃ)'র মতামত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'মহিলাদের দিকে তাকানো জায়েয নয় শুধু ফিতনার আশঙ্কায়। আর চেহারা খোলা থাকলে যে ফিতনার সৃষ্টি হয় তা পা, নলা এবং চুল খোলা রাখার চেয়েও মারাত্মক। যেখানে পায়ের নলা এবং চুলের দিকে তাকানো সর্বসম্মতভাবে হারাম, সেখানে চেহারার দিকে তাকানো আরো বেশি হারাম হওয়া উচিৎ। কারণ তা হচ্ছে সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু ও ফিতনার উৎস।'[৩২৮]

সুতরাং বোঝা গেলো যে, ইভটিজিং বন্ধে মহিলাদেরকে সতর হিসেবে তাদের মুখমণ্ডলসহ সমস্ত শরীরই ঢেকে রাখতে হবে। সাধারণত কিশোরী, তরুণী ও যুবতিরাই ইভটিজিং-এর শিকার হয়ে হয়ে থাকে। কারণ এ সময় তারা নিজেদেরকে আবেদনময়ী সাজসজ্জা করে পরপুরুষের কাছে উপস্থাপন করে।

৩. সাজ-সজ্জা হবে নির্দিষ্ট পরিসরে

নারী সাজবে নারীর মত করে। পৃথিবীর যত স্বর্ণ সব নারীর জন্য, পুরুষের জন্য তা হারাম। যত রেশমী বস্ত্র সব নারীর জন্য, পুরুষের জন্য তা নিষিদ্ধ। যত মণি-মুক্তা হিরা-জহরত সব নারীর জন্য। ইসলামে এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই যে নারী সাজতে পারবে না। তবে আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করে নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌন কামনামুক্ত পুরুষ এবং বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য

---

৩২৪ আল কুরআন, ২৪ : ৩১

৩২৫ আবু বকর আল- জাস্‌সাস, *আহকামুল করআন* (বৈরুত: দারু ইহয়িয়া আত তুরাসিল আরাবী, ১৪০৫ হি.), খ. ৫, পৃ. ১৭২

৩২৬ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *রাওয়ায়িউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকামি মিনাল কুরআন* (দামেস্ক: মাকতাবাতুল গাজালী, ১৯৮০), খ. ২, পৃ. ১৫৬

৩২৭ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ উবনু আহমদ আল-কুরতুবী, *আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন* (কায়রো: দারু কুতুবিল মিসরিয়াহ, ১৯৮৪ হি.), খ. ১২, পৃ. ২২৯

৩২৮ মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, *রাওয়ায়িউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকামি মিনাল কুরআন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

জোরে পদচারনা না করে। মু'মিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[৩২৯]

৪. নারীর অবস্থান ও কর্মস্থল

নারীর প্রধান অবস্থান ও কর্মস্থলই হল ঘর। এখানে বসেই নারী একটি সৎ ও যোগ্য জাতি নির্মাণের দায়িত্ব পালন করতে পারে। এখানেই সে বেশি নিরাপদ। আর প্রয়োজনে যদি তাকে ঘর থেকে বের হতেই হয় তাহলে সে যেন জাহেলী যুগের নারীদের মত নিজেকে প্রদর্শন না করে। কারণ নারীর নিরাপত্তাহীনতার প্রথম কারণ হল নিজেকে অশালীনভাবে মানুষের সামনে পেশ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে– মুর্খতার যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শণ করবে না। নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে।'[৩৩০]

৫. ঘরের বাইরে নারীর পোষাক

প্রয়োজনের তাগিদে যদি নারীকে ঘর থেকে বের হতে হয় তাহলে সে কীভাবে বের হবে তাও আল্লাহ বলে দিয়েছেন, যা মানলে নারী ইভটিজিংয়ের শিকার হওয়া তো দুরের কথা, কোনপ্রকার সম্মানহানিই হবে না। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে বলেন, 'হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'[৩৩১]

আল্লামা ত্বকী উসমানী তার Nobel Quran -এ فلا يؤذين এর তরজমা করেছেন Hence not teased 'তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না'। স্রষ্টার চেয়ে কে আর ভালো বলতে পারবেন যে, তার সৃষ্টির রোগ কী ও তার প্রতিকার কীসে?

এ আয়াতে ইভটিজিংয়ের সমাধানে নারীর প্রতি একটি মৌলিক নির্দেশনা এসেছে। আর তা হল-নারী যেন বাইরে বের হলে জিলবাব দ্বারা তার মুখমণ্ডল ও শরীর আবৃত করে, পর্দার সাথে বের হয়, অশালীনভাবে বের না হয়। নতুবা 'রুগ্ন' পুরুষও তার প্রতি প্রলুব্ধ হবে ও কুদৃষ্টি দিবে। তাফসীরে কুরতুবীতে (১৪/২৪৩) জিলবাবের অর্থ করা হয়েছে, এমন বড় চাদর, যা দ্বারা মুখমণ্ডল ও পূর্ণ দেহ আবৃত করা যায়।

প্রয়োজনের খাতিরে মহিলাদের ঘরের বাইরে বের হওয়া সম্পর্কে রাসুল (স.) এর হাদীস দিয়েও দলিল দেওয়া হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাতে সাওদা বিনতে যাময়া (কোন প্রয়োজনে) রাতের বেলা বাইরে গেলেন। উমর (রা.) তাকে দেখলেন এবং চিনতে পারলেন। তিনি (তাকে লক্ষ্য করে) বললেন, আল্লাহর কমস! হে সাওদা তুমি নিজেকে আমাদের নিকট থেকে লুকাতে পারনি। সুতরাং, তিনি নবী (স.) এর কাছে ফিরে এলেন এবং এ ঘটনা তার কাছে বর্ণনা করলেন; যখন তিনি আমার ঘরে বসা ছিলেন, রাতের খাবার খাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় যে, গোস্তপূর্ণ একখানা হাঁড় তার হাতে ছিল। এ সময় তার কাছে ওহী নাযিল হল। যখন সে অবস্থা (ওহী নাযিলের) অতিক্রান্ত হলো, নবী (স.) বললেন, হে মহিলারা প্রয়োজনে আল্লাহ তোমাদের বাইরে বেরুবার অনুমতি দিয়েছেন।'[৩৩২]

---

[৩২৯] আল কুরআন, ২৪ : ৩১

[৩৩০] আল কুরআন, ৩৩ : ৩৩

[৩৩১] আল কুরআন, ৩৩ : ৫৯

[৩৩২] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৯৮, হাদীস নং- ৪৮৫৪

Dhaka University Institutional Repository

কোন নারী যদি মসজিদে যেতে চায়, তাহলে তাকে নিষেধ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন রাসুল (স.)। হযরত সালিম তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, নবী (স.) বলেছেন, 'যদি তামাদের কারো স্ত্রী তোমাদের কাছে মসজিদে যাওয়ার (নামাজের জন্য) অনুমতি চায়, তাহলে তাকে নিষেধ করো না'[৩৩৩]

৬. লজ্জা ও শালীনতা

আর লজ্জা ও শালীনতাবোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শালীনতার চূড়ান্ত শরয়ী রূপ হল পর্দা। পর্দার মধ্যে বড় ওড়না বা বোরকা, সেগুলো আকর্ষণীয় না হওয়া, কথার আওয়াজ কোমল ও আকর্ষণীয় না হওয়া, কথার বিষয়বস্তু ও বাক্য শালীন হওয়া, চলার ভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি মার্জিত হওয়া, বাইরে বের হলে সুগন্ধি ব্যবহার না করা, আকর্ষণ ও প্রদর্শন থেকে বিরত থাকা, পবিত্র মানসিকতা, আল্লাহর ভয় ইত্যাদি অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত। আর সবগুলো বিষয় পালন করার জন্য শুধু একটি বিষয় প্রয়োজন। তা হল তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়।

এ বিষয়টিই পর্দার আনুষাঙ্গিক সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে যার পর্দার শুরু আল্লাহভীতি থেকে তার আপনাআপনিই বাকিগুলো এসে যায়। আর যার পর্দার শুরু হয় পোশাক থেকে তার মাঝে আল্লাহভীতি আসা পর্যন্ত বাকি সবগুলো বোঝা মনে হয়। আর আল্লাহভীতি আসার জন্য সবচেয়ে সহায়ক হল সঠিক তারবিয়াত বা তত্ত্বাবধান ও সুন্দর পরিবেশ এবং সহীহ ইলম তথা পর্দা ও ইসলাম সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা।

কারো মাঝে যখন লজ্জাবোধ থাকে না তখন সে সবকিছুই করতে পারে। একটি হাদীসে এসেছে, 'যখন তোমার থেকে লজ্জা বিদায় নেয় তখন যা ইচ্ছা তাই কর'।[৩৩৪]

৭. রাস্তায় আড্ডা না দেয়া

আজকের সমাজে যে সব স্থানে ইভটিজিং হয় তা হল রাস্তা, ঘাট, বাজার, বিপনী বিতান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অথচ এসব ব্যাপারে ইসলামের বিধান যদি মানা হত তাহলে ইভটিজিং নামক শব্দটিরই হয়তো উদ্ভব হত না। এ প্রসংঙ্গে একটি হাদীস। 'হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী (স.) বলেছেন, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো। সাহাবীগণ বলেন, আমাদের তো রাস্তার উপরে বসা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। আমরা তো সেখানে বসেই আলাপ করে থাকি। রাসূলূল্লাহ (স.) বললেন- যদি তোমরা একান্তই রাস্তায় বসতে চাও, তাহলে রাস্তার হক আদায় করবে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল। রাস্তার হক কী? রাসূলূল্লাহ (স.) বললেন, রাস্তার হক হল- চক্ষু অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎ কাজে বাধাদান করা।[৩৩৫]

আলোচ্য হাদীসের নির্দেশনা যদি সমাজে বাস্তবায়িত হতো, তাহলে রাস্তার মোড়ে মোড়ে এত আড্ডার আসর হত না এবং ইভটিজিংও হত না। সুতরাং ইভটিজিং বন্ধে রাস্তার হকসমূহের যথাযথ অনুশীলন জরুরী। বাংলাদেশে সংঘটিত ইভটিজিংয়ের অধিকাংশ ঘটে রাস্তা ঘাটে, স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন গার্মেন্টসের সামনে অবস্থানকারী বখাটে উগ্র যুবকদের দ্বারা।

---

৩৩৩ প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৪৮৫৫

৩৩৪ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারি* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম প্রকাশ, ২০০৬), খ. ৫, পৃ. ৪৪৫

৩৩৫ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, বাবু আল-মাজালিম ওয়াল গাদাব, অনুচ্ছেদ: আফনিয়াতি আদদাউরি ওলজুলুসি ফীহা ওলজুলুসি আলাস সাউদাত (দামেশক: দারুত'কুন নাজাত, ১৪২২ হি.), হাদীস নং- ২৪৬৫। ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, বাবু আল-লিবাস ওয়ায যীনা, অনুচ্ছেদ: আন-নাহি আন জুলুসি ফী তুরুকাত ও ইতাইত তারিকি হাক্কাহু (বৈরুত: দারে ইয়াহইয়া আত তুরাস আল-আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং- ২১২১/১১৪। ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট, ২০০৬), খ. ৫, পৃ. ৪৭৯, হাদীস নং- ৪৭৪০

Dhaka University Institutional Repository

৮. জাহান্নামের আগুন অনেক বেশি উত্তপ্ত

হযরত সাফিয়্যা বিনতে শাইবা বলেন, 'আমরা আয়েশা (রা.)-এর কাছে বসা ছিলাম। কুরাইশ গোত্রের নারী এবং তাদের গুণাবলির প্রসঙ্গ আলোচনায় এল। তখন হযরত আয়েশা রা. বললেন, কুরাইশ বংশের নারীদের বিশেষত্ব অবশ্যই আছে, তবে আমি আনসারী নারীদের চেয়ে কিতাবুল্লাহর প্রতি অধিক বিশ্বাসী ও আস্থাশীল আর কাউকে দেখিনি। যখন সূরা নূরের এই আয়াত অবতীর্ণ হল- 'এবং তারা যেন তাদের বক্ষদেশে ওড়না জড়িয়ে রাখে' তখন তাঁদের পুরুষগণ নিজ-নিজ ঘর বাড়িতে তাদের স্ত্রী, কন্যা ও বোনদের গিয়ে এই আয়াত শোনালেন আর অমনি তারা বড় বড় চাদর দিয়ে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে ফেলল। এটা ছিল আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের নিষ্কম্প বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ।'

কিতাবুল্লাহর প্রতি আনসারী সাহাবিয়াগণের এই একনিষ্ঠ আনুগত্যের বর্ণনা দেওয়ার পর ড. মুহাম্মাদ আলী আল-হাশেমী বলেন, 'এবার আমি দামেস্ক ইউনিভার্সিটির একজন মুসলিম পর্দানশীন তরুণীর কথা বলব, যার অন্তরের অবিচল আনুগত্যও সেই মহান আনসারী সাহাবিয়াগণের সাথেই সাদৃশ্যপূর্ণ। তাকে একজন অতিথি সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিল, এই প্রচন্ড গ্রীষ্মের গরমে আপনি কীভাবে বোরকাবৃত থাকেন? আপনার কি গরম লাগে না? তরুণীটি এর উত্তরে কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেন- 'বলে দিন, জাহান্নামের আগুন এরচেয়ে অনেক বেশি উত্তপ্ত।' নিঃসন্দেহে এমন পবিত্রাত্মা মুসলিম নারীর মাধ্যমেই মুসলিম ঘরসমূহ আবাদ হয়, নতুন প্রজন্ম গড়ে ওঠে পবিত্র বৈশিষ্ট্যাদি নিয়ে এবং এদের মাধ্যমেই মুসলিমসমাজে জন্ম নেয় সমাজসংস্কারক কর্মবীর সন্তানেরা।'[৩৩৬]

৯. পোষাক যেন হয় শালীন

ইসলাম নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পর্দা প্রথা চালু করেছে। পর্দার অর্থ অবরোধ নয়। ইসলামে পর্দা অর্থ নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করে সম্মান-সম্ভ্রম নিয়ে আপন আপন কর্মক্ষেত্রে কাজ করা। মুমিন নারীদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে– মুর্খতার যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শণ করবে না।'[৩৩৭]

নারীর পোষাক যেন আঁটসাঁট ও উগ্র না হয় এবং ভাবভঙ্গি ও চালচলন যেন অশালীন না হয়–এ বিষয়ে হাদীসে সতর্ক করা হয়েছে। নবী (স.) বলেছেন, 'কতক নারী আছে যারা পোষাক পরেও নগ্ন, যারা (পরপুরুষকে) আকর্ষণকারী ও (পরপুরুষের প্রতি) আকৃষ্ট। যারা বুখতী উটের হেলানো কুঁজের মতো মাথা বিশিষ্ট। এরা জান্নাতের সুবাস পর্যন্ত পাবে না।'[৩৩৮]

পোশাকের ব্যাপারে ইসলামী বিধান

নারীর পোশাকের ব্যাপারে ইসলামী বিধি-বিধানের কয়েকটি হলো-

ক. ঢিলে ঢালা পোশাক পরিধান করা

সতর পরিমাণ ঢেকে থাকে এমন ঢিলে ঢালা পোশাক পরিধান করা;

খ. জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক না পরা

প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক না পরা; আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন: তারা যেন যা সাধারণতঃ প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে এবং তারা যেন তাদের মথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র,

---

৩৩৬ শাখসিয়্যাতুল মারআতিল মুসলিমা, পৃ. ৫১-৫২

৩৩৭ আল কুরআন, ৩৩ : ৩৩

৩৩৮ ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ: জুন ১৯৯৭, দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০০৩), খ. ৬, পৃ. ১৬১, হাদীস নং- ৫৩৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতিত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।'[৩৩৯]

গ. জাহিলিয়াতের ন্যায় নগ্নপোষাক না পরা

জাহিলিয়া যুগের ন্যায় নগ্ন কিংবা খাটো পোষাক না পরা। এ ব্যপারে মাহন আল্লাহ বলেন: 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে– মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শণ করবে না।'[৩৪০]

ঘ. পোষাক স্বচ্ছ পাতলা না হওয়া

পর্দার উদ্দেশ্য আবৃত করা এবং তাদনুযায়ী সাফল্যের জন্য পাতলা স্বচ্ছ কাপড় দ্বারা পর্দা তৈরী করা ঠিক হবে না। নামে মাত্র পর্দা আর বাস্তবতায় অনাবৃত এ হতে পারে না। এ ব্যাপারেও মহানবী (স.) এর নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমার শেষ জামানার উম্মতের নারীরা পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে উলঙ্গ মনে হবে, তাদের চুলের খোপাকে মনে হবে যেন বুখ্ত উটের কুঁজোর মতো সুউচ্চ। তাদের অভিশাপ দাও, কেননা তারা অভিশপ্ত।'[৩৪১]

পোষাক-পরিচ্ছদের শালীনতা সম্পর্কে বেশ কঠোর ছিলেন রাসুল (স.)। এ ক্ষেত্রে কোন ছাড় দিতেন না তিনি। যেমনটি আল্লাহ তায়ালাও দেবেন না। এ কারণেই রাসুল (স.) উপরোক্ত হাদীসটির ন্যায়ই আরেকটি হাদীসে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। 'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেছেন, জাহান্নামী দু'ধরনের। যাদের আমি (এখনও) দেখতে পাইনি। একদল লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে পেটাবে। আর একদল স্ত্রী লোক যারা, বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা, যারা অন্যদের আকর্ষণকারীনি ও আকৃষ্টা তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি তার খুশবুও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ বহুদূর হতে পাওয়া যাবে।'[৩৪২] এখানে বলা বাহুল্য যে, নারীর অশালীন পোষাক ও উগ্র চলাফেরা পুরুষকে অন্যায়ের প্রতি প্রলুব্দ করে এবং নারীকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। এভাবে তা উভয়ের ধ্বংস ডেকে আনে।

ঙ. পোষাক আঁটসাঁট না হওয়া

পর্দা ফেৎনা হতে বাঁচার রক্ষাকবচ। এটা আঁটসাঁট হলে নারী-পুরুষের দেহ গঠন প্রণালী প্রকাশিত হবে এবং তাতে পর্দার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এ প্রসঙ্গে উসামা ইবনু যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 'রাসূলূল্লাহ (স.) আমাকে একটি কুবতী মোটা আঁটসাঁট কাপড় পরার জন্য দিলেন, যা তাঁকে দাহ্ইয়া আল-কালবী (রা.) উপঢৌকন দিয়েছিলেন। আমি কাপড়টি নিয়ে আমার স্ত্রীকে পরার জন্য দিয়েছিলাম। রাসূলূল্লাহ (স.) তা জানতে পেরে বললেন: কী ব্যাপার, তুমি কুবতী কাপড়টি পরলে না? আমি জবাব দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.) আমি কাপড়টি আমার স্ত্রীকে পরার জন্য দিয়েছি। তখন রাসূল (স.) বললেন: তোমার স্ত্রীকে এ নির্দেশ দেবে, যেন সে এর নিচে একটি অন্তর্বাস পরে নেয়। কেননা আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এতে তার হাঁড়গুলোর আকৃতি বাহির থেকে ফুটে উঠতে পারে।'[৩৪৩]

---

৩৩৯ আল কুরআন, ২৪ : ৩১

৩৪০ আল কুরআন, ৩৩ : ৩৩

৩৪১ আবুল কাশেম সুলাইমান ইবনে আহমদ আত-তাবারানী, *মুজামুস সাগীর*, অধ্যায়: বাবুল হা', অনুচ্ছেদ: মান ইসমুহু হারুন (বৈরুত: মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫ হি.), হাদীস নং-১১২৫ '

৩৪২ ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরিফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৬১, হাদীস নং- ৫৩৯৭

৩৪৩ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, অধ্যায়: মুসনাদে আনসার, (দামেশক: মআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি.), হাদীস নং- ২১৭৮৬

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে আরও একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। রাসুল (স.) বলেছেন, যে নারী তার পরিবারের লোকদের বাইরে সুসজ্জিতা হয়ে ঠাক-ঠমকে চলে, তার উদাহারণ হলো, কিয়ামত দিবসের আঁধারের মত, সেদিন তার জন্য কোন আলো থাকবে না।'[৩৪৪]

চ. নারী-পুরুষের পোষাকে সাদৃশ্য না হওয়া

ইসলাম নারীদেরকে পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে বলেছে। বর্তমান সমাজে দেখা যাচ্ছে এমন কোন কোন নারী রাস্তায় বের হন যাদের পোষাক দেখলে তারা নারী না পুরুষ বোঝাই যায় না। নারীরা পুরুষের ন্যায় পোষাক পরিধান করার কারণে ইভটিজিংয়ের ঘটনাও অনেক বেশি ঘটে থাকে। এ ব্যাপারে হাদীসে এসেছে, 'হযরত ইবনে আববাস (রা.) বলেন, যে সকল নারী পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং যে সকল পুরুষ নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ (স.) তাদেরকে লানত করেছেন।'[৩৪৫]

ছ. মুসলিমের পোশাক বিজাতীয় পোষকের ন্যায় না হওয়া

মুসলমান মানেই আল্লাহর প্রিয় এবং খাঁটি বান্দা। তাদের আচার-আচরণ, পোষাক পরিচ্ছদই প্রমান করবে, পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানিত জাতি তারা। এ কারণে অন্য ধর্মের লোকদের ন্যায় মুসলামনের পোষাক যেন না হয়। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য (পোশাক-পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতিতে) রাখে, সে তাদের অন্তর্ভূক্ত।'[৩৪৬]

ন. যশ-খ্যাতির উদ্দেশ্যে পোশাক না পরা

পোশাক হবে শালীনতার প্রতীক এবং সাধারণ। পোশাক যেন যশ-খ্যাতির জন্য না হয়। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স.) ইরশাদ করেন: 'যে ব্যক্তি দুনিয়ার খ্যাতিজনক পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরিধান করাবেন, অতঃপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করে আগুনে জ্বালাবেন।'[৩৪৭]

সর্বোপরি ইসলাম নির্দেশিত পোশাকের বিধান অনুসারে হিজাব অনুশীলনের মাঝেই নারীর সঠিক মর্যাদা ও কল্যাণ নিহিত। বেপর্দার কারণেই নারী নির্যাতন, ইভটিজিং সমাজে আজ ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কুরআনের এ সুন্দর বিধানকে উপেক্ষা করে আজকের সমাজে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চাকুরীজীবীদের কর্মস্থল ইত্যাদিকে শালীনতা বিবর্জিত ও ইসলাম বিরোধী পোশাকের প্রচলন করা হয়েছে। যা ইভটিজিং এর মতো অনভিপ্রেত অপরাধ বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং ইভটিজিং বন্ধে ইসলামী পোশাক প্রচলন জরুরী। বাংলাদেশে সংঘটিত ইভটিজিং এর অধিকাংশই নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন ও অশ্লীল পোশাক পরিধানে কারণেই হয়ে থাকে।

১০. সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে যাওয়া যাবে না

সুগন্ধি মানুষের মধ্যে স্নায়ুবিক দুর্বলতা তৈরী করে। এটা এমন এক ধরনের বস্তু যা ব্যবহার করলে একে অপরের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। আর কোন নারী যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে বের হয় এবং কোন পথ দিয়ে গমন করে তাহলে সেই নারীর প্রতি কোন না কোন পুরুষ প্রলুব্ধ হবে- এতে কোন সন্দেহ নেই।

---

৩৪৪ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৪৪৭, হাদীস নং- ১১৬৮

৩৪৫ প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯১, হাদীস নং : ২৭৮৪,

৩৪৬ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১২৯, হাদীস নং- ৪০৫৩

৩৪৭ ইমাম ইবনে মাজাহ, *আস-সুনান*, প্রাগুক্ত, অধ্যায়: আল-লিবাস, অনচ্ছেদ: বাবু মান লাবিসা শুহরাতান মিনা লিবাসি (বৈরুত: দারে ইয়াহইয়া কিতাবুল আরাবীয়্যাহ, তা. বি.), হাদীস নং-৩৬০৭

Dhaka University Institutional Repository

এ কারণে নারীদের প্রতি সুগন্ধি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রাসূলল্লাহ (স.) বলেছেন, 'প্রত্যেক চোখ যিনা করে। আর কোনো নারী যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে কোনো মজলিসের পাশ দিয়ে যায় তাহলে সে এই... এই... অর্থাৎ সেও যিনাকারী (নযরের যিনার প্রতি বা যিনার প্রতি প্রলুব্ধকারী)।'[৩৪৮]
যেহেতু সুগন্ধি ইন্দ্রিয়গুলোকে উত্তেজিত করে, তাই মহানবী সা. মহিলাদেরকে খুশবু লাগিয়ে বাইরে বের না হবার হুকুম দিয়েছেন। ইবনুল আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, কোন মহিলা যদি সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর মানুষের পাশ দিয়ে হাঁটে, যাতে তারা তার সুঘ্রাণ পায়, তবে সেই মহিলা ব্যভিচারিনী।'[৩৪৯] সুতরাং ইভটিজিং বন্ধে ইসলামী অনুশাসন মেনে নারীর উচিত হবে সুগন্ধি ব্যবহার করে বাইরে বের না হওয়া।

১১. রাস্তায় নম্রভাবে নারীদের চলাচল

ইসলামী অনুশাসন হল নারীরা সাবধানতার সাথে রাস্তার একপাশ দিয়ে চলাচল করবে নম্র, ভদ্র ও শালীনভাবে। কিন্তু তারা যদি অহংকারের সাথে রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলাচল করে, তবে তাদের ইভটিজিং এর সম্মুখিন হওয়া অতি সাধারণ বিষয়। তাই ইসলামী অনুশাসন মানা খুবই জরুরী।
রাস্তায় হাঁটতে গেলেও নারীকে তার সম্মান ও মর্যাদার বিষয়ে বেশ সতর্ক থাকতে হয়। হাঁটতে গিয়ে যদি অসতর্ক হয় এবং সজোরে হাঁটা-চলা করে, তাহলে খারাপ মানুষকে বিষয়টা প্রলুব্ধ করে তুলবে এবং ইভটিজিংয়ের মত অপরাধ ঘটাবে। এ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তায়ালা সুন্দর নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন, 'তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারনা না করে। মুমিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও।'[৩৫০] নারী নুপুর পরতে পারে তবে তা হবে বাজনাবিহীন যেন সেই নুপুরের আওয়াজ শয়তানকে সাহায্য না করে। পরপুরুষকে প্রলুব্ধ না করে।

১২. পরপুরুষের সাথে আকর্ষণীয় স্বরে কথা না বলা

নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য ইসলাম বেশ কিছু সুন্দর বিধান নির্ধারিত করে দিয়েছেন। যেমন একজন পরপুরুষকে যে কোন সময় যে কোনভাবে প্রলুব্ধ করতে পারে একজন নারীর আকর্ষণীয় স্বরে কথা-বার্তা বলা। এতে যে কোন ধরনের ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। নারী নিগ্রহের প্রতিকার করার আগে সেই নিগ্রহ যাতে ঘটার সুযোগ না পায়, সেটা নিশ্চিত করার জন্যই কিছু মনস্তাত্বিক বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ বিধান জারি করে রেখেছেন।
এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করে আল্লাহ বলে দিয়েছেন, পরপুরুষের মনে যেন কোন নারীর প্রতি প্রলুব্ধ অনুভূতি সৃষ্টিকারী কোন ব্যাপার না ঘটে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা নারীদের (উম্মাহাতুল মুমিনীনকে) সম্বোধন করে বলেছেন- 'হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না। ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছ। তোমরা সঙ্গত কথা-বার্তা বল।'[৩৫১]
পরস্পরের লেনদেন যদি পর্দার আড়াল থেকে হয় এবং কথা বলার প্রয়োজনে যদি আকর্ষণীয় ও কোমল স্বরে কথা না বলে তাহলে কারো মনেই অন্যায়ের ইচ্ছা জাগবে না। এখানে শুধু পর্দার আড়াল থেকে লেনদেনই যথেষ্ট নয়, যে নারী মোবাইলে কথা বলছে তাকে তো পুরুষ দেখছে না কিন্তু এটুকু তো ফিৎনা থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট

---

৩৪৮ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১৯২, হাদীস নং : ২৭৮৬
৩৪৯ আবু আব্দুর রাহমান আহমদ বিন শুআইব আন-নাসাঈ, *আস-সুনান*, হালব: মাকাতাবাতু মাতবাআতু আল-ইসলামীয়্যাহ, ১৪০৬ হিজরী, হাদীস নং- ৫১২৬
৩৫০ আল কুরআন, ২৪ : ৩১
৩৫১ আল কুরআন, ৩৩ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

নয়; বরং কোমল স্বরে কথা বলা থেকেও বিরত থাকা জরুরী। এ বিষয়টিই আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কারণ নারীর কোমল স্বর স্বভাবতই পুরুষকে আকৃষ্ট করে। সুতরাং একথা ভাবার কোনো সুযোগ নেই যে, আমি তো পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলছি, সুতরাং যা বলি যেভাবে বলি কোনো সমস্যা নেই।

বর্তমান আধুনিক সমাজে মোবাইলের অপব্যবহারের ফলে এই সমস্যা অহরহ ঘটছে। সুন্দর কণ্ঠে প্রলুব্ধ হয়ে অনেক নারীর প্রতিই পুরুষরা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং ছলে-বলে কৌশলে সেই নারীর সঙ্গে গোপনীয়, অবৈধ সম্পর্ক তৈরী করছে। যে কারণে সে ধরনের নারীর সতীত্বহানি ঘটনা ঘটারও অসংখ্য নজির সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিনই এ ধরনের ঘটনা এখন শোনা যাচ্ছে। আল্লাহর দেয়া এই বিধান বাস্তবায়ন করা হলে এমন ঘটনা ঘটার কোন সম্ভাবনাই ছিল না।

মোটকথা নারী বা পুরুষ সকলকেই এমন সব কথা বা কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে, যা অন্যায়ের প্রতি প্রলুব্ধ করে। এবার যার মাঝে আল্লাহর ভয় আছে এবং যে নিরাপদ থাকতে চায় সে নিজেই বলতে পারবে, তার কোন কাজ থেকে বেঁচে থাকা উচিত এবং কোন কাজ কীভাবে করা উচিৎ। নতুবা, আল্লাহ তায়লা কর্তৃক শাস্তি নির্ধারিত। এ শাস্তি থেকে বাঁচার কোন সুযোগ বান্দার নেই।

১৩. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন

ইভটিজিং যেহেতু একটি সামাজিক সমস্যা। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের মাঝে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাস্তবতার তুলনায় তারা অনেক বেশি আবেগ তাড়িত হয়েই মূলত এ সকল ঘৃণ্য কাজ করে। সেহেতু, তাদের সামনে যদি 'ইসলামী অনুশাসন' শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায়, তাহলে ইভটিজিং বন্ধে তা হবে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়: NCTB অনুমোদিত ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর সিলেবাসে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষা একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর প্রথম পত্র বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে 'ইভটিজিং প্রতিরোধের ধর্মীয় অনুশাসন' অন্তর্ভুক্তি। শুধু একদশ-দ্বাদশ শ্রেনী নয়, শিশুকাল থেকেই ইসলামী নৈতিক শিক্ষা যদি বাস্তসম্মতভাবে প্রতিটি শিশুকে দেওয়া যায়, তাহলেই এ ক্ষেত্রে ভালোমানের সুফল পাওয়া সম্ভব। এ জন্য সকল শ্রেনীতেই ইসলামী শিক্ষার অপরিহার্য একটি বিষয়ই থাকা জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৪. ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা

বর্তমান সমাজে প্রচলিত অপসংস্কৃতি মূলতঃ ইভটিজিং-এর প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। সুতরাং ইভটিজিং বন্ধ করতে হলে পশ্চিমা ও ভারতীয় অপসংস্কৃতির বিপরীতে ইসলামী সংস্কৃতির উপর জোর দেয়া জরুরী। ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক পর্যায়ে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা চালু করা হলে, মানুষের মন-মানসিকতায়ও ব্যাপক পরিবর্তণ আসতে বাধ্য। মানুষ মানুষকে সম্মান করতে শিখবে। নারীর যথার্থ সম্মান কিভাবে দিতে হয় সেটা জানবে। সর্বোপরি, ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার ফলে মুসলমানদের হৃদয়ে আল্লাহর ভয় জাগরিত হবে। যেখান থেকে ইভটিজিংসহ সকল অপরাধ সংঘটন থেকে বিরত থাকবে মানুষ। নারী নির্যাতন তো তখন কল্পনাই করা যায় না।

রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা জোরদারকরণে 'ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' যথার্থ প্রতিষ্ঠান। ইসলামী সংস্কৃতি বাস্তবায়নে এ প্রতিষ্ঠানের আরো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং ভুমিকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে কয়েকটি পদক্ষেপ তারা নিতে পারে। যেমন–

* সরকারী উদ্যোগে ইসলামীক টেলিভিশিন ও বেতার চ্যানেল প্রতিষ্ঠা;
* সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চালু করা;
* দেশের চলমান টেলিভিশন ও বেতারগুলোকে ইসলামাইজেশন করার উদ্যোগ গ্রহণ;

Dhaka University Institutional Repository

* এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন ইসলামী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গঠন।
* ইসলামীক শিক্ষা অর্জণ করে যেন মানুষ একটি বসবাসযোগ্য, যথার্থ পরিবেশ তৈরী করতে পারে, যেখানে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা করা সম্ভব, সে লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে সুপারিশমালা তৈরী করা এবং সেই সুপারিশের আলোকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। যাতে করে, এই সমাজ একটি নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। ব্যক্তি মাত্রই যেন ন্যায়-নীতিবান এবং যথেষ্ট আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

১৫. পরিবার প্রথা ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ

আধুনিক সমাজ যান্ত্রিক উন্নতিকে আত্মস্থ করতে গিয়ে নৈতিকতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করছে। পশ্চাত্যের অধিকাংশ মানুষ 'Living together' পন্থাকে বিয়ের (Marriage) বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছে। যা দেখে আমাদের কোমলমতী তরুণ-তরুণীরা ইভটিজিং-এ উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। অথচ ইসলাম অভিভাবকদের নির্দেশ দিয়েছে পরিণত বয়সে ছেলে-মেয়েদেরকে বিয়ের ব্যবস্থা করতে। এ ব্যপারে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ন, তাদেরও।[৩৫২]

এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (স.) এর হাদীস, 'আলক্বামাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন: হে যুবক সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করতে সক্ষম, তারা যেন বিবাহ করে নেয়। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম, সে যেন রোযা রাখে। কেননা, রোযা তার যৌন ক্ষুধাকে অবদমিত রাখে।'[৩৫৩]

১৬. চারিত্রিক উন্নতি সাধন

মূলত চারিত্রিক অবক্ষয়ের করণেই সমাজে ইভটিজিং এর ন্যায় ভয়াল সামাজিক অপরাধ নেমে এসেছে। তাই ইভটিজিং প্রতিরোধে যে কাজটি সবার আগে করতে হবে তা হলো- ব্যক্তি চারিত্রের উন্নতি সাধন। ইসলামী জীবনাদর্শে চারিত্রিক উন্নতি সাধন একটি মহৎ গুণ। নবী (স.) চারিত্রিক উন্নতির পূর্ণতা সাধন করতেই এ পৃথিবীতে আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'মহান নৈতিক গুণাবলী পরিপূর্ণ করার জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।'[৩৫৪]

১৭. নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত জাতি গঠন

মানুষ জন্মগতভাবেই নৈতিক জীব। নৈতিক জীবনবোধ মানুষকে ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত, নীতি-দুর্নীতি, পাপ-পুণ্য সম্পর্কে সচেতন করে, প্রেরণা যোগায়, ভালো হতে সাহায্য করে। ধর্মই নৈতিকতা শিক্ষা দেয়। 'নৈতিকতা'র ইংরেজী প্রতিশব্দ Morality, যা এসেছে Morals থেকে। এর অর্থ হলো: আচর-ব্যবহার, রীতি-নীতি বা (Customs) প্রথা। আরবী প্রতিশব্দ হচ্চে খুলুক (Khulq), বহুবচন (Akhlaq) আখলাক। আসল ও প্রকৃত উৎস। ধর্মের বাঁধন শিথিল হয়ে গেলে কিংবা ধর্মের শিক্ষা ও নির্দেশনা ভুলে গেলেও মানুষ তার সামাজিক পরিমণ্ডলের উচিত-অনুচিতবোধ থেকে নৈতিক অবস্থান তৈরি করে নেয়; যা সর্বাত্মক ও পরিপূর্ণ নয়। কেননা, আল্লাহ প্রদত্ত তথা স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত নীতিমালা ও বিশ্বাসই মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণের চালিকাশক্তি। ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন মানব জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ উন্নয়ন ও পরিত্রাণ সম্ভব নয়।

---

[৩৫২] আল কুরআন, ২৪ : ৩২
[৩৫৩] ইমাম বুখারী, *বুখারী শরীফ*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ২৭, হাদীস নং- ৪৬৯৪
[৩৫৪] আবু মুহাম্মদ আব্দল্লাহ বিন ওয়াহাব বিন মুসলিম, *আল জামে*, (মিশর: দারে মাকতাবা হাসান হুসাইন, ১৪৬১.), হাদীস নং- ৪৮৩

Dhaka University Institutional Repository

এজন্যই সত্য ধর্মাশ্রিত নৈতিক শিক্ষা মানব জীবনের জন্য অপরিহায্য। ইসলাম ধর্মই নৈতিকতা শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। সুতরাং একজন মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে নৈতিকতার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে।
রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, নৈতিকতার বিচারে যে ব্যক্তি উত্তম, মু'মিনদের মধ্যে সে ব্যক্তিই পূর্ণতম ঈমানের অধিকারী।'[৩৫৫]
ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নৈতিক অবক্ষয়ের কারণেই মূলতঃ সমাজে ইভটিজিং-এর ন্যায় ভয়াল সামাজিক অপরাধ নেমে এসেছে। তাই জাতিকে এ নৈতিক অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে হলে যে কাজটি অত্যান্ত গুরুত্বের সাথে করতে হবে, তা হলো- জাতিকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স.) জাতিকে নৈতিক শিক্ষায় সুন্দররূপে গড়ে তুলতেই এ পৃথিবীতে মহান শিক্ষকরূপে আগমন করেছিলেন।

১৮. মাদকাসক্তি দূরীকরণ

মাদকাসক্তি মানব বিবেক-বুদ্ধি ও মস্তিষ্কের ওপর মারাত্নক ও ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। মস্তিষ্কের করটেক্স বা উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তির স্তরে নিস্তেজ হয়ে যায়; ফলে মদপানকারী মাতাল হয়ে পড়ে। লজ্জা-সংকোচ কমে যায়, কথাবার্তা বেশি বলে, এমনকি অনেক গোপন তথ্যও বের হয়ে পড়ে। কথাবার্তা জড়িয়ে যায়, এক পর্যায়ে চেতনা হারায়। মাদকাসক্তি মানুষকে শুধু মানবতা ও নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপের দিকেই উদ্বুদ্ধ করে না, এটা মানুষকে যাবতীয় মন্দ ও ঘৃণ্যতর পাপ কাজের দিকেও ধাবিত করে। এটা মানুষকে চিত্তবিভ্রম, অস্থির ও উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে। ব্যভিচার, নরহত্যা, ছিনতাই, রাহাজানি, সড়ক দুর্ঘটনা ও নির্যাতনের মত জঘন্যতম অপরাধের অধিকাংশই মাদকাসক্তিরই পরিণাম। রাসূলুল্লাহ সা. বলেন, 'মদ সকল অপকর্মের জননী।'[৩৫৬] সুতরাং ইভটিজিং প্রতিরোধ করতে হলে অবশ্যই সমাজ থেকে মাদকাসক্তি দূর করতে হবে।

১৯. আল্লাহর আদেশ শিরোধার্য

আল্লাহ সূরা আহযাবের পর্দা বিষয়ক আয়াতের পর বলছেন- 'আল্লাহ ও তার রাসূল কোনো কাজের আদেশ করলে কোনো ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টায় পতিত হয়।'[৩৫৭]

কন্যা শিশু হত্যা ইসলামে নিষিদ্ধ

ইসলাম–পূর্ব আরবে যখনই কোনো কন্যাশিশু জন্মলাভ করত, তাদের বেশিরভাগকেই জীবন্ত পুঁতে ফেলা হতো। ইসলামের আগমনে এ প্রথা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই যুগেও জাহেলি যুগের প্রথা চালু রয়েছে। পত্রিকার পাতায় ওল্টালেই দেখা যায়, কন্যা জন্মদানের অপরাধে মা-মেয়েকে হত্যা করেছে পাষণ্ড বাবা। কিংবা পাচারকারীর কবল থেকে বিপুল সংখ্যক নারী–শিশু উদ্ধার, এ ধরণের সংবাদ।
জাহেলি যুগের কন্যা সন্তানের জীবন্ত কবর, হিন্দু সমাজে নারীর সহমরণ ও সতীদাহ প্রথা আজও বিবেকবান মানুষকে শিহরিত করে। কন্যা সন্তান জন্ম হওয়া জাহেলি যুগে ছিল যেন অভিশাপ। তাই কন্যা সন্তান জন্ম হওয়া মাত্রই তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। এ কাজকে তারা মনে করত সম্মানজনক। পিতা নামের নর পশুদের নিকটে ওই সন্তানের আত্মচিৎকার তার পাষাণ হৃদয়ে কোন দয়ার উদ্রেক করত না। জাহেলী আরবরা তাদের কন্যা

---

৩৫৫ ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আবওয়বুল রিদা, (মিশর: শিরকাতু মাকতাবাতু মাতবাআত মুসতাফী আল বালী আল হালী, ১৩৯৫ হি.), হাদীস নং- ১১৬২

৩৫৬ আবুল হাসান আলী দারে কুতনী, *আস-সুনান*, অধ্যায়: আল-আসরিবাতি ওগাইরিহা, (বৈরুত: মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৪ হি.), হাদীস নং- ৪৬১৩

৩৫৭ আল কুরআন, ৩৩ : ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান জন্ম হওয়াকে সামাজিকভাবে নীচু ও হীন ন্যক্কারজনক ঘটনা বলে মনে করত। যার জন্য পিতা-মাতা তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অতি আদরের সন্তানদের জীবন্ত কবর দিতে দ্বিধা করত না। এছাড়াও সেই যুগে নারীকে হেসে খেলে হত্যা করা হতো, পাথর ছুড়ে, জীবন্ত কবর দিয়ে, মাটিতে পুঁতে নারীদেরকে হত্যা করা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। তাদের হত্যা করলে কোন জবাবদিহি পর্যন্ত করতে হতো না।

এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হচ্ছে, 'যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে সে তাকে থাকতে দেবে নাকি মাটির নীচে পুঁতে ফেলবে? শুনে রাখ তাদের ফায়সালা খুবই নিকৃষ্ট।[৩৫৮]

জাহেলী যুগে যে এমন ঘটনা প্রচলিত ছিল সেটা জানা যায় এ প্রসঙ্গে আবু দাউদ শরিফে বর্ণিত হাদীসে। যেখানে জনৈক সাহাবি তাঁর ইসলাম গ্রহণপূর্বের একটি নৃশংস ঘটনার বর্ণনায় বলেন 'আমি আমার আদরের ছোট্ট মেয়েটিকে পুঁতে ফেলার জন্য ফুসলিয়ে অনেক দুরে নিয়ে গেলাম। সেখানে আমি একটি গর্ত খুঁড়তে শুরু করে দিলাম। মেয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করছিল, আমি কেন গর্ত খুঁড়ছি। কোন জবাব না দিয়ে গর্ত খুঁড়ে যেতে থাকলাম। ওই সময় মাটি এসে আমার দাড়িতে লাগছিল, আর মেয়ে আমার দাড়ি থেকে সেই মাটি পরিস্কার করে দিচ্ছিলো। অবশেষে গর্ত খোঁড়া শেষ হলে আমি তাকে সেখানে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দিতে শুরু করলাম। সে তখন আব্বা! আব্বা! বলে চিৎকার করছিল। আমার পাষান হৃদয় কিছুতেই গললো না। আমি তার মুখের ওপর পাথর নিক্ষেপ করলাম এবং মাটি চাপা দিয়ে চলে আসলাম। ঘটনা শুনে রাসুল (স.) খুব কাঁদছিলেন এবং এতটাই যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি মোবারক ভিজে যাচ্ছিল।'

অন্য একটি হাদীসেও কন্যা শিশুদের প্রতি জাহেলী যুগের নৃশংসতার কথা প্রকাশ পেয়েছে। 'হযরত কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তামিম গোত্রের প্রধান নেতা ইসলাম গ্রহণ করার পর আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (স.), আমার নিজ হাতে আটটি কন্যা সন্তান জীবিত অবস্থায় মাটির নীচে পুঁতে ফেলেছি। তিনি বলেন, হে কায়েস প্রতিটি কন্যা সন্তানের কাফফার হিসেবে একটি করে গোলাম আযাদ করে দাও। সাহাবী আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (স.) আমার নিকট উট আছে। তিনি বললেন, প্রতিটি কন্যা সন্তানের কাফফারা হিসেবে একটি করে উট কুরবানী কর। (তাফসীরে ইবনে কাসীর এবং তাফসীরে ইবনে জারীর)।[৩৫৯]

আজও বিভিন্ন উপায়ে কন্যা শিশুকে হত্যা করা হয়। ভারতের মত প্রগতিশীল বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে কন্যা শিশু হত্যার ঘটনা ঘটে থাকে সবচেয়ে বেশি। শুধু কন্যা শিশু হত্যা নয়, বর্তমানে ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে কন্যা ভ্রূণ ধ্বংস করা হচ্ছে। চীন, ভারত, পাশ্চাত্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গর্ভপাতকে বৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কন্যাসন্তানের পিতা যৌতুক ও নারী নির্যাতনের নির্মম বলি থেকে ভবিষ্যতে মেয়ে সন্তানকে রেহাই দেয়ার জন্য ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে পরিচয় জেনে কন্যা ভ্রূণকে আগেই হত্যা করছে। আর সেখানে প্রচার করা হচ্ছে 'Pay 500 rupees and save 5,00,000!' অথ্যাৎ, ৫০০ রুপি খরচ করুন এবং ৫ লাখ রুপি বাঁচান। ৫০০ রুপি দিয়ে আলট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে মাতৃগর্ভের শিশুটি ছেলে না মেয়ে জানার জন্য মূলতঃ এই প্রচারপত্র। মেয়ে হলে মায়ের গর্ভেই তাকে হত্যা করে ফেলা হচ্ছে। এমনও শোনা যায়, ভারতে যদি কোনভাবে একটি কন্যা শিশু ভুমিষ্ঠ হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে লবন কিংবা চুন– এমনভাবে মেখে দেয়া হয়, যাতে ছটফট করতে করতে সাথে সাথে তার মৃত্যু নিশ্চিত হয়। কন্যা হয়ে জন্মালো কেন, এটাই তার অপরাধ। সে অপরাধের শাস্তিই এভাবে দেয়া হয় নবজাতককে।

---

৩৫৮ আল কুরআন, ১৬ : ৫৮-৫৯

৩৫৯ মাওলানা ইকরামুল্লাহ জান কাসেমী, অনু: মাওলানা হায়াত মাহমুদ জাকির, *ইসলামে শিশু প্রতিপালন* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ২০০৭), পৃ. ৭৩-৭৪

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে পিতা-মাতার বুক ফাঁটা চাপা আর্তনাদ, অপর দিকে ঘৃণ্য বর্বর সামাজিক প্রথায় লোকলজ্জার ভয়ে স্নেহতুল্য কন্যাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া- এ যেন পৃথিবীর মুক্ত হাওয়াকে ভারী করে তুলেছিল। আর সে বিষাক্ত ও অমানবিক প্রথা বন্ধ করার যখন কেউ ছিল না। এমনি এক সময়ে মানবতার মুক্তির বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হলেন হযরত মুহাম্মাদ (স.)। রাসূল (স.) প্রবর্তিত ইসলাম কখনওই কন্যা ও নারীদের প্রতি পৈশাচিক মনোভাব সমর্থন করে না। ইসলাম সব ধরনের হত্যাকাণ্ডের ঘোর বিরোধী। তারপরও আলাদাভাবে নারী শিশুকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। 'যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল'?[৩৬০] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পুত্র-সন্তান কি তোমাদের জন্যে এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য?'[৩৬১]

ইসলামই কেবল সকল যুগের সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নির্ভিক প্রতিবাদ শুরু করে। মিথ্যা অহংকারের বেড়াজাল ছিন্ন করে পুরুষের পাশাপশি নারী জাতিকেও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ছেলে সন্তানের মতো কন্যা সন্তানেরও বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলাম কন্যা সন্তান হত্যার প্রাচীন প্রথাকে প্রচণ্ডভাবে নিন্দা করেছে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে- 'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে (কন্যা সন্তানদের) হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।[৩৬২]

অনেকেই জেনে হোক কিংবা না জেনে হোক, সন্তানদেরকে হত্যা করার মত জঘণ্য কাজ করে ফেলেন। আল্লাহ এ ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'নিশ্চয় তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, যারা নিজ সন্তানদেরকে নির্বুদ্ধিতাবশতঃ কোন প্রমাণ ছাড়াই হত্যা করেছে।'[৩৬৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ (স.) সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি।? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহর শরীক করা। অথচ তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনটি? হুজুর (স.) বললেন, তোমার সাথে খাওয়ায় ভাগ বসাবে এ ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কোনটি? নবী (স.) বললেন, আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যেনা করা। অতঃপর, আল্লাহ তায়ালা নবী (স.) এর কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করে নাযিল করেন, 'এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না।'[৩৬৪] এই হাদীসে– খাওয়ায় ভাগ বসানোর মানে হলো, খাদ্যাভ্যাবের আশংকায় সন্তান হত্যা, ভ্রুণ হত্যা একই কথা এবং সমান গুনাহ।[৩৬৫]

সন্তান হিসেবে ছেলে মেয়ে উভয় সমব্যবহারের অধিকারী, এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার ব্যবধান সৃষ্টি করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূল (স.) এরশাদ করেছেন, 'তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় কর এবং সন্তানদের ব্যাপারে ইনসাফ কায়েম কর। মেয়েদের প্রতি অবহেলা করে ছেলেদেরকে অধিকতর গুরুত্বদান ইসলামে নিষিদ্ধ। সকল সন্তানের প্রতি সমব্যবহার করা পিতা-মাতার উপর অবশ্য কর্তব্য।'

হাদীসে বর্ণিত নিম্নোক্ত ঘটনা দ্বারা এ বিষয়টি আরও বেশি প্রমাণিত। 'হযরত আনাস ইবন মালেক (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূল (সা) এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। তার শিশু পুত্র তার নিকট এল। উক্ত সাহাবী

---

৩৬০ আল কুরআন, ৮১ : ৮-৯

৩৬১ আল কুরআন, ৫৩ : ২১

৩৬২ আল কুরআন, ৭ : ৩১

৩৬৩ আল কুরআন, ৬ : ১৪০

৩৬৪ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৪৪, হাদীস নং- ৫৫৬৬ ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. ৩২২, হাদীস নং- ২৩০৪

৩৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪, ৫৫৬৬ নং হাদীসের পাদটীকা।

Dhaka University Institutional Repository

তাকে চুম্বন করলেন এবং কোলে বসালেন। একটু পরে তার কন্যা এলো। তাকে তিনি তার সামনে বসালেন। তখন রাসুল (সা.) সাহাবীকে বললেন, তোমার কি উচিত ছিল না দুজনের প্রতি সমান আচরণ করা?'[৩৬৬]

জাগতিক স্বার্থের মোহে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে মানুষ সাধারণত: পুত্র সন্তান হলে আনন্দিত হয়, কন্যা সন্তান হলে অসুন্তুষ্ট হয়। ইসলাম এ হীন ও সংকীর্ণ মনোভাব দূর করতে উপদেশ দিয়েছে। বরং পুত্র সন্তানের তুলনায় কন্যা সন্তানকে পরকালের মুক্তির অন্যতম উপায় হিসেবে ঘোষনা করেছে। কেননা কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করায়, তাকে সৎ ও সুশিক্ষা দেয়ায়, বয়:প্রাপ্ত হলে সৎ পাত্রে পাত্রস্থ করায় এবং পরবর্তীকালে তার খোঁজ খবর নেয়া ও দেখাশুনা করায় পিতার জাগতিক কোন স্বার্থ থাকে না। উপরন্তু অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

বিশ্বনবী রাসূল (স.) বলেন, 'যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান আছে, সে যদি তাকে জীবন্ত প্রোথিত না করে, তাকে অপমান লাঞ্চিত না করে এবং পুত্র সন্তানদের প্রতি তার তুলনায় অধিক গুরুত্ব না দেয়, তা হলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন।'[৩৬৭] এই হাদীস দ্বারা, কন্যা সন্তানের জন্ম যে একটি দুর্ঘটনা, একটা অবাঞ্চনীয় ব্যাপার তাদের মন-মগজ থেকে এ হীন চিন্তাকে রাসূল (স.) নির্মূল করে দিয়েছেন।

এমনকি বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্তা কন্যার যদি দেখা-শুনা বা নিরাপত্তা বিধান করার কেউ না থাকে এবং পিতার গৃহে অসহায় অবস্থায় ফিরে আসে, তা হলে পিতা অম্লানবদনে তাকে গ্রহণ করে তার সকল দায়িত্ব পালন করবে। এ সম্পর্কে রাসূল (স.) বলেছেন, 'আমি কি তোমাকে সর্বোত্তম সদকার কথা বলবো না? তোমার যে কন্যা তোমার কাছে ফিরে আসে অথচ তুমি ব্যতীত তার উপার্জনের কেউ নেই।'[৩৬৮] অর্থাৎ এ অবস্থায় তার ভরণপোষণসহ সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা পিতার পক্ষে সর্বোত্তম সদকা।

যত্ন ও স্নেহের সঙ্গে একজন মেয়েকে প্রতিপালন করার জন্য তার অভিভাককে রাসূল (স.) উৎসাহিত করেছেন নানান ভঙ্গিমায়। রাসূল (স.) বলেন, 'যদি একটি পরিবারে একের পর এক মেয়ে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে এবং পিতামাতা যদি মেয়েদের যত্ন ও স্নেহের সঙ্গে প্রতিপালন করে তবে মেয়েরা পিতামাতাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করবে।'

অপর এক হাদীসে এসেছে, 'আনাস (রা.) থেকে বর্নিত, নবী সাল্লালাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি দুটি মেয়েকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন–পালন করল, সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি ও সে এরকম একত্রে থাকব। তিনি তার আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।[৩৬৯]

শুধুমাত্র নিজের মেয়ে নয়, বোনদের লালন-পালন করার ব্যাপারে ইসলামে সুন্দর নির্দেশনা এসেছে। যাতে কোন কোন বোন অনাকাংখিতভাবে অভিভাবকহীন হয়ে না পড়ে, 'রাসূল (স.) বলেন, কেউ যদি দুই-তিনজন মেয়ে অথবা বোনকে লালন-পালন করে, তাদেরকে শিষ্টাচার শেখায়, তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করে ও তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে, তবে তার জন্য জান্নাত রয়েছে।'[৩৭০]

কন্যা সন্তান উত্তমরূপে লালন-পালন করার অর্থই হলো, কাল কিয়ামতের দিন ওই ব্যক্তির সামনে সেই কন্যাগণ জাহান্নামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। এ ব্যাপারটিই এসেছে পবিত্র হাদীসে, 'হযরত আয়েশা রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে এক মহিলা আসল এবং তার সাথে দুটি মেয়েও ছিল। সে কিছু চাইল কিন্তু আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি খেজুরটি তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই কন্যার মধ্যে বন্টন করল, কিন্তু সে নিজে তা থেকে খেল না। অতঃপর উঠে চলে গেল। নবী (স.) আমাদের কাছে আসলে আমি তাঁকে ব্যাপারটি অবহিত করলাম। তিনি বললেন : যে ব্যক্তি এই রূপ কন্যা সন্তানদের নিয়ে

---

[৩৬৬] মাওলানা ইকরামুল্লাহ জান কাসেমী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[৩৬৭] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ. ১৩, পৃ. ৩৫৭৮, হাদীস নং ৪৪৮০

[৩৬৮] ইমাম ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনু মাজাহ*, কিতাবুল আদাব, পৃ. ২৬৯

[৩৬৯] ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৪, দ্বিতীয় সংস্করণ: মে ২০০৩), খ. ৭, পৃ. ১৪৪, হাদীস নং- ৬৪৫৬

[৩৭০] ইমাম তিরমিযী, *জামে আত-তিরমিযী* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: জুন, ১৯৯২), খ. ৪, পৃ. ৩৬৬, হাদীস নং- ১৯১৮

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষার সম্মুখীণ হবে এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তারা (কিয়ামতের দিন) তার জন্য জাহান্নামের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।[৩৭১]

নারী ও শিশু পাচার রোধে ইসলামের ভূমিকা

পাচার শব্দটি বর্তমানে বেশ সুপরিচিত একটি পরিভাষা। মানব পাচার, নারী ও শিশু পাচার এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। পাচার বলতে এক শ্রেণির অসাধু ও দুষ্টচক্রকে বুঝায়। যারা অর্থের লোভে মানবতাকে বিসর্জন দিয়ে তাদেরকে ফুসলিয়ে বা অচেতন করে ভিনদেশে পাচার করে দেয়। পরবর্তীতে তাদেরকে হত্যা করে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চড়ামূল্যে বিক্রি করা হয় অথবা তাদেরকে অনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হয়।

নারী পাচার আমাদের দেশে একটি বিশাল সমস্যা। পাচার চক্রের সদস্যরা ছলে বলে কৌশলে কিংবা ফুসলিয়ে নারীদেরকে বিভিন্ন দেশে মোটা অংকের বিনিময়ে পাচার করে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাচারকৃত এসব নারীদেরকে জোরপূর্বক দেহ ব্যবসা ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত কাজে ব্যবহার করা হয়। এসব অত্যন্ত ঘৃণ্য, জঘন্য ও নিন্দনীয় কাজ। পাচার একটি পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়। বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। এটা বাংলাদেশের একটি জাতীয় সমস্যা, যার দ্রুত নিষ্পত্তি ও অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ইসলাম মানব পাচারকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব পাচার সংশ্লিষ্ট সব ধরনের কাজ হারাম। মানব পাচার একটি প্রতারণামূলক কাজ। প্রতারণার মাধ্যমে পাচারকারীরা মানুষকে ক্ষতিকর ও সমাজবিরোধী কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করছে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করে বলেন, 'যারা মন্দ কাজের চক্রান্তে লেগে থাকে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।'[৩৭২]

প্রতারনার মূল বিষয়ই হলো মিথ্যা। মিথ্যা কথা দিয়ে মানুষকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে পাচার করে থাকে দুস্কৃতিকারীরা। সুতরাং, মিথ্যা যে কত বড় ক্ষতিকর এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী সেটা বোঝাই যাচ্ছে। এ কারণে বলা হয়ে থাকে, 'মিথ্যা বলা মহাপাপ।' আল্লাহর রাসুলও (স.) এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, 'হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (স.) কবীরা গুনাহ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যচরণ করা, মানুষ হত্যা করা এবং মিথ্যা বলা (কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত)।'[৩৭৩]

উক্ত আয়াতের আলোকেই বলা যায়, ইসলাম মানব পাচারকে হারাম ঘোষণা করেছে এবং পাচারকারীদের কঠিন শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম মানব পাচারকারীদের কোনো অবস্থাতেই ক্ষমা করে না, তাদের অবশ্যই ইহকাল ও পরকালে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইসলাম মানবাধিকার লঙ্ঘন ও যেকোনো রকম মানবতাবিরোধী নির্যাতন প্রতিরোধে সোচ্চার। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব পাচার সংশ্লিষ্ট সব ধরনের কাজই হারাম। অনেক সময় পাচারকারীরা বিভিন্ন প্রলোভন দেখায়, যাতে নারী বা শিশুর অভিভাবক নিজেদের সন্তানকে স্বেচ্ছায় তাদের হাতে তুলে দেয়, কিন্তু সে আর ফিরে আসে না। পাচারকারী চক্র আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষের স্বাধীনতা হরণ করার পাশাপাশি তাদের বিশ্বাসের চরম অবমাননা ও অবমূল্যায়ন করে থাকে। এর চেয়ে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি আর কী হতে পারে? হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এর চেয়ে

---

৩৭১ ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৪৪১-৪৪২, হাদীস নং- ৫৫৬০। ইমাম মুসলিম, *মুসলিম শরীফ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০৩), খ. ৭, পৃ. ১৪৩, হাদীস নং- ৬৪৫৪

৩৭২ আল কুরআন, ৩৫ : ১০

৩৭৩ ইমাম তিরমিযী, *জামে আত তিরমিযী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩৬২, হাদীস নং- ১১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

বড় বিশ্বাসঘাতকতা আর কিছুই নেই যে, তুমি এমন ব্যক্তির সঙ্গে মিথ্যার আশ্রয় নেবে, যে তোমাকে বিশ্বাস করে।'

পাচার হওয়া অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের বিপদ-আপদে পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, 'আর তোমাদের কী হলো যে তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে জনপদ থেকে নিস্কৃতি দান কর; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী। আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও।'[৩৭৪]

মানব পাচারের পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নেই, বরং অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জনই পাচারকারীদের মূল লক্ষ্য। তা ন্যায় পথে হচ্ছে কি অন্যায় পথে, সেটিকে তারা বড় করে দেখে না। তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) যথার্থই সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'মানবজাতির কাছে এমন একটি সময় আসবে, যখন মানুষ কামাই-রোজগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোনো বাচ-বিচার করবে না।'[৩৭৫]

যে সব উদ্দেশ্যে নারী ও শিশু পাচার করা হয়, ইসলাম সেসব গর্হিত কাজকে সমর্থন করে না। পাচারের শিকার হওয়া মানুষকে পাচারকারীরা বিদেশে বিভিন্ন অমানবিক কাজে নিয়োগ করছে। যেখানে পাচার করা ব্যক্তির মানবাধিকার বা কোনো স্বাধীনতা থাকে না। পাচারকারীরা নারী ও শিশুদের সাধারণত যেসব অবৈধ কাজে নিয়োজিত করে, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শরিয়তসম্মত নয়। পাচারকৃত মানবসন্তানকে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, নারীদের পতিতাবৃত্তি বা অশ্লীল পর্নো ছবি তৈরির অসৎ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। শিশুদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম, যেমন, উটের জকি, অঙ্গহানি করে ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি, ছিনতাই, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে বাধ্য করা হয়।

এসব কাজ ইসলামে অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানব পাচারকে নারী ও শিশুর জন্য অমানবিক নির্যাতন হিসেবে দেখা হয়। কারণ, তারা যৌনতা, দাসত্ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেচাকেনার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এবং এটি মানুষের সহজাত ইচ্ছার বিরুদ্ধে মারাত্মক জুলুম বটে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'যারা মানুষের ওপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায় (মানবতা বিরোধী কাজ) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।'[৩৭৬]

নারীর আত্মহত্যা প্রতিরোধে ইসলাম

ইসলাম মানুষকে কেবল অন্যায়ভাবে একে অপরকে হত্যা নিষিদ্ধ করেনি। বরং আত্মহত্যাও নিষিদ্ধ করছে। অথচ, বর্তমানে সামান্য কারণেও মানুষ আত্মহত্যা করছে। মানসিক অবসাদ, যৌতুক বা অন্য কোনো কারণে পারিবারিক কলহ বা নির্যাতন, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, হতাশা ও অতিরিক্ত আবেগপ্রবণতার কারণেই বেশির ভাগ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন মনোবিজ্ঞানীরা। নারীদের ক্ষেত্রে যৌতুকের জন্য নির্যাতন, পারিবারিক কলহ, পরকীয়া কেলেঙ্কারি, ইভটিজিং, উত্যক্তকরণ যৌন অত্যাচার, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, প্রেমে ব্যর্থতার কারণে আত্মহত্যা প্রবণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। প্রযুক্তির বিকাশের কারণে নগ্ন ছবি তুলে কিংবা ভিডিও ধারণ করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার কারণেও বিপন্ন হচ্ছে অনেকের জীবন, বাড়ছে আত্মহত্যার ঘটনা।

---

[৩৭৪] আল-কুরআন, ৪ : ৭৫

[৩৭৫] ইমাম বুখারী, *সহীহ বুখারী*, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৩০৪

[৩৭৬] আল কুরআন, ৪২ : ৪২

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যার সমাধানে ইসলামী বিধান

জীবন আল্লাহর অন্যতম নিয়ামত ও আমানত। মানুষের জীবন-মৃত্যুর মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তিনিই জীবন ও মরন দান করেন এবং তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তণ করতে হক্ষ।'[৩৭৭]

সুতরাং, নিজ থেকে মৃত্যু কামনা করা ইসলামে নিষিদ্ধ। মানুষ হত্যার চেয়েও আত্মহত্যা আরো জঘন্য অপরাধ। কেননা এতে হিংস্রতা, নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতা আরো বেশি প্রদর্শিত হয়। পরম দয়ালু আল্লাহ তায়অলা তাই এই নির্দয় কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন, 'আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়ালু।'[৩৭৮]

পবিত্র কুরআনুল কারীমে অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আর ব্যয় কর আল্লাহর পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না।'[৩৭৯]

নিজের জীবনকে ধ্বংসকারী ব্যক্তি অবশ্যই অপরাধী। এমন অপরাধী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হাদীস শরিফে এসেছে, 'পূর্বকালে এক ব্যক্তি আহত হয়। ব্যথার তীব্রতায় সে অধৈর্য হয়ে ছুরি দিয়ে নিজ হাত কেটে ফেলে। ফলে রক্ত বের হওয়ার আগেই সে মারা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা নিজ হাতে তার মৃত্যুকে দ্রুত সম্পন্ন করেছে। তাই আমি তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ করে দিলাম।'

যে যেভাবে আত্মহত্যা করবে পরকালেও তেমনি শাস্তি পাবে। হাদীস শরিফে এসেছে, 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্নিত, রাসুল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল সে জাহান্নামে চিরকাল বসবাস করবে, যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করল, সে বিষে চুমুক দিতে দিতে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে, যে ব্যক্তি কোনো লৌহধাতব দ্বারা নিজেকে হত্যা করল, সে লৌহ দ্বারা স্বীয় পেট বিদীর্ণ করতে করতে চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।' উক্ত হাদীসে অপরাধের তীব্রতা ও ভয়াবহতা প্রদর্শন করেই যে এ কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আত্মহত্যা শুধু কুফুরি নয়, কবিরা গুনাহ। তাই এমন ব্যক্তির জানাজা পড়াও বৈধ নয়।

আত্মহত্যার কারণে অনেক অবলা সতী নারীর জীবনের মায়া ত্যাগ করতে হচ্ছে যৌতুকলোভী নরপিশাচদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্যাতনের কারণে। এসব আসলে পারিবারিক অশান্তিরই অংশ। পারিবারিক অশান্তি রোধেও প্রথমে দরকার পরিবারে ইসলামের চর্চা বাড়ানো তথা ইসলামী পরিবার গড়ে তোলা। শ্বশুর–শ্বাশুড়ীসহ পুরুষের পরিবারের সবাইকে মনে রাখতে হবে যৌতুকের নামে কোনো কিছু গ্রহণই তাদের জন্য বৈধ নয়। ইসলামে যৌতুকের কোনো স্থান নেই। মানুষের আন্তরিক প্রদান ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণই বৈধ নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, 'অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।'[৩৮০] রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন, 'কোনো মুসলিমের সম্পদ তার আন্তরিক অনুমোদন ছাড়া কোনো ব্যক্তির জন্য হালাল নয়।'

মূলতঃ যে সব কারণে নারীরা আত্মহত্যা করে থাকে, যেমন ধর্ষণ, ইভটিজিং, উত্যক্তকরণ, যৌন নির্যাতন, যৌতুক, ব্যভিচার করে তা ইন্টারনেটে দুনিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া, এসিড নিক্ষেপ– এসব কারণগুলো প্রতিরোধে ইসলামে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। ইসলামের সেই বিধানগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলেই কেবল নারীদের আত্মহত্যার প্রবণতা প্রায় শতভাগ কমিয়ে আনা সম্ভব।

---

[৩৭৭] আল কুরআন, ১০ : ৫৬

[৩৭৮] আল কুরআন, ৪ : ২৯

[৩৭৯] আল কুরআন, ২ : ১৯৫

[৩৮০] আল কুরআন, ৪২ : ৪২

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধক্ষেত্রে নারী ও শিশু হত্যা নিষিদ্ধ

ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থা, যেখানে মানবিন গুনাবলীর চরম উৎকর্ষতা সাধন করা হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে গেলে শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়াই করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ পরিস্থিতিতে লড়াই কিংবা যুদ্ধের সাধারণ বিধান কী হবে, শত্রুপক্ষের কার সঙ্গে লড়াই করতে হবে, জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান কিভাবে করতে হবে, সব বিষয়েরই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়েছে ইসলামে। যুদ্ধক্ষেত্রে নারী নারী, শিশু এবং বৃদ্ধেও ওপর অস্ত্র ধারণে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে ইসলামে। এ বিষয়ে রাসুল (স.) এর স্পষ্ট হাদীস, 'ইয়াজিদ ইবনে খালিদ ইবনে মাওহাব ও কুতায়বা অথ্যাৎ ইবনে সাঈদ (র.) সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (স.) উপস্থিত ছিলেন এরূপ কোন এক যুদ্ধক্ষেত্রে জনৈক মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন রাসুলুল্লাহ (স.) মহিলা ও বাচ্চাদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।'[৩৮১]

এ ব্যাপারে আরেকটি হাদীসে এসেছে, 'আবু ওলীদ তিবলিসি (র.) রিবাহ ইবনে রাফী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা কোন এক যুদ্ধে রাসুলুল্লহ (স.) এর সাথে ছিলাম। তিনি কিছু লোককে এক স্থানে একত্রিত হতে দেখেন। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠান এবং বলেন, দেখ তো এরা এখানে কি জন্য একত্রিত হয়েছে? তখন সে ব্যক্তি ফিরে এসে বলল, তারা জনৈক মহিলার নিকট একত্রিত হয়েছে। তখন তিনি (রাসুল স.) বলেন, এ মহিলা তো কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসেনি (এক মারা হল কেন?)। তখন এক ব্যক্তি বলল, অগ্রবর্তী সেনাদলের নেতা হলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ। তখন তিনি এক ব্যক্তিতে পাঠিয়ে বলেন, খালিদকে বল, মহিলা ও মজদুর (খাদিমদের) যেন হত্যা না করে।'[৩৮২]

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার

ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা নারীর অধিকার এবং উত্তরাধিকারকে বিধি বিধানের আওতায় এনে একে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দিয়েছে। নারীর অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে পুরুষের সমপর্যায়ে। 'আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষের ওপর নিয়মানুযায়ী। আর নারীদের ওপরও পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।[৩৮৩]

সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারন একটি জটিল বন্টন ব্যবস্থা। এ বিষয়টি কুরআনে সামগ্রিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলিম সমাজে বিয়ের পর মেয়েদেরকে স্বামীর সংসারে চলে যেতে হয়। পিতার অবর্তমানে সংসারের সকল দায় দায়িত্ব পড়ে পুত্রের উপর। ইসলাম তাই পৈত্রিক সম্পত্তির উপর ছেলের অংশের পরিমান মেয়ের অংশের দ্বিগুন নির্ধারন করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার মেয়েদেরকে সম্পত্তির বেশী অংশ দেওয়ার বিধানও রয়েছে। অপরদিকে নারীকে করা হয়েছে স্বামীর সম্পত্তির অংশীদার। বোনকে করা হয়েছে ভাইয়ের সম্পত্তির অংশীদার। ইসলামে নারী-পুরুষ এই বিবেচনায় সম্পত্তির অংশ নির্ধারন করা হয়নি। সম্পত্তির অংশ নির্ধারন করা হয়েছে পরিবারকে সমৃদ্ধ রেখে দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে সংসারে প্রত্যেকের অধিকারকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে। যেহেতু পরিবারে নারীর কোন আর্থিক দায়িত্ব নেই, সম্পত্তির মূল্যমান তাই নারীর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। নারীকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার করা হয়েছে বস্তুত: নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের জন্য। এই অধিকারের বলেই নারী সমাদৃত থাকে সর্বত্র। এটা কেবল ইসলামেই সম্ভব।

ইসলামে সম্পত্তি বন্টনের আইনকে বলা হয় মীরাস। এই আইনে পারিবারিক-সামাজিক অবস্থানগত এবং দায়িত্বপালনের দিক বিবেচনা করেই সম্পত্তি বন্টনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে এই বন্টন

---

[৩৮১] ইমাম আবু দাউদ, *সুনান আবি দাউদ*, প্রাগুক্ত, খ, ৪, পৃ. ১৪, হাদীস নং- ২৬৫৯

[৩৮২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫, হাদীস নং- ২৬৬০

[৩৮৩] আল কুরআন, ২ : ২২৮

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা খুবই জটিল। এ কারণে কে কার সম্পত্তিতে কত অংশ পাবে সেটা সুস্পষ্ট করেই আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন। মূলতঃ প্রাক ইসলামী সমাজে নারীকে যেভাবে সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো, এমনকি ইসলাম পরবর্তীযুগেও বিভিন্ন সমাজে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজেও কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত নারীকে সম্পত্তির অধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হচ্ছিল। অথচ, ইসলাম এমন একটি সমাজে এসে সর্বপ্রথম নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পত্তিতে তাদের অধিকার নিশ্চিত করেছেন পরিবারে দায়িত্ব পালন এবং সাম্যের ভিত্তিতে।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসাতেই সম্পত্তির বন্টন ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যে আলোচনা থেকে নারীকে কোনভাবেই বাদ দেওয়া হয়নি। বরং, সম্যক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১. সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকারের বিষয়ে সাধারণ নির্দেশনা

সূরা নিসার ৭ নাম্বার আয়াতেই প্রথম স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সম্পত্তিতে পুরুষদের অধিকার যেমন আছে, তেমনি নারীদেরও অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষদেরও অংশ আছে এবং পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে; অল্প হোক কিংবা বেশী। এ অংশ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) নির্ধারিত।'[৩৮৪]
এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে পাঁচটি আইনগত নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১. মীরাস কেবল পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও অধিকার।
২. যত কমই হোক না কেন মীরাস অবশ্যই বন্টন করতে হবে। এমনকি মৃত ব্যক্তি যদি এক গজ কাপড় রেখে গিয়ে থাকে এবং তার দশজন ওয়ারিস থাকে, তাহলেও তা ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে। একজন ওয়ারিস অন্যজনের থেকে যদি তার অংশ কিনে নেয় তাহলে তা আলাদা কথা।
৩. এ আয়াত থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, মীরাসের বিধান স্থাবর-অস্থাবর, কৃষি-শিল্প বা অন্য যে কোন ধরনের সম্পত্তি হোক না কেন সব ক্ষেত্রে জারী হবে।
৪. এ থেকে জানা যায় যে, মীরাসের অধিকার তখনই সৃষ্টি হয় যখন মৃত ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে মারা যায়।
৫. এ থেকে এ বিধানও নির্দিষ্ট হয় যে, নিকটতম আত্মীয়ের উপস্থিতিতে দূরতম আত্মীয় মীরাস লাভ করবে না।

২. পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অংশ

সম্পত্তিতে নারীর অধিকার বর্ণনা করার পর মহান আল্লাহ তায়ালা এর পরবর্তী এক আয়াতে তারা কি পরিমান সম্পদের অধিকারী হবে সে বিষয়টাও সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। সূরা নিসার **১১** নাম্বার আয়াতে এসেছে সে নির্দেশনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন: পুরুষদের অংশ দুজন মেয়ের সমান। অতঃপর যদি শুধু নারীই হয় দু-এর অধিক, তবে তাদের জন্য ওই মালের তিন ভাগের দুই ভাগ যা ত্যাগ করে মরে এবং যদি একজনই হয়, তবে তার জন্যে অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্যে ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ, যদি মৃতের পুত্র থাকে। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হয়, তবে মাতা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। অতঃপর যদি মৃতের কয়েকজন ভাই থাকে তবে তার মাতা পাবে ছয় ভাগের একভাগ ওছিয়্যাতের পর, যা করে মরেছে কিংবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের

[৩৮৪] আল কুরআন, ৪ : ৭

Dhaka University Institutional Repository

পিতা ও পুত্রের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী তোমরা জান না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, রহস্যবিদ।'[৩৮৫]

মীরাসের ব্যাপারে এটি প্রথম ও প্রধান মৌলিক বিধান যে, পুরুষদের অংশ হবে মেয়েদের দ্বিগুণ। যেহেতু পারিবারিক জীবনে শরীয়াত পুরুষদের ওপর অর্থনৈতিক দায়িত্বের বোঝা বেশী করে চাপিয়ে এবং অনেকগুলো অর্থনৈতিক দায়িত্ব থেকে মেয়েদেরকে মুক্তি দিয়েছে, তাই মীরাসের ব্যাপারে মেয়েদের অংশ পুরুষদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম রাখা হবে, এটিই ছিল ইনসাফের দাবী।

যদি (মৃতের ওয়ারিস) দুয়ের বেশী মেয়ে হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুভাগ তাদের দাও। দু'টি মেয়ের ব্যাপারেও এই একই বিধান কার্যকর। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির যদি কোন পুত্রসন্তান না থাকে এবং সবগুলোই থাকে কন্যা সন্তান, কন্যাদের সংখ্যা দুই বা দু'য়ের বেশী হোক না কেন, তারা সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ পাবে। অবশিষ্ট তিনভাগের একভাগ অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্য বন্টন করা হবে। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির শুধুমাত্র একটি পুত্র থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে অর্থাৎ ফিকাহবিদগণ সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, অন্যান্য ওয়ারিসদের অনুপস্থিতিতে সে-ই সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিস হবে। আর যদি অন্যান্য ওয়ারিসরাও থাকে, তাহলে তাদের অংশ দিয়ে দেবার পর বাকি সমস্ত সম্পত্তিই সে পাবে।

আর যদি একটি মেয়ে ওয়ারিস হয়, তাহলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক তার। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে তার বাপ-মা প্রত্যেকে সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ পাবে। আর সন্তান যদি সবগুলোই হয় কন্যা বা সবগুলোই পুত্র অথবা পুত্র-কন্যা উভয়ই হয় বা একটি পুত্র অথবা একটি কন্যা হয়, তাহলে বাকি তিনভাগের দু'ভাগে এ ওয়ারিসরা শরীক হবে।

আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং পিতা-মাতা তার ওয়ারিস হয়, তাহলে মাকে তিন ভাগের একভাগ দিতে হবে। পিতা-মাতা ছাড়া যদি আর কেউ ওয়ারিস না থাকে তাহলে বাকি তিনভাগের দু'ভাগ বাপ পাবে। অন্যথায় তিনভাগের দু'ভাগে বাপ ও অন্যান্য ওয়ারিসরা শরীক হবে। যদি মৃতের ভাই-বোনও থাকে, তাহলে মা ছয় ভাগের একভাগ পাবে।

ভাই-বোন থাকলে মায়ের অংশ তিনভাগের এক ভাগের পরিবর্তে ছয় ভাগের একভাগ করে দেয়া হয়েছে। এভাবে মায়ের অংশ থেকে যে ছয় ভাগের এক ভাগ বের করে নেয়া হয়েছে তা পিতার অংশে দেয়া হবে। কেননা এ অবস্থায় বাপের দায়িত্ব বেড়ে যায়। মনে রাখতে হবে, মৃতের বাপ-মা জীবিত থাকলে তার ভাই-বোনরা কোন অংশ পাবে না। (এ সমস্ত অংশ বের করতে হবে) মৃত ব্যক্তি যে অসিয়ত করে গেছে তা পূর্ণ করার এবং এ যে ঋণ রেখে গেছে তা আদায় করার পর।

এরপর বলা হয়েছে, তোমরা জানো না তোমাদের পিতা-মাতা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক দিয়ে কে তোমাদের বেশী নিকটবর্তী। এসব অংশ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আল্লাহ অবশ্যই সকল সত্য জানেন এবং সকল কল্যাণময় ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন।

মীরাসে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের গভীর তত্ত্ব উপলব্ধি করতে যারা সক্ষম নয়, এ ব্যাপারে যাদের জ্ঞান অজ্ঞতার পর্যায়ভুক্ত এবং যারা নিজেদের অপরিপক্ক বুদ্ধির সাহায্যে (তাদের জ্ঞান অনুযায়ী) আল্লাহর এই আইনের ত্রুটি দূর করতে চায়, তাদেরকে এ জবাব দেয়া হয়েছে।

---

[৩৮৫] আল কুরআন, ৪ : ১১

Dhaka University Institutional Repository

৩. স্ত্রীর সম্পত্তিতে স্বামীর, স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার

প্রাক ইসলামী সমাজে স্ত্রীরা যদি কোন সম্পত্তি রেখে মারা যেতো তাহলে স্বামী সেই সম্পত্তি সম্পূর্ণ গ্রাস করে নিত। অন্য কোন ওয়ারিস থাকলে তাকে পূর্ণাঙ্গভাবে অধিকার বঞ্চিত করা হতো। আবার স্বামী মারা গেলে স্ত্রীদের সম্পূর্ণ অধিকার বঞ্চিত করা হতো। এ ব্যাপারে তাদেরকে গণ্যই করা হতো না। শুধু তাই নয়, বর্তমানেও এমন অনেক সমাজ রয়েছে যেখানে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীকে পূর্ণাঙ্গভাবে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু ইসলাম এসব ব্যাপারে ইনসাফের বিধান রেখেছেন। স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে স্বামীর অধিকারকে যেমন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তেমনি স্বামীর পরিত্যাক্ত সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার নির্দিষ্ট করে তাদেরকে সামাজিকভাবে পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে।

আল্লাহ তায়ালা এসব ব্যাপারে সূরা নিসার ১২ নং আয়াতে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, 'আর তোমাদের হবে অর্ধেক সম্পত্তি, যা ছেড়ে যায় তোমাদের স্ত্রীরা যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের হবে এক-চতুর্থাংশ ওই সম্পত্তির, যা তারা ছেড়ে যায়; ওছিয়্যাতের পর যা তারা করে এবং ঋণ পরিশোধের পর। স্ত্রীদের জন্য এক-চতুর্থাংশ হবে ঐ সম্পত্তির, যা তোমরা ছেড়ে যাও ওছিয়্যাতের পর, যা তোমরা কর এবং ঋণ পরিশোধের পর।'[৩৮৬]

৪. ভাইয়ের সম্পত্তিতে বোনের অংশ

বাবা কিংবা স্বামী নয়, ভাইয়ের সম্পত্তিতেও বোনের জন্য অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। যদিও এ ক্ষেত্রে হেকমত এবং কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসল বিষয় হলো, ভাইয়ের সম্পত্তিতেও বোনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, পারিবারিক এবং সামাজিভাবে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মানুষ আপনার নিকট ফতোয়া জানতে চায়- অতএব আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদিগকে 'কালালাহ'-এর মীরাস সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেষ বাতলে দিচ্ছেন; যদি কোন পুরুষ মারা যায় এবং তার কোন সন্তানাদি না থাকে এবং এক বোন থাকে, তবে সে পাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক অংশ এবং সে যদি নিঃসন্তান হয়, তবে তার ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে। তা দুই বোন থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। পক্ষান্তরে যদি ভাই-বোন উভয়ই থাকে, তবে একজন পুরুষের অংশ দু'জন নারীর সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হবে বলে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।'[৩৮৭]

মূল বাক্যে কালালা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'কালালা' শব্দের অর্থের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতো কালালা হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যার সন্তান নেই এবং যার বাপ-দাদাও বেঁচে নেই। আবার অন্যদের মতে যে ব্যক্তি নিছক নিসন্তান অবস্থায় মারা যায় তাকে কালালা বলা হয়। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু শেষ সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে প্রথমোক্ত লোকটিকেই কালালা বলা হয়। সাধারণ ফকীহগণ তাঁর এই মত সমর্থন করেছেন। কুরআন থেকেও এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ কুরআন কালালার বোনকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেকের মালিক বানানো হয়েছে। অথচ কালালার বাপ বেঁচে থাকলে বোন সম্পত্তির কিছুই পায় না।

এখানে এমন সব ভাইবোনের মীরাসের কথা বলা হচ্ছে যারা মৃতের সাথে মা ও বাবা উভয় দিক দিয়ে অথবা শুধুমাত্র বাবার দিক দিয়ে শরিক। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর এক ভাষণে এই অর্থের ব্যাখ্যা করেছিলেন। কোন সাহাবা তাঁর এই ব্যাখ্যার সাথে মতবিরোধ করেননি। ফলে এটি একটি সর্বসম্মত মতে পরিণত হয়েছে।

---

[৩৮৬] আল কুরআন, ৪ : ১২

[৩৮৭] আল কুরআন, ৪ : ১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে বলা হয়েছে, ভাই তার সমস্ত সম্পদের ওয়ারিশ হবে, যদি কোন নির্দিষ্ট অংশের অন্য কোন অধিকারী না থেকে থাকে। আর যদি নির্দিষ্ট অংশের অন্য কোন অধিকারী থাকে- যেমন স্বামী, তাহলে প্রথমে তার অংশ আদায় করার পর অবশিষ্ট পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাই পাবে। দু'য়ের বেশী বোন হলে তাদের সম্পর্কেও এই একই বিধান কার্যকর হবে।

৫. নারীর অধিকার সংরক্ষণের পুরস্কার এবং লঙ্ঘণের শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের অধিকার নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এখানে কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। কোন প্রকার বেশ-কম করা যাবে না। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা যারা অনুসরণ করবে তাদের জন্য যেমন রয়েছে পুরস্কারের ব্যবস্থা, তেমনি যারা লঙ্ঘণ করবে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির ঘোষণাও।

আল্লাহ সর্বপ্রথম পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। যে কেউ আল্লাহ ও রসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাত সমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এ হল বিরাট সাফল্য।'[৩৮৮]

এরপর ঘোষণা করেছেন সীমালঙ্ঘণের শাস্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যে কেউ আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্যতা করে এবং তার সীমা অতিক্রম করে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সে সেখানে চিরকাল থাকবে। তার জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।'[৩৮৯]

[৩৮৮] আল কুরআন, ৪ : ১৩

[৩৮৯] আল কুরআন, ৪ : ১৪

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশ

নারী নির্যাতনের অতীত ইতিহাস, বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশ পরিস্থিতি তুলে ধরার পর আমরা আলোচনা করেছি, কিভাবে ইসলাম নারী নির্যাতন বন্ধে কার্যকরী ব্যাবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তবে এ কথা সত্য যে, ইসলামী শরীআতের পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম শর্ত হলো, একটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ রাষ্ট্র হলেও, এখানে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত নয়। এ কারণেই বাংলাদেশে নারি নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে গবেষণার এ পর্যায়ে এসে প্রচলিত আইন ও সমাজ ব্যবস্থার সাথে সংগতি রেখে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সুপারিশ আকারে পেশ করছি। আমাদের বিশ্বাস, এ সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশে নারী নির্যাতন উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

১. নারী নির্যাতনের বিপক্ষে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।
২. ইসলামে নারীর যে মর্যাদা ও সম্মান সংরক্ষিত রয়েছে, তা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে এবং সে সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে।
৩. পারিবারিক গণ্ডিতে ইসলামীক পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদেরকে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।
৪. দীনি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।
৫. পারিবারিক পরিবেশে সন্তান-সন্ততিদেরকে জীবনের শুরু থেকেই কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে 'তাকওয়া'র শিক্ষা দিতে হবে।
৬. শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন শিক্ষা সংযোজন করতে হবে: ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণে ইভটিজিং সহ মেয়েদের লাঞ্ছিত করার ঘটনা বেশী ঘটছে। ছোটবেলা থেকেই যদি সন্তানদেরকে নৈতিক শিক্ষায় উজ্জীবিত করা যায়, তাহ'লে তাদের দ্বারা একটি সুষ্ঠু সমাজ গঠন করা সম্ভব। ধর্ম থেকে দূরে সরে গিয়ে অতিমাত্রায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগাতে গিয়েই সামাজিক এই অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে।
৭. ইসলাম প্রদত্ত নারী ও পুরুষের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার সমূহ সকলকে জানানো এবং তা মেনে চলার প্রবণতা তৈরী করতে হবে।
৮. নারীদের সম্পর্কে প্রচলিত কু-সংস্কার দুর করতে হবে।
৯. নারীদের পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে আলাদা পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
১০. যৌতুকের বিপক্ষে ও মোহরের পক্ষে সামাজিক সচেতনতা তৈরী করতে হবে।
১১. উত্তরাধিকার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।
১২. অশ্লীল সাহিত্য ও সংস্কৃতির লাগাম টানতে হবে।
১৩. নগ্নতা ও অশ্লীলতার প্রচার ও প্রসার বন্ধ করতে হবে।
১৪. নারী নির্যাতন বন্ধে মিডিয়া, সুশিল সমাজ এবং সচেতত নাগরিকদের শক্তিশালি ভুমিকা পালন করতে হবে।
১৫. আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার আন্তরিক ভূমিকা নারী নির্যাতন বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় প্রনিধানযোগ্য, রক্ষক হয়ে যেন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. সর্বোপরি নারী নির্যাতন রোধে প্রচলিত আইনের কার্যকরী প্রয়োগের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত ইসলামী বিধানগুলোকে কিভাবে সমাজে বাস্তাবায়ন করা যায়, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় গবেষণার ব্যবস্থা করতে হবে এবং গবেষণা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত বাসড়বায়নের লক্ষ্যে উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৭. নারী ও শিশু পাচার রোখে সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানের জন্য মানব পাচারের মতো জঘন্য অপরাধ দমনের জন্য প্রচলিত আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের যে বিধান রাখা হয়েছে, তা ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। নারী ও শিশুদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য মানব পাচার বন্ধ করতে হবে আর এ জন্য সমাজের সচেতন জনগোষ্ঠীকে পাচারের বিরুদ্ধে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। মানব পাচার অপরাধ দমনের জন্য এ মুহূর্তে দেশব্যাপী গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সামাজিক আন্দোলন অত্যন্ত প্রয়োজন। জাতীয় পর্যায়ে সভা, সমাবেশ, সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠানে মসজিদের ইমাম, খতিব, শিক্ষক ও ধর্মীয় নেতাদের জনসচেতনতা সৃষ্টিতে মানব পাচারের মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। জনসচেতনা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় মূল্যবোধের লালনই পারে নারী ও শিশু পাচারের মত জঘণ্য এবং ঘৃণ্য কাজের মূলোৎপাটন করতে।

১৮. যে সব কারণে নারীরা আত্মহত্যা করে থাকে, যেমন ধর্ষণ, ইভটিজিং, উত্যক্তকরণ, যৌন নির্যাতন, যৌতুক, ব্যভিচার করে তা ইন্টারনেট দুনিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া, এসিড নিক্ষে– এসব কারণগুলো প্রতিরোধে ইসলামে সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। ইসলামের সেই বিধানগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলেই কেবল নারীদের আত্মহত্যার প্রবণতা প্রায় শতভাগ কমিয়ে আনা সম্ভব।

১৯. পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে : নারী উত্ত্যক্তের অন্যতম প্রধান কারণ হল পর্দার বিধান পালন না করা। পর্দা নারীর ইজ্জত, সম্মান ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। নারী যখন আল্লাহ প্রদত্ত পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে পরপুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে, তখনই সে বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। ধর্ষণ, অপহরণ, খুন, অঙ্গহানী, এসিড নিক্ষেপ, উত্ত্যক্ত করা ইত্যাদির প্রধানতম কারণ নারী ও পুরুষ কর্তৃক পর্দার বিধান লঙ্ঘন। নারীরা খোলামেলাভাবে চলাফেরা যত বেশী করবে, ততই তাদের সম্মানহানি ঘটবে। সুতরাং নারীর মর্যাদা যথাযথভাবে রক্ষা করতে হলে রাসূল (স.) প্রদর্শিত পর্দা প্রথার পূর্ণ অনুশীলন এবং তা পুরোপুরি পালন করে মার্জিতভাবে চলাফেরা করতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে; মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদের প্রদর্শন করবে না।'[৩৯০]

নিতান্ত প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যেতে হলে সেক্ষেত্রে পিতা-মাতা, স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে হিজাব পরিহিতা অবস্থায় বের হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে নবী আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীগণকে বলে দিন তারা যেন তাদের শরীর চাদর দ্বারা আবৃত করে রাখে। এটি তাদের চেনার সহজ উপায়। ফলে তাদেরকে উত্ত্যক্ত করা হবে না।'[৩৯১]

যদি কখনো অপরিচিতি কোন লোকের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হয় তাহ'লে রুক্ষতা বজায় রাখতে হবে। এমনভাবে মিষ্টি মিষ্টি, রসালো সুরে কথা বলা যাবে না, যাতে পুরুষের মনে কুধারণা সৃষ্টি হয়।

২০. শালীন হতে হবে : নারীকে তার পোষাক-পরিচ্ছদে, কথাবার্তায়, চলাফেরায় অত্যন্ত সংযত ও শালীন হতে হবে। কারণ নারীর প্রকৃতিতে চম্বুকধর্মী অস্ত্রের প্রভাব বিদ্যমান আর পুরুষের প্রকৃতিতে খারের প্রভাব প্রবল। নারীর প্রতি আকর্ষিত হওয়া পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আগুনের পরশে যেমন মোম না গলে পারে না, তেমনি নারীর সংশ্রবে পুরুষ উদ্বেলিত না হয়ে পারে না। সুতরাং নারীর অশালীন পোষাক পরে

---

৩৯০ আল কুরআন, ৩৩ : ৩৩

৩৯১ আল কুরআন, ৩৩ : ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

বাইরে নগ্নভাবে চলাফেরা সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। সৌদিআরব ও ইরানে এ বিধান চালু আছে বিধায় সেখানে আমাদের দেশের মত নারী উত্ত্যক্তের ঘটনা বিরল।

২১. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে : নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ বিশ্বের উন্নত দেশ সমূহের মতো আমাদের দেশেও নারী উত্ত্যক্তের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অন্যতম কারণ। অফিস-আদালতে, বিভিন্ন ক্লাবে, পার্টিতে, পার্কে, যানবাহনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজের সর্বক্ষেত্রে বর্তমানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দিন দিন অবারিত হচ্ছে। ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে ইভটিজিং ও নারী নির্যাতন। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা বন্ধের লক্ষ্যে নারীদের জন্য পৃথক কর্মস্থল, আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রে নারীদের জন্য মহিলা ডাক্তার, পৃথক পরিবহন ব্যবস্থাসহ সমাজের বিভিন্ন পেশার নারীদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এজন্য সমাজের অভিভাবক শ্রেণী এবং সরকারের যৌথ প্রয়াস অত্যাবশ্যক।

২২. নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করতে হবে : প্রাইমারী শিক্ষা থেকে শুরু করে শিক্ষার সকল স্তরে সহশিক্ষা বন্ধ করতে হবে। এজন্য চাহিদা মাফিক বালিকা বিদ্যালয়, মহিলা মাদরাসা, মহিলা কলেজ, মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজণ। বর্তমানে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একসাথে এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা ব্যয়সাধ্য বিধায় পর্যায়ক্রমে এ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের জন্য আলাদা শিফ্‌ট চালু করা প্রয়োজন। সাথে সাথে পর্যায়ক্রমে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চূড়ান্ত রূপ দেওয়া সম্ভব না হবে, ততদিন পর্যন্ত সরকারীভাবে শিক্ষার সকল স্তরে ইসলামী পরিবেশ ও পর্দার বিধান চালু করে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মহানবী (স.) নারী শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তাঁর সময়েই নারীদের জন্য পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।

২৩. অশ্লীল সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে : ভিসিআর, টিভি, স্যাটেলাইট, ভিডিও, সিডি, বিজ্ঞাপনে নারী-পুরুষের, যুবক-যুবতীদের একত্রে নাচ-গানের অনুষ্ঠান, অশালীন পোষাক পরিহিত চিত্র বা ছায়াছবি এবং যৌন উত্তেজনাধর্মী চলচ্চিত্র প্রদর্শন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। যৌন উত্তেজক গান, কবিতা, সাহিত্য, নভেল, নাটক বন্ধ করতে হবে। প্রাইমারী শিক্ষার পর থেকে জাতীয়, সামাজিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোন অনুষ্ঠানে তরুণ-তরুণী, যুবক-যুবতী এবং মহিলা ও পুরুষদের একত্রে অনুষ্ঠান বন্ধ করে পৃথকভাবে করার সুন্দর এবং নিরাপদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। রেডিও, টিভিতে শিক্ষামূলক, জাতিগঠনমূলক এবং নির্মল আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে অবশ্যই নারী জাতি তাদের হারানো সম্মান ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ।

২৪. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে : 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য বিদ্যা অর্জন ফরয।' এ শিক্ষা অবশ্যই ধর্মভিত্তিক ও নৈতিকতাপূর্ণ শিক্ষা হ'তে হবে। সুশিক্ষা যেমন জাতিকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দেয়, তেমনি অশিক্ষা-কুশিক্ষা তাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। একমাত্র ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা ও ইসলামী সমাজই পারে নারীর সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার গ্যারান্টি দিতে। ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত একজন যুবক জানে যে, নারী উত্ত্যক্ত তো দূরের কথা, গায়র মাহরাম কোন নারীর দিকে দৃষ্টি দেওয়াও পাপ।

২৫. কঠোর শাস্তি প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ: ইসলাম নারী নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে যেমন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তেমনি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা সমূহের মধ্যে রয়েছে নারী নির্যাতনকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা। নারী নির্যাতন তথা উত্ত্যক্তকরণ, ধর্ষণ, খুন,

Dhaka University Institutional Repository

ছিনতাই, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, অঙ্গহানী, সম্মানহানী, মিথ্যা অপবাদ প্রদান ইত্যাদি অপরাধের জন্য ইসলামী শরী'আত যে শাস্তির বিধান দিয়েছে, সে বিধান যথাযথভাবে কার্যকর করা অত্যন্ত জরুরী।

২৬. আখিরাতের জবাবদিহিতার ভয় সৃষ্টি করতে হবে: যদি কেউ নারী নির্যাতন করে থাকে তাহলে আখিরাতে তাকে এজন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ ব্যাপারে আয়াত ও হাদীসের সংখ্যা অত্যন্ত ব্যাপক। মূলতঃ জবাবদিহিতা একজন মুসলিমকে উত্তম চরিত্রের মুসলিমে পরিণত করে।

২৭. ইভটিজিং যেহেতু বড় ধরনের একটি সামাজিক সমস্যা এবং নারী নির্যাতনের মূলে অনেক বেশি কাজ করে, সেহেতু এই ইভটিজিং বন্ধ করতে পারলে নারী নির্যাতনও অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব। মূলতঃ সে লক্ষ্যেই ইভটিজিং প্রতিরোধে কিছু সুপারিশ পেশ করছি। ক) বাংলাদেশের প্রচলতি আইনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন রয়েছে। তবে ইভটিজিংকে নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে কোন আইন কিংবা ধারা এবং শাস্তির কোন বিধান নেই। অথচ এটা নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক মারাত্মক একটি অপরাধ। সুতরাং, ইভটিজিং প্রতিরোধে আইন মন্ত্রণালয় ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে একটি পূর্ণাঙ্গ 'ইভটিজিং প্রতিরোধ আইন' প্রণয়ন; কিংবা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (২০০০)'-এর সংশোধন করে ইভটিজিং প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও ধারা প্রনয়ন করা জরুরী। একই সঙ্গে 'ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামের অনুশাসন' বিষয়ক ধারা সংযোজন। খ) তথ্য মন্ত্রণালয় ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে 'ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসন' ধারাটি ব্যাপকভাবে প্রচার, মানুষকে এ ব্যাপারে সতর্কীকরণ, সঠিক শাস্তির বিধান এবং সঠিকভাবে এর প্রয়োগের বিধান মানুষের মাঝে প্রচার করণ ও জনসচেতনতা গড়ে তোলা জরুরী। গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিক্ষার সর্বস্তরে 'ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসন' বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ; ঘ) জনপ্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম, পরিবারের প্রধান ব্যক্তিরা নিজ নিজ স্থান থেকে 'ইভটিজিং প্রতিরোধে ইসলামী অনুশাসন' বাস্তবায়নের প্রদক্ষেপ গ্রহণ; ঙ) অবাধ নারী স্বাধীনতায় গা ভাসিয়ে না দিয়ে নারী স্বাধীনতার মূল প্রত্যয় উপলব্ধি করে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা; চ) ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রেখে শিক্ষাব্যবস্থা ও নারীর কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ; ছ) ইসলামে প্রদর্শিত 'মানহানি প্রতিরোধ' আইন মেনে চলা; জ) পারিবারিক শৃংখলা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, রাষ্ট্রীয় আইনের বাধ্যবাধকতা ও ইসলামী অনুশাসন গ্রহণে যত্নশীল হওয়া; ঝ) নারীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর মানসিকতা সৃষ্টি; ঞ) চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনে তৎপরতা বৃদ্ধি ইত্যাদি। আল্লাহ তাআলা নারীকে মা, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে সম্মান দিয়েছেন। অথচ আজ আল্লাহর প্রদত্ত গৌরব ও মর্যাদা ভুলে গিয়ে তারা মেকি ভোগ বিলাস, কামনা-বাসনা, অইসলামীক উম্মাদনায় আক্রান্ত। তারা আজ আদর্শ মা ও স্ত্রী হবার পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খল প্রেমিকা, রক্ষিতা, নায়িকা, মডেল ও খ্যাতি আর্জনে উদ্গ্রীব। উচ্ছৃঙ্খল, আঁটসাঁট পোশাক আর বেপরোয়া চলন-বলন অব্যহত রেখে আইন প্রণয়ন অনর্থক। তাই আজকের সমাজ থেকে ইভটিজিং নামক কালো অধ্যায় দূর করতে হলে ইসলামী অনুশাসনের যথাযথ বাস্তবায়ন একান্ত প্রয়োজন।

২৮. এছাড়াও ইভটিজিং প্রতিরোধে আরও কিছু করনীয় নির্ধারণ করা যেতে পারে। কিশোর-তরুণদের করনীয় নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। যেমন- ক) ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে। খ) আবেগকে সংযত রাখতে হবে। গ) অনৈতিক চিন্তা ভাবনা পরিহার করতে হবে। ঘ) নিজেকে সৎ হতে হবে। ঙ) বিবাহ পূর্ব প্রেম-প্রীতি/ অবৈধ সম্পর্ক পরিহার করতে হবে। চ) অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলতে হবে। ছ) মেয়েদেরকে মায়ের উপর্যুক্ত সম্মান দিতে হবে। জ) কোন মেয়ে আক্রান্ত হলে তাকে সাহয্যের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। ঝ) সম্প্রীতির মনোভাব বজায় রাখতে হবে। ঞ) হিংসা প্রতিহিংসা পরিহার করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৯. সামাজিকভাবে ইভটিজিং প্রতিরোধে কিছু করণীয় নির্ধারণ করে সেই আলোকে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। করনীয়গুলো হতে পারে এইরকম- ক) সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বখাটের পরিবারকে 'একঘরে' করে রাখতে হবে। খ) শান্তির স্বার্থে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উদার করতে হবে। অপরের দুঃখে সমবেদনা জানাতে হবে। গ) ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার হতে হবে। ঘ) উঠতি বয়সী সন্তানদেরকে চোখে-চোখে রাখতে হবে। ঙ) মেয়েদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর হতে হবে। চ) রাস্তার মোড়ে, গাছ তলায়, ব্রিজের ওপর, চায়ের দোকানের সামনে বখাটে ছেলেদের আড্ডা বন্ধ করতে হবে।

৩০. পাচার প্রতিরোধে করণীয়: পাচার প্রতিরোধে আমাদের অনেক কিছুই করণীয় রয়েছে। পাচার প্রতিরোধে সরকার ও জনসাধারণের যৌথ ভূমিকা প্রয়োজন। যেমন- ক) ফৌজদারি মামলার প্রচলিত তদন্ত প্রক্রিয়ার পরিবর্তন; খ) আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা; গ) পাচার রোধে যে আইন রয়েছে, সে আইনের আলোকে পাচারকারীদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। ঘ) নারীর প্রতি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিশেষ করে পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন; ঙ) পুলিশ স্টেশনে পাচারের পৃথক সেল গঠন; চ) পাচারকৃতদের ফিরিয়ে আনার জন্য সুষ্ঠু প্রক্রিয়া চালু; ছ) প্রত্যার্পণ চুক্তি প্রণয়ন; ঞ) পাচারের শিকার ব্যক্তি এবং সাক্ষীদের রক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন; ট) নারী বান্ধব গণমাধ্যম নীতিমালা প্রণয়ন; ঠ) সচেতনতা বৃদ্ধি; ড) সেবামূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি; ঢ) কমিউনিটি পর্যায়ে পরিচর্যা কমিটি গঠন; ণ) স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের মাধ্যমে পাচার সম্পর্কে জনগনকে অবহিত করা; ত) এনজিওদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগনকে সচেতন করা এবং এর প্রতিরোধের জন্য জনগনকে ঐক্যবদ্ধ করা; থ) দারিদ্র্য দূরীকরণ বিশেষ করে নারীদের দারিদ্র্য দূরীকরণে নানামুখী কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ; দ) স্কুল-কলেজে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং গ্রাম, থানায় স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে শিশু-কিশোর ও জনগনকে সচেতন করা; ধ) পাচারকারীদের কবল থেকে উদ্ধারকৃতদের সামাজিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা, সেই সাথে প্রয়োজন অনুসারে আইনী এবং খাদ্য, বাসস্থান ও চাকরির সহায়তা প্রদান করা। ন) পাচার হয়ে ফেরত আসা নারী ও শিশুদের পূর্নবাসনের জন্য আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসা নাগরিক কর্তব্য। প) রাষ্ট্রীয়ভাবে কয়েকটি পূনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। পাচারের পর ফিরে আসা নারী-শিশুদের পরিবার স্বচ্ছন্দে তাদের গ্রহণ করতে চায় না। এ সকল নারী শিশুরা পাচারের মাধ্যমে নির্যাতিত হয়, আবার ফিরে এসে পরিবার ও সমাজ কর্তৃক নির্যাতিত হয়। ফলে পাচারকৃত নারী শিশুদের পুনর্বাসন তথা নিজের পায়ে দাঁড়ানো অত্যন্ত জরুরী। ফ) বেসরকারী উদ্যেগেও পাচার হওয়া নারী শিশুদের সহযোগিতা ও পুনর্বাসন করা সম্ভব। ব) বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন পাচারের শিকার ও উদ্ধারকৃতদের নিম্নলিখিত সহায়তা দিতে পারে– (১) খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, (২) স্বাস্থ্য সেবা ও মানসিক চিকিৎসা, (৩) বাসস্থানের ব্যবস্থা, (৪) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, (৫) কর্মসংস্থান ও নিয়োগ প্রদানে সহায়তা করা, (৬) সামাজিক সমর্থন দেয়া, (৭) সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পাচারের শিকারকে নয় পাচারকারী চক্রকে ঘৃন্য চোখে দেখা। ভ) সর্বোপরি ইসলাম যেভাবে প্রতারনা করে নারী এবং শিশু পাচারের শাস্তি নির্ধারণ করেছে, দুনিয়া এবং আখিরাতে এর যে ক্ষতিকর দিক রয়েছে সেগুলো মানুষকে জানানো এবং সে অনুযায়ী আমল করার জন্য বাধ্য করতে সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে। একই সঙ্গে সামাজিকভাবে ধর্মীয় অনুশাসনের বিষয়গুলোও যথাযথভাবে প্রচার এবং মানুষ যেন সেগুলো মান্য করে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

এ বিশ্বের যা কিছু কল্যাণকর তার অর্ধেকই নারী জাতির অবদান; কিন্তু কথিত আধুনিক ও সভ্যতার যুগেও প্রতি দিন বহু সংখ্যক কিশোরী ও যুবতী কিংবা বৃদ্ধা নারী অমানবিকতা, নৃশংসতা, পাশবিকতা এবং নানা ধরনের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। গত কয়েক দশকে পশ্চিমা সমাজ নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়ার নামে নারীর অধিকার পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এতে করে বরং নারীরা আরও বেশি প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও সংকটের সম্মুখিন হচ্ছে। নিরাপদ পরিবেশ হারাচ্ছে এবং নানামুখী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এবং তাদেরকে সামাজিক অঙ্গনের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করার চেষ্টা চালিয়েছে।

নারীর মর্যাদা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দৃষ্টিভঙ্গী ভুল ধারণা ও সংকীর্ণ চিন্তায় ভরপুর। এটা স্পষ্ট যে নারীর অধিকার ও সম্মান যদি যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়, তাহলে বিভিন্ন সমাজে নারীর অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটবে।

ইসলামই নারীকে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়েছে। নারী মহান আল্লাহর এক অসাধারণ সৃষ্টি। কারণ পুরুষের উন্নতি বা পূর্ণতার পথে নারীর সহযোগীতা অপরিহার্য। ইসলামের দৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক উন্নতি, সামাজিক অগ্রগতি, গঠনমূলক কাজ এবং বিশ্বের ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনার কাজে দায়িত্ব পালনের জন্য নারীকে অবশ্যই সুযোগ দেওয়া উচিত। ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিন্তা, সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রসহ আধ্যাত্মিক এবং অন্য সব গুণের ক্ষেত্রে নারীকে সর্বোচ্চ অবস্থানে দেখতে চায়। পরিবার ও মানব সমাজের সদস্য হিসেবে নারীকে সবচেয়ে কল্যাণময়ী হিসেবে গড়ে তোলাও ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য।

বস্তুত ইসলামই নারীকে যেমন দিয়েছে সকল ন্যায্য অধিকার, তেমনি তাকে রক্ষারও ব্যবস্থা করেছে সকল প্রকার নির্যাতন থেকে। কেননা ইসলামী বিধান তো সেই মহান সত্ত্বার কাছ থেকে অবতারিত যিনি নারীর স্রষ্ঠা। সুতরাং, নারী নির্যাতনমুক্ত সমাজ বিনির্মান করতে হলে, আমাদের জন্য ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার কোন বিকল্প নেই। প্রকৃতই যদি ইসলাম মেনে চলা হয়, তাহলে নারীর নির্যাতিত হওয়ার কোন সুযোগই থাকবে না।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. : মহাগ্রন্থ আল কুরআন

২. মুফতি মোহাম্মদ শফি : অনু: মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন, মদিনা মুনাওয়ারা। খাদেমুল হারামাইন শরিফাইন বাদশা ফাদাহ কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.।

৩. ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাইল বুখারী : সহীস বুখারী, ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা: আধুনিক প্রকাশনী, ৫ম সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৯৬, ৫ম খণ্ড।

৪. ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল কুশায়রী আন নিশাপুরি (র.) : অনু. ও সম্পাদনা: সম্পাদনা পরিষদ, সহীহ মুসলিম, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০০৩, ৭ম খণ্ড।

৫. আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ'আছ আস সিজিস্তানি (র.) : অনু: ড. আ, ফ, ম আবু বকর সিদ্দিকী, সম্পাদনা: অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ইয়াকুব শরীফ, সুনান আবি দাউদ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬, খণ্ড: ৫ম।

৬. আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনু ইয়াজিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ : অনু: মুহাম্মদ মুসা, *সুনানু ইবনে মাজা*, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ ডিসেম্বর, ২০০২), ৪র্থ খণ্ড।

৭. আরবী-বাংলা অভিধান : আরবী-বাংলা অভিধান, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৩

৮. মাওলানা মুহিউদ্দিন খান : সঙ্কলক, আল কাওসার : আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ১৯৮৬, ৭ম সংস্করণ- মার্চ ১৯৯৭

৯. আবু তাহের মেসবাহ : সঙ্কলক ও সম্পাদক, আল মানার: আধুনিক আরবী-বাংলা অভিধান, ঢাকা: মোহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রকাশ- ১৯৯০

১০. আবদুল খালেক : নারী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ১৯৯৫

১১. সাইয়েদ জালালুদ্দিন আনসার উমরী : অনু: মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ইসলামি সমাজে নারী, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, নভেম্বর ২০০৮

১২. অগাস্ট বেবেল : অনু: কনক মুখোপাধ্যায়, নারী অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতে, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ৩য় প্রকাশ, জুন ২০০৩

১৩. ড. মুস্তাফা আস সিবায়ী : অনু:আকরাম ফারুক, ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৫ম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ১০

১৪. হাফেজ আল্লামা ইমামুদ্দিন ইবনু কাসীর (রহ.) : অনু: ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, তাফসিরে ইবনে কাসীর, ঢাকা : তাফসীর পাবলিকেশন্স কমিটি, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ৮ম সংস্করণ, মে ২০০৮

১৫. ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আত-তিরমিযী : সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, জামে আত-তিরমিযী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন, ১৯৯৫, তৃতীয় খণ্ড।

১৬. মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহীম : হাদীস শরীফ, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি-এপ্রিল, ১৯৭৫, ৩য় খণ্ড।

১৭. ইমাম আবু আবদির রহমান ইবনে শোয়াইব আন নাসায়ী (রঃ) : অনু: মাওলানা রিজাউল করিম ইসলামাবাদী, সুনানু নাসায়ী শরীফ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রকাশকাল জুন, ২০০৩, ৩য় খণ্ড।

১৮. ইমাম তিরমিযী : অনুবাদ ও সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুসা, জামে আত-তিরমিযী, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর: ১৯৯৬, ২য় খণ্ড।

১৯. মাহমুদা ইসলাম : নারীবাদী চিন্তা ও নারী জীবন, ঢাকা: জে কে প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০২, দ্বিতীয় সংস্করণ: মে ২০০৫।

২০. ড. আবুল হোসেন : সংগ্রহ ও সম্পাদনা এবং প্রকল্প পরিচালক, '*বাংলাদেশে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ*', ঢাকা: 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম' কর্তৃক প্রকাশিত সংকলন গ্রন্থ, জানুয়ারি- ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

২১. সিরাজুল ইসলাম, প্রধান সম্পাদক : ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজাহান মিয়া, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম সংস্করণ: মার্চ ২০০৩, পূন: মূদ্রণ, মার্চ- ২০০৪, ৮ম খণ্ড

২২. সিরাজুল হক : ইসলাম ও যৌতুক, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

২৩. নির্মলেন্দু ধর : হিন্দু আইন, ঢাকা, রেমিসি পাবলিশার্স প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, পঞ্চম সংস্করণ- ১ নভেম্বর ২০১৩

২৪. তারেক মোহাম্মদ জায়েদ ও শহীদুল ইসলাম : প্রচলিত ও ইসলামী আইনে মানহানি : এক তুলনমূলক বিশ্লেষণ, ইসলামী আইন ও বিচার, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগেল এইড সেন্টার, সংখ্যা: ২৩, জুলাই-সেপ্টেম্বর: ২০১০

২৫. বাংলাদেশের আইন : পরিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০, ২০১০ সালের ৫৮ নং আইন-এর '২' নং ধারার '১৮'নং উপধারা

২৬. মুহাম্মদ মাকসুদুর রহমান : ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর বয়স-সীমা: সমস্যা ও সমাধান, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বর্ষ: ৪৮, সংখ্যা: ৪র্থ, এপ্রিল-জুন: ২০০৯

২৭. ইমাম তিরমিযী : অনু: মাওলানা ফরীদ উদ্দিন মাসউদ, জামে আত-তিরমিযী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল, জুন ১৯৯২, ৩য় খণ্ড

২৮. সৈয়দ শওকতুজ্জামান : বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা: স্বরুপ ও সমাধান, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩

২৯. মো. আবদুল হামিদ : নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিকার বিষয়ক আইন, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০, ধারা: ২০, উপধারা: ৩, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, প্রকাশকাল: জুন, ২০১০

৩০. বি আইশা লেমু ও ফাতিমা হিরেন : অনু: ড. মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান, ইসলামের দৃষ্টিতে নারী, ঢাকা : বিআইআইটি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬

৩১. মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহীম : নারী, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, পঞ্চম প্রকাশ, মে ১৯৯৮

৩২. আল্লামা ওলিউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল খতীব আল উমারী আত তাবরিযী : অনু: মাওলানা, এ বি এম এ খালেকুজ্জামান মজুমদার, মিশকাত শরীফ, ঢাকা: মুরাদ পাবলিকেশন্স, প্রকাশকাল, নভেম্বর, ২০০০, ১ম খণ্ড

৩৩. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম : পরিবার ও পারিবারিক জীবন, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর-১৯৮৩, ২২তম প্রকাশ, মার্চ: ২০১২

৩৪. আবদুস শহীদ নাসিম : ইসলামে পারিবারিক জীবন, ঢাকা: শতাব্দী প্রকাশনী, প্রকাশকাল: ১৯৮৬, ১০ম মুদ্রণ: জুন ২০০৩

৩৫. আল্লামা আবু বকর আহমাদ বিন আলী জাসসাস : অনু: মাও: মুহাম্মদ আবদুর রহীম, আহকামুল কুরআন, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২য় খণ্ড

৩৬. মাওলানা নোমান আহমদ : নিয়ামুল মুনইম শরহে মুসলিম, (ঢাকা: ইসলামিয়া কুতুবখানা, জানুয়ারি, ২০০০), ১ম খণ্ড

৩৭. সুলায়মান বিন আহমদ বিন আয়ুব তাবরানী : *আল-মুজামুল ওয়াসীত*, কায়রো: দারুল হারামাইন, তাবি

৩৮. সুলায়মান বিন আহমদ বিন আয়ুব তাবরানী : আল-মুজামুল সাগীর, বৈরুত: কুতুবুল ইসলামিয়্যা, ১৪০৫ হি.

৩৯. আবু বকর আল-জাস্‌সাস : আহকামুল করআন, বৈরুত: দারু ইহয়িয়া আত তুরাসিল আরাবী, ১৪০৫ হি., ৫ম খণ্ড

৪০. মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী : রাওয়ায়িউল বায়ান ফী তাফসীরি আয়াতিল আহকামি মিনাল কুরআন, দামেস্ক: মাকতাবাতুল গাজালী, ১৯৮০, ২য় খণ্ড

৪১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ উবনু আহমদ আল-কুরতুবী : আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন, কায়রো: দারু কুতুবিল মিসরিয়াহ, ১৯৮৪ হি., ১২খণ্ড

৪২. আবুল কাশেম সুলাইমান ইবনে আহমদ আত-তাবারানী : মুজামুস সাগীর, বৈরুত: মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৫ হি.

৪৩. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল : আল-মুসনাদ, দামেশক: মআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২১ হি.

৪৪. আবু মুহাম্মদ আব্দল্লাহ বিন ওয়াহাব বিন মুসলিম : আল জামে, মিশর: দারে মাকতাবা হাসান হুসাইন, ১৪৬১.

৪৫. আবুল হাসান আলী দারে কুতনী : আস-সুনান, বৈরুত: মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৪ হি.

৪৬. মাওলানা ইকরামুল্লাহ জান কাসেমী : অনু: মাওলানা হায়াত মাহমুদ জাকির, ইসলামে শিশু প্রতিপালন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ২০০৭

Dhaka University Institutional Repository

47. Deana F. Morrow and Lori Messinger : Sexual Orientation and Gender Expression in Social Work Practice, New York City: Columbia University Press, 2006
48. Oxford advanced learning Dictionary : International student edition, London: Oxford University press, 6th edition, 2003-2004, p. 1549.
49. Catherine Soanes : Compact oxford reference Dictionary, London: Oxford University Press, 2001
50. Bosworth & Toller : Anglo-Saxon Dictionary Oxford, Oxford university press, 1898-1921
51. C. T. Onions : Oxford Dictionary of English Etymology (Oxford, Oxford university press, 1966
52. Noah Webster : Webster's New World Dictionary, Boston: Houghton Mifflin Harcourt, Second College Edition, 2014
53. Elizabeth Cady Stanton and the Revising Committee : The Woman's Bible, England : the Church of England , 1898
54. J. Gere & C. C. Helwig : Young adults' attitudes and reasoning about gender oles in the family context. "Psychology of Women Quarterly, 36", California: Sage Publications, 2012
55. Londa Schiebinger : Has Feminism Changed Science? : Science and Private Life, Cambridge: Harvard University Press, 1999
56. Eisenhart, A. Margaret, Finkel, Elizabeth : Women (Still) Need Not Apply: The Gender and Science Reader. New York: Routledge, 2001
57. Brainard, G. Susanne, Carlin, Linda : A six-year Longitudinal Study of Undergraduate Women in Engineering and Science: The Gender and Science Reader, New York: Routledge, 2001
58. Jacues Gelis : History of Childbirth, Boston: Northern University Press, 1991
59. W.F Bynum & Roy Porter : Companion Encyclopedia of the History of Medicine, London and New York: Routledge, 1993
60. Eisenhart and Finkel : Ch: 1 in The Gender and Science Reader ed. Muriel Lederman and Ingrid Bartsch, New York, Routledge, 2001
65. Marguerite Angelari : Hate Crime Statutes: A Promising Tool for Fighting Violence Against Women, in Gender and American Law, Sereies Editor: Karen J. Maschke, New York and London, Garland Publishing, Inc, 1997
66. E. Prügl, (Director) : Violence against Women, (Geneva, Switzerland: Gender and International Affairs Class 2013, 25 November), Lecture conducted from The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID).
67. G. Krantz and C. Garcia-Moreno : Violence against Women. Journal of Epidemiology and Community Health, London, 59(10), October 2005
68. L. Visaria : Violence against Women: A Field Study, Mumbai: Economic and Political Weekly, 35(20), 2000
69. Safer Lives : Changed Lives, a shared approach to tackling violence against women in Scotland, (Edinburgh: Safer Scotland, Scottish Government, 2009
70. European Parliament : European Parliament Council Official Journal, C*OUNCIL DIRECTIVE,* (Directive 2002/73/EC - equal treatment of 23 September 2002

Dhaka University Institutional Repository

71. Dr Etienne G Krug, James A Mercy PhD, Linda L Dahlberg PhD, Prof Anthony B Zwi PhD : The world report on violence and health". Amsterdam, Netherlands: Volume 360, No. 9339, 5 October 2002

72. Mary Dickson : *No Safe Place: Violence Against Women*. Ireland, Patricia, A PBS Documentary Film Script, 1996, PBS

73. Berne Stedman : *Right of Husband to Chastise Wife'*, Virginia Law Register **3** (4), August 1917

74. Penelope Harvey & Peter Gow : *Sex and violence: issues in representation and experience*, Routledge, Psychology Press, 1994

75. Donatella Barazzetti, Franca Garreffa, Rosaria Marsic : National Report: Italia, "DAPHNE PROJECT "PROPOSING NEW INDICATOORS: MEASURING VIOLENCE'S EFFECTS. GVEI", ITALIA: Centre Women's Studies "Milly Villa", University of Calabria, Rende, July 2007

76. Violence Against Women Act : Office of Violence against Women (OVM). "The History of the Violence Against Women Act", U.S. Department of Justic, Visited on 20 June, 2015

77. Sarah Venis, Richard Horton : "Violence against women: a global burden". Netherlands: Elsevier, Volume 359, No. 9313, 6 April 2002

78. Claudia Garcia-Moreno : 2005, WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women. Switzerland: WHO.

79. Susana T. Fried : Violence against Women, Health and Human Rights, Harvard University: Harvard School of Public Health/François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, 2003, Vol. 6, No. 2, Violence

80. Lisa Colarossi : Journal of Social Work Education, A RESPONSE TO DANIS & LOCKHART: WHAT GUIDES SOCIAL WORK KNOWLEDGE ABOUT VIOLENCE AGAINST WOMEN? Oxford shire: Taylor & Francis Ltd. Council on Social Work Education, WINTER 2005), Vol. 41, No. 1

81. KRIS CLARKE : International Perspectives in Victimology, Academic Journal, The Paradoxical Approach to Intimate Partner Violence in Finland, Tokiwa International Victimology Institute (TIVI) and The Press at California State University, August 2011, Vol. 6, Issue 1

82. Lori B. Girshick : "No Sugar, No Spice: Reflections on Research on Woman-to-Woman Sexual Violence." Violence Against Women, New York, Warren Wilson College: December 2002, Vol. 8 No. 12

83. Hugh Chisholm : General Editor, The new Encyclopedia Britanica, UK, USA: Encyclopedia Britanica, 1911, V. 4

84. Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg James A. Mercy, Anthony B. Zwi and Rafael Lozano : World report on violence and health, Geneva: World Health Organization, 2002

Dhaka University Institutional Repository

85. Hedge Barbara : Edited by Jenny Petrak, The Trauma of Sexual Assault Treatment, Prevention and Practice. Chichester: John Wiley & Sons, 2003

86. United Nations Survey : Rape at the National Level, number of police recorded offenses, United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems (UN-CTS)

87. Sexual Assault in America : American Medical Association, Sexual Assault in America, Chicago: AMA, 1995

88. Antonia Abbey, Renee BeShears, A. Monique Clinton-Sherrod, Pam McAuslanof : Women Quarterly, "Similarities and differences in women's sexual assault experiences based on tactics used by the perpetrator", Department of Community Medicine and Psychology, Wayne State University, 2004, Issue: 28

89. William O'Grady : Crime in Canadian Context: debates and controversies, London, Oxford University Press, 2011

90. Jennifer Temkin : Rape and the legal process, Oxford University Press, 2002

91. Marita Kieler : Tatbestandsprobleme der sexuellen Nötigung, Vergewaltigung sowie des sexuellen Mißbrauchs widerstandsunfähiger Personen, Tenea; 2003

92. Farah Faizal, Swarna Rajagopalan : "In Public Spaces: Security in the Street and in the Chowk", Women, Security, South Asia: A Clearing in the Thicket, California: SAGE Publications, October 3, 2005

93. Emerson Dobash, Rebecca, Russell : Rethinking Violence Against Women, California: SAGE Publications, 1998

94. Editorial Board : Britannica, USA: Encyclopaedia Britannica, Inc, 1768, Vol.5

95. Mangai Natarajan : "Role of Women Police", Women Police in a Changing Society: Back Door to Equality, Farnham, UK: Ashgate Publishing Ltd, 2008

96. Krishan Vij : Textbook of Forensic Medicine and Toxicology: Principles and Practice, 5th Edition, Elsevier India, 2003

97. Jordan Swanson : 'Acid attacks: Bangladesh's efforts to stop the violence', Harvard University: Harvard Health Policy Review, 2002, **3** (1)

98. Bernard M Levinson : Gender and Law in the Hebrew Bible and the Ancient Near East, (2004)

99. The Asia-Pacific Journal : Tessa Morris-Suzuki, Japan's 'Comfort Women': It's time for the truth (in the ordinary, everyday sense of the word), The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, March 8, 2007

100. Andrea Dworkin : Scapegoat: The Jews, Israel and Women's Liberation, Free Press, 2000

101. Susan brownmiller : 'Against our will', In William F. Schulz, The Phenomenon of Torture: Readings and Commentary. University of Pennsylvania Press, 2007

102. Cheryl Hanna : 'No Right to Choose: Mandated Victim Participation in Domestic Violence Prosecutions,' Harvard Law Review, 1996, Vol. 109

103. Leo Beletsky, Gustavo Martinez,

Dhaka University Institutional Repository

Tommi Gaines : 'Mexico's northern border conflict: collateral damage to health and human rights of vulnerable groups', Washington: Rev Panam Salud Publica, May. 2012, vol.31 n.5

104. Steffanie A Strathdee, Remedios Lozada, Gustavo Martinez : 'Social and structural factors associated with HIV infection among female sex workers who inject drugs in the Mexico-US border region', published: April 25, 2011

105. Bettina Shell-Duncan : 'From Health to Human Rights: Female Genital Cutting and the Politics of Intervention', American Anthropological Association, First published: June 2008

106. Martha Nussbaum : Sex and Social Justice, USA: Oxford University Press, 2000

107. Dubravko Habek : "Possible feto-maternal clinical risk of the Kristeller's expression", Central European Journal of Medicine, Jun 2008, Volume 3

108. Julie M.L.C.L. Dobbeleir, M.D., Koenraad Van Landuyt, M.D., Ph.D., and Stan J. Monstrey, M.D., Ph.D : 'Aesthetic Surgery of the Female Genitalia', Seminars in Plastic Surgery, May 2011, 25(2)

109. I.O Fernández : 'PTSD and Obstetric Violence', Midwifery Today, 2013, Volume 105

110. Catherine Palmer : Violence against women and sport: Literature review, London: Durham University, 2011

111. Siwan Anderson : The Economics of Dowry and Brideprice. Journal of Economic Perspectives, 2007, Volume 21

112. Santi Rozario : Purity and Communal Boundaries: Women and Social Change in a Bangladeshi Village, Dhaka: The University Press Limited 2004.

113. Attila Ambrus, Erica Field, Maxio Torero : Muslim family law, prenuptial agreements and the emergence of dowry in Bangladesh. The Quarterly Journal of Economics 2010), 125 (3), 1349-1397

114. Hanne Cecilie Geirbo, Nuzhat Imam : The Motivations Behind Giving and Taking Dowry Research Monograph Series No. 28, BRAC, July 2006

Dhaka University Institutional Repository